মৃত্যু ও পরলোক

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬২
জানুয়ারী ১৯৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৭২, এপ্রিল ১৯৬৫।

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণে
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

প্রকাশকের বক্তব্য

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ দৈহিক মৃত্যুর পরও একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। সেইজন্য মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দেশে নানা নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিচিত্র ধরনের পারলৌকিক ক্রিয়া ছিল—যে ক্রিয়াগুলি আধুনিক মানুষের কাছে যে-কোন রোমহর্ষক উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষাও চমকপ্রদ। গ্রন্থ শেষে তার নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস দেওয়া গেল।

মৃত্যুর পর কোন সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থাকে কিনা তা নিয়ে মানুষের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেইজন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও অধিমনোবিজ্ঞান এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যে সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে সেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিস্তৃত আলোচনা দিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ করা হল। শেষ অংশে এ বিষয়ে ভারতীয় যোগীরা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক স্বীয় যোগবললব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সেই কাহিনীও ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন মানুষের সূক্ষ্ম আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা এবং ভারতীয় যোগীদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যজ্ঞান বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। মৃত্যু ও পরলোক নিয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। পাঠকের ত্রিমাত্রিক চিন্তাধারায় এই গ্রন্থ সুনিশ্চিতভাবে নতুন ভাবনা যুক্ত করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরলোক সম্পর্কিত এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরার দায়িত্ববোধ থেকেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে

লেখকের বক্তব্য

বর্তমান গ্রন্থটি মৃত্যু ও পরলোকের ওপর লিখিত। দেখা যাচ্ছে সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানুষ এই প্রশ্ন নিয়ে রীতিমত ধাঁধায় আছে। তবে সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে আধুনিক যুগের উষালগ্ন পর্যন্ত মানুষ প্রায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করে এসেছে যে, মৃত্যুই সব নয়, মৃত্যুর পরেও কিছু আছে। [যদিও ভারতবর্ষে কিছু কিছু সাধক, যেমন অজিত কেশকম্বলিন, বৃহস্পতি, চার্বাক প্রভৃতি, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকর করেন নি]। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অংশে মৃত্যুর পর যথার্থ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও অধিবৈজ্ঞানিক আলোচনা দিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ করা হল। সঙ্গে দেওয়া হল ভারতীয় যোগীদের এবিষয়ে যোগলব্ধ অভিজ্ঞতা। সর্বশেষে দেওয়া হল স্থূল দেহের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পৃথিবীর নানা জাতি ও গোষ্ঠী যে ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছিল তার বিস্তৃত নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা। গ্রন্থটি যদি বস্তুবাদী মানুষের মনে সামান্য মাত্রও চিন্তার পরিবর্তন আনতে পারে তবে যে উদ্দেশ্যে এই কলম ধরা তা সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়াতে পাঠকবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—গ্রন্থকার

তরুণ সাহিত্যিক বিপ্রদাস ভট্টাচার্য

ও

অনুজপ্রতিম অধ্যাপক শুভেন্দু বারিককে

এই লেখকের :

দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ যন্ত্রস্থ)

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড

পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড

ঈশ্বর মরে গেল

মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (৩য় সং)

সহস্রারের পথে (২য় সং)

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী প্রভৃতি।

উপক্রমণিকা

বিজ্ঞান, অধিমনোবিজ্ঞান ও মৃত্যু

বিজ্ঞানে মৃত্যু বলতে বোঝায় মানুষের দেহের মধ্যে যে জটিল রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়া আছে তার ব্যর্থতা, দেহের মধ্যে যে জীবিত স্নায়ু আছে তার সঙ্গে পরিবেশের প্রতিনিয়ত দেওয়া-নেওয়ার খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া। দেহের ভেতর থেকে যে অনবরত তাপ বা শক্তি বিনির্গত হচ্ছে, মৃত্যুতে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু ক্রমপর্যায়ে হয়, হঠাৎ নয়। তবে এও সত্য যে, একবার প্রাণশক্তি-ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে, প্রচণ্ড রকমে আঘাত পেলে মুহূর্তের মধ্যে যে ক্ষতি হয়, তা অপূরণীয়। দৈহিক মৃত্যু হবার পরও কতকগুলি দেহতন্ত্রী অনেকক্ষণ সময়ের জন্য বেঁচে থাকতে পারে। যেমন মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেও চোখের জীবন্ত কর্নিয়া তুলে এনে অপরের চোখে আলো দেওয়া চলতে পারে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে স্বাভাবিকভাবে স্নায়ুতন্ত্রী ক্ষয়ে গিয়ে মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। তবু অনেক সময়ই অকালমৃত্যু হয়। হয় রোগে, যুদ্ধে, মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে। কিন্তু বিজ্ঞানের মৃত্যু মৃত্যুই। মৃত্যু মানে প্রাণশক্তির ব্যর্থতা। এই প্রাণ নতুন করে বিজ্ঞানীরা আর দিতে পারেন না, তৈরিও করতে পারেন না। যা তাঁরা তৈরি করতে পারেন না, তার উৎসও তারা জানেন না! উৎস যদি না জানা যায় অন্তও জানা অসম্ভব! সুতরাং মৃত্যুর আগে ও পরে তাদের কাছে আর কিছুই নেই। নবজন্ম হল ধারাবাহিক জীবসত্তার সংমিশ্রিত রাসায়নিক ক্রিয়া। মৃত্যু হল এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যর্থতা। এর বাইরে বস্তুবিজ্ঞানের আর কিছু বলার নেই। সেই জীবনের উষালগ্ন থেকে মানুষ যে দেহের পরও একটি বিশেষ সূক্ষ্ম সত্তা ও সূক্ষ্ম জগতের কথা বলে আসছে বস্তু-বিজ্ঞান তাতে সায় দিতে পারছে না। কারণ বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রে এর বাইরে আর কিছু ধরা পড়ে নি। যা হাতেনাতে ধরা যায় না, বস্তুবিজ্ঞানীরা তাতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞান যখন বহির্বিশ্ব ছেড়ে নিজের অন্তর্জগতে ঢুকেছে তখনই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কাছে ধরা দিয়েছে আর এক নতুন জগৎ যাকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন অধিমনোবিজ্ঞান। পদার্থ বিজ্ঞান আজ তার অতি দুর্ধর্ষ অগ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে এমন সব সূক্ষ্ম সত্তার সন্ধান দিয়েছে যার ফলে অধিমনোবিজ্ঞানের বহু আহৃত তথ্যই যেন স্থির বিশ্বাসে তার উপর পা ফেলে দাঁড়াতে পারছে।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নিজেদের অন্তস্তলে ডুব দিয়েই যেন চমকে উঠেছেন। তারা দেখছেন, বাইরে যেমন বিশ্বজগৎ আছে অন্তরের মধ্যেও রয়েছে তেমনই কোন ব্রহ্মাণ্ড। অবাক হয়ে নিজের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম সত্তা ও রঙের খেলা দেখে, বিশ্বজগতের লীলা প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য বিস্ময়ে সে বলে উঠেছে "The heart has its reason of which reason knows nothing' (Pascal). অর্থাৎ আত্মর সত্তার নিজস্ব

কর্মের ধারা মানুষের বিবেকসত্তা বিচার বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারে।
এই জন্যই তাঁরা বলেছেন—'The proper study of mankind is man' অর্থ
মানুষের চর্চার যথার্থ ক্ষেত্র হল সে নিজে। এই যে তার নিজস্বতা এটা তার বহিরঙ্গ
নিজস্বতা নয় অন্তরঙ্গ নিজস্বতা অর্থাৎ এখানে সে সামাজিক মানুষ নয় ব্যক্তি-মানুষের
আন্তর সত্তা।[১]

এই আন্তরসত্তা বা মানুষকে চর্চা করতে গিয়ে মানুষ দেখল, যে মানুষের, মন
মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে তার আন্তর রহস্যে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে আমাদের জগ
কাজ করে প্রকৃতির নিয়মে, যে নিয়মের বাইরে কোথাও এক পা ফেলার উপায় নেই।
অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই এমন অনেক ঘটনা ঘটছে বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলে
না। কোনটা ঘটছে অদ্ভুত সমস্যাময় এক মুহূর্তে, কোনটা ঘটছে মৃত্যুর মুহূর্তে বা
ভয়ংকর বিপদের মুখে। দেখা যাচ্ছে, এক মন বহুদূরে আর এক মনের সঙ্গে কথা
বলছে বিনা মাধ্যমে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বস্তুগ্রাহ্য নিয়মের বাইরে। যেমন, কেউ
হয়তো চিন্তা করছে তার কোন এক বন্ধুর কথা, তক্ষুনি বেজে উঠল তার ফোন,
যেন, মনের জোরেই ডেকে নিয়ে আসা হল তাকে। কেউ বা স্বপ্ন দেখে পরের দিন
দেখলেন, স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। এ সব ঘটনার জবাব কি? জবাব এই :—
দেহের পরিধি ছাড়িয়েও মনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে আছে সীমার অতীত এক জগৎ
জুড়ে। দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা বিজ্ঞানস্বীকৃত নয়, মানুষ সেই
ক্ষমতারই পরিচয় দিচ্ছে। এই প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষকে কেউ সম্মান করছে জ্ঞানী-
ব্যক্তি বলে, আবার পশ্চিমী জগৎ তাদের দিকে তাকাচ্ছে কৌতুহলের দৃষ্টিতে, ভয়ের
দৃষ্টিতে, সন্দেহের দৃষ্টিতে।

প্রশ্ন জেগে উঠছে—বাইরের বস্তুগ্রাহ্য জগৎ ও আমাদের আন্তর জগতের মধ্যে সম্পর্ক
কি? অনেক সময়ে মনে হয় জগৎ চলেছে তার নীতিসম্মত পথেই এবং আমরা যারা
এই জগতের অধিবাসী আমরাও চলেছি লজিক অনুযায়ী। অথচ এমন সব ঘটনা
দিনরাত আমাদের আশপাশে ঘটে চলেছে যা লজিকের ধার ধারে না। হয়তো সাধারণ
একটি মানুষই অনুভব করলেন যে, নিজের দেহকেই তিনি যেন বাইরে থেকে দেখছেন!
তার মনে হল তার ব্যক্তিসত্তা আর দেহ যেন অবিচ্ছিন্ন কোন একক নয়। অনেকে
সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে বলেছেন, এমন এক সময় আছে যেখানে দেহ এবং
চৈতন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেহ নিথর হয়ে চলে কিন্তু চৈতন্যসত্তা সক্রিয় থাকে।
তাহলে কি আমাদের আন্তর জগৎ ও বহির্সত্যের মধ্যে রহস্যময় একটা সম্পর্ক রয়েছে?
আমাদের ভেতরকার সত্তা যেন আমাদের স্বপ্নেরই মত চমকপ্রদ, খেয়ালী ও রহস্যময়।
তক্ষুনি প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে স্থান, কাল আর মরণশীলতা কি আমরা যেমন চিন্তা

১ Landmark of the World's Art, The Modern world, Edt, Norbert Lynton, Paul Hamlyn London, p 8, Introduction.

...নই সীমাবদ্ধ ? মানুষ কি নিজের জৈব দেহ পরিত্যাগ করে ভিন্নমানের একটা ...হ যেতে পারে ? আবার সেই অস্তিত্ব থেকে ফিরে এসে নিজের জৈবিক দেহে ...বেশ করতে পারে ? অধিমনোবিজ্ঞানীদের কাছে এ ব্যাপারে যে-সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর এসেছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে রহস্যের যেন কিনারা নেই। যেমন, ১৮২৮ খ্রীঃ রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের এক বাণিজ্য-জাহাজের মেট বা অধ্যক্ষের সহকারী কর্মচারী ...ছিলেন। তাঁর জাহাজ চলাফেরা করত ইংল্যান্ড, লিভারপুল ও কানাডার মধ্যে। ...একদিন অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর কেবিনে বসে আছেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। ...ন স্লেটের উপর কি লিখছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল এত ভয়াবহ উদ্বেগাকুল যে, তিনি ভয় পেয়ে দৌড়ে গেলেন ক্যাপ্টেনের কেবিনে। ক্যাপ্টেন তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমি পাগল হয়ে গেছ। ছয় সপ্তাহ পেরিয়ে এসেছি। এখানে লোক আসবে কোত্থেকে ? যাও, আবার গিয়ে দেখ। ব্রুস বললেন, 'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা আমি একা প্রত্যক্ষ করিনি।'

একথা শুনে ক্যাপ্টেন এবং ব্রুস দুজনে মিলেই গেলেন ব্রুসের কেবিনে। দেখলেন, সেখানে টেবিলের উপর বিছানো স্লেটের এক পিঠে লেখা রয়েছে, 'উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ ঘোরান।'

ক্যাপ্টেন লেখা দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে, এ লেখা তাঁদের মধ্যে কারো নয়। তা সত্ত্বেও নানা জনের হাতের লেখা মিলিয়ে নিয়ে দেখলেন। না, এ লেখা কারও নয়। তাহলে ? জাহাজ খুঁজে অপরিচিত কাউকে পাওয়া গেল না। সুতরাং হাওয়া অনুকূলে ...কার জন্য জাহাজ ঘোরানো হল। তিন ঘণ্টা চলার পর ক্যাপ্টেন খবর পেলেন যে, ...সমান বরফখণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে একটি জাহাজ। ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে ...লেন, বহুলোক রয়েছে জাহাজে। জাহাজটি প্রায় বিধ্বস্ত। বরফে জমে গেছে। ...রা তখনও বেঁচে আছে তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি উদ্ধারকারী নৌকো পাঠালেন। যখন তৃতীয় নৌকো থেকে ব্রুসের জাহাজে লোক এসে উঠতে লাগল, ব্রুস ...দেখে অবাক হলেন যে, তাদেরই মধ্যে রয়েছে সেই লোক যাকে তিনি তাঁর টেবিলে বসে লিখতে দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন এবং ব্রুস সেই লোকটির কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন। তার হাতের লেখা পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল হুবহু সেই স্লেটে লেখা হস্তাক্ষর। সেই স্লেটের শূন্য দিকটাতেই তার হাতের লেখায় ঐ একই বক্তব্য লেখানো হয়েছিল, 'উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ ঘোরান।' স্লেট উল্টে অপর পিঠের লেখা মিলিয়ে দেখা গেল হুবহু এক।

লোকটিকে এই লেখা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হল। সে বলল, ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আমি শুধু একটি শব্দই লিখেছিলাম। বাকী শব্দ লিখল কে ? তারও যেন বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সে শুধু এইটুকুই মনে করতে পারল যে, সেদিন দুপুরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে সে শুধু বলেছিল যে, সে নিঃসন্দেহ এ যাত্রায় সবাই বেঁচে যাবে, ত্রাণ-জাহাজ আসবে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন

দেখেছিল যে, সে অন্য একটা জাহাজে রয়েছে, যে জাহাজ তাদের উদ্ধার করতে আসছে। বিধ্বস্ত সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনও তার বক্তব্য স্বীকার করে নিলেন, অর্থাৎ লোকটি একথাই বলেছিল এবং রুসের জাহাজের নির্ভুল বর্ণনাও দিয়েছিল।

ব্যাপারটি হল, কি করে ঘটনাটি ঘটল? এর জবার অধিমনোবিজ্ঞান দিয়েছে এই বলে ঃ—OOBE অর্থাৎ out of the body expeience. অর্থাৎ দেহসত্তার বাইরের অভিজ্ঞতা। এরকম আরও বহু ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণ করে অধিমনোবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছে যে, জৈব দেহের বাইরেও মানুষের স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে। এই জন্যই সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম ও গুহ্যবিদ্যা বলে এসেছে যে, আমাদের এই বস্তুগ্রাহ্য দুনিয়ার বাইরেও বহু সূক্ষ্ম অস্তিত্ব আছে সেখানে স্থান কাল ও মরণশীলতার তত্ত্ব কাজ করে না। আশ্চর্য কাণ্ড এই যে, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান এবং মনোস্তত্ত্ব ও দর্শনের অগ্রগতি এই ধর্ম ও গুহ্যবিদ্যার সমর্থনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সত্য নির্ণয়ে বস্তুগ্রাহ্য জ্ঞানই যে একমাত্র উপায় তা অগ্রাহ্য হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী তাই বলতে আরম্ভ করেছেন যে, 'আমাদের ইন্দ্রিয় ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই ইন্দ্রিয় কেবল আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বাস করার পক্ষেই সহায়ক। এদের মূল কাজ হল চতুর্দিকে যত বিভ্রান্তিকর ঘটনা রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন্‌টা আমাদের প্রকৃত বাঁচার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাই বেছে নেওয়া।' কিন্তু বস্তুগ্রাহ্য সাধারণ বিচারে এর কোন অর্থ ধরা পড়ে না। তাই সাধারণ মানুষ একে কোন মূল্য দিতে রাজি নয়। অথচ বর্তমানকালে পদার্থবিদ্যা, মনোস্তত্ত্ব এবং দর্শন—এই ধর্মীয় ও গুহ্যজ্ঞানের প্রতিই যেন সমর্থন জানাতে যাচ্ছে। এবং সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিই যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা নয় একথাই বলতে চাচ্ছে। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্রমোন্নতি ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান দেবার জন্য নয়। এটা শুধুমাত্র আমরা যে পরিবেশে বাস করি সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য।[১] ইন্দ্রিয়ের মূল কর্তব্যই হল নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর যে-সব ঘটনা আমাদের ঘিরে রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন্‌টা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সেটিকে বেছে নেওয়া।

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এই সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে সেই সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান আমরা পাব কেমন করে? অনেকেই দাবি করছেন যে, এই সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান তাঁরা জানেন। কিন্তু সেই জানার পর্যায়কে ধর্তব্যের মধ্যে এনে প্রমাণ করে না দিতে পারলে কিছুতেই তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মানুষের একটা সূক্ষ্ম সত্তা যে দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এ ব্যাপারে কয়েক বছর আগে Mrs. Eileen Garret নামে এক মহিলা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

১ Mysteries of the Inner Self, Stuart Holroyd, p. 13.

থাকতেন নিউ ইয়র্কে। একবার সূক্ষ্ম দেহে আইসল্যান্ডের রেক্‌জভিক (Reykjavik, Iceland)-এ এক ডাক্তারের ঘরে বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বহু ডাক্তার এই সময় আইসল্যান্ডের রেক্‌জভিক নামক স্থানে সেই ডাক্তারের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারটি তাঁর অফিস ঘরের টেবিলের উপর নানা জিনিস রেখেছিলেন যেগুলির কথা মিসেস ইলীন গ্যারেটকে বলতে হবে। পরীক্ষায় তিনি উত্তরে যান। নিউ ইয়র্কে বসে মিসেস ইলীন গ্যারেট নির্ভুলভাবে সেই দ্রব্যগুলির বর্ণনা দেন। শুধু তাই নয় সেই সময় ডাক্তারটি যে বই পড়ছিলেন তার প্রতিটি ছত্রও তিনি বলে যান। ডাক্তার বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, এই সময় তিনি মিসেস ইলীন গ্যারেটের উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু বর্তমান লেখকের ধারণা, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে সূক্ষ্ম দেহের কোন কিছু, তা নয়। কারণ, তিনি নিজে এ ধরনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডঃ ভট্টাচার্যের সামনে। তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই মহিলা থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের কাছে নিজের বাড়িতে। তিনি লন্ডনে তাঁর নিজের মেয়ের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। লেখক বলেছিলেন যে, তিনি শিক্ষকতা করেন। এবং গত জুন মাসে (১৯৮৮ খ্রীঃ) লণ্ডনে দ্বিতীয় বাড়ি কিনেছেন। তাঁর সন্তান সর্দিকাশিতে ভোগে। ডঃ ভট্টাচার্য এতে বেশ অবাক হয়েছিলেন। লেখক ব্যাপারটিতে কোন সূক্ষ্মদেহের কার্যকলাপ বলে মনে না করে সমান্তরাল তরঙ্গের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছিলেন, যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থে রয়েছে। তবে সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বের কথা তিনি অস্বীকার করেন না। নিজেরই অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্মস্তরে প্রবেশ করলে সেখানে নিজেরই সূক্ষ্মদেহকে আশ্চর্যভাবে দেখা যায়।

নিউ ইয়র্কের শিল্পী Ingoswann-ও এধরনের অভিজ্ঞতার বহু বর্ণনা দিয়েছেন। অধিমনোবিজ্ঞানে একে OOBP বলা হয়—অর্থাৎ দেহের বাইরে গিয়ে সূক্ষ্মদেহে দর্শন (out of the body perception)। সূক্ষ্মদেহ আকাশ পথে যায় বলে অনেকে একে 'আকাশ পরিক্রমা' বা Astral Travel বলেন।

মানুষের এই সূক্ষ্ম সত্তার অভিজ্ঞতার কথা লিও টলস্টয়ও বর্ণনা করে গেছেন। যখন বিখ্যাত মিডিয়াম ড্যানিয়েল ডগলাস হোম রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন তখন লিও টলস্টয় ও তাঁর স্ত্রী সেন্ট পীটার্সবার্গ রেলরোড স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁরা দেখেন যে, হোম গাড়ি থেকে নেমে সটান চলে গেলেন। তাঁদের চিনতেও পারলেন না। এতে আহত হয়ে টলস্টয়ের স্ত্রী হোমের হোটেলে তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দেন। সেই চিঠি হোটেলে পৌঁছুবার ঘণ্টা তিনেক পরে হোম এসে উপস্থিত হন। তাঁর এই ঘণ্টা তিনেক পরে এসে পৌঁছুবার কারণ, ট্রেনটিই তিন ঘণ্টা পরে এসেছিল। তাহলে টলস্টয় দম্পতি কাকে দেখেছিলেন? অধিমনোবিজ্ঞানীদের মতে টলস্টয় দম্পতি হোমের দ্বিতীয় সত্তাকে দেখেছিলেন। এই

সত্তা সূক্ষ্মসত্তা যা আকাশ পরিভ্রমণ করে মুহূর্তের মধ্যে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে।

দেহের বাইরে এই অভিজ্ঞতার (OOBE) জন্য অধিমনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মন ও দেহ একটা আধার মাত্র। একটা এনভেলপের মত। মানুষের যথার্থ সত্তা এই দেহের মত নয়।

বহুলোক, যাদের সাময়িকভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়েছে, তাদের আন্তর সত্তা দেহের খোলস ছেড়ে এসে উপর থেকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে নিজেদেরই জড়দেহটাকে উদাসীনভাবে লক্ষ্য করে দেখেছেন। বরং যেন দেহের খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন এমন বোধ করেছেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানার পর যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, মানুষের দেহ তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক নয়, তাহলে একই স্থূলদেহধারী ব্যক্তি একই সঙ্গে বহুলোককে দেখা দিতে পারেন। অতি প্রাচীনকালে মানুষের এ অভিজ্ঞতাই তাদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সূক্ষ্মসত্তার মধ্যেই মানুষের কর্মফল নিহিত থাকে। তারই ভারে আবার তাদের জন্ম হয়। মানুষের কর্মফল সূক্ষ্মসত্তার যে জিনিসে আশ্রয় নিয়ে থাকে বৈজ্ঞানিকেরা তাকেই বলেছেন Ectoplasm. এই একটোপ্লাজম নতুন জন্মে স্থূলদেহে এসে আশ্রয় নেয়। জন্মান্তরের এই তত্ত্বে আধুনিক অনেক মানুষের অবিশ্বাস থাকলেও প্রাচীনকালে প্রায় সব মানুষেরই বিশ্বাস ছিল—হিন্দু, বৌদ্ধ, যাযাবর, এবং নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। পৃথিবীর বহু ধর্মেই এই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস আছে। পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকালে পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিকেরা এই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। খ্রীষ্টধর্মে দ্বিতীয় অমর সত্তায় বিশ্বাস আছে। হিন্দুরা অবশ্য শূন্যতাবাদে শেষ পর্যন্ত কোন অমর সত্তায় বিশ্বাস করে না। মনে করে নির্বিকার এই শূন্যতায় মিশে গেলে তবেই আত্মা মোক্ষলাভ করে। বৌদ্ধ মতে জন্মমৃত্যুর বৃত্তের বাইরে নির্বাণ লাভ করে।

অধিমনোবিজ্ঞানে রবার্ট নামে এক ব্যক্তির সূক্ষ্মসত্তা সম্পর্কিত অদ্ভুত এক কাহিনী আছে। ঘটনাটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের। একটি ছায়া ছায়া হাওয়াভরা দিনে তিনি মিলড্রেড নামে এক বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে যান। সেদিন সমুদ্রে স্রোত ছিল প্রবল। সমুদ্র যথেষ্ট উত্তালও হয়েছিল। সুতরাং তাড়াতাড়িই তিনি তীরে ফেরার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্ষীণ একটি চিৎকার শুনতে পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে, ভীত সন্ত্রস্ত এক তরুণ একটি নৌকোয় ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি রবার্ট তাকে উদ্ধার করতে যান। তরুণটিকে তিনি নৌকোয় তুলেও দেন। কিন্তু তিনি নিজেই বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় হারিয়ে যান। বুঝতে পারেন, তিনি ডুবে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি জলেরও অনেক উপরে উঠে গেছেন। সেখান থেকে নিচে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। যে আকাশ ছায়া ছায়া ছিল সে আকাশ

যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর চারদিকে চলেছে রঙের খেলা ও নানা ধরনের গানবাজনা। তিনি অদ্ভুত এক প্রশান্তি বোধ করছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল নিচে তাঁর বন্ধু মিলড্রেড দু'জন লোকের সঙ্গে একটি রো-বোটে রয়েছে। তাদের নৌকোর কাছে ভাসছে অসাড় ও অস্পষ্ট একটি জিনিস। রবার্ট লক্ষ্য করে দেখলেন, সেই অসাড় বস্তুটি তিনি নিজেই। তিনি যেন ভারমুক্ত বোধ করলেন। এ দেহের তাঁর আর প্রয়োজন নেই। লোকগুলি দেহটিকে জল থেকে নৌকোয় তুলল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর বোধ হল যে, তিনি ঠাণ্ডা ও বেদনাদায়ক বেলাভূমিতে শুয়ে আছেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর স্থূলদেহে চৈতন্য ফেরাতে প্রায় দু ঘণ্টা সময় লেগেছিল। লোকের সাহায্যে বালকটিও বেঁচে গিয়েছিল।

বর্তমানে জানা যাচ্ছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পর অধিমনোবিজ্ঞান চর্চায় প্রতিযোগিতা করে চলেছে। লক্ষ্য আত্মিক শক্তির দ্বারা অপরের গোপন খবর জানা যায় কি না দেখা। এ ধরনের গুপ্তচরবৃত্তির চিন্তা বর্তমানে উদ্ভট মনে হলেও বাইবেল গ্রন্থে এর উদাহরণ আছে। ঘটনাটি এই রকম : একবার সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল। বার বারই সিরিয়ার রাজা কোন গোপন পথে ইস্রায়েলীদের উপর হঠাৎ আক্রমণ হানার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছিল। প্রত্যেক বারই দেখা যাচ্ছিল যে, যে পথে তিনি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলেন, ইস্রায়েলীরা সেখানেই তাদের সেনাবাহিনী সরিয়ে এনেছে। অতি গোপনে গৃহীত তাঁর এই পরিকল্পনা কি করে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ভেবে তিনি কুল পাচ্ছিলেন না। রাজার শয়নকক্ষে এই গোপন পরিকল্পনা করা হত। তাঁর মনে হল, তাঁরই একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা সেই গোপন পরিকল্পনা পাচার করে দিচ্ছেন। পরামর্শদাতাদের সকলকেই তিনি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠালেন। এঁদের মধ্যে একজন সাহসী ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, 'তাঁদের মধ্যে কেউই এই পরিকল্পনা ফাঁস করেননি।' বরং তিনি এক আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন, ইস্রায়েলীদের মধ্যে এলিশা (Elisha) নামে এক সন্ত ব্যক্তি আছেন, যাঁর আত্মিক শক্তি প্রচণ্ড। তিনিই সিরিয়ার রাজার গোপন পরিকল্পনার কথা ইস্রায়েলীদের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

সিরিয়ার রাজা এই গল্পে বিশ্বাস করলেন। এবং এলিশাকে বন্দী করবার পরিকল্পনা আঁকলেন। এলিশা যে শহরে ছিলেন সেই শহর অকস্মাৎ ঘিরে ফেলার জন্য তিনি সৈন্য পাঠালেন। এলিশা এটা বুঝতে পেরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ঈশ্বর প্রত্যেকটি সিরীয় সৈন্যকে অন্ধ করে দিলেন। এলিশা তাদের নিয়ে ইস্রায়েলের রাজার কাছে এলেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর খাইয়ে-দাইয়ে ফেরত পাঠালেন। বলাই বাহুল্য, এর পর অকস্মাৎ আক্রমণ করে সিরিয়া আর কখনও ইস্রায়েলকে বিব্রত করেনি। এলিশার এই গল্প প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালে আত্মিক শক্তি দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তি করা হত।

এই আত্মশক্তিকে পশ্চিমীরা বলছেন দ্বিতীয় সূক্ষ্ম সত্তা। বর্তমান লেখক মনে করেন এটা হল স্নায়ুতরঙ্গ। কিভাবে এই স্নায়ুতরঙ্গ কাজ করে লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ এই সূক্ষ্ম সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাঁরা ভাবতেন যে, নিদ্রাকালে মানুষের এই সূক্ষ্ম সত্তা বাইরে চলে যায়। ফলে ঘুমন্ত কোন ব্যক্তিকে তারা অকস্মাৎ জাগাবার চেষ্টা করতেন না, পাছে পরিভ্রমণরত আত্মা বা সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের মধ্যে আর ফিরে আসতে না পারে। এবং তা যদি হয়, তাহলে স্থূলদেহী ও সূক্ষ্মদেহীর মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। সেক্ষেত্রে স্থূলদেহের মৃত্যু ঘটবে।

এই যে ধারণা—মানুষের দ্বিতীয় একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে—যা স্থূল দেহের সঙ্গে একত্র থাকে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই স্থূলদেহ জীবিত থাকা কালেও এক ধরনের ভাবমগ্নতা বা ভরের মধ্যে সেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং স্থূল দেহের মৃত্যু হলেও এই সূক্ষ্মদেহ বেঁচে থাকে—তা অতি প্রাচীনকালেও মানুষের মধ্যে ছিল। প্রাচীন লোকেরা মনে করত যে, প্রত্যেকটি জিনিসেরই আর একটি সূক্ষ্ম সত্তা আছে, যা স্থূল সত্তার কাছে দৃশ্য নয়। এই বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের জগতের অনুরূপ আর একটি সূক্ষ্ম জগৎও আছে। সেটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ মিথ্যে নয়। গাছগাছালি, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, নদী, হ্রদ সব কিছুরই এই সূক্ষ্ম সত্তা বা spirit আছে। গ্রহনক্ষত্রদেরও প্রাণসত্তা আছে। পৃথিবীতে এদের প্রভাব পড়ে। জগতে অনেক লুক্কায়িত শক্তি আছে যা পরস্পর পরস্পরকে টানে। এই বিশ্বাস থেকেই সর্বপ্রাণবাদ (animism) তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে কমপক্ষে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে। উদ্ভাবক একজন অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। তাঁর নাম মিলেটাস। তিনি থেলস্-এর অধিবাসী। তাঁর ভাষায় প্রত্যেকটি জিনিসই ঈশ্বরময়।'

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কাছে এ ধরনের চিন্তা ছিল অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞান এই ধারণার উপর স্থাপিত যে, এই স্থূল জগৎ ধীরে ধীরে মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও বিচার বিশ্লেষণের কাছে তার গোপন রহস্য ব্যক্ত করবে। বস্তুসত্তার উপস্থিতিতে প্রাচীনকালে কোন সন্দেহই ছিল না। তাঁরা মনে করতেন, প্রত্যেকটি জিনিসই ত্রিমাত্রায় (three dimensional space) বিরাজ করে। প্রত্যেকটি বস্তুই সূক্ষ্ম অণুর পরস্পরের সংযোগে গঠিত। এঁদের মধ্যে রয়েছে mass. এবং এই আণবিক জগৎ যান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনেই কারণ আছে। যা এই নিয়মের বহির্ভূত তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রাচীন এই সর্ব-প্রাণবাদকে ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞান শুধু অস্বীকারই করেনি ছেলেমানুষী ও অজ্ঞতা বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছে। প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ আজ আর অবিশ্বাসের বিষয় নয়। ত্রিমাত্রার জগতে

আইনস্টাইন চতুর্মাত্রাও সমন্বয় যুক্ত করেছেন। বর্তমান কোয়ান্টাম পদ্ধতি বহুমাত্রিক জগতের কথা চিন্তা করছে। Mass হল বৃহদায়তিক দ্রব্যের উপাদান মাত্র। অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এই mass অস্তিত্ব হারিয়ে তরঙ্গে পরিণত হয়। Massকে এনার্জি বা শক্তিতে পরিণত করা চলে। কোথাও কোথাও রয়েছে Negative mass যা সময়ের বিচারে পেছনের দিকে চলতে পারে। এই ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রে (Microscopic level) কারণ ছাড়াই ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও দেখা যায় ফলই আসছে কারণের আগে। যান্ত্রিক নিয়ম ভেঙে গিয়ে গাণিতিক সম্ভাব্যতার নিয়ম (Mathematical laws of probability) কাজ করে। ফলে বিংশ শতকের বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞান থেকে সরে এসেছে। এবং বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদকে সমর্থন জানাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা ক্রম উচ্চ পর্যায়ে জৈব স্নায়ু বিচার করতে গিয়ে দেখছেন যে, ক্রমশই এমন এক পর্যায়ে এসে তাঁরা পৌঁছোচ্ছেন, যেখান থেকে বলা যাচ্ছে না যে, স্বতন্ত্র চেতনা বলতে কিছু নেই। যা যেভাবে দেখা যাচ্ছে তা সে ভাবেই আছে একথা আর ভাবা যাচ্ছে না। ভিন্ন মাত্রার এক অস্তিত্ব অনুমান করা যাচ্ছে, যা মানুষের বিচারবুদ্ধিতে সহজে ধরা দেবার নয়।

সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা অধুনা মানুষের দেহের শক্তিক্ষেত্র (energy field) বা আলোকবৃত্ত (Auras)-এর সন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এই আলো দেহের প্রাণময় স্নায়ু থেকে নির্গত হয়। গুহ্যবিদ্যার অধিকারী লোকেরা দাবি করেন যে, তারা খালি চোখেই মানুষের দেহের এই আলোকবলয় দেখতে পান। ইদানীং ইলেকট্রো-ফটোগ্রাফি সেই দাবিকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের দেহকে আবরিত করে আছে এক ধরনের শক্তিবৃত্ত বা বাইয়োপ্লাজমিক দেহ (bioplasmic body)। এটাই দ্বিতীয় দেহ। ভারতীয় যোগীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই বৃত্তের মধ্যে আরও ছয়টি বা সাতটি স্তর আবিষ্কার করেছেন। এই প্রত্যেকটি বৃত্তই এক একটি দেহ বলে তাঁদের ধারণা। এই সূক্ষ্মদেহই আকাশ পরিভ্রমণ করতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক লেখক প্লুতার্ক দাবি করেছিলেন যে, মানসিক, জৈব ও মানুষের সত্তার চরিত্রের উপর দেহের এই আলোকবলয় নির্ভর করে। এক এক দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় এই আলোর বর্ণ ভিন্নতর হয়। ভারতীয় যোগীরা দেহের মধ্যে সাতটি স্থানে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সপ্ততলে দেহের মূলাধারস্থ শক্তির উন্নয়ন পর্যায়ে এক এক স্তরে এক ধরনের বর্ণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যেমন মূলাধারে লাল, স্বাধিষ্ঠানে সবুজ, মণিপুরে সাদা, অনাহতে নীল, বিশুদ্ধে গভীর নীল ও আজ্ঞাচক্রে বিস্ফোরণ জাত নানা বর্ণ ও সপ্তলোকে জ্যোতি সদৃশ্য আলো। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও আবিষ্কার করেছেন যে, দেহের অবস্থার উপর জৈবিক দেহ ঘিরে যে রঙ আছে তা কখনও ম্রিয়মাণ, কখনও উজ্জ্বল, কখনও বর্ণময়, কখনও বর্ণহীন হয়ে থাকে।[১]

১ Mysteries of the Inner Self, Holroyd. p. 28

বিজ্ঞানের আর একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার এই যে, মানবদেহ এক এক জায়গা থেকে আশ্চর্য রঙ ছড়ায়। দেহের এই বিভিন্ন অংশের রঙের সঙ্গে চীনের আকুপাংচার বিজ্ঞানের নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। চীনের আকুপাংচারবিশারদরা মনে করেন যে, মানবদেহের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অদৃশ্য বৃত্তাকার রেখা। এই রেখা বা লাইনের মধ্য দিয়ে প্রাণসত্তা প্রবাহিত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই রেখার অত্যন্ত প্রয়োজন। এই রেখার কোন কোন সন্ধি অঞ্চলে সূচ ফুটিয়ে দিলে এই লাইনের অপর অঞ্চলে কোন ব্যথা-বেদনা থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এই রেখা (Meridian line)-র অস্তিত্ব ধরতে পারেন নি। আসলে চর্মচক্ষুতে এগুলো ধরাও যায় না। বর্তমান লেখক নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কোন মানুষ সম্পর্কে চোখ বুজে চিন্তা করলে তার যদি কোন রোগ থাকে যেমন কিডনীর অসুবিধা, সর্দিকাশি, রক্তপাত প্রভৃতি, রঙের মাধ্যমে তাঁর চোখে তা ধরা পড়ে যায়।

এই সূক্ষ্মদেহ সম্পর্কে ধারণা পূর্বদেশীয়দের মধ্যে বহুল প্রচলিত। তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা ও অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে এই বর্ণের প্রভূত অবদান রয়েছে। তারা মনে করেন, এটাই অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ। এই বর্ণদেহ এক ধরনের তরল জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি। স্থূলদেহ থেকে এটি ভিন্ন। স্থূলদেহের কোন কোন অংশের সঙ্গে এই সূক্ষ্মদেহের যোগ রয়ে গেছে। দেহের ষট্ বা সপ্ত চক্রের সাতটি অঞ্চলে এই সূক্ষ্ম দেহ স্থূলদেহকে স্পর্শ করে রয়েছে। এই চক্রগুলি মানবদেহের আত্মিককেন্দ্র। মানুষের দেহের উপর রঙের বলয়ের সঙ্গে বর্ণভেদ অনুসারে এদের সম্পর্ক রয়ে গেছে।

ব্রেজিলে এক ধরনের সূক্ষ্ম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে স্থূলদেহের উপর অস্ত্রোপচার না করে সূক্ষ্মদেহে এই অস্ত্রোপচার করা হয়। এতে স্থূলদেহকে মোটেই স্পর্শ করা হয় না। একজন ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ গাই প্লেফেয়ার (Guy Playfair) বহুদিন ব্রেজিলে ছিলেন। সে সময় তিনি এই ধরনের অস্ত্রোপচার লক্ষ্য করেছিলেন। 'ফ্লাইং কাউ' নামে একটি গ্রন্থে এডিভালডো সিলভা নামে এক স্কুল শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন তিনি, যিনি গত দশ বছরে এ ধরনের পঁয়ষট্টি হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর মেরুর পুরোহিত সম্প্রদায়, যাদের বলা হয় শমন (বৌদ্ধ শমনের অপভ্রংশ), আজও এদের মধ্যে অনেকেই টিকে আছে। স্থানীয় আদি অধিবাসীদের ধারণা, এরা সূক্ষ্মদেহে আকাশ পরিক্রমা করতে পারে। বস্তুজগতে যেমন তারা অনায়াসে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করতে পারে তেমনি পারে পরলোকেও। তাঁদের কথামত সূক্ষ্ম জগতে নানা ধরনের শক্তি, দেবতা ও দৈত্যদানো আছে— যারা কেবলমাত্র তাদেরই শক্তির কাছে নীত স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাদের কথা শোনে।[১]

১ Mysteris of the Inner Self—Stuart Holroyd. p. 32.

চরমানন্দ ভোগের যে গুহ্যসাধনা—এই সাধনা অনেকের মতে স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে যাবার আনন্দ (OOBE)। এই চরমানন্দকে ইংরেজীতে এই জন্যে বলে 'Ecstasy' যার অর্থ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা।[২] শমনরা নেচেকুঁদে, গান গেয়ে, অনশন করে, ধ্যানে মগ্ন থেকে, নেশা করার দ্রব্য খেয়ে নানাভাবে এই 'আনন্দ' পর্যায়ে বা 'ভর' জাতীয় পর্যায়ে পেঁছায়। এস্কিমোদের শমনেরা নাকি দেহের বাইরে দিনের পর দিন থেকে আকাশ বা সমুদ্রতলে তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। এই সময় তাদের দেহ জড়বৎ হয়ে থাকে, সমাধিতে যেমন ভারতীয় যোগীদের হয়।

আধুনিক স্নায়ুবিদেরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির চেতনা ক্রমশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্যাগ করে মস্তিষ্কের যোগাযোগ কেন্দ্রগুলিতে এসে আশ্রয় নেয়। এই যোগাযোগ কেন্দ্র ত্যাগ করে চিন্তাশক্তি যখন চলে যায়, তখন দেখা গেছে যে, দেহের ওজন আধ আউন্স বা তিন চতুর্থাংশ আউন্স কমে যায়। (মাতৃগর্ভে এই মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলিই প্রথম জটিল স্নায়বিক দেহের স্ফুরণ হিসেবে দেখা দেয়।) এতে প্রমাণ হয় যে, স্থূলদেহের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দেহও আছে। সেই দেহ সূক্ষ্মবস্তু দিয়ে গঠিত, ইদানীংকালে যাকে বৈজ্ঞানিকেরা 'প্লাজমিক বডি' বলতে আরম্ভ করেছেন। এই হাল্কা বস্তুটির নাম একটোপ্লাজম্।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুহ্যবিদ্যাবিদ্দের আকাশ-পরিক্রমা বিচার করে প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা এ ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি ধরনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যেমন,

(১) অনেকে বলেন যে, স্থূল দেহ ত্যাগ করার পর সূক্ষ্মদেহ তার স্থূলদেহের উপর সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে ভেসে থাকে। ইংরেজীতে বলা যায় **horizontal position.** সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর কয়েক মিনিট এইভাবে থাকে। তার পরই হঠাৎ বোধ করে যে, সূক্ষ্মদেহ সরলরেখায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(২) বাইবেলের **Book of Eclesiastes**-এ, স্থূলদেহের বাইরে একটি সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বের কথা আছে। এই সূক্ষ্মদেহের কথা দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মধ্যেও রয়েছে। এই সূক্ষ্মদেহ শমন বা যোগীরা ধ্যানমগ্ন থাকা কালে ভ্রূমধ্যস্থ পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সঙ্গে একটি সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সূত্রের চরিত্র তিন ধরনের, যেমন—পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্তি, দেখতে উজ্জ্বল এবং স্থূলদেহ থেকে যত দূরে যায় ততই এই যোগসূত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়।

(৩) সূক্ষ্মদেহ আকাশে উঠে গেলে এক ধরনের 'কুয়াশা কুয়াশা' স্তর অনুভব করে। স্তরটি ধূসর বর্ণের, ঘন এবং ভারি ভারি। চৈতন্য তখনও স্থূলদেহের আবরণের মধ্যেই থাকে। ফলে নতুন অবস্থায় সূক্ষ্মদেহের চৈতন্য কিছুটা বিভ্রান্ত ও মেঘাচ্ছন্ন থাকে। সহজে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না।

(৪) স্থূলদেহের সঙ্গে তখন কি ধরনের সম্পর্ক থাকে তা এই সূক্ষ্মদেহ নির্ণয় করতে পারে না। সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণকালে স্থূলদেহের অভ্যাস অনুযায়ী ব্যবহার করার

২ **History of Religion—Sergei Tokarev, p. 87-89.**

চেষ্টা করে। অনেকে অবাক বোধ করে যে, তারা দেয়াল দুয়ারাদি ভেদ করে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। দ্বিতীয় দেহ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ তখন এতটাই পার্থিব সত্তাবোধে আচ্ছন্ন থাকে যে, বুঝতেও পারে না যে, তার স্থূলদেহের শক্তি নেই, তার সীমাবদ্ধতাও নেই।

(৫) সূক্ষ্মদেহে একটা সতর্কভাব থাকে। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার পর এই সূক্ষ্ম সত্তা সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখার চেষ্টা করে। অনেকে আকাশ পরিক্রমা শেষ করে স্থূলদেহে ফিরে এসে বলেছেন যে, সেখানে চৈতন্যের সতর্কতা ও বিচারক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায়। সূক্ষ্মদেহ আরও অনেক বেশি সত্য ও নিজেকে জীবন্ত বোধ করে। এ সময় অনেক বেশি সচেতনভাবে সূক্ষ্মদেহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনঃসংযোগ করতে পারে, যে জন্য OOBE স্বপ্ন ধরনের নয়।

(৬) এ সময় সূক্ষ্ম সত্তার মধ্যে বিশেষ ভাবাবেগের একটা আতিশয্য দেখা দেয়। ভয় হলে ভয়ও বেশি রকম হয়। নিজেকে হাল্কা ও ভারমুক্ত মনে হয়। যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে। তবে ভয় থাকে এই যে, পাছে সে অনেক দূরে চলে গিয়ে স্থূলদেহের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে।

(৭) সূক্ষ্মদেহ বুঝতে পারে যে, সে ভিন্ন জগতে রয়েছে। ইচ্ছামাত্র যেখানে সেখানে যেতে পারছে। কিন্তু যেইমাত্র স্থূলদেহের কথা মনে করে, তখনই সেখানে ফিরে আসতে পারে। অনেকের অভিজ্ঞতা এই যে, সূক্ষ্মদেহে দ্রুতগতি-ভ্রমণকালে চিৎসত্তাই যেন হারিয়ে যায়।

(৮) স্থূলদেহে ফিরে আসার সময় এরা অনেক সময় একটা কম্পন অনুভব করে। হঠাৎ স্থূলদেহে ফিরে আসার এই আঘাত অনেককে যেন অবাক করে দেয়।

আকাশ পরিক্রমার কথা ইদানীং কালে মনস্তত্ত্ববিদেরা বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছেন। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহের নির্গমনকালে—বিশেষ কোন দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হয় কিনা এটা তাঁরা জানবার চেষ্টা করছেন। আকাশ পরিভ্রমণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে পরীক্ষাগারে আশিভাগ পরীক্ষার্থীই বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নয়, দেহহীন একটা চৈতন্যই শুধু অনুভব করেছেন।

সূক্ষ্মদেহের অভিজ্ঞতার বিচারের এক কাহিনী জানা গেছে হফ্‌মান (Hoffman) নামে এক জার্মানের কাছ থেকে। পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় সে আক্রান্ত হয়। ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর তাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দেবার পরের দিন রাতে তার মা দেখতে পান যে, হফ্‌মানের সূক্ষ্ম সত্তা তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছে যে, সে মারা যায় নি। কবর থেকে তার স্থূলদেহ তুলে আনার জন্য অনুরোধ জানায়। সে আরও জানায় যে, কবর খোঁড়া হলে দেখা যাবে যে, ডান কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। ডান হাত রয়েছে ডান গালের নিচে। পর পর তিনরাত্রি হফ্‌মানের মা এইভাবে তাকে তাঁর বিছানার পাশে দেখতে পান। যদিও

তার বাবা মায়ের কথাতে বিশ্বাস করে কবর খুঁড়ে দেখবার উৎসাহ দেখান নি, তবু শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে তাঁকে কবর খুঁড়তেই হয়। কবর খুঁড়লে দেখা যায় যে, হফ্মানের সূক্ষ্ম সত্তা তার মাকে যা বলেছিল ঠিক সেইভাবেই সে শুয়ে আছে। ডাক্তাররা আবার তার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। হফ্মানের স্থূলদেহ সত্যি মারা যায় নি, শুধু রুদ্ধপ্রাণ হয়ে ছিল। এই অবস্থাতে তার সূক্ষ্ম সত্তা বাইরে এসে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়।[১] অধিমনোবিজ্ঞানীদের মতে দেহের বাইরে সত্তার বোধ স্বপ্নের মত একই ভূমিকা পালন করে। Carl Jung যেমন মনে করেন যে, স্বপ্ন মানুষের চিত্তে একটি সমতা আনে, তেমনই অধিমনোবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, দেহের বাইরে সূক্ষ্মসত্তাবোধ মানুষের আত্মিকক্ষেত্রের অনেক অভাব পূর্ণ করে।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানা সাক্ষ্য থেকে জেনেছেন যে, আকাশ পরিক্রমা করতে হলে কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন, যিনি সূক্ষ্মদেহে পরিভ্রমণ করবেন, তাঁকে স্থূলদেহ বিচ্ছিন্ন করার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে আহার বন্ধ করে দিতে হবে। এরও বেশ কিছুদিন আগে থেকে প্রোটিন খুব বেশি রয়েছে এমন খাদ্য পরিত্যাগ করতে হবে। প্রাণায়ামে দেহকে আকাশ পরিক্রমার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ বিচ্ছিন্ন করার সময় বড় বড় ছন্দময় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া করতে হবে, অথবা কুম্ভক করতে হবে। সম্পূর্ণ হাল্কাভাবে চিন্তাভাবনা মুক্ত হয়ে আকাশ পরিক্রমার জন্য বসতে হবে।

প্রশ্ন হল এই যে, আকাশ-ভ্রমণের লক্ষ্যস্থল কি? এর ফলে কী পাওয়া যায়? এক্ষেত্রে বিপদই বা কি? এর জবাব আকাশ পরিক্রমা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবেন না।

একজন বিখ্যাত আকাশচারী মুলডুন (Muldoon) আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার 'energy body' তত্ত্বের ভিত্তিতে (যা Electro-photography দ্বারা ধরা হয়েছে) বলেছেন যে, আকাশভ্রমণকারী দেহ মহাজাগতিক শক্তিকে ঘনীভূত করে। স্থূলদেহ থেকে এ দেহ যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার কারণ, মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা সে নতুন করে উদ্বোধিত হবার চেষ্টা করে। এই জন্য দেখা যায় রুগ্ণ ও ক্লান্ত ব্যক্তিরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দ্বৈতসত্তার স্বাদ অনুভব করে। লক্ষ্য করে দেখাও গেছে যে, দুর্বল ও রুগ্ণ ব্যক্তিদেরই OOBE[২] বেশি হয়। মুলডুন বহুবার আকাশচারণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ফ্লিয়াডের (Fliade) লেখা থেকে জানা যায় যে, এই কারণে আদিবাসীরা তাদের শমন নিযুক্ত করতেন রুগ্ণ ও দুর্বল ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। সত্যিকারের শমন তিনিই, যিনি নিজেকে রোগমুক্ত করে সুস্থ হয়ে উঠতে সফল হয়েছেন। দেখা যায় যাঁরা সূক্ষ্মদেহে আকাশ পরিভ্রমণ করেন তাঁরা

১ Mysteris of the Inner Self : The Projection of Astral Body, Stuart Holroyd, p. 49.

২ OOBE = Out of the Body Exprience.

ভ্রমণ ছেড়ে স্থূলদেহে ফিরে আসা মাত্রই অদ্ভুত একটা লঘুতা ও ক্লান্তিহীনতা বোধ করেন।

সূক্ষ্মদেহে পরিক্রমাবিদ অলিভার ফক্স মনে করেন যে, রুদ্ধজৈবচৈতন্য হয়ে আকাশ পরিক্রমা করতে গেলে ভ্রূমধ্যস্থ পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন। এখানে মনঃসংযোগ করলেই আকাশপথে পরিভ্রমণ করা যায়।

ফক্সের সমসাময়িককালে জনৈক ফরাসী আকাশচারী য়্রাম (Yram) আকাশের নানাস্তরের কথা বলেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থটির নাম Practical Astral Projection। তিনি মনে করেন যে, মানুষের শুধু একটি মাত্র সূক্ষ্ম সত্তাই নয়, বহু সূক্ষ্ম সত্তা আছে। দেহস্তরের বিভিন্ন অংশে উঠতে পারলে মানুষের বিভিন্ন সত্তা আকাশেরও বিভিন্ন স্তরে পরিক্রমা করতে পারে। এই দেহগুলি ঘনত্বে বিভিন্ন প্রকার। [বর্তমানে গ্রন্থের লেখকও স্বীয় অভিজ্ঞতাতে বিভিন্ন দেহ ও আকারের বিভিন্ন স্তর লক্ষ করেছেন, যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।]

সূক্ষ্মদেহে আকাশচারণার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত একজন হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট মনরো (Robert Monroe)। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রীতিমত ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, দেহের বাইরে অনুভূতি লাভ করার সময় (OOBE) 'মস্তিষ্ক তরঙ্গ' স্বপ্নে থাকাকালে মস্তিষ্ক তরঙ্গের মত কাজ করে। এ-সময় তার হৃদস্পন্দন একই রকম থাকলেও রক্তচাপ পড়ে যায়। মনরো তাঁর গ্রন্থ 'Journeys out of the Body (1971)' গ্রন্থে তাঁর আকাশচারণার স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আকাশ' না বলে এই বিভিন্ন স্তরকে লোকেল (Localc i, ii, iii) ইত্যাদি নাম দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সময় তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা উন্নত কোয়ান্টাম মেকানিকস (Advanced Quantum Mechanics)-এর উপর কাজ করছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁছান যে, শুধুমাত্র একটি নয় বহু ইউনিভার্স আছে। এর প্রত্যেকটিই প্রায় একরকম হলেও সামান্য কিছু পার্থক্যও আছে। এর একটা জগৎ থেকে আর এক জগতে যাবার সময় অভিজ্ঞতার ভিন্নতা অনুভব করা যায়। অফিয়েল (Ophiel) নামে একজন লেখক তাঁর 'The Art and Practice of Astral Projection' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, দূরদর্শনকালে আকাশ অতিক্রম করার সময় আকাশচারী ব্যক্তি প্রথম দেখেন—ঘন কালো। পরে এই অন্ধকার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে আরম্ভ করে। অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে হারিয়ে যায়। ক্রমশ রঙ বেশি করে ফুটে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল শ্বেতশুভ্র এক জ্যোতির জগৎ তার মানসনেত্রে ফুটে ওঠে।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা মৃত্যুচর্চা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, স্থূলদেহের মৃত্যু হলেও সূক্ষ্মদেহ এর পরও বেশ কয়েক মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সম্পর্কে একটি

রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিপোর্টটি রেভারেন্ড বারট্রান্ড সম্পর্কে। রিপোর্টটি বেরিয়েছিল 'Proceeding for the Society for Psychical Rescarch'এ। সময় 1892. রেভারেন্ড বারট্রান্ড কয়েকজন ছাত্র নিয়ে আল্‌পস্ পর্বত অতিক্রম করছিলেন। চলতে চলতে তিনি বেশ ক্লান্ত বোধ করেন। সুতরাং তিনি বিশ্রাম নেওয়া স্থির করে বসে যান। অপরদের কি পথে উঠতে হবে, কি পথে নামতে হবে, যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে থাকেন। পাহাড়ের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখে সিগারেট নিয়ে দেশালাই ধরাতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর অদ্ভুত এক বোধ হল। দেখলেন যে, দেশালাইয়ের কাঠি তাঁর আঙুল পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি সেটা ফেলেও দিতে পারছেন না, বা আঙুল সরিয়ে নিতে পারছেন না। রেভারেন্ড বুঝতে পারলেন যে, তিনি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছেন, আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। বেঁচে থাকার সব আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি কিভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যু আসে তাই লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন।

তাঁর চেতনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় দেহ অসাড় হয়ে গেল। এক সময় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মাথা হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে। এর পরই অকস্মাৎ তাঁর সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি যেন নিজেকেই উপর থেকে নিচে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, তিনি রীতিমত বিবর্ণ হয়ে গেছেন। হলুদ নীলে মেশানো এক অদ্ভুত রঙ তাঁর দেহে। দুই দগ্ধ আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যেন একটি বেলুন। একটি রবার জাতীয় দড়িতে পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা। যত উপরে উঠছেন দড়িটাও তত বড় হচ্ছে। তাঁর আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে, এক সময় দড়িটা ছিঁড়ে যাবে এবং তিনি পার্থিব জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। যাদের তিনি পর্বতারোহণে পাঠিয়েছিলেন তাদেরও দেখতে পেলেন। তবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তিনি যে প্রকারে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গাইড তা পালন করছেন না। তাঁকে অপরের ব্যাগ থেকে কিছু চুরি করতেও দেখেন।

এরপর সূক্ষ্মদেহে আরও একটু ভ্রমণ করবার পর তিনি তার স্ত্রীকে দেখতে পান। পরদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হবার কথা। তবে তাঁর দুঃখ এই যে, যে রবার জাতীয় সুতোয় তিনি বাঁধা তা বড় হলেও ছিঁড়ে যাচ্ছে না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি নিচে পড়ে যাচ্ছেন। পর্বতারোহী দল যেখানে তাকে ফেলে গিয়েছিল সেখানেই ফিরে এল। গাইডকে দেখা গেল যে, তাঁর দেহ ঘষে দিচ্ছে, যাতে রক্ত চলাচল আরম্ভ হয়। তিনি যেন বেলুন। তাকে টেনে নিচে নামানো হচ্ছে। পুনরায় তাঁর স্থূলদেহে প্রবেশ করাকে যেন এক ধরনের জোর জবরদস্তি মনে হল তাঁর। এক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা এই ঃ—"আমি যখন আমার স্থূলদেহে ঢুকতে যাচ্ছি তখনও আমার শেষ আশা ছিল যে, আমার স্থূলদেহের মুখ দিয়ে বেলুনটি ভেতরে ঢুকতে পারবে না। হঠাৎ আমি যেন বন্য পশুর মত ভয়াবহভাবে চিৎকার করে উঠলাম। মৃতদেহটি বেলুনটাকে গিলে ফেলল। বারট্রান্ড আবার বারট্রান্ড হলাম।

যে বৃদ্ধ গাইডটি বারট্রান্ডকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল সে ভাবল বারট্রান্ড তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ, সে তাঁর জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু তার বদলে শুনে অবাক হয়ে গেল যে, বারট্রান্ড পর্বতারোহীদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মুরগির ঠ্যাং চুরি করে খাওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করছেন। লুসার্নে থেকে যখন তার স্ত্রী ফিরে এলেন, বারট্রান্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর গাড়িতে পাঁচজন যাত্রী ছিল কিনা। ফেরার পথে লুনগ্রেন হোটেলে তাঁরা উঠেছিলেন কিনা। স্ত্রী বললেন, হাঁ, তোমাকে এ কথা কে বলল ?

বারট্রান্ড তখন সব খুলে বললেন।

বারট্রান্ডের মত আরও বহু ব্যক্তি সাময়িক মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্ম জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু তথ্য অধিমনোবিজ্ঞানীদের দপ্তরে জমা করে গেছেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে এই কথা মনে হয়েছে যে, মানুষ যাকে 'মৃত্যু' বলে তা হল স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্ম সত্তার বিচ্ছেদ মাত্র। স্থূল জগৎ অসুখী ও হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। এখানে একে অপরের সঙ্গে মিথ্যেই সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। এখানে যারা বেঁচে আছে তারা প্রকৃতপক্ষে বেঁচে নেই। এই পার্থিব জগৎটাই আসলে নরক মাত্র।

এদের বক্তব্য থেকে এরকম ধারণা হয়েছে যে, 'পাশ্চাত্য' বিজ্ঞান চেতনার একটি মাত্র স্তরের সঙ্গে যুক্ত। বাস্তব সত্যের সীমিত একটি বৃত্তের সঙ্গে এর যোগ। এখানে সত্যের ধারণা সীমিত মাত্র। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে—The Royal Medical Society of Edinburgh-এর স্যার অক্ল্যান্ড গেডে (Sir Auckland Geddes) এক ডাক্তারের সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে গেছেন। সেই বছরই নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে ডাক্তারটি দুপুর রাতের কিছু পরে নিতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমশ তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হতে থাকে। সকালবেলা বুঝতে পারেন যে, তিনি নিরুপায়। কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠানোর সাধ্যও তাঁর নেই। সুতরাং সব আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি যেন দুটি স্বতন্ত্র চেতনাতে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রথমটিতে রয়েছে শুধুমাত্র আত্মচেতনা, দ্বিতীয়টিতে দেহচেতনা। তাঁর দৈহিক অবস্থা খারাপ হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় অর্থাৎ দেহচেতনাও যেন ভেঙে যেতে লাগল। প্রথম চেতনাটি যেন দেহের বাইরে থেকে গেল। এই প্রথম অর্থাৎ আত্মচেতনা তাঁর স্থূল দেহটাকে দেখতে পেল। এই সময় শুধুমাত্র দেহ নয় আরও অনেক কিছু দেখতে পেলেন তিনি। সময় এবং মাত্রার মধ্যে সে যেন একটি মুক্ত আত্মা হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, দৈহিক চেতনার বাইরে একটি আত্মিক চেতনা শুধুমাত্র তিন নয় বহু মাত্রিক অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নানা মাত্রা একে অপরকে ভেদ করে যাচ্ছে। চতুর্থ মাত্রা রয়েছে ত্রিমাত্রিক সকল জিনিসের মধ্যে। একই সময় ত্রিমাত্রিক জগতের সবকিছুও চতুর্থ ও পঞ্চম ইত্যাদি মাত্রার মধ্যে রয়ে গেছে।

এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অবস্থা থেকে ডাক্তারটি ত্রিমাত্রিক জগতের সব পরিচিত ব্যক্তিকেই চিনতে পারলেন। দেখলেন, তাঁদের প্রত্যেকের চারদিক ঘিরে রয়েছে একটি ঘন আত্মিক স্তর। এই আত্মিক স্তর নানাবর্ণময় (রাশিয়ার কির্লিয়ান ফটোগ্রাফির মত)। শব্দ, দৃশ্য সবই তিনি শুনতে ও দেখতে পাচ্ছেন। এই স্বাধীন উন্মুক্ত জগতের জন্য তিনি এতটাই আনন্দ পাচ্ছিলেন যে, বারম্বাণ্ডের মত স্থূলদেহের মধ্যে আর তাঁর ঢোকার ইচ্ছে করছিল না। তাঁকে স্থূল চেতনায় ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন। ডাক্তারের বর্ণনা থেকে গেডে-এর মনে হয়েছিল যে, আত্মিক চলমানতা যেন আঠালো একটি জালের মত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (বর্তমান Astrophysics-এর Superstring-এর মত ? বা সার্ত্র যাকে gluey sensation বলেছেন ?)। এই সম্প্রসারমান চেতনাতে সবই যেন ছবির মত ফুটে আছে, দূর, নিকট, সব।

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেমিংওয়েও OOBE-এর কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯১৮ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই সময় তিনি ইটালীতে যুদ্ধ করছিলেন। এসময় তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত পান। ট্রেঞ্চে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হয়, আত্মা যেন দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোটের পকেট থেকে যেমন রেশমী রুমাল বেরয়, আত্মা যেন সেইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সেই আত্মা তাঁর দেহের চারদিকে ঘুরে বেড়ালো, তার পর ফিরে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। হেমিংওয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস **A Farewell to Arms** উপন্যাসে বর্ণনা করে গেছেন।

ক্রুকওয়েল নামে এক ব্যক্তি বহুলোকের এই ধরনের দ্বিতীয় দেহের অভিজ্ঞতার কথা সংগ্রহ করে রেখেছেন। এই সংগ্রহ থেকে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এই ঃ—মৃত্যুর সময় মরণোন্মুখ ব্যক্তির মাথা থেকে এক ধরনের বাষ্প জাতীয় জিনিস বেরয়। এটা ধীরে ধীরে ঘন হয়ে মৃতের মধ্যে দেহের আকৃতি গ্রহণ করে। স্থূলদেহের সঙ্গে এই সূক্ষ্মদেহ কিছুক্ষণ লেগে থাকে। এক ধরনের রুপোলী ফিতে যেন এই সূক্ষ্মদেহকে আটকে রাখে। তারপর দেহটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৯১৮ খ্রীঃ এক ব্রিটিশ ধাত্রী ও মনস্তত্ত্ববিদ জয় স্নেল (Joy Snell) লিখেছিলেন যে, মৃত্যুর মুহূর্তগুলি তিনি খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতেন। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি লক্ষ্য করতেন যে, ধোঁয়ার মত কিছু বেরুচ্ছে। বিশেষভাবে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুর সময় তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমদিকে এটা কিছুটা আবছা থাকলেও পরে তা পরিবর্তিত হয়। ধীরে ধীরে সেই ধোঁয়া মৃতের আকৃতি নেয়। কিন্তু পার্থিব স্থূলদেহের জ্বালা যন্ত্রণা যেন সে দেহে নেই।

তাঁর এই সাক্ষ্যের সঙ্গে থিটিয়ানদের বিশ্বাসের যেন এক নিকট সম্পর্ক রয়ে গেছে। থিটিয়ানরা মনে করে যে, মৃত্যুর সময় আত্মা দেহ থেকে বেরয় মাথা দিয়ে, এবং এই

আত্মা ধোঁয়ার আকৃতিতে বেরিয়ে পরে মৃতের দেহের আকার ধারণ করে। **American Society of Psychical Research**-এর **Dr. K. Osis**, মৃত্যু সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন—তাতেও দেখা যায় যে, মৃত্যু হল চৈতন্যের একটি ভিন্নতর অবস্থা মাত্র। অনেকে স্থূলদেহ ত্যাগ করবার পর অদ্ভুত এক আনন্দ বোধ করে।

ফরাসী চিকিৎসক 'হিপোলাইট বরডুক' তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ১৫ মিনিট এবং এক ঘণ্টা পর ছবি নিয়ে এই ধূম্রাকৃতি জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর নয় ঘণ্টা পরে কফিন থেকে ফটো তুলেও তিনি এই ধরনের ধোঁয়ার অস্তিত্ব দেখেছিলেন।[১]

সূক্ষ্মদেহের এই অস্তিত্বের কথা বহুজনের বিশ্বাসের মধ্যে থাকার ফলে আর একটি বড় প্রশ্ন এসেও দেখা দিয়েছে। সে প্রশ্নটি হল,—কখনও কখনও কারো ব্যক্তিত্ব তাকে ছেড়ে দিতে পারে। আবার কোথাও কোথাও বাইরের কারো সত্তা বা সূক্ষ্মদেহও এসে দেহে ঢুকতে পারে। বাইরের কোন সূক্ষ্ম সত্তা এসে দেহের ভেতর ঢুকলে একই দেহের বহুতর মানসিকতা দেখা দিতে পারে। আধুনিককালে মনস্তত্ত্ববিদেরা এই বহুসাত্তিক ব্যক্তিত্বেরও সন্ধান পেয়েছেন। হিপনোটিস্টরা বহু রোগীর মধ্যে প্রাক্তন জীবনের স্মৃতিও খুঁজে পেয়েছেন। সুতরাং প্রশ্ন হল, এই যে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, তা কোথা থেকে আসে ? যদি তাদের দেহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে তারা কোথায়ই বা আবার যায় ?

থিওডোর ফ্লাওয়ারনে (**Theodor Flouernay**) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ জেনেভা ইউনিভার্সিটিতে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি **'Spiritualism and Psychology'** নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এতে তিনি বহুসত্তা বা ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাবে ঃ—স্ফটিক যেমন বিশেষ রেখা বরাবর হাতুড়ির আঘাত পেলে নানা টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, তেমনই মানুষের ব্যক্তিসত্তাও অত্যধিক ভাবাবেগের আঘাত পেলে নানা টুকরো অর্থাৎ সত্তা নিয়ে ভেঙে পড়তে পারে, যেগুলো একত্রে থাকার সময় একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাভাবিক সত্তার আকারে প্রতিভাত হয়েছিল। একই সত্তা তখন কোথাও গম্ভীর, কোথাও চঞ্চল, কোথাও আশাবাদী, কোথাও সরলতা, কোথাও অহংকার, কোথাও সচ্চরিত্র, কোথাও বা চরিত্রহীনতা ইত্যাদি নানা ভাব নিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

জেমস হাইস্লোপ (**James Hyslop**) নামে তর্কবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী এক ভদ্রলোক থিওডোর ফ্লাওয়ারনের-এর যুক্তি প্রথমটা মানতে চাননি। পরে দশ বছর এব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর পর দেখতে পান যে, আগে যাকে হিস্টেরিয়া বলা হত, সেখানে বহু মানসিক সত্তা বা এমন জিনিস দেখা যাচ্ছে যা উল্লিখিত ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্র নয়, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এ যেন বহিরাগত একটা কিছু।

১ **Mysteries of the Inner Self, Beyond the Veil, Stuart Holroyd, P. 92**

বহু সত্তাবিশিষ্ট মানসিকতার চরম উদাহরণ বোধহয় মিস বিউচ্যাম্প (Miss Beauchamp)। তাঁকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন মনস্তত্ত্ববিদ মরটন প্রিন্স। পর পর অনেকগুলি মানসিক আঘাত পাবার পর বিউচ্যাম্পের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়। প্রত্যেকটি মানসিকতা অপর মানসিকতা থেকে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার চারটি ব্যক্তিত্ব বা মানসিকতার মধ্যে একটি নিজেকে স্যাল্লি (Sally) বলে দাবি করত। অপরকে অভিভূত করার ক্ষমতা তার ছিল। এই ব্যক্তিত্ব দিয়ে অপরকে সে রীতিমত উত্ত্যক্ত করত। অপর তিনটি ব্যক্তিত্ব থেকে তার ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নানাভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্যাল্লিকে মিস বিউচ্যাম্পের দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অপর তিনটি ব্যক্তিত্ব তখন একত্রে মিশে একটি ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা তৈরি করে। দুজন মানসিক রোগের চিকিৎসক C. H. Tigpen ও H. M. Cleckley, Eve ও Briday Murphy-র চিকিৎসা করে এ ব্যাপারে এক সময় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। এই ঘটনাটি নিয়ে তাঁরা 'Three Faces of Eve' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

আর্থার গুইরধান (Arthur Guirdhan) নামে এক ইংরেজ মানসিক রোগের চিকিৎসক ছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে পেতেন। স্বপ্নে দেখতেন যে, একজন লম্বা লোক তাঁর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে।

১৯৬২ সালে এক মহিলা রোগী তাঁর কাছে আসেন। তিনিও ঠিক অনুরূপ একটি স্বপ্নের কথা তাঁকে বলেন। ডাঃ গুইরধান তাঁকে নিজের স্বপ্নের কথা বলেন না। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল এই যে, এই মহিলা রোগিনীটি তাঁর কাছে আসার পর তিনি স্বপ্নে আর কখনও সেই দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটিকে দেখেন নি। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস স্মিথ। চিকিৎসাকালে মহিলাটি নিজের জীবনের অদ্ভুত স্মৃতির কথা বলতে থাকেন। দেখা গেল তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই বলতে পারছেন। মধ্যযুগে তিনি ফ্রান্সে ছিলেন বলে দাবি করেন। কারণ, এই দক্ষিণ ফ্রান্সের উপরই তিনি বার বার স্বপ্ন দেখতেন। এই সময়ে তিনি 'ক্যাথার' নামে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্মবিরোধী এক ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁর একজন প্রেমিক ছিলেন। তাঁর নাম Roger de Grisolles. আসলে ডাঃ গুইরধানই ছিলেন পূর্বজন্মে সেই Roger de Grisolles.

মিসেস স্মিথ তাঁর মধ্যযুগীয় পূর্বজন্মের যে সব বর্ণনা দিয়েছিলেন তার অনেক কিছুই ঐতিহাসিকদের বিচারে সত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তার স্মৃতিচারণা ডাক্তারের মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরিত করে। তিনি স্মরণ করতে পারেন যে, 'ক্যাথার' হিসাবে তিনিও মধ্যযুগীয় ফ্রান্সে ছিলেন।

মানুষের একটা সূক্ষ্মসত্তা যে আছে তা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়েছে জাতিস্মরদের পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণে। এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্মৃতির সূত্র ধরে যে সব কথা তারা বলছে তা প্রায় সবই সত্য। এ ব্যাপারে ইয়ান স্টিভেনশন

(Ian Stevenson) নামে এক লেখক 'Twenty Cases Suggestive of Reincarnation' নামে একটি গ্রন্থ বের করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। ১৯৬২ সালে তিনি এক তরুণ লেবানিজের সঙ্গে পরিচিত হন। এই তরুণটি তাঁকে বলেন যে, তাঁর নিজের গ্রাম কোরনায়েল (Kornayel)-এ বহু শিশু আছে যারা পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে। অনুসন্ধান করে দেখার জন্য সে তার ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখে স্টিভেনশনকে দেয়। ইমাদ এলাওয়ার (Imad Elawar) নামে একটি শিশুর ঘটনা তাঁকে রীতিমত চমকিত করে। কোরনায়েল-এ ইমাদের জন্ম হয় ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে। যখনই সে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই দুটি নাম উচ্চারণ করতে থাকে 'জেমাইল' ও 'মহম্মদ'। অথচ যে পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল সে পরিবারের কারো সে দুটি নাম ছিল না। কোরনায়েল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সে একাট গ্রামের নাম বলতে থাকে, যার নাম 'খিব্রি' (Khriby)। গ্রামটি পাহাড়ের ওপারে। দু'বছর বয়সে একবার সে তার ঠাকুমার সঙ্গে বেড়াতে বেরয়। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে অপরিচিত একটি লোককে সে জড়িয়ে ধরে। অবাক হয়ে লোকটি বলে—'তুমি কি আমাকে চেন?' ইমাদ বলে, 'হাঁ, তুমি আমার প্রতিবেশী ছিলে।' খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লোকটি সত্যিই খিব্রির।

ইমাদের এলাওয়ার পরিবার ইসলামের এমন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত যারা মুসলমান হয়েও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করত। তথাপি তার পুত্র ইমাদ একটি জাতিস্মর শিশু একথা তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ইমাদ যখন খিব্রিতে তার প্রাক্তন জীবন ও বোহামজি (Bouhamzy) পরিবারের কথা বলে তখন সে অত্যন্ত চটে যায়। সুতরাং ইমাদ বাবার সামনে কখনও আর পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা বলত না। কিন্তু তার মা ও ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে সব সময়েই পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা শোনাতো। সে জেমাইল নামে এক তরুণীর সৌন্দর্যের কথাও বলত। আর একজন লোকের কথা বলত, যে দুর্ঘটনায় গাড়ির চাকার নিচে তার দুটি পা-ই হারিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। তার কথা শুনে সকলে খুব অবাক হত। ইমাদ হাঁটতে শেখার পর খুব খুশি হয়। সব সময়ই বাবা মাকে এরপর সে খিব্রি নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু তার বাবা রাজি হয় না।

অধ্যাপক স্টিভেনশন যখন কোরনায়েল-এ গিয়ে পৌঁছান ইমাদের বয়স তখন পাঁচ বছর। এ সময় গত তিন বছর যাবৎ সে তার অতীত জীবনের স্মৃতি বলেই চলেছিল। অথচ কখনও সে নিজের গ্রাম ছেড়ে যায় নি। স্টিভেনশন ইমাদের স্মৃতিচারণার সত্যতা যাচাই করার জন্য পাহাড় অতিক্রম করে খিব্রিতে যান। তিনি জানতে পারেন যে সেখানে সত্যিই বোহামজি নামে একটি পরিবার আছে। ১৯৩৩ খ্রীঃ সেই পরিবারের সইয়দ বোহামজি ট্রাক চাপা পড়ে মারা যায়। অপারেশন করা হলেও তাকে বাঁচানো যায় না। সইয়দ বোহামজির গৃহ স্টিভেনশনকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তবে ইমাদ তার স্মৃতি থেকে প্রাক্তন গৃহের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে সইয়দের বাড়ির

কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সইয়দ বোহামজির যে বর্ণনা ইমাদ দিয়েছিল তাও অসত্য বলে মনে হয়।

কিন্তু স্টিভেনশন এ ব্যাপারে তাঁর অনুসন্ধান চালিয়ে যান। জানতে পারেন যে, সইয়দের চাচাতো ভাই ছিল—তার নাম ইব্রাহিম বোহামজি। দু'জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। ইব্রাহিম নির্লজ্জভাবে জেমাইল নামে এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে বাস করত। কিন্তু অল্প বয়সেই অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়সেই টি. বি.-তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর আগে ছ মাস যে শয্যাশায়ী ছিল। হাঁটতে পারত না। এ জন্য তার দুঃখের অন্ত ছিল না। সইয়দের মত ইব্রাহিমও একজন ট্রাক ড্রাইভার ছিল। বেশ কয়েকবার সে দুর্ঘটনা ঘটায়। ইব্রাহিমের চাচার নাম ছিল মহম্মদ। ইব্রাহিম যে গৃহে বাস করত তার সঙ্গে ইমাদের বর্ণনা মিলে যায়। ইমাদ কোরনায়েলের রাস্তায় যে লোকটিকে জড়িয়ে ধরেছিল সে ইব্রাহিমের বাড়ির পাশেরই লোক। স্টিভেনশন নিশ্চিন্ত হন যে, প্রাক্তন জীবনের সাতচল্লিশটি ঘটনার যে বিবরণ ইমাদ তাকে দিয়েছিল তার মধ্যে চুয়াল্লিশটি যথাযথ মিলে গেছে।

স্টিভেনশন কোরনায়েল-এ ফিরে এসে ইমাদের বাবাকে বুঝিয়ে তাকে খিব্রিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তারা তিনজনেই খিব্রির দিকে রওনা হন। ইমাদ সাতবার পথের নিশানা ঠিক ঠিক দেয়। খিব্রিতে পেঁৗছে ইব্রাহিমের জীবন সম্পর্কে আরও ষোলটি সত্য কথা বলে। এর মধ্যে ১৪ টি সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়। কয়েক বছর ধরে ইব্রাহিমের ঘর বন্ধ ছিল। নবাগন্তুকদের জন্য তা খুলে দেওয়া হয়। স্টিভেনশন ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে ইমাদের বর্ণনা মিলিয়ে নেন। ইব্রাহিম বলেছিল, তার দুটি রাইফেল ছিল। একটি ছিল দুনালা। সেটি সত্য প্রমাণিত হয়। আর একটি রাইফেল যা সে লুকিয়ে রেখেছিল, ইমাদ সরাসরি গিয়ে সেটা বের করে দেয়।

ইমাদের এই ঘটনার মত স্টিভেনশন অন্তত হাজারখানেক জাতিস্মরের ঘটনা নিয়ে চর্চা করে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, জন্মান্তর সম্পর্কে ভাবা চলে।[১] ঘটনাগুলি যথার্থ ইঙ্গিতবহ।

কখনও কখনও নতুন করে জন্ম না নিয়েও সদ্য মৃতের আত্মা কোন মুমূর্ষুর দেহে প্রবেশ করতে পারে। স্টিভেনশন এরকম ঘটনার সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে। ভারতীয়রা জন্মান্তরবাদে সব সময়ই বিশ্বাস করে। যে ঘটনার সন্ধানে স্টিভেনশন ভারতে এসেছিলেন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তরপ্রদেশের রসুলপুরে। ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে স্টিভেনশন ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে দুবার ভারতে আসেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ—১৯৫৪ সালে যশবীর নামে রসুলপুর গ্রামের একটি শিশু গুটিরোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়। বাহ্যত তাকে মৃত বলেই মনে করা হয়। তার সমাধির জন্য ব্যবস্থা চলে (হিন্দুদের শিশুরা মারা গেলে না পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়)। ইতিমধ্যে

১ **Mystery of the Inner Self, the Evidence for Reincarnation P. 111-114.**

শিশুটির মধ্যে আবার জীবনের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কয়েক সপ্তাহ পরে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ওঠে। যখন সে আবার কথা বলতে পারে তখনি বলতে আরম্ভ করে যে, তার নাম শোভারাম। সে ব্রাহ্মণের ছেলে। বাবার নাম শংকর লিল ত্যাগী। গ্রাম বেহেদি। রসুলপুর থেকে সেই গ্রামের দূরত্ব বিশ মাইলের মত। এরপর সত্যি সত্যি তার মুখে ব্রাহ্মণদের মতই কথাবার্তা বেরুতে লাগল। সে নিজের পরিবারের খাবার খেতে অস্বীকার করল। সৌভাগ্যবশত গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মহিলা ব্যাপারটি শুনতে পেয়ে নিজে হাতে তাকে রান্না করে খাওয়াতেন।

এইভাবেই কয়েক বছর চলে। রসুলপুর ও বেহেদির মধ্যে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। ১৯৫৭ সালে জনৈকা বেহেদি মহিলা, যার জন্ম হয়েছিল রসুলপুরে, সে রসুলপুরেই ফিরে আসে। ১৯৫২ সাল থেকে সে এ গ্রামে আসেনি। এই সময় যশবীরের বয়স ছিল ১৮ মাস। কিন্তু যশবীর তাকে দেখেই চিনতে পারে। অনেকের কাছ থেকে সে যশবীরের অদ্ভুত গল্প শুনতে পেয়েছিল। বেহেদিতে ফিরে সে নিজের পরিবারের লোকজনের কাছে যশবীরের গল্প বলে। শোভারাম ত্যাগীর পরিবার এ কথা শুনে রসুলপুরে যশবীরকে দেখতে আসে। শিশুটি সকলকেই নাম ধরে সম্বর্ধনা জানায়। শোভারামের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক ছিল তাও বলে। শোভারাম কি করে মারা যায় সে বর্ণনাও সে দেয়। একটি বরযাত্রী মিছিলে যাবার সময় গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। শোভারামের পরিবার রসুলপুর আসার পর যশবীরকে বেহেদি গ্রামে যেতে দেওয়া হয়। এখানে ত্যাগী পরিবারের সঙ্গে রসুলপুরের জাট পরিবারের অপেক্ষা সে অনেক বেশি সহজভাবে বাস করে। স্টিভেনশন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারেন যে, যে উনচল্লিশটি ঘটনার কথা যশবীর বলেছিল তার মধ্যে আটত্রিশটিই সত্য। যে ঘটনাটি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি তা হল মৃত্যুর কথা। যশবীর বলেছিল যে, শোভারামের মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল বিষ খাইয়ে। কে তাকে বিষ খাইয়েছিল তার নামও সে বলে দেয়। খোঁজখবর নিয়ে জানা যে, শোভারামের যখন মৃত্যু হয় তখনই গুটিরোগে যশবীরের প্রাণ চলে গিয়েছিল, পরে আবার সে বেঁচে ওঠে।

অদ্ভুতভাবে অধিমনোবিজ্ঞান জন্মান্তর রহস্যের উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব জাতিস্মরের প্রাক্তন জীবনে মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক দুর্ঘটনায়। এদের আবার প্রায়ই অপরিণত বয়সে মৃত্যু হয়েছিল। যাদের স্বাভাবিকভাবে বেশি বয়সে মৃত্যু হয়েছে, দেখা যায় এমন লোক জাতিস্মর হয়ে জন্মাচ্ছে না। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের অব্যবহিত পূর্বজন্মের স্মৃতি অত্যন্ত প্রবল থাকে বলে দেখা গেছে। অনেক সময় দেখা গেছে, দেহের যে স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে, পরজন্মে নবজাতকের দেহের সেই স্থানেও এক ধরনের চিহ্ন রয়েছে।

তিব্বতের লোকেরা সবাই জন্মান্তরিত বলে বিশ্বাস করে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করেন যে, তিব্বতের প্রধান প্রধান বিহারগুলির লামারা পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব

ছিলেন। এঁরা বুদ্ধত্বলাভের জন্য জ্ঞানান্বেষণ করছেন। ফলে নবজন্মেও সমমর্যাদা-সম্পন্ন ঘরে বা পদে জন্মগ্রহণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে সূক্ষ্ম আত্মার ভিন্ন জীবদেহে প্রবেশের সুন্দর এক কাহিনী পাওয়া যায় হরনাথ ব্যানার্জির জীবনে। তার জন্ম ১৮৬৫ খ্রীঃ। বাবার নাম জয়রাম ব্যানার্জি। মায়ের নাম সুন্দরী। হরনাথের জন্মের পূর্বাভাস তার পিতা স্বপ্নে পেয়েছিলেন। যাতে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পূর্বজন্মের এক সাধু তাঁর পুত্ররূপে জন্ম নেবেন। সেই জন্যই দেখা যায় যে, ছোটবেলা থেকেই হরনাথের মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। প্রায়ই তাঁর ভর বা সমাধি হত। পরে তিনি আকাশ পরিক্রমা করতে আরম্ভ করেন। এই সময় বহু দিব্যপুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর অপূর্ব রোগ-নিরাময় শক্তি ও ঈশ্বরভক্তির জন্য বহুলোক তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

১৮৯৬ খ্রীঃ একবার তীর্থভ্রমণে যাবার প্রাক্কালে হরনাথ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দশঘণ্টা পরেও তাঁর চৈতন্য ফেরে নি। হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণের কোন লক্ষণই আর তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না। তার সহযাত্রীরা তাঁর শবদাহের আয়োজন করে। হঠাৎ এমন সময় হরনাথ চেতনা ফিরে পান। তাঁর অচৈতন্য অবস্থাতে তিনি ভয়ানকভাবে মানসিক ক্রিয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। বিরাট এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি, যার সঙ্গে ছোটবেলায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই মহাপুরুষ হলেন ষোড়শ শতাব্দীর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। হরনাথ যখন চেতনা হারিয়ে ছিলেন, তখন তাঁর দেহকে আশ্রয় করেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এই ঘটনার পর হরনাথের দেহে অদ্ভুত এক স্বর্ণপ্রভা দেখা দেয়।

'মৃত্যু ও পরলোক তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থের লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীও তাঁর গ্রন্থে মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম আত্মা ও জগতের এমনি এক বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি তিনি তাঁর কোন মরণাপন্না নিকট আত্মীয়ার মুখ থেকে শুনেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাঁর সেই আত্মীয়াটি দীর্ঘকাল অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর ভগবৎ কৃপায় পুনরায় নিরাময় হন। নিরাময় হবার পর লেখকের কাছে তিনি যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন তা এই ধরনের ঃ—রোগিনী এক সময় অনুভব করেন যে, পায়ের দিক থেকে উর্ধ্ব দিকে তাঁর দেহ ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় তাঁর কাছে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁর চেতনার মধ্যে আর কিছুই থাকল না। কয়েক ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলে তিনি দেখলেন যে, একটি দেহ যেন দুটি হয়ে গেছে। তাঁর শয্যাশায়ী দেহের উপর অনুরূপ দেহ নিয়ে তিনি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়ে দেখলে যেমন নানা প্রকার সুন্দর রঙ দেখা যায় চারিদিকে যেন সেই ধরনের সুন্দর রঙের ছড়াছড়ি। যে রোগযন্ত্রনা তাঁর ছিল তাও নেই। বরং একটা আনন্দের ভাব। সেই সময় তাঁর পরলোকগতা পিতামহীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল। এরপর যত ধরনের প্রচেষ্টা যারা তাঁর স্থূল দেহে প্রাণ ফিরিয়ে

আনা হয় সে সকলই তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী যে ঘটনা ঘটেছিল তা লেখক অনুসন্ধান করে সত্য বলে জানতে পেরেছিলেন।

গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পাইথাগোরাসও জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সময় হল খ্রীঃ পূঃ ৫৮০-৫০০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি বলতেন যে, তার অনেক পূর্ব জন্ম ছিল। ট্রয়ের যুদ্ধের সময় তাঁর নাম ছিল ইউফোরবাস। এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এক সময় তিনি ছিলেন ধর্মগুরু হারমোটিমাস। তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিরা পুড়িয়ে মেরেছিল। এক জীবনে ছিলেন থ্রেসের এক কৃষক। আর এক সময় লিডিয়ার এক দোকানদারের ঘরনী। আর এক জীবনে ছিলেন ফিনিসীয় বারবণিতা। তিনি যে জন্মান্তরবাদের কথা বলতেন, তা বলতেন এই রহস্যময় অনুভূতি থেকে।

নিলম জ্যাকোবসন নামে সুইডেনের এক মানসিক রোগের চিকিৎসক—তাঁর 'Life Without Death' গ্রন্থে নিম্নরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয় ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা এই রকম :—যে রুগীটি তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন, পরিণত বয়সে প্রায়ই তিনি যেন ভর জাতীয় একটি ভাবের মধ্যে দেখতেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি একজন সৈনিক ছিলেন, যার মৃত্যু হয়েছিল ফ্ল্যান্ডার্সে। এই অভিজ্ঞতা হবার আগে তিনি এক ধরনের ক্লান্তি ও বিষাদ বোধ করতেন। তখনই তার OOBE[১] হত। মনে হত দেহ ছেড়ে দুগ্ধনিভ ঘন কুয়াশার মধ্যে মধ্যে ঢুকে গেছেন, যেখানে সবকিছুই মৃত্যুর মত নীরব। তারপর দেখেন জনবহুল রেলপথ। দেখেন একদল সৈন্য যাদের আত্মীয়-স্বজনেরা বিদায় জানাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য সৈন্যরা গাড়িতে উঠছে। যখন তিনি গাড়িতে একটি জানালার ফাঁকে নিচে ঝুঁকে পড়ে আছেন তখন একটি সুন্দরী তরুণী তাকে সম্বোধন করেছেন 'মার্সেল, আমার মার্সেল।' তিনি বলছেন, 'ক্যাথারিন, আমার ক্যাথি…।' ট্রেন ছেড়ে দিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঝিক্‌ঝিক্ করতে করতে ট্রেনটি এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি এসে থামল 'আরাস'-এর কাছে। তিনি ট্রেন থেকে অন্যান্য সৈন্যের সঙ্গে নেমে কাদাভরা রাস্তা দিয়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কিভাবে সময় কেটে গেল তিনি জানেন না। এবার হঠাৎ আক্রমণ করে একটি গ্রাম দখল করার প্রয়োজন দেখা দিল। একটি পাহাড়ের নিচু পথে নদী পার হয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এমন এক জায়গায় এসে থামলেন যেখান থেকে আক্রমণ করতে হবে। ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি উঁচু চূড়া থেকে গ্রামটির দিকে দৌড়ে গেলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আঘাতে তিনি থেমে গেলেন। বুকে জ্বলন্ত এক ব্যথা অনুভব করলেন। তারপরই আর কিছু মনে রইল না।

জ্যাকোবসন-এর রোগীটি বহুবার এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে যখন তিনি আরাসের কাছে আসেন। ফলে তিনি অনুসন্ধান

১. OOBE : Out of the Body Experience.

করে দেখার চেষ্টা করেন যে, এই দিবাস্বপ্নের সত্যিই কোন ভিত্তি আছে কিনা। তিনি শহরের ভেতরে ও বাইরে বার বার ঘুরেও তাঁর সেই দিবাস্বপ্নের সঙ্গে মেলে এমন কোন দৃশ্যই দেখতে পেলেন না। খুঁজতে খুঁজতে একসময়ে তিনি একটি সাইন পোস্টের কাছে এসে দেখেন লেখা রয়েছে বপউমে (Bapaume)। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠ অবধি উঠে আসে। সেই রাস্তা থেকে নিচের দিকে তিন মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই তিনি তাঁর সেই দিবাস্বপ্নের সঙ্গে মিলে যায় এমন দৃশ্য দেখতে পান। সেই গ্রামের কাছে আসতেই তাঁর স্মৃতি যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছান যেখানে দিবাস্বপ্নে দেখা ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সরু পাহাড়ী নিচু পথটিও তিনি দেখান। শেষ পর্যন্ত সেই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হন যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলে স্মৃতিতে ফুটে ওঠা সেই গীর্জা, ঘরবাড়ি কিছুই দেখতে পান না। তবে তাঁর ছেলে গ্রামের লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে সংঘর্ষে গ্রামটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থানটির চারদিকে নতুন গীর্জা ও ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়।

এই ঘটনাটি এই জন্যই উল্লেখযোগ্য নয় যে, স্থানটিতে আসার আগেই তিনি এর বর্ণনা দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, স্থানটি মিলিয়ে নেবার সময় অন্যান্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কারণ, এরা সকলেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাঁর দিবাস্বপ্নের সত্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন।

পূর্বজন্মের স্মৃতির এমন উজ্জ্বল নিদর্শন আরও অনেক পাওয়া যায়। জার্মানীর লুবেক অঞ্চলের হেনরি হাইনেককেন (Henry Heinecken) ছিলেন এমনি আশ্চর্য এক শিশু। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই সে অনর্গল কথা বলতে আরম্ভ করে। এক বৎসর বয়সে সে সমগ্র বাইবেল আওড়াতে পারতো। চার বছর বয়সে সে ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা শেখে। পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই সে মারা যায়। জাতিস্মরদের মধ্যে হেনরি হাইনেককেনের এই ঘটনাটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে আছে। বাদক মোজার্টও পাঁচ বছর বয়সেই নতুন সুর রচনা করতে শিখেছিলেন।

ইংরেজ উপন্যাস লেখিকা জোয়ান গ্রান্টও জাতিস্মর ছিলেন। তিনি তাঁর গত কয়েক জন্মের স্মৃতি স্মরণ করতে পারতেন। এর উপর ভিত্তি করে তিনি যে উপন্যাস রচনা করেন সেগুলো যেন তাঁর আত্মজীবনী হয়ে আছে। জোয়ান ও আর্কের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বিখ্যাত কয়েক শতাব্দী বা সহস্রাব্দীর স্মৃতি স্মরণ করতে পারতেন। তবে বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর মানসিক ক্ষমতা তখনও পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি। একবার মিশর পরিদর্শনে এসে অতীত জীবনের বহু স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে ওঠে। যে সব স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে ওঠে তাই নিয়ে তিনি একটি

স্মৃতিকথা লেখেন। বইটির নাম 'Winged Phoraoh'। এর আগে মিশরের উপর তিনি কোন রিসার্চওয়ার্ক করেন নি। তবু তিনি নির্ভুলভাবে প্রাচীন মিশরীয় জীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে রাজকুমারী 'যেকীতার' জীবনকাহিনী লেখেন। পণ্ডিতজন, সমালোচক ও মিশর-বিশেষজ্ঞরা তাঁর নির্ভুল প্রাচীন মিশরীয় বর্ণনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঘটনাগুলোর প্রাক্তন যথার্থতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। তবু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, টেলিপ্যাথিজনিত দূরদর্শন ও পূর্বাহ্নেই কোন কিছু জানা মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়।

ব্রাজিলিয়ান লেখিকা গাই প্লেফেয়ার (Guy Playfair) ছোটবেলা থেকে যৌন চেতনার অধিকারী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখতেন। মধ্য বয়সে একবার তিনি পম্পেই নগরীতে বেড়াতে যান। পম্পেইতে গিয়েই তিনি যেন সব চিনতে পারেন। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে তিনি তাঁর নিজের ঘরে যান। জানা যায় ঘরটি প্রাচীনকালে বেশ্যালয় হিসেবে কাজ করত।

মানুষের এই সূক্ষ্ম সত্তার সঙ্গে তার স্বপ্নেরও একটি অদ্ভুত যোগ রয়েছে বলে অনেক মনে করেন। প্রাচীনকালেও লোকেরা মনে করত যে, স্বপ্নে তার দেহস্থ সূক্ষ্ম সত্তা বাইরে বিচরণ করতে বেরয়। ইদানীংকালে Astral Travel বা আকাশ পরিক্রমায় বহু ব্যক্তি জাগ্রতভাবেই এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সকলের পক্ষে জাগ্রত আকাশ পরিক্রমা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই আকাশ পরিক্রমা অধিকাংশ লোকই স্বপ্নে করে থাকে। স্বপ্নে মানুষ অপরিচিত দেশে চলে যায়। এই স্বপ্ন কি, যা ঘুমের মধ্যে আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর অধিকাংশই হারিয়ে যায়, সামান্য কিছু মাত্র স্মৃতিতে থাকে। কোন কোন স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়! কিপলিং (ইংরেজ কবি) এই ধরনের স্বপ্ন দেখে বলেছিলেন যে, আমার জীবনের 'অমুক্ত ফিল্ম'। কোন কোন স্বপ্নে দেখা যায় যে, এক মন অপর মনকে স্পর্শ করেছে। আবার অনেক স্বপ্নই অর্থহীন। তাহলে স্বপ্ন কি ? আমরা স্বপ্ন দেখিই বা কেন ?

প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতকে পাশ্চাত্য জগৎ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, স্বপ্ন হল অবচেতন বা অচেতন মনের ভাষা। লোকে যাকে ভয় পায়, চেপে রাখবার চেষ্টা করে বা গোপনে কামনা করে, স্বপ্নে তাই বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধরে। সে জন্য তাকে আমরা ঠিক চিনতে পারি না। স্বপ্ন আসে ছদ্মবেশে প্রতীকী মূর্তি ধরে। অধিমনোবিজ্ঞানীরা বা মনস্তাত্ত্বিকরা তাকে বিশ্লেষণ করে এর অর্থ উদ্ধার করেন, ফ্রয়েড ও য়ুঙ্ যা করতেন। আজ যাকে 'মনের ভাষা' বলে বলা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগে তাকেই অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হত। তখন ভাবা হত যে, পেট গরম হলে বা ভয়াবহ কোন গল্পের বই পড়লে এ ধরনের স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু সব স্বপ্নই তো

আর ভয়ানক নয়। আর সবাই যে পেট গরম করে স্বপ্ন দেখে তাও নয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোকেরাও সুস্থ দেহতে স্বপ্ন দেখে থাকে। বস্তুত স্বপ্ন প্রত্যেকে প্রত্যেক রাতেই দেখে এবং একাধিক। এবং তা দেখে বলেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, কারণ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বহু অবাঞ্ছিত তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়। এইজন্য 'ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ' যন্ত্র দিয়ে দেখা গেছে যে, যারা স্বপ্ন দেখে না তারা অতি দ্রুত পাগলামির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজ বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অতীতে বহু লেখকও সেরকমেই ভাবতেন, যেমন কোলরিজ (Coleridge) বোদলেয়ার (Baudelair) গ্যয়টে (Goethe) স্টিভেনশন (Stevenson) পো (Poe), মেরি শেলী (Mary Shelley) প্রভৃতি। অনেকে এই স্বপ্ন থেকেই সুন্দর সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন। তাঁরা মনোবিজ্ঞানীদের বহু আগেই বুঝেছিলেন যে, স্বপ্ন হল অবচেতন মনের ভাষা। কিন্তু স্বপ্ন 'অচেতন বা অবচেতন মনের ভাষা' এও বোধ হয় স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। সেই জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানী থেকে অতীত ঐতিহ্যবাদীদের অনেকে এ চিন্তাও করেছেন যে, স্বপ্ন 'অবচেতন মনের ভাষা' ছাড়িয়েও ভিন্ন কিছু।

এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে জন চ্যাপম্যানের গল্প তো একটা কিংবদন্তী হয়ে আছে। চ্যাপম্যান এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে লণ্ডন গিয়ে লণ্ডন-ব্রীজের কাছে অপেক্ষা কর। সেখানে একজন লোক তোমাকে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত দেবে। স্বপ্নটি চ্যাপম্যানের এতই সত্য মনে হয়েছিল যে, সে সত্যি সত্যি নিজের গ্রাম সোয়াফহ্যাম (Swaffham) থেকে তিন দিন পায় হেঁটে একশ মাইল পথ পার হয়ে লণ্ডন-ব্রীজের কাছে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। এখানে তখন প্রচুর দোকানপত্র ও ঘরবাড়ি ছিল। চ্যাপম্যান সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কেউ এসে তার সঙ্গে একটি কথাও বলে না। আশা ত্যাগ করে চ্যাপম্যান যখন ফিরে যাবে বলে ভাবছে এমন সময় এক দোকানী এসে তার সঙ্গে কথা বলে। সে তাকে লণ্ডন-ব্রীজের কাছে কয়েকদিন থেকে অপেক্ষা করতে দেখছিল। দোকানীটি জিজ্ঞেস করে, সে এখানে অপেক্ষা করছে কেন? চ্যাপম্যান নিজের নাম ধাম কিছুই প্রকাশ না করে তার স্বপ্নের কথা বলে। দোকানীটি হেসে বলল, এভাবেই যদি ভাগ্য ফিরত তা হলে সেও তো সোয়াফহ্যাম বাজারে গিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারত। সে স্বপ্ন দেখেছিল যে, নরফোকে সোয়াফহ্যাম বাজারে জন চ্যাপম্যান নামে এক ব্যক্তি বাস করে। বাড়ির পেছনে তার বাগানে একটি পীয়ার গাছ আছে। তার নিচে ঘড়া ভর্তি টাকা পোঁতা আছে। তাই শুনে সে যদি সোয়াফহ্যামে দৌড়তো, তা হলে সে কেমন বোকা বনত?

জন চ্যাপম্যান সে কথা শুনেই নিজের গ্রামে ফিরে আসে এবং বাগানের সেই গাছটির তলা খুঁড়ে সত্যি সত্যি সোনা ও রুপার টাকা ভর্তি একটি কলসী পায়। এবং তার ভাগ্য ফিরে যায়।

চ্যাপম্যানের গল্প কতদূর সত্য বলা দুষ্কর। তবে এমনতর অভিজ্ঞতা যে নেই তা নয়। বৈজ্ঞানিকরা এমনতর স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে অনেক সত্যও খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী, অধিমনোবিজ্ঞানী লুইসা রাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'Hidden Channels of the Mind'**-এ উল্লেখ করে গেছেন। একজন অপেশাদার ভুতত্ত্ববিদের একটি স্বপ্নের কথা সেখানে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ—তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পঁচিশ মাইল দূরে একটি নদীর ধারে অল্পজলে একটি ফাঁকা স্ফটিক-পাথর পড়ে আছে। স্ত্রীকে তিনি সেই স্বপ্নের কথা বলেন এবং দ্বিপ্রহরের আহার শেষে তাকে নিয়ে স্বপ্ন নির্দিষ্ট সেই স্থানের দিকে বেরিয়ে পড়েন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা সেই জায়গায় এসে পেঁছান। তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে সত্যি সত্যি সেই ফাঁকা স্ফটিকটি পান। পরে এই স্ফটিকের দাম উঠেছিল তিনশ পাউন্ড। কিন্তু তিনি সেই স্ফটিকটি বিক্রি করেন নি।

অনেকে মনে করেন যে, স্বপ্নে নাকি ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ ধরনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন। তাঁরা মনে করেন যে, যা নেই তার কোন টেলিপ্যাথী হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন অনেক স্বপ্ন দেখা গেছে যা ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। লুইসা রাইনই তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের একটি স্বপ্নের কথা বলে গেছেন। গল্পটি এই রকম ঃ—একটি কলেজের মেয়ে একজন স্বল্প পরিচিত তরুণের সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া ঠিক করে। কিন্তু তার মা একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেন। মা কেন তাকে পিকনিকে যেতে বারণ করছেন তা পরে বলবেন বলে জানান। কিন্তু মেয়েটি বাড়ি থাকবে বলে কথা দিলেও এক ফাঁকে সেই ছেলেটির সঙ্গে পিকনিকে যায়। ফেরার পথে সেই ছেলেটি একটি অরণ্যের ধারে গাড়ি থামিয়ে তার উপর বলাৎকর করে। এতে মেয়েটি এতটা ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয় যে, সে কারো কাছে তা ব্যক্ত করে না। কিন্তু পরের সপ্তাহে বাড়ি গেলে মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেদিন সে নিজের ঘরে ছিল কিনা? সে বলে যে, সে ছিল। তখন মা তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। যা ঘটেছিল মা পূর্বাহ্নে ঠিক সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

কবি কিপ্‌লিং আত্মিক অভিজ্ঞতার গল্পকে বিদ্রূপই করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে যায়। তিনি একবার স্বপ্নে দেখেন যে, কোন একটি অনুষ্ঠানে ভিড়ের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একটি লম্বা লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকাতে আগে কি ঘটছে তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে দর্শকরা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে একজন অপরিচিত লোক এসে তাঁর হাত ধরে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।' বাহ্যত এ স্বপ্নের কিপ্‌লিংয়ের কাছে কোন অর্থই ছিল না। কিন্তু প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে ওয়েস্টমিনস্টার এবে-তে দেখা গেল, তিনি একটি স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নটির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। সত্যি সত্যিই একজন লম্বা লোকের জন্য সামনে কি হচ্ছে তা

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। সভা ভঙ্গ হলে লোকেরা যখন চলে গেছে তখন পেছন থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল—'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।' এ সম্পর্কে কিপ্‌লিং, নিজেই লিখে গেছেন যে, 'কেমন করে এবং কে যে আমার জীবন-ফিল্মের অপ্রকাশিত দৃশ্যটি দেখালেন, কে জানে!'

চার্লস ডিকেন্সও নাকি এ ধরনের বহু স্বপ্ন দেখতেন, যেগুলিকে তিনি তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়ে গেছেন।

আফ্রিকার জঙ্গী চরিত্রের মাসাইরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। একবার তাদের এক গুণিন নেতা মৃত্যুর আগে বলে যান যে, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, একটি বড় সাপ মাসাইদের দেশের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ছে বড় বড় পাখি। তার ছায়া পড়েছে মাসাই-উপত্যকাতে। এ সবই নিয়ে আসছে শ্বেতকায়রা। তবে মাসাইরা যদি এই শ্বেতকায়দের কাউকে হত্যা করে তাহলে তাদের অর্ধেক লোক এবং সব গরুভেড়া মহামারীতে মারা যাবে।

এর কিছুদিন পরেই ইংরেজরা যখন উগান্ডা-রেলপথ তৈরি করতে আরম্ভ করে তখন মাসাইরা কিছু বলে না। এই রেলপথ ছিল সাপেরই মত আঁকাবাঁকা। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাসাইরা তাদের পরলোকগত নেতার কথা অমান্য করে একজন শ্বেতকায় ইংরেজকে মেরে ফেলে। ফলে গুটিরোগ মহামারীতে তাদের অর্ধেক লোক মারা যায়। আর এক ধরনের মহামারীতে তাদের গরু, ভেড়া, ছাগল প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এইভাবে তাদের পরলোকগত গুণিন নেতার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। তিনি যে বড় বড় পাখির কথা বলে গিয়েছিলেন সেগুলি হল আধুনিক উড়োজাহাজ।

মালয় উপদ্বীপের সেনয় উপজাতি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন। স্বপ্ন ব্যাখ্যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি বড় জিনিস। ছেলেমেয়েদের বলা হয় তারা যেন সকালবেলা রাতের দেখা স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে। এ হলে তাদের সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে। খারাপ স্বপ্ন দেখা গেলে তারা অশুভ আত্মার প্রভাব দূর করার চেষ্টা করে। এজন্য শুভ আত্মা বা শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, যাতে শুভ শক্তি অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করতে পারে। সেনয়দের মানসিক সুস্থতা ও সম্প্রদায়-চেতনা মনে করিয়ে দেয় যে, এই উপজাতিটি বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের অধিকারী। সেই সহজ জ্ঞানের সন্ধান পাশ্চাত্যের লোকেরা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এইসব উপজাতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অনুসন্ধান করে চলছে। দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য স্বপ্ন-চিন্তা অনেকটাই অ-পাশ্চাত্যদের চিন্তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

আর্থার গ্রিম্বল নামে এক লেখক তাঁর 'Pattern of Islands' গ্রন্থে স্বপ্নকে কার্যে ব্যবহারের এক অদ্ভুত ঘটনা তুলে ধরেছেন। এক সময় তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে ভূমি-কমিশনার ছিলেন। একবার তিনি দূরবর্তী কোন এক গ্রামে কালো তিমি ডেকে আনা সম্পর্কিত অনুষ্ঠান দেখতে আমন্ত্রিত হন। কালো

তিমির মাংসকে এরা খুব মূল্য দিত। এই কালো তিমি ডেকে আনতো বংশ পরম্পরায় এক শ্রেণীর তিমি-আহ্বায়ক। এরা স্বপ্ন দেখার সময় তাদের সূক্ষ্মদেহকে ছেড়ে দিত। পশ্চিম দিগন্তের নিচে এদের আত্মা কালো তিমিদের দেশে চলে যেত। সে তাদের তার সঙ্গে ফিরে গিয়ে তাদের গ্রামের নাচ ও ভোজ উৎসবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো। আমন্ত্রণ যদি যথার্থভাবে করা হত তিমিরা তাহলে উল্লাসে শব্দ করতে করতে তার সঙ্গে আসত।

গ্রিম্বল যখন উল্লেখিত গ্রামে এসে উপস্থিত হন, দেখেন যে, উৎসবের সব কিছুই প্রস্তুত। শুধু তিমির মাংসই নেই। তিনি তিমি-আহ্বায়কের সঙ্গে দেখা করলেন। লোকটি বেশ মোটাসোটা, কিন্তু বড় ভদ্র। সে নিজের কুঁড়েঘরে গিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ রইল। দ্বীপবাসীরা নীরবে বসে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তিমি-আহ্বায়ক দ্রুত তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে ছিট্‌কে পড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে নিজের চুল চেপে ধরে কুকুরের বাচ্চার মত খ্যান্‌খ্যান্‌ করতে লাগল। বলতে লাগল, টিরাকে টিরাকে (Teirake, Teirake) অর্থাৎ 'ওরা আসছে, ওরা আসছে।' গ্রামের লোকেরা সবাই গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রিম্বল দেখলেন, তিমিরা ঝাঁক বেঁধে আসছে। আসছে খুব ধীরে ধীরে। যেন কেমন মুগ্ধ হয়ে আসছে তারা। তাদের নেতা তিমি-আহ্বায়কের পথ ঘিরে প্রচণ্ডভাবে লাফাতে আরম্ভ করেছে। তিমি-আহ্বায়ক নিঃশব্দে তার পাশে হাঁটতে লাগল এবং অল্প জলের দিকে এগুতে লাগল। গ্রামের লোকেরা ঘিড়বিড় করে তাদের অতিথিদের তীরে ডাকতে লাগল। সবুজ শ্যাওলা ছাওয়া জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে গ্রিম্বল দেখলেন—তিমিদের পুচ্ছ বালিতে আছড়াচ্ছে, যেন সাহায্য চাচ্ছে এমন ভাব। বড় বড় ব্যারেল দুহাতে ঘিরে ধরে লোকেরা তিমিদের দিকে পেতে দিচ্ছে। তিমিদের ভাব এই রকম, যেন কোন রকমে তীরে উঠতে পারলেই তারা বাঁচে। যখন তারা তীরে উঠে এল তখনই তাদের মেরে দ্বীপবাসীরা খেতে আরম্ভ করে দিল।

এই অদ্ভুত গল্প বহুদিনের সেই প্রশ্ন, 'স্বপ্নের অর্থ কি ?' তার উপর যেন নতুন আলো ফেলেছে। সাধারণত আমাদের বিশ্বাস যে, স্বপ্ন এমনিতেই আসে, ঘুমের মধ্যে আমরা তা দেখি। কতকগুলি অলৌকিক স্বপ্নেরও আমরা এই ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকি। কিন্তু তিমি-আহ্বায়কদের স্বপ্নে তিমি ডেকে আনা প্রমাণ করে যে, স্বপ্ন নিজে নিজেই আসে না। এর মধ্যে মনের নিজস্ব একটা ইচ্ছা থাকে। সুতরাং গ্রিম্বলের বর্ণনা শুনে মনে হয় যে, ঘুমের সময় মানুষ যথার্থই ঘুমোয় না, এক ধরনের আচ্ছন্নভাবে থাকে। তিমি-আহ্বায়কের স্বপ্নের কথা শুনে মনে হয় স্বপ্নের মধ্যেও আত্মিক শক্তিকে অপরের উপরে চালনা করে দেওয়া যায়। পৃথিবীতে স্বপ্নের ইতিহাসে গিলবার্ট দ্বীপের এই ধরনের স্বপ্নের কোন কাহিনী লেখা নেই। এ এক অদ্ভুত রহস্যময় স্বপ্ন। অনেক স্বপ্ন অনেক সময় স্বাপ্নিকের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে,

অনেক সময় এই স্বপ্নগুলি হয়তো পৃথিবীকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু স্বপ্নে অপরকে প্রভাবিত করা গেছে এমন জানা যায় না। সেই জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই আমরা চমকে যাই তার জটিলতা, সূক্ষ্মতা ও মানবমনের রহস্যময়তা দেখে।

স্বপ্ন-চিত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন ইদানীং কালে সিগমন্ড ফ্রয়েড। মানুষের অবচেতন মনের স্তরে যাবার জন্য ফ্রয়েড যেন রাজপথ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর শিষ্য কার্ল গুস্তাভ য়ুঙ্ও ফ্রয়েডেরই মত স্বপ্নের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছে। 'স্বপ্ন প্রতীকের মাধ্যমে স্বাপ্নিকের মনের কামনা-বাসনাকেই ব্যক্ত করে', ফ্রয়েডের তাই ধারণা, বিশেষ করে যৌনবাসনা। সব স্বপ্নের গোড়াতেই ফ্রয়েড যৌনতার গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু য়ুঙ্ সর্বক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের সহমত হতে পারেন নি। একটি স্বপ্ন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই এই দুই মহান স্বপ্ন-তত্ত্ববিদের মানসিকতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। স্বপ্নটি এই রকম ঃ—একটি লোক স্বপ্ন দেখলেন যে, দ্বিতল গৃহের দোতলায় তিনি আছেন। ঘরটি অপরিচিত, অথচ তাঁরই। পুরানো সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র এবং দেয়ালের সুন্দর চিত্রগুলি দেখে তিনি ভাবলেন, মন্দ নয়। আরও ভাল করে দেখার জন্য তিনি নিচে গেলেন। নিচের তলার সাজসজ্জা যেন মধ্যযুগীয়। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মেঝেতে ইঁট বিছানো। ভারি একটা দরজা সরিয়ে তিনি দেখলেন, একটি সিঁড়ি ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেছে। ভাঁড়ার ঘরটি রোমান যুগের সুন্দর গম্বুজওয়ালা ঘরের মত। মেঝেতে পাথর বসানো। একটি পাথরের উপরে লোহার আংটা লাগানো। তিনি পাথরটি সরিয়ে আর একটি পাথরের সিঁড়ি দেখতে পেলেন। সেই সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিচে নেমে দেখলেন, ছোট পাথর কুঁদে তৈরি করা একটি গুহা। মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু হাড় ও মাটির পাত্রের টুকরো। প্রাগৈতিহাসিক এই নমুনার মধ্যে দুটো নরকরোটিও তিনি দেখতে পেলেন। এরপরই তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

লোকটি এই স্বপ্ন দেখে তা তাঁর এক সতীর্থের কাছে বলেন। সতীর্থটি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করে নরকরোটি দুটি। এই নরকরোটি দুটি কার? একটি বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে তিনি তাদের যুক্ত করতে চান। অর্থাৎ তিনি স্বপ্ন দেখা লোকটিকে বোঝাতে চান যে, কোন দু'জন লোকের মৃত্যু তিনি কামনা করছেন বলেই এক জোড়া নরকরোটি দেখেছেন। কিন্তু যিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি দৃঢ়প্রত্যয় যে, সেরকম কোন ইচ্ছা তাঁর মনে নেই। তবে যে দু'জনের মৃত্যু হলে তিনি অখুশি হবেন না, সেই দু'জন হলেন তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা। এই উত্তর পেয়ে সতীর্থ স্বপ্নব্যাখ্যাকারকটি যেন স্বস্তি পেলেন। যদিও সেই স্বপ্ন বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবুও স্বপ্নতত্ত্বের ইতিহাসে এই স্বপ্নটি একটি যুগান্তর বিশেষ। কারণ, যিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি স্বয়ং কার্ল গুস্তাভ

য়ুঙ্। আর যিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি সিগমন্ড ফ্রয়েড। এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এই দুই স্বপ্নতত্ত্ববিশারদ ভিন্ন দুই পথে চলে যান।

স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যৌনতার গন্ধ পেলেও য়ুঙ্ ভিন্ন অর্থ খুঁজে পান। দোতলার পরিচিত পরিবেশ তাঁর মতে তাঁর নিজেরই চেতনাশক্তির প্রতীক (consciousness)। নিচের তলা অচেতন মনের প্রথম অংশ। মাটির নিচের অন্ধকার ঘর তাঁর মধ্যে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতা ও সংস্কৃতির প্রতীক, যাকে চেতন স্তরে তুলে আনা হয়েছে। এই স্বপ্ন থেকে য়ুঙ্-এর মনে 'সমবেত অচেতনতা' (collective unconscious) সম্পর্কে ধারণা জন্মে। মানুষ যে শুধু দৈহিক কতকগুলি লক্ষণই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে তা-ই নয়, একটা অচেতন-স্মৃতিও সেই আদিম পূর্বপুরুষ থেকে তার মধ্যে বয়ে আসে।

এই সময় য়ুঙ্ আর একটি স্বপ্ন দেখেন। যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে য়ুঙ্ ও ফ্রয়েডের মধ্যে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্বপ্ন দেখেন যে, সুইজারল্যান্ড-অস্ট্রিয়া সীমান্তে পার্বত্য এলাকার কোন এক আবগারি চৌকিতে (custom post) তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বৃদ্ধ অস্ট্রীয় রাজকীয় আবগারী কর্মচারী তাঁকে অতিক্রম করে হেঁটে গেলেন। লোকটি একটু বেঁকে গিয়েছিল। ভাব দেখে মনে হয় যে, খিটখিটে স্বভাবের, বিষাদাচ্ছন্ন ও বিরক্ত। কেউ কেউ তাঁর স্বপ্নের কথা শুনে বললেন যে, বৃদ্ধ আবগারী কর্মচারীটি পুরনো কোন আবগারী কর্মীর ভূত। বেশ কয়েক বছর আগে হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে। আর একজন বললেন, আবগারী কর্মচারীটি যেমনভাবে মরা উচিত তেমনভাবে মরে নি।

কিন্তু য়ুঙ্ যখন নিজের স্বপ্ন নিজেই ব্যাখ্যা করলেন তখন এই আবগারী কর্মচারীটির মধ্যে দেখতে পেলেন ফ্রয়েডের অচেতন চিত্র। স্বপ্নের আবগারী কর্মচারীটি বহুদিন আগের এক কর্মী যিনি এ কাজে কখনও খুশি হতে পারেন নি। ফ্রয়েড কখনও কখনও নিজের কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাতেন। য়ুঙ্ মনে করেন যে, এই স্বপ্নে তিনি সচেতনভাবে ফ্রয়েড সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা করেছিলেন সেই ধারণাকে অনেকটা শুধ্রে দিয়েছিল। ফ্রয়েডকে ভৌতিক অবস্থায় দেখা মানে যে তাঁর মৃত্যু কামনা করা, য়ুঙ্ তা কখনও মনে করতেন না। কিন্তু ফ্রয়েডকে এ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে দিলে ফ্রয়েড হয়তো এমনতর ব্যাখ্যাই করতেন। বরং তাঁর ব্যাখ্যাতে এ স্বপ্নের শেষ কথা ছিল ফ্রয়েডের মৌলিক অমরত্ব। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই যখন তিনি স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁর মনে হয় 'সীমান্ত' দ্বারা বুঝিয়েছে চেতন ও অচেতন মনের সীমান্ত। তা ছাড়া এ দ্বারা ফ্রয়েড ও তাঁর নিজের চিন্তার ফারাকও বোঝানো হয়েছে। স্বপ্নটি আবগারী চৌকিতে দেখার অর্থ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিশেষ একটি শব্দ 'censorship'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। আবগারী চৌকি-প্রথার কথা তাঁর মনে আসার কারণ, আবগারী কর্মচারীরা যেমন ব্যক্তিগত স্যুটকেস, বাক্স ইত্যাদি খুলে দেখে, তেমনই মনের গভীর অন্তঃপুর খুলে দেখেন মনস্তত্ত্ববিদেরা। তার অপরিতৃপ্তি ও শ্রান্তি

অবসান দ্বারা বুঝিয়েছে ব্যক্তি-ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতি তাঁর অনীহা। এ সব কিছুই স্বপ্নটির মধ্যে প্রতীক হয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

এটাই ভাগ্যের পরিহাস, যে-স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে য়ুঙ্-এর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল সেটা এসেছিল ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়েই। সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে তিনি ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অবশ্যই গ্রহণ করেছিলেন। য়ুঙ্ মনে করেন ফ্রয়েডের তত্ত্ব কঠোর। যৌন ইচ্ছার উপর বেশি রকম জোর দিয়ে তিনি ঘটনাকে বিকৃত করেন। ফ্রয়েড স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে। অনেক কিছুই তা থেকে বাদ পড়ে যায়। তথাপি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মন বিশ্লেষণে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হবে, কারণ তিনিই হলেন এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক।

নিচে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করা হচ্ছে যা অতি সহজেই ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি ও চিন্তার মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্বপ্নটি এই ধরনের ঃ—একজন হয়তো স্বপ্ন দেখল যে, সে ছাদে কাজ করছে। হঠাৎ নিচে উঠান থেকে বাবার কণ্ঠ শোনা গেল। ভাল করে বাবার কথা বোঝার জন্য সে ফিরে দাঁড়াল। যেই ফিরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়িটি তার হাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে ঢালু ছাদ বেয়ে নিচে গিয়ে পড়ল। ভারি একটা কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ পড়ে গেছে। ভয় পেয়ে লোকটি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। দেখল তার বাবা মরে পড়ে রয়েছেন। মাথা রক্তে রক্তাকার। ভয় পেয়ে সে মাকে ডাকতে আরম্ভ করল। মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু ভেবো না। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি জানি উনি মারা গেলেও তুমি আমাকে দেখবে। মা তাকে চুমু খেলেন, আর সেই মুহূর্তে লোকটির ঘুম ভেঙে গেল।

যে এই স্বপ্ন দেখেছিল তার বয়স তেইশ। বিবাহিত। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এক বছর ছাড়াছাড়ি। বাবা চাপ দিচ্ছেলেন যে, স্ত্রীর কাছে সে ফিরে যাক। কিন্তু সে যেতে রাজি হয় নি। এইটুকু মতভেদ ছাড়া বাবা মার সঙ্গে আর সমস্ত দিক থেকেই তার সুসম্পর্ক ছিল।

ফ্রয়েডের মতে সব স্বপ্নই ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন। যে ইচ্ছাকে সে অচেতন মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল তা 'সেন্সর' (censor) করে রাখার মত। সেই ইচ্ছাই স্বপ্নে ছদ্মবেশ ধরে বেরিয়ে আসে। বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময়ই এই ধরনের ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়। আবেগের তাগিদেই সে এমন করে। এদের অতৃপ্ত ইচ্ছা শিশুর মত মা বাবার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করে। ছেলেটি হয়তো ব্যর্থ স্বামী হিসেবে বৈবাহিক সমস্যা এড়িয়ে যাবার জন্য বাবাকে সরিয়ে মায়ের নিরাপদ বাহুতে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। সেই কারণেই এমন স্বপ্ন দেখে সে।

ইচ্ছাপূরণ এমনভাবেই হয়ে থাকে। 'সেন্সর' সাধারণত আরো দক্ষতার সঙ্গে মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রকাশ করে থাকে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা এই জন্য ফ্রয়েডের

মতে অচেতন বা অবচেতন মনে ঢোকার রাজপথস্বরূপ। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় এই জন্য স্বপ্নের বাহ্যিক রূপকে ভেদ করে তার অন্তস্তলের মূল সত্যে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। এজন্য বিশেষ একটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, যার দ্বারা অবচেতন বা অচেতন মন তার রহস্য খুলতে বাধ্য হয়। যখন এই গভীর সত্য প্রকাশ পায় তখন সচেতন মনের কাছে তা গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিকে বলেন স্বপ্নের রূপান্তর। স্বপ্ন মনের চাপকে নানা রূপ ধরে বাইরে ঠেলে নিয়ে আসে। এই জন্যই ঘুমানো সম্ভব হয়। ফ্রয়েড স্বপ্ন বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন, স্থানচ্যুত করা, ঘনীভূত করা, প্রতীকী করা এবং দ্বিতীয়বার বিশ্লেষণ করা (**displacement, condensation, symbolization, and secondary revision**)।

১। স্থানচ্যুত করা অর্থ যার সম্পর্কে ভাবা হয় তাকে না দেখিয়ে অন্যের মধ্যে তাকে আরোপ করা। যেমন, 'Y'-এর মৃত্যু কামনা করা হলে 'স্বপ্নে দেখা যায় 'X'-কে। 'Y'-কে 'X'-এ রূপান্তরিত করাই হল স্থানচ্যুত করা।

২। ঘনীভূত করা। স্বপ্ন অনেক সময় এত ছোট হয়ে দেখা দেয় যে, খুব ছোট হলেও তা ব্যাখ্যা করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চলে যাবে। এই সূত্র ধরেই কাব্যে নতুন প্রতীক জন্ম নিয়েছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'কম্প্রেশন'।

৩। প্রতীকীকরণ। স্বপ্ন ছদ্মবেশ ধরে প্রতীকের মাধ্যমে মনের কথা বলে। ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে এই প্রতীকগুলি মূলত যৌনতারই প্রতীক। তাঁর কাছে, লাঠি, ছাতা, গাছ, বন্দুক, তরোয়াল, বর্ম, ফিতে ইত্যাদি সব পুরুষাঙ্গের প্রতীক। গর্ত, বাক্স, পকেট, কাবার্ড, গোলাকৃতি জিনিস, দরজা ইত্যাদি যোনির প্রতীক। এই প্রতীকের মাধ্যমে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সম্পূর্ণ নির্দোষ স্বপ্নের মধ্যেও এক ধরনের যৌনতা রয়ে গেছে।

৪। দ্বিতীয়বার বিশ্লেষ করা। এর মধ্যে রয়েছে অবচেতন মনের রচনার উপর সচেতন মনের বিশ্লেষণ। স্বপ্ন 'লজ অব্ অ্যাসোসিয়েশনে' এমনভাবে চলে যে, অনেক কিছুই অসংশ্লিষ্ট বলে বোধ হয়। কিন্তু সচেতন মন ঘটনাগুলির পরম্পরা ব্যাখ্যা করে তাতে সংযোগ সাধন করে।

ফ্রয়েড যে বলেছেন, 'স্বপ্ন ব্যাখ্যা হল অচেতন মনে প্রবেশের রাজপথ'। য়ুঙ্ এই বক্তব্যকে কখনও অস্বীকার করেন নি। তবে সব অচেতন বা অবচেতন চিত্রই যে যৌনতাপ্রসূত তিনি একথা স্বীকার করতে চান নি। অনেক স্বপ্নে হয়তো অবরুদ্ধ যৌন ইচ্ছা কাজ করে, কিন্তু যে স্বপ্ন কোন রূপই ধরতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে তাহলে জবাব কি ? তিনি স্বপ্নের দুনিয়ার সীমানাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে এর মধ্যে রয়েছে দার্শনিক বক্তব্য, ভ্রান্তি, বন্য চিন্তা, অনুমান, অবিবেকী অভিজ্ঞতা, এমন কি টেলিপ্যাথিক অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া আরও যে কত আছে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন !

ফ্রয়েডের মূল তত্ত্ব ও য়ুঙ্-এর নতুন চিন্তা একই স্বপ্ন সম্পর্কে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা

দেখে। একটি বিশেষ স্বপ্নকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলেই এ কথার সত্যতা অত্যন্ত সুন্দররূপে প্রতীয়মান হবে। ধরা যাক স্বপ্নটি এই ধরনের ঃ—একজন স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর দেশের বাড়িতে আছেন। সবাই শুয়ে পড়ার পর তিনি নিচের তলায় বসবার ঘরে গেলেন। গেলেন নিচে যে অগ্নিচুল্লির অবশিষ্ট কয়লা রয়েছে তা নিজের শোবার ঘরে নিয়ে আসার জন্য। যখন সেই জ্বলন্ত কয়লার অবশিষ্টাংশ নিয়ে তিনি বসবার ঘর থেকে করিডরে পৌঁছেছেন তখন একজন নিগ্রোর সঙ্গে তাঁর দেখা। নিগ্রোটি তাঁকে শাসাতে লাগল। লোকটি তাকে ধস্তাধস্তি করে ফেলে দিল। কিন্তু তারপর কি করবে ভেবে পেল না। তখন একটি মহিলা বেরিয়ে এসে বলল, ওকে মেরো না। আঘাত দিও না। বরং তাকে কোন সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠাও।…' ফ্রয়েড একে বলবেন যৌন স্বপ্ন। যে আগুন লোকটি নিতে এসেছিল সে আগুন যৌন ইচ্ছার প্রতীক—যে যৌন ইচ্ছা নিষিদ্ধ হবার ফলে অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত আকারে ছিল। কালো নিগ্রো ও মহিলাটি পিতা এবং মাতার প্রতীক। নিগ্রোকে হারিয়ে দেওয়ার অর্থ পিতার হাত থেকে উদ্ধার পাবার এবং মাকে পাবার গোপন ইচ্ছা। নিগ্রোটিকে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতে বলে মা এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন, যাতে পিতার হাত থেকে মুক্তিও পাওয়া যায় অপর পক্ষে পুত্রেরও কোন হত্যার অপরাধ না হয়।

কিন্তু য়ুঙ্ এর ব্যাখ্যা করবেন এই ভাবে ঃ—এ হল প্রাচীন কাল থেকে বয়ে আসা একটি কিংবদন্তীয় উপাখ্যানের অংশ মাত্র। এর দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বর্গ থেকে প্রমেথিউস কর্তৃক অগ্নি চুরির কথা—যে জন্য তাঁকে দেবতাদের ক্রোধের শিকার হতে হয়েছিল। নিগ্রো হল 'সমবেত সচেতনতার' প্রতীক—অর্থাৎ প্রাচীন বর্বর মানসিকতা, যা মনের অন্তস্তল থেকে সচেতন মনের স্তরে এসে পৌঁছুলে অস্বস্তি দেখা দেয়। মহিলাটি হল পুরুষ মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহিলার গুণ, যা এই ধরনের বর্বর শক্তিকে সাম্যের মধ্যে এনে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। নিগ্রোটিকে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব হল নিজেরই মধ্যে সচেতন মানস ও সমবেত অচেতন মানসের সংঘাতকে মিলিয়ে দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিত্ব তৈরি করা।

দুইয়ের এই স্বপ্নচর্চা থেকে ফ্রয়েড ও য়ুঙ্-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাবে তুলনা করা যেতে পারে ঃ

ফ্রয়েডের মতে অচেতন বা অবচেতন মনে বহু ইচ্ছা চাপা পড়ে থাকে। য়ুঙ্ একে বলেন—'ব্যক্তি-অচেতনতা', যা 'সমবেত অচেতনতা' থেকে পৃথক। সমবেত অচেতনতা বা 'collective unconscious' আসে—জাতীয় স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা থেকে। এই সমবেত অচেতনতার শক্তিই 'মিথ' বা 'কিংবদন্তী।' সমবেত অচেতনতা বা অবচেতনতাকে য়ুঙ্ বলেছেন প্রাচীন ধরনের (Arcbetypal)। অনেকে পুরাণ-কাহিনী না জানা সত্ত্বেও এ ধরনের স্বপ্ন দেখে থাকে। এটা আসে সমবেত অবচেতনতা বা প্রাচীনকাল থেকে জীবনের ধারাতে বয়ে আসা চিন্তা থেকে, যে চিন্তা সম্পর্কে

ব্যক্তিমানস সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে পারে। য়ুঙ্-এর মতে স্বপ্নের কাজ হল আমাদের আত্মিক সাম্য স্থাপন। স্বপ্ন এই আত্মিক সাম্য আনে খুব সুন্দরভাবে। অর্থাৎ স্বপ্ন শুধু যে ফ্রয়েডের কথামত চেপে রাখা ইচ্ছাকে পূরণ করে তা নয়, স্বপ্ন মানুষের পরস্পর বিরোধী চিন্তার মধ্যে সাম্য স্থাপন করে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং স্বপ্ন উদ্দেশ্যমূলক। অচেতন মানস বা অবচেতন মানস যে শুধুমাত্র চাপিয়ে রাখা ইচ্ছার আধার তা নয়। এরই মধ্যে থাকে ভবিষ্যৎ মানসিকতা ও চিন্তাধারার বীজও। স্বপ্ন যে শুধু পিছন দিকে হাতড়ে বেড়ায়, শিশুসুলভ ইচ্ছা পূর্ণ করে তা নয়। স্বপ্ন অনেক সময় এগিয়েও নিয়ে যায়। অবচেতন বা অচেতন সত্তা থেকে সে এমন নির্দেশ নিয়ে আসে যা স্বাপ্নিকের সারা জীবন ও মানসিক কার্যকলাপের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে। কোন্ পথে চলতে হবে তারও নির্দেশ দেয়।

ফ্রয়েড স্বপ্নে দেখা গৃহকে বলবেন মহিলার প্রতীক। য়ুঙ্ এই গৃহকে মনে করেন আত্মস্বরূপ। গৃহের এক একটি ঘর ব্যক্তিত্বের এক একটি অংশকে ব্যক্ত করে।

স্বপ্নে 'সিঁড়ি' অর্থ ফ্রয়েডের কাছে লিঙ্গ উত্থান-এর প্রতীক। সিঁড়ি দিয়ে নামা লিঙ্গ পতনের প্রতীক। অপর পক্ষে মহিলার সিঁড়ি দিয়ে নামার অর্থ যৌন ক্রিয়ার প্রতীক। য়ুঙ্-এর মতে সিঁড়ি হল জীবনের ধাপের প্রতীক। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আর্টেমিডোরাস নামে এক রোমান স্বপ্নবিশারদও য়ুঙ্-এর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে পাখি হল লিঙ্গের প্রতীক। কিন্তু য়ুঙ্-এর মতে পাখি হল আত্মার প্রতীক, অর্থাৎ মানুষের মুক্ত অংশের প্রতীক, যা অনায়াসে উর্ধ্বে উঠতে পারে।

স্বপ্নে ওড়ার অর্থ ফ্রয়েডের কাছে যৌন আনন্দ ভোগ করার প্রতীক। কিন্তু য়ুঙ্-এর মতে 'স্বপ্নে ওড়া' অর্থ মুক্তির প্রতীক, উর্ধ্বগতির প্রতীক। স্থূল জগৎ থেকে উর্ধ্বে ওঠার প্রতীক।

স্বপ্নে দেখা সাপ হল ফ্রয়েডের কাছে লিঙ্গের প্রতীক। এদের আকৃতি ও গতি, ধারণ ক্ষমতা, চাপ দেওয়া ও থুতু ফেলার ক্ষমতা লিঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। য়ুঙ্-এর কাছে সাপ হল নানা বিপরীত অর্থের দ্যোতক। কখনও মহিলা, কখনও শয়তান। কখনও পুনরুত্থান আবার কখনও আরোগ্যের প্রতীক। এ সবই প্রাচীন কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িত। এইজন্য সাপ তাঁর কাছে সচেতনতার সংঘাত রূপেও চিহ্নিত। স্বপ্নে সাপ দেখা মানে পূর্বাহ্নেই আত্মদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া।

মাকড়-এর জীবন মনুষ্য জীবনের ঠিক উল্টো। মাকড় দ্বারা ফ্রয়েড বোঝেন 'ব্যক্তিত্ব চাপানো মা' যিনি নিজের পুত্র ও কোন যুবতী মহিলার মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। এদের যৌন সংগম করতে দেওয়া অপেক্ষা একজনকে খেয়ে নেবেন।

য়ুঙ্-এর মতে মাকড় হল আত্মিক অর্থাৎ মানসক্ষেত্র, যার বিষয় সচেতন মানসের বিশ্লেষণের কাছে দীর্ঘদিন অধরা থাকবে।

স্বপ্নে দাঁত পড়তে দেখার অর্থ ফ্রয়েডের কাছে বীর্যপাতের প্রতীক। পুরুষের ক্ষেত্রে বীর্যপাত ও মহিলার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের প্রতীক। কিন্তু এ স্বপ্নকে বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেও ধরা যেতে পারে। এই বৃদ্ধি শৈশব থেকে বাল্যে উন্নীত হবার প্রতীক।

স্বপ্নে নগ্নতার দৃশ্য ফ্রয়েডের মতে উন্মুক্ত যৌনতার প্রতীক। য়ুঙ্-এর মতে আত্মিক সাম্য আনার চেষ্টার প্রতীক।

স্বপ্নে পিতার মৃত্যু দেখার অর্থ ফ্রয়েডের কাছে 'অদিপাস কমপ্লেক্স' স্বরূপ অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝায়—মাকে পাবার জন্য পুত্রসন্তানের পিতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আকাঙক্ষা। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাসনাই এ ধরনের স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্বপ্ন এমনিতে কোন ঘটনা নয়। স্বপ্ন মানুষেরই একটি সূক্ষ্ম সত্তার খেলা মাত্র যে সূক্ষ্মসত্তা থাকে অন্তরের অন্তস্তলে। এইজন্য প্রাচীনকালে স্বপ্নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রাচীনকালের লোকেরা স্বপ্নকে বিশেষ করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বলে মনে করত। স্বপ্নে জীবের আর একটি সত্তা বাইরে বেরিয়ে যায় এমনও ভাবত তারা। প্রাচীন পৃথিবীর লোকেরা ভাবত, কিছু কিছু স্বপ্ন দেবতারা মানুষকে কিছু জানবার জন্য পাঠান। এইজন্য স্বপ্নকে প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা মানুষেরই মত হাত পা-ওয়ালা বলে ভাবত। তারা স্বপ্নকে মনে করত ভৌতিক কিছু, যা নানা আকৃতি ধরতে পারে। দেবতারা মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে নানা বার্তা পাঠান এরকমও মনে করত তারা।

কথিত আছে, গ্রীক দেবতারা মানুষের নানা কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। এজন্য তাঁরা স্বপ্নকেও ব্যবহার করতেন। তবে অনেক সময় তাঁদের স্বপ্ন মিথ্যা স্বপ্নও হতো, যেমন হোমার ইলিয়াদে রাজা অ্যাগামেমননের স্বপ্নের কথা বলেছেন। দেবতা জিউস রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যই এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। স্বপ্নে জিউস রাজার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা নেসটর (Nestor)-এর রূপ ধরে রাজাকে জানান যে, সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে ট্রয় আক্রমণ করার সময় হয়েছে। দেবতারা সব এখন গ্রীকদের পক্ষে। সুতরাং জয় হবেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা মাত্রই অ্যাগামেমনন তাঁর পারিষদদের সভা ডাকেন। রাজার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে নেসটর বলেন যে, অন্য কেউ এ স্বপ্ন দেখলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই স্বপ্ন যেহেতু রাজা স্বয়ং দেখেছেন সুতরাং তা সত্য হবেই। সুতরাং ট্রয় আক্রমণ করাই স্থির হয়। কিন্তু স্বপ্ন অনুযায়ী ঘটনা ঘটে না। দীর্ঘদিন সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষ চলাকালে দেবতারা কখন এ-পক্ষ কখন ও-পক্ষ নিয়েছিলেন।

সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকেই মানুষের জীবনে স্বপ্নের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ হল 'গিলগামেশ মহাকাব্য'। এটা লেখা হয়েছিল

আজ থেকে চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে। মহাকাব্যটি স্বপ্নের কাহিনীতে ভরপুর। যেমন, একটি স্বপ্নে আছে, উপর থেকে কোন এক দেবতা গিলগামেশের উপরে পড়াতে সে মাটিতে প্রায় মিশে যায়। অপর একটি স্বপ্নে আছে,—গিলগামেশ এনকিডু নামে এক সহযোগীকে নিয়ে এক পাহাড়ের চুড়াতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টি ভেঙে পড়ে। একটি দুঃস্বপ্নের বর্ণনায় আছে—পালক-ওয়ালা হাত ও ঈগলের নখরের মত নখ নিয়ে একটি জীব এনকিডুকে ধূলাচ্ছন্ন এক জগতে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে মৃতেরা বাস করে। স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্নও। এখানকার অধিবাসীরা দেখতে আংশিকভাবে মানবাকৃতি, আংশিকভাবে পাখির আকৃতি।

প্রাচীন লোকেদের কাছে স্বপ্ন অর্থহীন ব্যাপার ছিল না। ছদ্মবেশে স্বপ্ন কিছু বলছে একথাই তারা ভাবত। আধুনিককালে আমরা ভাবি যে, স্বপ্ন হল আমাদেরই অচেতন বা অবচেতন মনের সৃষ্টি, বাইরে থেকে আসা কিছু নয়। স্বপ্ন যদিও যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই হতে পারে, তবু স্বপ্ন দ্বারা ভবিষ্যৎ জানা যায়। স্বপ্ন ইতিহাসের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন ভাবনা অধিকাংশ লোকেই করতে চায় না। কিন্তু অতীতের লোকেরা স্বপ্নকে নানা ঘটনার নির্দেশক বলে ভাবতে দ্বিধাবোধ করত না। এ ব্যাপারে বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্বপ্নের কথা লেখা রয়েছে 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'। স্বপ্নের গল্প এই ধরনের ঃ—

যোশেফ এক সময় তাঁর ভাইয়েদের কাছে গল্প করেছিলেন যে, তিনি এমন দুটি স্বপ্ন দেখেছেন যার দ্বারা এই বোঝায় যে, একদিন তিনি খুব বড় হবেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করতে বাধ্য হবে। এইজন্য তাঁর ভাইয়েরা বণিকদের কাছে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। ক্রীতদাস হিসেবে যোশেফ শেষপর্যন্ত আশ্রয় পান মিশরে। মিশরে প্রথম ছিলেন জেলে। জেলের সহবন্দীদের নানা স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে একসময় তিনি মিশরের শাসক ফ্যারাও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একবার এই ফ্যারাও অদ্ভুত দুটি স্বপ্ন দেখে বড় বিচলিত হন। স্বপ্নটি এই ধরনের ঃ—'ফ্যারাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এই সময় নদী থেকে সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী উঠে এসে সবুজ তৃণভূমিতে বিচরণ করতে থাকে। এরপরই সাতটি কঙ্কালসার গাভী নদী থেকে উঠে এসে সাতটি নাদুসনুদুস গাভীকে খেয়ে ফেলে। আর একটি স্বপ্নে দেখেন, একটি শস্যচুড়ার শীর্ষে সাতটি সুন্দর কান গজিয়ে উঠেছে। এরপর পূবের বাতাসে সাতটি পাতলা কান এদের পেছনে ফুটে উঠছে। ফ্যারাওয়ের কোন পণ্ডিত-সভাসদ বা জাদুকর এই স্বপ্ন দুটির ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ফ্যারাও তখন ব্যাখ্যা করার জন্য যোশেফকে ডেকে পাঠান। যোশেফ ফ্যারাওয়ের স্বপ্নকে ঈশ্বরের বার্তারূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'স্বপ্ন দ্বারা এই বোঝা যাচ্ছে যে, পর পর সাত বছর মিশরে প্রচুর শস্য হবে। এরপর, পর পর সাত বছর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।' সারা দেশ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হবে।' সেইজন্য তিনি প্রাচুর্যের বছরগুলিতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলির জন্য শস্য সংগ্রহ করে রাখতে বলেন। সত্যি সত্যি যোশেফের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। খুশি হয়ে

ফ্যারাও যোশেফকে তাঁর শস্যভাণ্ডারের অধ্যক্ষ করেন। এই সময় প্যালেস্টাইন থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে যোশেফের ভাইয়েরা পর্যন্ত মিশরে শস্য কিনতে আসে। এই সময় তাদের যোশেফের করুণা ভিক্ষা করতে হয়। যোশেফের সকল স্বপ্ন-ব্যাখ্যাই সত্য হয়।

প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, স্বপ্ন থাকে রসাতলে (মনের অন্তস্তলে?)। দুটো প্রবেশপথ দিয়ে সে বেরয়। একটি প্রবেশপথে থাকে শিঙওয়ালা দরজায়। এর উপর একটি গরু বসে পাহারা দেয়। এই পথ দিয়ে জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে সত্য স্বপ্নেরা আসে। মিথ্যে স্বপ্ন আসে হাতির দাঁতের দরজা দিয়ে। এখানে প্রহরা দেয় একটি হাতি।

মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। ফ্যারাওয়ের স্বপ্নকে তাঁরা তাঁর নিজেরই ইনটুইটিভ অন্তস্তলের ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। প্রাচীনকালের অন্যান্য স্বপ্নের কাহিনীকেও তাঁরা মানুষের অবচেতন মনের জ্ঞান হিসেবে চিন্তা করেন, যা প্রতীকের আকারে স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অবচেতন মনের ক্রিয়া স্বপ্নের আকারে কিভাবে দেখা দেয় সুলতান নাসিরওয়ান-এর স্বপ্নের মধ্যে তা সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। সুলতান স্বপ্ন দেখেন, তিনি যখন স্বর্ণ-ভৃঙ্গার থেকে পান করছেন তখন একটি কালো শূকরও সেই পাত্রে মাথা বাড়িয়ে পান করছে। সুলতান তাঁর উজীরের কাছে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে উজীর তার এইভাবে ব্যাখ্যা করেন: 'রাজার প্রিয়তমা উপপত্নীর এক কৃষ্ণকায় প্রেমিক ভৃত্য আছে।' তাকে ধরার জন্য উজীর নির্দেশ দেন যে, হারেমের সকল মহিলা ও দাসীদের উলঙ্গ হয়ে সুলতানের সামনে নাচতে হবে। দেখা গেল হারেমের একজন এই নির্দেশ পালন করতে ইতস্তত করছে। অপরে তাকে আড়ালে রাখার জন্য ব্যস্ত। পরে দেখা গেল সে পুরুষ। ভারতীয় হিন্দু-ভৃত্য।

সুলতানের এই স্বপ্ন যেন এক ধরনের দূরদৃষ্টির সামিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের অভিমত হল এ স্বপ্ন সুলতানের অবচেতন মনের সন্দেহের সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করত না। তাঁরা স্বপ্নকে কোন দৈবী ব্যাপার বলে মনে করত। স্বপ্নে দেখা সূক্ষ্ম সত্তারা যথার্থই কথা বলে, তারা এই ধরনের ভাবত। এইজন্য দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজরাজড়ারাই স্বপ্ন দেখছেন। রাজরাজড়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং দৈব নির্দেশ তাঁদের কাছেই আসতে পারে। অপরপক্ষে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, রাজাদের দুশ্চিন্তা সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা থেকে অনেক বেশি ছিল। সেই জন্য তাঁরাই বেশি স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের দুশ্চিন্তা প্রতীকরূপ ধরে তাঁদের মনের কথা বলত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদরেজ্জার স্বপ্ন দেখেন যে, 'বিরাট এক ফলাদি সজ্জিত বৃক্ষ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গেছে। সারা পৃথিবী যেন সেই বৃক্ষ আবৃত করে রেখেছে। রাজা বলছেন, 'স্বর্গ থেকে কোন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছে। এই গাছকে কেটে ফেল। ডালপালাগুলো ছেঁটে ফেল এবং ফলগুলি

ছাড়িয়ে দাও। গোড়াটাকে লোহা ও পিতলের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ।' সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্র আত্মা নির্দেশ দিলেন, 'তাঁর মানব-হৃদয় বদলে যাক। মানুষের অন্তরের পরিবর্তে তাকে পশুর হৃদয় দাও।'

এই স্বপ্ন দ্বারা নেবুচাদরেজ্জারের পতনের সূচনা হয়েছে, এবং তাঁর মন যে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এ ধরনের আরও এক আশ্চর্য স্বপ্নের ইতিহাস জানা যায় প্রাচীন লিডিয়ার রাজা অ্যাস্টিয়াগে (Astiyage) সম্পর্কে। তিনি একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর কন্যা মানদানে এত মূত্রত্যাগ করছে যে, এতে প্রথম তাঁর শহর, এবং শেষে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ ভেসে যাচ্ছে। প্রাচীন স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারকরা এ ধরনের মূত্রত্যাগকে প্রজন্মের প্রতীক বলে মনে করতেন। কিন্তু রাজা এর ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেন। তিনি মনে করেন যে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে এমন এক লোকের বিবাহ হবে যে তাঁর কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবে ও নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং মেয়ে বিবাহযোগ্যা হলে তাকে এমন এক পার্শী যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, যে অত্যন্ত গরীব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জিত। মানদানে যখন গর্ভাবস্থায় তখন রাজা আবার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন যে, মেয়ের গর্ভ থেকে দ্রাক্ষালতা বেরিয়ে এসে সমগ্র এশিয়াকে ঢেকে দিচ্ছে। এতে তাঁর চিন্তা আরও বেড়ে যায়। ফলে কন্যা পুত্রসন্তান প্রসব করলে তিনি তাঁর দৌহিত্রকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। মানদানে এমন এক শিশুর জন্ম দেয় পরিণতিতে যে বিরাট এক বিজয়ী শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই শিশুই পরবর্তী কালে মহামতি কুরুস বা কাইরাস নামে পারশ্যাধিপতি হন।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ক্রোয়েসাস নামে লিডিয়ার এক রাজার স্বপ্নের কাহিনী লিখে গেছেন। রাজার দুই পুত্রসন্তান ছিল। একজন বোবা, আর একজন আটিস (Atys)। আটিস ছিলেন সেকালের উজ্জ্বল তরুণদের মধ্যে একজন। ক্রোয়েসাস স্বপ্ন দেখেন যে, আটিস কোন লৌহ অস্ত্রের আঘাতে নিহত হবেন। এতে তিনি এতটাই বিচলিত হন যে পুত্রকে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে আনেন। তাঁকে সামরিক কুচকাওয়াজেও অংশ নিতে বারণ করেন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কোন এক ঘরে তালাবন্দী করে রাখা হয়। আটিস এতে অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি একদিন শিকারে যাবার জন্য জেদ ধরেন। ফলে একটি বন্য বরাহ শিকার করার জন্য তিনি পুত্রকে শিকারযাত্রায় যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য রাখার জন্য সঙ্গে পাঠান একজন অভিজ্ঞ সৈনিককে, যার নাম অ্যাড্রাসটাস (Adrastus)। শূকরটি আহত হয়। তাকে ঘিরে ফেলা হয়। এই সময় চতুর্দিক থেকে বর্শা ছোঁড়া হয়। ভুলক্রমে অ্যাড্রাসটাসের বর্শা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আটিসকে এমন আহত করে, যাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ক্রোয়েসাসের স্বপ্ন কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ ছিল? আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, স্বপ্নের ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত দেবার

ক্ষমতা আছে। দেখা গেছে অভিশাপ লাভ করার পরে অনেক লোক মারা গেছে। বস্তুত ভয়েই তাদের মৃত্যু হয়েছে। হতে পারে যে, অ্যাড্রাসটাস উদ্বিগ্নতা হেতু এতটাই স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছিলেন যে, তাঁর উপর যে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করার জন্য বেশিরকম সাবধানতা হেতু তিনি সেই কাজটিই করে ফেলেন, যে সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্যই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দেখা যায়, দক্ষ খেলোয়াড়ের দুশ্চিন্তা থেকে জাত মনের ভীতিই পূর্ণতা লাভ করে। অপর-পক্ষে এই স্বপ্নের সাধারণ ব্যাখ্যা হল এই যে, রাজা নিজের পুত্র সম্পর্কে অত্যধিক চিন্তিত ছিলেন বলেই এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অতীত কালের স্বপ্নগুলিকে বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে ফেলা হলে তাঁরা সহজেই এই স্বপ্নগুলিকে অতীন্দ্রিয়তা মুক্ত করতে পারেন। এজন্য যে আমরা প্রাচীন লোকদের অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী তা নয়। ফ্রয়েডের কৃতিত্ব এই যে, তিনি স্বপ্নের সঙ্গে স্বাপ্নিকের মানসিকতা ও স্বাস্থ্যের সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন। তবে তিনি যে এ ধরনের চিন্তা করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তা নয়।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে গ্রীস ও ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলে ৩২০টির মত মন্দির ছিল যেখানে স্বপ্ন তৈরি করা হত, অর্থাৎ মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর ব্যবস্থা হত। এজন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়—ঈস্কুলাপিয়াসকে। ঈস্কুলাপিয়াস নিরাময়ের দেবতা নামে খ্যাত। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়াতেও এমন ছিল। গিলগামেশ মহাকাব্যে এই ধরনের কবিতা আছে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার জন্য যা করতে হয় তার নির্দেশ আছে, যেমন, 'চল্লিশ ঘণ্টা পরে তারা সামান্য খাবার পেল, ষাট ঘণ্টা পরে সামান্য বিশ্রাম নিল। সূর্যের দিকে মুখ করে তারা পরিখা খনন করল, গিলগামেশ পরিখার ঢালু জায়গায় দাঁড়ালেন এবং পরিখাতে আটা ঢেলে দিয়ে বললেন—'হে পর্বত, আমাদের স্বপ্ন দাও!'

স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করা হত কোন দৈত্যদানো হত্যা করার আগে স্বপ্নের নির্দেশ পাবার জন্য। অনেক বর্বর জাতি অদ্যাবধি শিকারযাত্রার আগে স্বপ্নের নির্দেশের অপেক্ষা করে। প্রাচীন মিশরে স্বপ্ন দেখাবার মন্দিরও ছিল। (আমাদের তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে নির্দেশ পাবার মত?) মন্দিরের কাজের মধ্যে একটি ছিল—স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ-ধরনের নির্দেশিকা সহ ফলকও খুঁজে পেয়েছেন।

স্বপ্ন তৈরির যে প্রয়াস ঈস্কুলাপিয়াস করেছিলেন তা বেশ জটিল। ভাল স্বপ্ন দেখতে গেলে নানা ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। যেমন মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি খাওয়া চলত না। এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হত। জল পবিত্র করার জন্য অনুষ্ঠান করতে হত। দেবতার উদ্দেশে দান করতে হত। দৈব নিরাময়ের জন্য বেশ কিছু বক্তৃতাও শুনতে হত। রাত্রিবেলা মশাল জেবলে ঈস্কুলাপিয়াসের কাছে প্রার্থনা জানাতে হত। অবশেষে বিশেষ ধরনের হলুদ রঙের নির্বিষ সর্পগৃহে ঘুমোতে যেত। ভোরবেলা বহু রুগীই রোগ নিরাময়ের দৈব নির্দেশ পেয়ে জেগে উঠত। স্বপ্নে রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ বা বিশেষ ধরনের খাদ্যের নির্দেশ পাওয়া

যেত। অদ্যাবধি এ-বিশ্বাস আমাদের দেশে টিকে আছে। এজন্য তারকেশ্বর-এর মন্দিরের মত নানা মন্দিরে হত্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ এক ধরনের নিদ্রায় স্বপ্নাদেশ পাবার জন্য চেষ্টা করা হয়।

প্রাচীন গ্রীসে গ্রীক বৈদ্য গ্যালেন ১৩০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় স্বপ্নে কোন এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুবার নির্দেশ পেয়েছিলেন। এজন্য তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে কোন এক বিশেষ রগ (Artery) কেটে ফেলার আদেশ হয়েছিল। এই নির্দেশ পালন করার ফলে সত্যি সত্যি তাঁর ব্যথা নিরাময় হয়েছিল। আধুনিক মতে এই নির্দেশ হয়তো তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকেই এসেছিল। তা যদি হয়, তা হলে মানুষের নিজেরই মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব তাকে স্বীকার করতে হয়।

এ-ব্যাপারে প্রাচীনকালেই এর নানা ধরনের ব্যাখ্যা ছিল। অ্যারিস্টটলের মতে ঘুমের সময় বাহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে মন অন্তরের অন্তস্তলে তাকাবার বেশি সুযোগ পায়। তিনি মনে করতেন যে, তথাকথিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বপ্ন-নির্দেশ এইভাবেই তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য বা হঠাৎ কিছু ঘটে যাবার জন্য ঘটত। প্লেটোর ধারণা ছিল যে, ব্যক্তির অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই স্বপ্নের উদ্ভব। এক্ষেত্রে ২৩০০ বছর পূর্বেই তিনি ফ্রয়েডের পূর্বসূরী ছিলেন। স্বপ্নেরও মধ্যে একটা দৈব ব্যাপার আছে এ-ধরনের চিন্তাকে অ্যারিস্টটল হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিসেরোও তাই করেছিলেন। অথচ তিনি নিজেই একটি স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আকাশ থেকে সুন্দর এক যুবক সোনার শেকলে বন্ধ অবস্থায় নেমে এসে একটি মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরদিন ক্যাপিটলে কোন সরকারী কাজে উপস্থিত থাকার সময় তিনি একটি যুবককে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন যে, গতরাত্রে একেই স্বপ্নে দেখেছিলেন। যুবকটির নাম অক্টেভিয়াস।

আর্টেমিডোরাস নামে এক রোমান তাত্ত্বিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার জন্য নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মতে স্বপ্ন ছিল পাঁচ ধরনের: যেমন, প্রতীকী, দৈবী, ইচ্ছাপূরণীয়, দুঃস্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন। আধুনিককালে য়ুঙও স্বপ্নকে সাধারণ স্বপ্ন ও মহৎ স্বপ্ন নামে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। আর্টেমিডোরাসের পূর্বে স্বপ্নতত্ত্ব সাধারণ কয়েকটি যান্ত্রিক পদ্ধতি ধরে চলত। আর্টেমিডোরাস এই ব্যাখ্যা মানতেন না। তিনি মনে করতেন যে, স্বপ্নের সামগ্রিক রূপ ও স্বাপ্নিকের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তবেই স্বপ্নের যথার্থ, অর্থ ধরা যায়। এজন্য পরিবেশও বিশ্লেষণীয়। এক্ষেত্রে আধুনিক স্বপ্ন-বিশ্লেষকের মত তিনিও বিশেষ বিশেষ স্বপ্নের কতকগুলি অর্থ করেছিলেন যেমন, চাষ করা, বপন করা, বা বীজ পোঁতার স্বপ্ন দেখলে তিনি তা দ্বারা বিবাহ ও সন্তানের জন্মদান বোঝাতেন। পরিখা ও গোলাঘর ছিল মহিলা, স্ত্রী ও উপপত্নীর প্রতীক। ভ্রাতার

মৃত্যু স্বপ্ন দেখলে তিনি তা দ্বারা শত্রুর অপসারণ বোঝাতেন। অসুস্থতার স্বপ্ন দ্বারা বুঝতেন দীর্ঘ জীবন।

অথচ অনেক স্বপ্ন আছে যা সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিয়েছিল। যেমন মেরী গর্ভবতী হলে যোশেফ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর কাছে এসে বলছেন, 'মেরীর গর্ভস্থ সন্তান হল পবিত্র সত্তা (Holy Ghost)। তাঁর নাম রেখ যিশু। কারণ, সে ইহুদীদের পাপ থেকে মুক্ত করবে। পৃথিবীর বহু কিংবদন্তীয় ধর্মপ্রচারকের জীবনে স্বপ্ন বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, যেমন, এরকম স্বপ্ন বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর জননী মায়া দেখেছিলেন। পবিত্র কোরানের প্রথম অংশ নাকি পয়গম্বর মহম্মদ ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বপ্নেই পেয়েছিলেন।[১] মক্কা অধিকারের প্রতিশ্রুতিও তিনি স্বপ্নেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস।

জুলিয়াস সীজার যেদিন রুবিকন নদী অতিক্রম করে রোমে প্রবেশ করবেন, তার পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি মায়ের সঙ্গে শুয়ে আছেন। ফ্রয়েড হয়তো এতে 'ঈদিপাস কমপ্লেক্স' জাতীয় যৌনতার গন্ধ পেতেন, কিন্তু জুলিয়াস সীজার এতে পেয়েছিলেন ভিন্ন অর্থ। অর্থাৎ তিনি এতে রোম আক্রমণ করার অনুমতি পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করেছিলেন। হ্যান্নিবলও ইটালী আক্রমণ করার আগে স্বপ্নে দৈব নির্দেশ পেয়েছিলেন।

তরুণ পারস্যাধিপতি ক্ষয়েস (Xerxes) গ্রীস আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী আরটাবনুস (Artabanus) তাঁকে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত করেন। কিন্তু রাতে ক্ষয়েস স্বপ্ন দেখেন যে, দীর্ঘাকৃতি এক দিব্য পুরুষ এই পরিকল্পনা ত্যাগ করার জন্য তাঁকে তিরস্কার করছেন। এবং নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলছেন। স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়ে তিনি যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ করার কথাই ঘোষণা করেন। কিন্তু রাতে আবার তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, পরিকল্পনা ত্যাগ করলে যেমন তিনি বড় হয়েছেন, তেমনই ছোট হয়ে যাবেন। ক্ষয়েস এতে চিন্তান্বিত হয়ে আরটাবনুসকে ডেকে স্বপ্নের কথা বলেন। স্বপ্নের যথার্থতা বিচারের জন্য তিনি স্থির করেন যে, আরটাবনুস ক্ষয়েসের সিংহাসনে বসবেন এবং রাতে তাঁর শয্যায় শয়ন করবেন। তিনি যদি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে, দৈব মানতেই হবে। সেইমত ব্যবস্থা করা হলে আরটাবনুসও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। শুধু তাই নয়, নির্দেশ অমান্য করা হলে তাঁকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়। ফলে গ্রীস অভিযান সাব্যস্ত হয়। ক্ষয়েস এথেন্সের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি আর একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন যে, জলপাই গাছ তার মুকুট হিসাবে বিরাজ করছে। গাছের ডালপালা সারা পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ তার মুকুট উধাও হয়ে গেল। এ স্বপ্ন প্রতীকী হলেও সত্যিই

১ Mysteries of the Inner Self, Dreams that Changed the World, Stuart Holroyd, p. 181.

ফলেছিল। ক্ষয়েস´ গ্রীক জগতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করলেও তা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

আধুনিককালেও পৃথিবীর অন্যতম রাষ্ট্রনায়কদের অনেকের মধ্যেই স্বপ্ন অনুরূপভাবে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ব্যাভেরিয়ার পদাতিক বাহিনীতে করপোরাল হিসেবে ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি যেন ভূমিকম্পে ধসে পড়া মাটিতে চাপা পড়ে গেছেন। তাঁর উপর দিয়ে গলিত লোহা বয়ে চলছে। বুক থেকে রক্ত ঝরছে। অথচ পরিখাতে তিনি অক্ষতই ছিলেন। তাঁর সামনেই ছিল প্রতিপক্ষ ফরাসীবাহিনী। সর্বত্রই অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। তথাপি এই স্বপ্ন হিটলারকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি পরিখার নিরাপত্তা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরের মাঝখানে একটি স্থানে গিয়ে দাঁড়ান, যেখানে কারো অধিকার নেই। নিদ্রাচ্ছন্নভাবে যেন তিনি খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনের একাংশ তাঁকে বলছিল, তিনি ভুল করছেন। বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চতুর্দিক কেঁপে উঠল। হিটলার ঠিক করলেন তিনি পরিখাতে ফিরে যাবেন। ফিরে গিয়ে দেখেন পরিখা নেই। পরিখার বদলে বিরাট গহ্বর হয়ে আছে। প্রত্যেকেই চাপা পড়ে গেছে। এই ঘটনার পরই হিটলারের বিশ্বাস জন্মে যায় যে, তাঁর জন্য বিরাট এক ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।

শুধু হিটলার নয় বহু লেখক ও মনীষীর জীবনে হিটলারের মত স্বপ্ন বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসে তার সাক্ষ্যও রয়ে গেছে। সুতরাং স্বপ্ন কোন তত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা জোর করে বলা যায় না। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত কে দেয়? যদি কোন স্বতন্ত্র সত্তা এ ইঙ্গিত না দেয় তাহলে আধুনিক মতে ব্যক্তির নিজস্ব অচেতন বা অবচেতন সত্তাই এই ইঙ্গিত দেয়। তা যদি হয়, তাহলে মানুষের স্থূলদেহের বাইরে সূক্ষ্ম আর একটি সত্তাতেও বিশ্বাস করতে হয়।

আধুনিককালেও অধিমনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, স্বপ্নে অনেক দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল বার্থা হিউসকে নিয়ে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর সে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। যখন ঘটনাটি জানা যায়, প্রায় শ'দেড়েক মানুষ চারদিকে তাঁর খোঁজ আরম্ভ করে। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া যায় না। একটি মাত্র সূত্র পাওয়া যায়। একজন মহিলা একটি তরুণীকে শকের ব্রীজ (Shaker Bridge)-এর উপর দেখেছিল। কিন্তু পর পর দুদিন ডুবুরি নামিয়েও বার্থার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেখান থেকে চার মাইল দূরে মিসেস টাইটাস নামে এক ভদ্রমহিলা বাস করতেন। দ্বিতীয় দিন যখন অনুসন্ধান চলছিল তখন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে কিছু একটা দেখছিলেন। তাঁর স্বামী যখন তাঁকে জাগিয়ে দেন, তিনি বলেন, 'আমাকে যেতে দিলে না কেন? সকালবেলাই তাহলে আমি তোমাকে বলে দিতে পারতুম যে মেয়েটি কোথায় কিভাবে আছে।' সেদিন রাত্রিবেলা ভদ্রমহিলার স্বামীটি দেখেন, ঘুমের মধ্যে তাঁর

স্ত্রী নিখোঁজ মেয়েটি সম্পর্কে বলছেন। যেন ডুবুরিকে নির্দেশ দিচ্ছেন :—এখানে নয়, ওখানে জলের নিচে দেখ। চতুর্থ দিন সকালবেলা যখন তিনি ঘুম থেকে ওঠেন, বলেন, যে, তিনি দেখেছেন, বার্থা কোথায় আছে। এনফিল্ড-ব্রীজের কাছে তাকে খোঁজ করতে হবে। আঞ্চলিক এক মিল মালিক বার্থার খোঁজ করাচ্ছিলেন। মহিলাটির কথা শুনে তিনি এতটাই অভিভূত হন যে, আবার ডুবুরি ডেকে আনেন। মিসেস টাইটাস নিজে ডুবুরিকে এনফিল্ড ব্রীজের কাছে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে বলেন, 'এই রকম জায়গাতেই আমি তাকে দেখেছি।' ডুবুরি যখন বলল যে, এ জায়গা সে আগেই খুঁজে দেখেছে তখন মিসেস টাইটাস বলেন, তুমি এখানে, এখানে ডুব দিয়েছিল, এই জায়গাটিতে দাওনি। এখানে সে কাদাতে মাথা ডুবিয়ে উল্টো হয়ে আছে। পায়ে রয়েছে রবারের জুতো। জনতা প্রায় জোর করেই ডুবুরির এক সহযোগীকে মিসেস টাইটাস নির্দিষ্ট স্থানে ঠেলে ফেলে দেয়। একটু পরেই ডুবুরিটি উঠে বলে, 'হ্যাঁ, সে মেয়েটির সন্ধান পেয়েছি। মিসেস টাইটাস যেভাবে মেয়েটি রয়েছে বলেছেন, সেইভাবেই সে আছে।' ডুবুরিটি আশ্চর্য হয় যে, চার মাইল দূরে থেকে মিসেস টাইটাস কিভাবে বার্থাকে দেখতে পেলেন ?' এই ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমস। তিনি সমস্ত জেনেশুনে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, স্বপ্নেরও অতিস্বাভাবিক (Supernormal) ক্ষমতা আছে।

আর একটি স্বপ্ন একটি হত্যাকাণ্ডের কিনারা করে দিয়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, মারিয়া মার্টেন নামে একটি মেয়ে তার নিজের গ্রাম সাফোক (Saffolk) থেকে উইলিয়াম করডার (Corder) নামে এক কৃষকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু করডার আর একটি মহিলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে মারিয়াকে খুন করে বস্তাবন্দী করে গোলাঘরের মাটির নিচে পুঁতে রাখে। এবং মেয়েটির বাবা মাকে জানিয়ে দেয় যে, তারা বিয়ে করেছে এবং সুখেই আছে। বছরখানেক কেউ কোন সন্দেহ করেনি। এর পরে তার মা একদিন স্বপ্নে হঠাৎ দেখতে পান যে, তার মেয়েকে খুন করে গোলাঘরে পুঁতে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার বাবা এ বিষয়ে খোঁজ করতে চান। তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বপ্নে দেখা গোলাঘরের তালা ভেঙে নির্দিষ্ট স্থানে মেঝে খুঁড়ে দেখেন যে, তাঁর মেয়ের কঙ্কাল একটি বস্তা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। করডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সে সব স্বীকার করে।

অদ্ভুত এই স্বপ্নে একটি প্রশ্ন জাগে, মারিয়ার মা কিভাবে এই স্বপ্ন দেখলেন ? অপরিচিত একটি স্থানের চিত্রই বা তাঁর কাছে পরিষ্কার হল কিভাবে ? তাহলে কি সত্যিই মারিয়ার সূক্ষ্মদেহ তাঁর কাছে এসেছিল এবং মায়ের সূক্ষ্মদেহকে সঙ্গে নিয়ে স্থানটি দেখিয়েছিল ? বিজ্ঞান এতে সন্দেহ করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। সে সম্পর্কে পরবর্তী যোগ ও পরলোক অংশে আলোচনা করা যাবে।

স্বপ্নের এই দূরদৃষ্টি বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি পৃথিবীতে অনেক বড় বড় বা মহৎ কাজ করে

গেছে। এই স্বপ্নের জন্যই দান্তের ডিভাইন কমেডির ত্রয়োদশ সর্গ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। দান্তের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা হন্যে হয়ে তাঁর ডিভাইন কমেডির শেষ অংশ অনুসন্ধান করেন। কোথাও তা পাওয়া যায় না। তাঁর দুই পুত্র জ্যাকোপো (Jacopo) ও পিয়েরো (Piero)-কে মহাকাব্যটি পূর্ণ করতে বলা হয়, কারণ তাঁরাও একটু-আধটু লিখতে পারতেন। এমন সময় জ্যাকোপো একরাতে স্বপ্ন দেখেন যে, হৃত অংশটি কোথায় আছে। দুপুর রাতে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন এবং তাঁর বাবার এক বন্ধু পিয়ের গিয়ার্ডিনো (Pier Giardino)-এর বাড়িতে চলে যান। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর বাবা তাঁকে হাত ধরে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে সেই পাণ্ডুলিপিটি আছে সেই ঘর ও স্থানটি দেখাচ্ছেন। সেটি ছিল একটি দেয়ালে।

গিয়ার্ডিনো জ্যাকোপোর স্বপ্নের কথা শুনে এতটাই চমকিত হন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে সেই বাড়িতে যান—যে-বাড়িতে দান্তে মারা গিয়েছিলেন। গৃহকর্তাকে জাগিয়ে রাত শেষ হবার আগেই তাঁরা সেই ঘরে চলে যান এবং নির্দিষ্ট স্থানে জানালার উপরে কুলুঙ্গিতে পাণ্ডুলিপিটি পেয়ে যান।

আধুনিককালে বর্তমান জার্মানীর স্রষ্টা ঐতিহাসিক পুরুষ বিসমার্কের জীবনেও এমন এক স্বপ্নের অবতারণা ঘটেছিল। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, আলপ্স পর্বতের সরু পথে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তাঁর ডানদিকে খাড়া পাহাড়, বাঁ দিকে সমতল পথ। পথটি এত ছোট যে, তাঁর ঘোড়া আর এগুতে চাইছে না। বিসমার্ক নামতেও পারছেন না। এমন সময় তিনি তাঁর চাবুক দিয়ে পর্বতের গায়ে আঘাত করলেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। হঠাৎ দেখা গেল চাবুকটি অনন্ত দৈর্ঘ্যে লম্বা হয়ে গিয়েছে। পর্বত খসে গিয়ে যেন কোন ঘটনামঞ্চ ভেসে উঠেছে। প্রশস্ত পথ দেখা গেল। দেখা গেল অরণ্য ও পাহাড়। যেন বোহেমিয়ার কোন প্রান্তর। প্রুশীয় সৈন্যরা পতাকা হাতে স্থানটি ভরে ফেলেছে। তারা রক্তাক্ত একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তিন বছর পর সত্যি বিসমার্ক প্রুশীয় বাহিনী নিয়ে এ পথেই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে যান। স্বপ্নে যেরকম দেখেছিলেন, যুদ্ধে ঠিক সেভাবেই জিতেছিলেন।

শুধু বিশেষ একজন ব্যক্তি নয়, একটি ঘটনা যা ঘটতে যাচ্ছে স্বপ্নে বহু ব্যক্তিই তার আঁচ পাচ্ছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের 'অ্যাবার ফ্যান' নামক স্থানে। ৯-১৫ মিনিটে অ্যাবার ফ্যানের কাছাকাছি একটি ব্যবহৃত কয়লার অবশিষ্ট অংশ জড়ানো পাহাড়ের মত স্তূপে বৃষ্টির দরুন দারুণ ধস নামে। এতে একটি স্কুলবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। একশ চল্লিশ জনেরও বেশি শিশু এতে মারা যায়। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার আগেই অনেকে এব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছিল। মৃতদের মধ্যেই একটি নয় বছরের শিশু—'এরিল ময় জোন্স' দুর্ঘটনার আগের দিন বলেছিল যে, সে স্বপ্ন দেখেছে যে, সে স্কুলে গিয়ে দেখে স্কুল নেই। কালো কালো কি স্কুলের উপর পড়ে স্কুলবাড়িটিকে ঢেকে রেখেছে। ২০শে অক্টোবর সেই রাতেই ইংল্যান্ডের

নানা স্থানে আরো অনেক লোক এই দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একজন দেখেছিলেন, একটি পাহাড়ের ধস নিচে নামছে এবং একটি শিশু দৌড়ে পালাচ্ছে। একজন দেখেছিলেন, টেলিফোন বুথে একটি শিশু চিৎকার করছে। আর একজন দেখেছিলেন একটি স্কুল এবং ওয়েল্‌স-এর জাতীয় পোশাক পরে একটি ছেলে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। একজন বৃদ্ধ লোক শুধু এই শব্দটিই স্বপ্নে শুনেছিলেন :—'অ্যাবার ফ্যান'। এর আগে অ্যাবার ফ্যানের নাম পর্যন্ত শোনেননি তিনি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল অবিশ্বাস্য-ভাবে টাইটানিক নামক জাহাজ বরফখণ্ডে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেলে তার আগেও বহু ব্যক্তি এই ঘটনা পূর্বাহ্ণেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

লর্ড ডাফ্‌রিন, একদা যিনি ভারতবর্ষে ভাইসরয় ছিলেন তাঁর জীবনেও অনুরূপ একটি স্বপ্নের ঘটনা আছে। তখন তিনি ফ্রান্সে ব্রিটিশ রাজদূত। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে নিচে তাকিয়ে একজনকে হাঁটতে দেখছেন। সে সঙ্গে একটি কফিন নিয়ে যাচ্ছে। লোকটি ফিরে তাকাতে ডাফ্‌রিন তার ভয়াবহ মুখ দেখতে পেলেন।

কয়েক বছর পরে ডাফ্‌রিন প্যারিসে একটি পাবলিক ডিনারে অংশ নিয়েছিলেন একজন সদস্য তাঁকে এলিভেটরের কাছে নিয়ে গেল উপরে ওঠার জন্য। কিন্তু এলিভে চালকের মুখ দেখতেই তিনি চমকে উঠলেন। স্বপ্নে যে লোকটিকে কফিন নিয়ে যেতে দেখেছিলেন, তার মুখ। ডাফ্‌রিন এলিভেটরে তো উঠলেনই না, বরং তার নাম জানার জন্য অন্যত্র গেলেন। ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। এলিভেটরটি পড়ে গেছে। এলিভেটরে যাঁরা ছিলেন সবাই মারা গেছেন অথবা ভয়ানকভাবে আহত হয়েছেন। লর্ড ডাফ্‌রিন এই স্বপ্নে দেখা সেই মুখটিকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই বেঁচে গেলেন।

ভারতবর্ষে হায়দরাবাদের সুলতান টিপুও অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরী করতেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজদের ঘোরতর শত্রুদের একজন ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ শ্রীরঙ্গপত্তম-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইংরেজরা তখন তাঁর কাছে একটি খাতা পান, যাতে তিনি তাঁর স্বপ্নের কাহিনী লিখে রাখতেন। টিপুর সকল সামরিক কৌশল এই সব স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেই তিনি স্থির করেছিলেন।

এ-ধরনের পূর্বাহ্ণ অবগতিমূলক স্বপ্নের কথা ইতিহাসের পাতায় অজস্র লিখিত আছে। প্রাচীন তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় এবং য়ুঙ-এর তত্ত্ব কোন কিছু দিয়েই এর ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় পড়লেও অনেক স্বপ্নই পড়ে না। যেগুলি পড়ে না সেগুলির পেছনে কোন সূক্ষ্ম সত্তার অবদান নেই এমন বলা যায় না। সুতরাং প্রাচীনকালের বর্বরেরা যে অতি সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক এক অবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যে জন্য অদ্ভুত রকমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো বর্বরদের সেই ধারণা মিথ্যে নয় বলেই উনবিংশ

শতাব্দীর বিজ্ঞানের উপহাস সহ্য করেও আধুনিককালের মানুষ আজ পর্যন্ত সেই আদি মৃত্যুচিন্তা ও পরলোকের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। যার বিশ্বাস্যতা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চায় না।

অতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাই একটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পাঁচটি স্তর আবিষ্কার করেছেন। এর উদ্ভাবক ফ্রিজ পার্লস (Fritz Parls)। তিনি মনে করেন যে, একটি মানুষকে সুষম ও পূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে ব্যক্তিত্বের পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই স্তরগুলি হল ঃ—

(১) তথাকথিত সাধারণ স্তর। এখানে আমাদের সম্পর্ক স্থূল জীবনের সঙ্গে, অর্থহীন কতকগুলি ফরমুলা ও সাধারণ স্তরের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে, যে আদান-প্রদান যথার্থই কোন আদান-প্রদান নয়।

(২) দ্বিতীয় স্তর হল সমস্বয়ী স্তর। এখানে আমরা জীবনযাপন করি স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক, মাতাপিতা, শিশু, মালিক, কর্মচারী প্রভৃতি রূপে, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্তই কম। এখানে যথার্থ জীবন নেই।

উপ. (৩) তৃতীয় স্তর হল—আবেগের স্তর। চেতনার এটাই প্রথম যথার্থ স্তর। খানে প্রেম, ঘৃণা, ক্রোধ, আনন্দ প্রভৃতি বোতলবন্দী হয়ে থাকে। এগুলি প্রকাশের এসুযোগ না পেলে মানসিক দ্বন্দ্ব ও স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করে।

(৪) চতুর্থ স্তর হল সংরক্ষণ বা মৃত্যুস্তর। এখানে আছে নানা সমস্যা। এখানে প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ হলে অন্তরের মধ্যে তা ঢুকে যায়, এবং সেখানে জটিলতা সৃষ্টি করে।

(৫) বিস্ফোরণ বা প্রাণস্তর। এখানে সঞ্চিত প্রাণশক্তি বিস্ফোরিত হয়ে মুক্তি পায়, মানুষ হাল্কা হয়, পূর্ণ হয়। নির্ভেজাল অনুভূতির সুযোগ পায়। এখানে সে স্বচ্ছন্দ-বিহারী হতে পারে। এখানেই রয়েছে মানুষের যথার্থ সত্তা—অর্থাৎ স্বপ্নের জগৎ।

সুতরাং স্পপ্ন যে নিঃসাত্তিক নয় বর্তমান বিজ্ঞানই এ কথা বলছে। এই ধরনের অধিমনোবিজ্ঞানের সর্বশেষ চেতনা এই ধরনের ঃ—স্বাস্থ্য, সুখ এবং অস্তিত্ব ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নির্ভর করে অচেতন মনের ক্রিয়ার উপর। যুদ্ধ, জাতিগত দ্বন্দ্ব, সম্পদ ও প্রাচুর্যের জন্য আকুতি এ সব হল সমষ্টিগত স্নায়ুর ক্রিয়া, যা মানুষের বাঁচার পক্ষে এক বিপদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে মানব-চৈতন্যের বহু স্তর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এই জ্ঞানই বুঝিয়ে দেবে যে, মানুষের যথার্থ সত্তা রয়েছে কোথায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ত্রুটি এই, যে নিরাময় ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্পর্ক ঘটানোর চেষ্টা হয় সেই সমাজই রুগ্ণ সমাজ।

আধুনিক মনস্তত্ত্বে, মানুষের অচেতন মানসেই রয়েছে তার স্বাস্থ্য ও রোগের কারণ। সুতরাং, স্বপ্নের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। এই স্বপ্নকে রোগ নিরাময়েও ব্যবহার করা সম্ভব।

আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ ক্যালভিন হলের (Calvin Hall) মতে স্বপ্ন নিত্যদিনের জীবনের নানা সমস্যা ও অবস্থার সঙ্গে জড়িত। স্বপ্নের অর্থ খোঁজার জন্য কোন তত্ত্বকথা সৃষ্টি করে লাভ নেই। স্বপ্ন হল ব্যক্তিগত তথ্য, নিজেরই কাছে নিজের লেখা চিঠি। স্বপ্নের অর্থ কোন তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে স্বপ্নেরই মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের খুঁজে পাই, অপরকেও বুঝতে শিখি। পৃথিবীতে আমাদের স্থান কোথায় তাও বুঝতে পারি। সচেতন মনের কাছে এই জ্ঞান সহজলভ্য নয় এই কারণে যে, সচেতনভাবে আমরা এতটাই বিভ্রান্ত অবস্থায় থাকি যে, আমাদের যথার্থ সত্তা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হই। স্বপ্নের ভাষার তাত্ত্বিক দিকই আমাদের বেশি করে মনে পড়ে। ফলে যথার্থ চিত্র চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তুলে ধরা তো দূরের কথা। তবে এ কথা সত্য যে, স্বপ্ন হল মন যা চিন্তা করছে তার চিত্ররূপ। যারা ছবির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে, ছবিটি কি বলছে, তাদের পক্ষে নিজের স্বপ্নের ছবির দিকে তাকিয়েও বলা উচিত যে, হ্যাঁ, এ স্বপ্নের অর্থ আমরা জানি। অবশ্য এ জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার।

'হল' পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে স্বপ্ন বিচার করার কথা বলেছেন, যেমন,

(১) আমি নিজেকে কেমন দেখি ?

(২) অপরকে কেমন দেখি ?

(৩) বিশ্বকে কেমন দেখি ?

(৪) নিজের আবেগকে কেমন ভাবি ?

(৫) নিজের মানসিক দ্বন্দ্বকে কিভাবে নিই ?

হলের মতে স্বপ্নের মধ্যে পাঁচ ধরনের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। যেমন, (১) পিতা মাতাব সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা।

(২) স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য ইচ্ছার সংঘর্ষ।

(৩) যৌন দ্বন্দ্ব।

(৪) স্বভাবের দাবির সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্যসাধন।

(৫) প্রাণশক্তি, সৃজনশীলতা ও সমন্বয়ী ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ, যার ফলে দেখা দেয় মৃত্যু ও অবলুপ্তি।

এই সব নানা স্তর-বিশ্লেষণ মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে, এর দ্বারা স্বপ্নের বিষয়সমূহকে জানবার চেষ্টা করা যায়। এক্ষেত্রে আরও যা জানা প্রয়োজন, তা হল ঃ

(১) স্বপ্ন তাৎক্ষণিক অবস্থাকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ যে সময় ও অবস্থার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে সেই সেই মুহূর্তকে। তবে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে একের বেশি চেতনা থাকে। অপর ব্যক্তি ও বিশ্ব সম্পর্কেও বহু ধারণা থাকে।

(২) স্বপ্নে একজন লোক যা-ই দেখে থাকুক না কেন, তা তার নিজেরই সৃষ্টি এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যত অবাস্তব এবং অর্থহীনই তা হোক না কেন।

(৩) তবে ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন সঠিক তথ্য দিতে পারে না। স্বপ্নকে ধারাবাহিক-ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিচার করে দেখতে হবে। এর মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যাবে, তাকে অনবরত তুলনা করে সাজিয়ে তবে বুঝতে হবে।

হল ও পার্লস, উভয়েই য়ুঙ্-এর কাছে অনেকটা ঋণী। তারা য়ুঙ্-এর কাছ থেকেই শিখতে পারেন যে, স্বপ্ন মানেই ইচ্ছাপূরণ নয়, স্বপ্ন হল—প্রয়োজন পূরণও। স্বপ্নের মধ্য দিয়েই অচেতন মানস পূর্ণতা, স্বাস্থ্য, সাম্য, সঠিক ঐক্য ও আত্মজ্ঞান লাভ করতে চায়।

স্বপ্নের এই দূরবগাহ ভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে উধর্বগতি ধ্যান। এই ধ্যান করতে গিয়ে বোঝা গেছে যে, আত্মশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন, যে শক্তিকে এতকাল আমাদের সংস্কৃতি অবহেলা করে এসেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন ঃ—

'দেয়া নেওয়ার সম্পর্ক দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করি মাত্র'। অধুনা দেখা যাচ্ছে যে, যুবসমাজও দেওয়া-নেওয়া ভিত্তিক সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ সব সামান্য ব্যাপারে তারা আর তাদের আত্মশক্তির অপব্যবহার করতে রাজি নয়।

স্থূলসত্তার বাইরে যদি সূক্ষ্মসত্তা থাকে, তাহলে স্থূলদেহের বাইরে অনুরূপ সূক্ষ্মদেহই বা থাকবে না কেন? এই সূক্ষ্মদেহের কল্পনা প্রাচীনতম কাল থেকে মানুষকে অনুসরণ করে আসছে। আধুনিক কালে মনস্তত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গোলমেলে ভুতেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মন থেকেই সৃষ্টি হয়। বয়ঃসন্ধিকালের তাড়নায় যারা বিভ্রান্ত তারাই সাধারণত এ ধরনের ভুতের ভয় পেয়ে থাকে। অপর পক্ষে আরেক দল মনে করছেন যে, ভুতেদের সত্যিই স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে। তবে এরা শক্তি সঞ্চয় করে থাকে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের বিশৃঙ্খল মন থেকে। ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অবচেতন মনের মধ্যে এমন শক্তি লুকিয়ে আছে যা ভারি কোন জিনিসকে মনের জোরেই তুলে দিতে পারে, দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে বা ভেঙে বাঁকিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কাছে উরি গেলার নামে এক যুবক অবচেতন মনের এই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে তিনি সফল হয়েছেন তা নয়।

মনের কোন গোপন গহ্বরে যদি এই শক্তি লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে কি করে? প্রত্যেকের মধ্যেই কি এই শক্তি লুকিয়ে আছে? এর আংশিক জবাব দিয়েছেন জন. জি. বেন্নেট নামে এক ব্যক্তি। রাশিয়ার রহস্যময় ব্যক্তি জর্জি গুরদ্‌জিয়েফ (Georgi Gurdjieff)-এর তিনি শিষ্য। গুরদ্‌জিয়েফের কাছে তিনি শুনেছিলেন যে, উচ্চ আবেগময় শক্তি (Higher Emotional Energy) নামে এক ধরনের শক্তি আছে। পৃথিবীর সামান্য কিছু লোক এই শক্তির বিরাট আধারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে ক্লান্তিমুক্ত হতে পারেন। কেউ একে বলেছেন 'দ্বিতীয় বায়ু', কেউ 'তৃতীয় বায়ু'।

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। এই শক্তি আলোরই মত ওজনসম্মত ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অধীন। অর্থাৎ অপর কোন শক্তিমান ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির শক্তিকে টেনে নিতে পারে।

আদিম মানুষ এই চিন্তাশক্তির আকর্ষণী ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। প্রাচীন গুহাতে যে শিকার-চিত্র দেখা যায় তা আদিবাসীদের গুণিনদের আত্মশক্তি প্রয়োগের একটি কৌশল মাত্র। অর্থাৎ ছবি এঁকে তারা শিকার্য জন্তুর উপর প্রভাব ফেলে তাদের মোহিত করত এবং কাছে টেনে এনে শিকার করত। জাদুবিদ্যার মধ্যে এই শক্তি আছে, যাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা 'Psi-power' আখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ আত্মিক শক্তি। মোজেস প্রাচীনকালে ফ্যারাওয়ের দরবারে এই আত্মিক শক্তি দেখিয়েই মিশরীয়দের প্রভাবিত করেছিলেন ও ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন।

এই আত্মিক শক্তির আরাধনা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ঋগ্বেদ, উপনিষদ্ ও ভগবদ্‌গীতা, সব গ্রন্থই বলেছে যে, মানবাত্মা ব্রহ্মতুল্য। মানুষ যদি নিজেব বহিঃসত্তা অতিক্রম করে আন্তর সত্তায় প্রবেশ করতে পারে তাহলে সে ভেতরে এক অদ্ভুত শক্তির সন্ধান পায়। যোগ ও ধ্যান মানুষকে এই আন্তরসত্তায় প্রবেশের পথ-নির্দেশ করেছে। অন্তরের মধ্যেই কোথাও রয়েছে এক মহাশক্তি এবং মহাশক্তির উৎস। বৌদ্ধরা মনকে তুলনা করেছেন ঢেউ তোলা পুকুরের সঙ্গে, যাতে আমাদের ছায়া অস্পষ্ট ও ভঙ্গুর। কিন্তু পুকুর স্থির হলে দর্পণের মত চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত করে। 'জেন' বৌদ্ধরা একাগ্রতা দ্বারা মন ও দেহকে একবৃন্তে এনে বিরাট আন্তর ক্ষমতার উদ্বোধন করতে চান। জেনদের মধ্যে আন্তর শক্তির উদ্বোধনের প্রধান অন্তরায় হল আত্ম-সচেতমতা (বাহ্যিক্)। ঔপন্যাসিক ডি, এইচ, লরেন্স একেই বলেছেন 'মস্তিষ্ক সচেতনতা'।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মনে করতেন যে, আত্মজ্ঞানের প্রথম স্তরে মানুষের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখা দেয়। তবে এর কোন মূল্য নেই। যে-সব যোগী এই ক্ষমতা দেখান তাঁরা প্রথম স্তরে রয়েছেন। যথার্থ যোগীর মূল আকাঙ্ক্ষা হল সর্বদা ব্রহ্মসাজুয্যে থাকা। এই ব্রহ্মসাজুয্যে থেকে গেলে জগতে অন্য কোন সত্তা থাকে না। স্থূলপ্রাণী হিসেবে থাকলে স্থূল জগৎ বা প্রাণী প্রত্যক্ষ হয়। স্থূল ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী জগতে সূক্ষ্ম চেতনায় সূক্ষ্ম সত্তা লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ হলে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে শূন্যে যাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন প্রেমের গল্পের মধ্য দিয়ে। সক্রেটিস বলতেন 'প্রেম আরম্ভ হয় দৈহিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে, পরে দেহের পরিবর্তে আকর্ষণ করে আত্মাকে, আত্মার পর বিশ্বাত্মাকে।' মানুষের মধ্যেই এই বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা রয়েছে, যে পরমাত্মায় গিয়ে পৌঁছানোই হল মানুষের মূল লক্ষ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লোটিনাস যে সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বলেছিলেন—'The flight of the alone to the alone'.

মানুষের মধ্যে যে লুক্কায়িত শক্তি একদিন অন্তস্থ শূন্যকে মহাশূন্যে মিলিয়ে দিতে পারে সেই শক্তি হল মানুষের আন্তর বিকাশে উদ্‌বৃত্ত অংশ (byproducts)। মানুষ এল কোথা থেকে, মানুষের সূক্ষ্ম অস্তিত্বই বা কি ? বা সে শেষপর্যন্ত যাবেই বা কোথায়, এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেই, জন্ম মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হবে। এই জন্য পৃথিবীতে মানা দেশে নানা তত্ত্বের জন্ম হয়েছে।

ইহুদীরা এ-জন্য বিশেষ এক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন যার নাম কাবালা (Cabala, Kabbalah)। এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল স্পেনে। কাবালা তত্ত্বে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে সীমাহীন (En Sof)। তাঁর থেকে ঈশ্বরের দশটি গুণ প্রকাশ পায় (Sefiroth—Ten New Dimensions of Modern Science ?)। এই গুণের অবতরণ দ্বারাই তিনি প্রকাশিত। এই গুণগুলি অনন্ত ও স্থূল পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। কাবালার রহস্যময় জ্ঞানে পতিত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের পথ বলে দেওয়া হয়েছে।

কাবালা তত্ত্বের মূল শিক্ষা নিহিত রয়েছে দুটি গ্রন্থের মধ্যে—(১) সেফেৎ ইয়েৎসিরাহ্ (Sefet Yetsirah) অর্থাৎ সৃষ্টির গ্রন্থ। (২) জোহর (Zohar) অর্থাৎ ঐশ্বর্যের গ্রন্থ। জাদুবিশারদেরা এই দুটি গ্রন্থ থেকে বহু প্রেরণা লাভ করেছেন।

সৃষ্টির গ্রন্থ (Sefet Yetsirah) সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। ঐশ্বর্যের গ্রন্থ (Zohar) লেখা হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তবে কাবালাপন্থীরা মনে করেন যে, পুস্তক দুটির বক্তব্য সভ্যতার উন্মেষ থেকেই মানুষ জানতে পেরেছিল। কাবালা তত্ত্বে বলা হয় যে, মানুষ এক ধরনের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। তবে অধিকাংশ মানুষই জানতে পারে না যে, তারা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। কাবালাপন্থীরা এ-তত্ত্ব অবগত হয়ে মুক্তির সন্ধান করেন।

কাবালাতে বলা হয়েছে যে, আদম পাপ করলে ঈশ্বরের সংস্পর্শ থেকে চ্যুত হন, অর্থাৎ তাঁর পতন হয়। ঈশ্বরের নিম্নবর্তী দশটি চেতনার স্তর বেয়ে তিনি নিচে পড়েন। নিচে পড়ে তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট হন। ফলে তাঁর দৈবীসত্তার কথা তিনি ভুলে যান। সুতরাং আদমের বংশধরদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পুনরায় উৎসে ফিরে যাওয়া, যাতে করে সেই পূর্ণ সত্তা সে আবার ফিরে পেতে পারে।

কাবালার প্রতীক হল একটি বৃক্ষ—জীবনবৃক্ষ। এই বৃক্ষের সর্বোপরি রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। স্রষ্টারূপে এখানে তিনি 'কেথার' (Kether) নামে পরিচিত। কেথার শব্দের অর্থ 'মুকুট'। এই গাছের অন্যান্য ডালপালার নাম জ্ঞান, সৌন্দর্য, শক্তি, বোধ, প্রেম, ধৈর্য, মহত্ত্ব, ভিত্তি ও রাজ্য। সমবেতভাবে একেই বলে সেফিরোথ (Sefiroth) অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে অবতরণ। জ্যামিতিক ভঙ্গীতে কাবালাপন্থীরা এই বৃক্ষের চিত্র এঁকেছেন।

এই জীবনবৃক্ষ আর পৃথিবীতে জন্মায় না। তাহলে এই বৃক্ষ বেয়ে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিরা আবার কিভাবে উপরে উঠবেন ? এজন্য তিনটি পথ বলে দেওয়া হয়েছে ঃ

(১) আকাশ ভ্রমণ (Astral travel) (২) আন্তর দৃষ্টি (সবিকল্প সমাধি ভাব) ও (৩) কাবালা পাঠ।

তবে কাবালার পথে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন। কারণ, নানা প্রতীকের অন্তরালে কাবালা লুকিয়ে আছে। কাবালার সূক্ষ্ম স্তর সেইজন্য শুধুমাত্র প্রতীক নয়, তারা বাস্তবও। যেমন আকাশ পরিক্রমাকালে যদি কেউ ঘুঘু, চিতাবাঘ ও প্রাণপূর্ণ স্থান দেখে তাহলে মনে করতে হবে যে, সে নেৎশাহ্ (Netshah) অর্থাৎ ধৈর্য ও শুক্রগ্রহে গিয়ে পৌঁছেছে। এই গ্রহ হল ধৈর্য ও বিজয়ের প্রতীক (৭নং বলয়)।

এগ্রিপ্পা (Agrippa) নামে এক ব্যক্তি কাবাল তত্ত্বে মানুষের মনকে জাদুশক্তির উৎস বলে দেখিয়েছিলেন। মানুষের দেহ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে বলেও তিনি মনে করতেন। পৃথিবী ও অধ্যাত্মজগতের মধ্যেও তেমনি যোগ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে একটি পাথরের টুকরো থেকে নক্ষত্রের স্বরূপ জানা যেতে পারে। এগ্রিপ্পার মতে সমগ্র প্রাকৃতজগৎ একটি মাকড়সার জালের মত জাল দিয়ে বেষ্টিত (Modern Super-String Theory ?)। অধিকাংশ মানুষই তাদের অন্তস্তলের সুপ্ত জাদুশক্তিকে জাগরিত করতে জানে না। কারণ, তারা মনে করে যে, জগৎ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। জাদুকরেরা জানে যে, যদি সঠিকভাবে তাঁদের চিন্তাকে পরিচালিত করা যায় তাহলে জগতের মাকড়সার জালে স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে বহু দূরবর্তী স্থানেও প্রভাব ফেলা যায়।

এলিফাস লেভি (Eliphus Levi) নামে এক সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি কাবালা চর্চা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষ একদিন তার মৌলিক পাপ অতিক্রম করে আবার ঈশ্বরত্ব ফিরে পেতে পারবে। লেভি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, 'ইচ্ছাশক্তি' মানুষ যেরকম ভাবে তার চাইতেও প্রবলতর। লেভি দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত করেছিলেন এই যে, সমগ্র দেশ (Space) এক ধরনের আকাশ-আলো দ্বারা প্লাবিত (Astral Light)। এই আলো মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির স্পন্দন অনুভব করতে পারে। তৃতীয়ত তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, 'উপরে যেমন নিচেও তেমনই।' অর্থাৎ স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগতেরই স্থূল রূপ।

লেভি সূক্ষ্ম জগতের কিছু জীবকে জাদুক্ষমতা বলে কাছে টেনে এনেছিলেন বলে দাবি করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ ছিল অতি দীর্ঘাকৃতি, কেউ বা অ্যাপোল্লো-নিয়াস। লেভি নিজের প্রতিচ্ছবিও (অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহও) দেখেছিলেন। আকাশ ভ্রমণ করার শক্তিও তাঁর ছিল।*

থিওসোফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃ মাদাম ব্লাভাৎস্কি দাবি করতেন যে-'কুট হুমি' নামে এক তিব্বতীয় মহাপুরুষের সূক্ষ্মদেহ তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তবে মাদাম ব্লাভাৎস্কির অনেক কারচুপি ধরা পড়ার জন্য তাঁর দাবি অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হয়নি।

* লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা'র দুটি খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেও অধিমনোবিজ্ঞানীরা একটি সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই এসেছেন। তা হল এই যে, বিজ্ঞান স্বীকার করতে রাজি না হলেও আমরা যে-পৃথিবীকে জানি সে-পৃথিবী আমাদের জ্ঞানের বাইরেও অনেক বেশি আশ্চর্য ও সম্পদপূর্ণ (The worid is stranger and richer place than science is willing to recognise)। এই পৃথিবী, এর সভ্যতা, মানব প্রজাতি, তা সবই যে প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সীমা দ্বারা ধৃত, তা নয়। এর অনেক কিছুই আজও আমাদের জ্ঞান-বৃত্তের বাইরে। দানিকেন সাহেব তো ধারণাই করে নিয়েছেন যে, গ্রহান্তরের কোন মানুষ আমাদের পৃথিবীর সভ্যতার মূলে কাজ করে গেছেন। এই সীমাহীন জগতে পৃথিবী নামক গ্রহে আমরা অসহায়ভাবে একা নই। আমাদের সমকক্ষ নিম্নতর বা উচ্চতর অনেক জীব নানা গ্রহেই আছে। আর তাছাড়া এই মানুষও নিজের গহন অন্তঃপুরে নানা রহস্যে ভরা। এই রহস্যের প্রমাণ সে দিয়েছে নানা ধরনের আন্তর ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে। যেমন—দূরদর্শন, অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন, কোন জিনিস দেখে জিনিসের অধিকারীর বর্ণনা দেওয়া ইত্যাদি। অধিমনোবিজ্ঞানের মহাফেজখানায় এ ধরনের বহু কাহিনী স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে বোধহয় নেদারল্যাণ্ডস-এর গেরার্ড ক্রোইসেট (Gerard Croiset)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রোইসেট (জন্ম ১০০৯ খ্রীঃ) নেদারল্যাণ্ডস-এ নাজি আক্রমণের ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছিলেন। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজও (ইন্দোনেশিয়া) যে একসময় জাপানের হাতে যাবে একথাও তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তিনি কোন লোক দ্বারা ফেলে যাওয়া জিনিস দেখে তার চরিত্র ও দৈহিক রূপের বর্ণনা দিতে পারতেন। মানুষের এই শেষোক্ত ক্ষমতা অধিমনোবিজ্ঞানে Psychometry নামে পরিচিত। এর সব চাইতে চমকপ্রদ প্রমাণ দিয়েছিলেন Pieter Van der Hurk নামে আর এক ডাচ Psychometrist. ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিয়ামি পুলিশকে এই শক্তি দ্বারা একটি ট্যাক্সিতে বসে একজন খুনীর যথাযথ বর্ণনা দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং একজন সাধারণ মানুষের মধ্যেই যে কি অপরিসীম শক্তি লুকিয়ে আছে অসাধারণ বৈজ্ঞানিকও সহসা তা অনুমান করতে পারেন না। মানুষের এই ধরনের ক্ষমতাকে অনেকে তার অতিচেতন মানসস্তর (Superconscious)-এর ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেছেন। হ্যারি স্টোন (Hary Stone) নামে এক ব্যক্তিকে দেখা গেছে যে আবেশ জাতীয় ঘোরে (deep trance) তিনি প্রাচীন মিশরের ভাষা বলছেন ও তাদের হাইয়েরোগ্লিফিক লেখা লিখছেন। অথচ এ-সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না।

উরি গেলার আত্মিক শক্তির যে আশ্চর্য প্রমাণ দিয়েছেন—অনেকের ধারণা সেই শক্তি তিনি পেতেন বাইরের দেশ (Space) থেকে, যেখানে উন্নততর জীবেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে বর্তমান লেখক এদেরই দেশজ (Spatial) সূক্ষ্ম জীব বলে বর্ণনা করেছেন।

ইজরায়েলী যুবক উরি গেলারের রহস্যময় জীবন নিয়ে অনেক গল্প আছে। শুধু তাকিয়ে থেকে আত্মিক জোরে তিনি বহু জিনিস সরিয়ে দিয়েছেন, বাঁকিয়ে দিয়েছেন। উরি গেলার সম্পর্কে গল্প আছে যে, ১৯৪৯ খ্রীঃ তিনি যখন তিন বছরের শিশু তখনই একদিন তেল আবিবে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে একটি রাস্তা পার হয়ে অপর ধারে একটি বড় বাড়ির বাগানে তার টপকে গিয়ে পড়েছিলেন। সেখানে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভেঙে উঠে তিনি লক্ষ্য করেন যে, আকাশ থেকে নীরবে একটি পাত্র নেমে আসছে। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর ও সেই পাত্রের মধ্যে হাত-পাহীন বিরাট এক জীবের ছায়া। তার অস্পষ্ট মুখের কাছ থেকে তীব্র আলো ছুটে আসছিল। এই আলো এত প্রচণ্ডভাবে উরি গেলাকে আঘাত করে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। যেন গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সে। যখন সে জেগে ওঠে তখন সন্ধ্যা। সেই পাত্রটি নেই। তার শুধু মনে পড়তে লাগল, সেই চোখ ঝলসানো আলোর কথা। কিন্তু এতে ভয় পেয়ে যাওয়া দূরস্থান সে যেন আরও ধীর স্থির বোধ করতে লাগল। নিজেকে প্রশান্ত বোধ করল। উরি গেলার বাড়ি ফিরে মাকে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। এ ধরনের কাজ ও গল্প বলার জন্য মা তাকে ধমকে দিলেন। মা যাই ভাবুন, উরি গেলার বোধহয় সেই দিব্য আলো থেকেই তাঁর রহস্যময় আত্মিক শক্তি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় যোগীরা বিন্দুর নিকটস্থ হলে এই জ্যোতি দেখতে পান। এবং যিনি এই জ্যোতির মধ্যে থাকতে পারেন তিনিই দৈব ক্ষমতার অধিকারী হন।

আমাদের এই স্থূল জগতের উর্ধ্বেও কিছু একটা আছে। পৃথিবীতে অনেকেই তা দেখতে পেয়েছেন। এই সূক্ষ্ম সত্তা যে সূক্ষ্ম দেশজ (Spatial) জীব তা নয়, মানুষের স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মরূপে তাঁর সত্তা আছে। দেশের নানা স্তরে ওজন অনুপাতে তারা থাকে। ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী জোয়ান অব আর্ক, সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট ক্যাথারিন দ্বারা নির্দেশিত হয়েই ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। জোয়ান যদি এই দুজন সন্ত দ্বারা আদিষ্ট হয়ে থাকেন তবে তাঁরা কারা? নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদেহী। সুতরাং মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ বলে একটি সত্তা থেকে যায়। ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মপ্রচারকেরা তাদের জীবনে বহু আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়েছেন, যেমন—আকাশ পরিক্রমা, ভূমিত্যাগ, রোগ নিরাময়, মৃতকে প্রাণদান, অন্ধকে চক্ষুদান ইত্যাদি। এঁদের দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, জন্মের পূর্বে এঁরা সূক্ষ্মদেহে ছিলেন; ঈশ্বরের নির্দেশে মর্ত্যে নামেন। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেরই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি বলে অনেকেই এঁদের দাবি স্বীকার করতে রাজি নন।

এই যে সব অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা ঘটে, এর পেছনে মূল শক্তি কি? দুধরনের হতে পারে (১) মানুষের অতি-চৈতন্য সত্তা (Superconscious) অথবা (২) সূক্ষ্ম কোন শক্তি বা আকাশস্তরের কোন প্রাণী।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বহু মানুষের মধ্যে যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়

তার কোন স্তর হয়তো তাঁরই মধ্যে কোন অনাবিষ্কৃত স্তরে রয়েছে। অধিমনোবিজ্ঞানের চর্চায় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, মন স্থূল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে যেতে পারে।

আফ্রিকায় যারা গুণিন আছেন নানাভাবে পরীক্ষা করে তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলতে পারেন। আধুনিককালে আমেরিকার মত দেশেও যাঁরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁরা মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম একটি সত্তা এই অলৌকিক কাজে তাঁদের সহায়ক হয়। নিউইয়র্কের ইনগো সোয়ান (Ingo Swann) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই অলৌকিক শক্তির পেছনে সূক্ষ্ম সত্তার কথা বলেছেন। তিনি একটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ছাদের সিলিং-এর সঙ্গে একটি কাবার্ড বাক্স ঝুলানো ছিল। কেউ জানতো না এতে কি আছে। সোয়ান কয়েক মিনিট চোখ বুজে থেকে সেই বাক্সের মধ্যে কি ধরনের জিনিস আছে বলে দিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাস করা হল কি করে তিনি বললেন, সোয়ান জবাব দিলেন যে, একটু ভরের (Trance) মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর সূক্ষ্ম সত্তা ভেসে গিয়ে সিলিং-এ উঠেছে। সেখান থেকে বাক্সের ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে। এর পরই সেই সূক্ষ্ম সত্তা তাঁর স্থূলদেহের মধ্যে আবার ফিরে আসে। এই সময় যে সব বৈজ্ঞানিক তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁরা সেই সূক্ষ্মসত্তার বিষয় কিছুই বুঝতে পারেন নি। যন্ত্রের সাহায্যে যেটুকু বুঝতে পেরেছিলেন তা হল এই যে, তাঁর ব্রেনওয়েভে (মস্তিষ্ক স্নায়ু তরঙ্গে) বিরাট ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ফাদার ট্রিলেস (Father Trilles) নামে এক ফরাসী মিশনারী একজন আফ্রিকান গুণিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। একদিন এই ফাদারকে গুণিনটি বললেন যে, তিনি পরদিন একটি জাদুবিদদের আসরে যাচ্ছেন। কিন্তু স্থানটিতে যেতে দূরত্বের জন্য কম পক্ষে চার-পাঁচ দিন লাগার কথা। সুতরাং ফাদার গুণিনকে জিজ্ঞেস করলেন, চার দিনের পথ একদিনে কি করে যাবেন ? গুণিনটি তা প্রত্যক্ষ করতে ফাদার ট্রিলেসকে তাঁর এই যাত্রা লক্ষ্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যখন তাঁরা স্থানটি থেকে তিনদিনের দূরত্বে রয়েছেন তখন ফাদার তাঁকে একটি গ্রামে বিশ্রাম নিতে বললেন। আর একজন গুণিন বন্ধুকে (আফ্রিকান গুণিন) বললেন, কিছু কার্ট্রিজ নিয়ে আসতে। গুণিন রাজী হলেন।

সেই রাতে গুণিনটি তাঁর গায়ে এক ধরনের লাল তরল পদার্থ মাখলেন। এই তরল পদার্থ মাখতে গিয়ে কয়েকবার মন্ত্র আউড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করলেন। হঠাৎ ছাদ থেকে একটি বিরাট সাপ পড়ল। সাপটি গুণিনটির দেহ জড়িয়ে ধরল। এবার তাঁর যেন ভর হল। সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারা রাত ফাদার ট্রিলেস সেই লোকটির পাশে বসে তার নিশ্চল অবস্থা লক্ষ্য করলেন। পরদিন সকালে গুণিনটি জ্ঞান ফিরে পেল। জ্ঞান ফিরতেই বলল, কার্ট্রিজের জন্য যে বার্তা পেঁৗছে দেওয়া দরকার তা পেঁৗছে গেছে। সত্যি সত্যি দেখা

গেল তিন দিন পর মিশনারীটির বন্ধু কার্টিজ নিয়ে হাজির হয়েছেন। যে পথ তিন দিন লাগে অতিক্রম করতে আফ্রিকার গুণিনটি সে পথ এক রাতে অতিক্রম করে খবর নিয়ে এলেন। কিন্তু আনলেন কিসের ভিত্তিতে? বর্তমান লেখক এ ব্যাপারে নিজে পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল—তরঙ্গের সমতা। কোন সূক্ষ্ম দেহ কোথাও যায়নি। প্রশ্নকারী ব্যক্তির মস্তিষ্ক-তরঙ্গের সমান্তরালে আসাহেতু তাঁর চিন্তাপ্রসূত তরঙ্গের সঙ্গে গুণিনটির মস্তিষ্কতরঙ্গ এক পঙ্‌ক্তিতে পড়ার ফলেই প্রশ্নকারীর মানসিক চিত্র গুণিনের মস্তিষ্ক স্নায়ুতে টি. ভি.-র পর্দার মত ছায়া ফেলে যে-সব ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের চিত্র তাঁর মানসনেত্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কস্নায়ুতে ফুটিয়ে তুলে চিত্রতরঙ্গের প্রকৃত স্থানে গিয়ে আঘাত হানে এবং সেই সব ব্যক্তির পরিণতি প্রত্যক্ষ করায়।

তবে সূক্ষ্ম দেহ যে একেবারেই নেই তা নয়। লেখক নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যাকে তিনি ধ্যাননেত্রে দেখেছেন সেও তাকে দেখতে পেয়েছে। এ থেকে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না যে, চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম সত্তা নড়ে ওঠে এবং তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। একেই বলে আকাশ-ভ্রমণ বা সূক্ষ্মদেহে বিচরণ।

অধিমনোবিজ্ঞানে মনস্তত্ত্ববিদেরা বহু রোগী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বহু লোকের নিজের দেহ থেকে বাইরে যাবার এবং সেখান থেকে নিজের স্থূলদেহ প্রত্যক্ষ করার অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমান লেখক নিজে বিশেষ ধরনের যোগ প্রক্রিয়ায় ধ্যানে বসে দেখেছেন যে, নিজের সূক্ষ্ম দেহকে বাইরে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি একই ধরনের দর্শনের কথা তাদের মুখ থেকেও জানতে পেরেছেন। এই শিক্ষার্থী ব্যক্তিদের কয়েকটি ফটো 'যোগ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা' গ্রন্থে অর্থাৎ 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি দিয়েছেন। পাঠকেরা তাঁর এই বক্তব্য সত্য কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।

প্রাচীনকালে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহকে বিচ্ছিন্ন করে আকাশ-ভ্রমণ বা astral travel করেছেন এ ধরনের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে অধিমনোবিজ্ঞানীরা 'Psi' ক্ষমতা নামে আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দুধরনের ব্যক্তি আছেন। একদল মনে করেন যে, বিশ্ব-প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়মে চলে। এই নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অতীন্দ্রিয়কে টেনে আনার কোন যুক্তি নেই। আর একদল মনে করেন যে, সব কিছুই সম্ভব। মানুষের মধ্যে এমন শক্তি আছে যা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। মানুষের অনাবিষ্কৃত এই অতীন্দ্রিয় শক্তির যখন প্রকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে যে. এই স্থূলদেহপর্যায়ের উর্ধ্বেও তার একটি ভিন্ন ধরনের পর্যায় আছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দল এ ধরনের চিন্তাকে অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে করেন এবং এ ধরনের বক্তব্যকে বিজ্ঞান ও বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করার

অপচেষ্টা বলে ভেবে থাকেন। তবে অধিকাংশ লোকই এ ব্যাপারে স্থূল সত্তার বাইরেও কিছু যে একটা আছে এরকম মনে করতে দ্বিধা করেন না।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের মনের সীমানা যথার্থ সীমানা নয়, বরং কৃত্রিম, আমাদের নিজেদেরই সৃষ্ট। এই সীমানা অতিক্রম করা গেলেই ভিন্নতর জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যাটারের যদি অ্যান্টিম্যাটার থাকে, যদি বিশ্বজগতের প্রতিবিশ্বজগৎ, তবে দেহের প্রতিদেহ (antibody) থাকতে দোষ কি? ফলে পাশ্চাত্য জগতেই এখন বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। 'Psi-এর পথ ধরেই এই নবদিগন্তের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এই জন্যই এডগার মিচেল (Edgar Mitchel) বলেছেন, 'টিকে থাকার জন্য আমাদের চিৎশক্তির অতিক্রমণ প্রয়োজন, মনের ক্রমবিকাশ প্রয়োজন (Survival seems to depend more than any thing on a transformation of consciousness, an evolution of the mind.)।

প্রাচীনকালে মানুষের আত্মিক শক্তি (Psi) চর্চার উদ্বোধন করেছিলেন সম্ভবত লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস (Croesus)। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। প্রাচীনকালে গ্রীস ও মিশরে বহু ভবিষ্যৎবাণীকেন্দ্র ছিল। এগুলির মধ্যে কোনটি কতটা শক্তিশালী তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি একবার এক ব্যবস্থা করেন। তিনি উভয় দেশেই এ ব্যাপারে দূত পাঠান এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি কি করছেন এই দৈব বা ভবিষ্যৎবাণী-কেন্দ্রগুলি থেকে তা জানতে চান। এই সময় তিনি অদ্ভুত এক কাজ করেছিলেন। ভেড়া ও কচ্ছপের মাংস একত্র করে একটি পেতলের কড়াইয়ে রান্না করছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, গ্রীসের দৈববাণী-কেন্দ্র থেকে এ বিষয়ে নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়।

ক্রোয়েসাস যে বিজ্ঞানের স্বার্থে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা নয়। প্রয়োজনে কোন দৈববাণী-কেন্দ্র থেকে তিনি সঠিক নির্দেশ পাবার জন্যই এমন করেছিলেন। তবে ডেল্‌ফির দৈববাণী অনেক সময় এমন অস্পষ্ট ও প্রতীকময় হত যে, সবাই তা যথার্থ অনুধাবন করতে পারত না। ফলে বিপরীত ফলের মুখোমুখি হত। ক্রোয়েসাসের নিজেরই একটি যুদ্ধযাত্রাকালে এই যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে ডেল্‌ফি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, একটি বড় ধরনের সেনাবাহিনী ধ্বংস হবে। ক্রোয়েসাস ভাবেন যে, এর দ্বারা তাঁর প্রতিপক্ষকে বোঝানো হয়েছে। ফলে পূর্ণোদ্যমে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ভবিষ্যৎবাণী কেমন করে সম্ভব এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যদি কেউ খুঁজতে চান তা হলে বর্তমান লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে পারেন।

শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে দেখা যাচ্ছে যে, ডাইনীরা বা পেত্নীরা ম্যাকবেথ যে অদূর ভবিষ্যতেই রাজা হবেন একথা বলেছেন। সাধারণ বিচারে এই দৃশ্যটিকে

এলিজাবেথান যুগের একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রতিফলন বলেই মনে হবে। কিন্তু অধিমনোবিজ্ঞানীদের ধারণাতে এ হয়তো পেত্নীদের তরফে পূর্বাহ্নধারণা বা ম্যাকবেথের মস্তিষ্কস্নায়ুতরঙ্গের সমান্তরাল ভাবহেতু তাঁর মানসক্রিয়া লক্ষ্য থেকে উক্ত। 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেট তাঁর পিতার প্রেতাত্মার কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর যে বর্ণনা লাভ করেছিলেন অধিমনোবিজ্ঞানীদের মতে তা হয়তো এক ধরনের ভ্রান্তিদর্শন বা হ্যালুসিনেশন।

এতদিন এসব ঘটনাকে অবিশ্বাস্য মনে হত এই কারণে যে, ঊনবিংশ শতকের লোকেরা প্রতিপদেই অতীন্দ্রিয় সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস পোষণ করত। তবে এক্ষেত্রে যথার্থ কোন ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেনি। না করার কারণ বোধ হয় এই যে, বিবেকশক্তিকে ঊনবিংশ শতকে জ্ঞানের যথার্থ নিয়ন্ত্রক বলে মনে করা হত। এ যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকে অল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবীই তৎকালে গ্রাহ্য কুসংস্কারকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার সাহস দেখাতো। কারণ এতে প্রতিপদে হাস্যাস্পদ হবার ভয় ছিল। কিন্তু মানুষের বিচারশক্তি যখন অনেকটাই রোমাণ্টিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে তখনই বিচারের ঊর্ধ্বে মানুষ নিজের অন্তস্থ একটি স্বতঃ অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে আরম্ভ করে। ফলে আত্মচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

রোমাণ্টিক যুগের একজন বিখ্যাত কবি শেলী অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন। একবার তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, কবি বায়রনের মৃত কন্যা—এল্লাগ্রা (Allagra) স্পেজিয়া (Spezia) উপসাগর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড এ. জেন উইলিয়ামস সমুদ্রের জলে প্লাবিত একটি ঘরের মধ্যে ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করছেন। এই দুঃস্বপ্নের অল্পদিন পরেই শেলী ও উইলিয়ামস ইটালির উপকূলের কাছে স্পেজিয়া উপসাগরে জলে ডুবে মারা যান।

মহাকবি গ্যয়টেও তাঁর আত্মজীবনীতে একটি পূর্বাহ্ন অমঙ্গল আভাসের কথা উল্লেখ করে গেছেন। একদিন তিনি ফুটপাথ ধরে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখতে পান যে, অদ্ভুত এক পোশাক পরে তিনিই বিপরীত দিক থেকে আসছেন। এরকম পোশাক তিনি জীবনে কখনও পরেন নি। চমক ভাঙতেই দেখেন যে, সেই ছবিটি আর নেই। আট বছর পরে যখন তিনি আবার সেই পথেই একদিন যাচ্ছিলেন—হঠাৎ তিনি মনে করতে পারেন যে, যে পোশাকে সেদিন তিনি নিজের প্রতিচ্ছবিটি দেখেছিলেন, সেদিন সেই পোশাক পরেই চলেছেন।

ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সেরও একদা এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর কার্যালয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্ন দেখেন যে, লাল শাল পরে এক মহিলা তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলাটি যখন ফিরে তাকালেন—তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিলেন মিস্ নেপিয়ার বলে। পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা

সঙ্গে নিয়ে আসেন এক মহিলাকে। তাঁর গায়ে ছিল লাল শাল। তাঁরা ডিকেন্সের সঙ্গে সেই মহিলার পরিচয় করিয়ে দেন। ডিকেন্স অবাক হয়ে শোনেন যে, তাঁর নাম মিস্ নেপিয়ার। সেই স্বপ্নে দেখা মহিলা। তবে স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের এরূপ অদ্ভুত মিল হওয়া সত্ত্বেও ডিকেন্স কিন্তু কোন অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস করতেন না।

ইংল্যাণ্ডে 'Society for Psychical Research'-এর নথিতে মানুষের সূক্ষ্ম সত্তা সম্পর্কে বহু রেকর্ডের মধ্যে একটি চমকপ্রদ রেকর্ড রয়েছে জনৈক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জুন মাসে এক সময় তিনি পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে কেরোসিন ল্যাম্পটি তার পায়ে লেগে উল্টে যায়। বাতিটা না নিভে সারা ঘরময় ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর চিন্তাশক্তি যেন নিজের দেহ ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে। তিনি আরও বুঝতে পারেন বাঁচতে হলে ল্যাম্পটি তুলে ধরে ঘরের জানালা খুলে দিতে হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁর ঘুমন্ত দেহকে জাগাতে পারছেন না। সেই মুহূর্তে তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর মা পাশের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। দেয়ালের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং জোরে জানালা খুলে দিলেন। দেখলেন, এবার মা তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। মা এসে তাঁর শরীরে হাত রাখলেন। সেই স্পর্শ পাওয়া মাত্র যেন তাঁর বুদ্ধিময় সত্তা আবার তাঁর স্থূল দেহের মধ্যে ঢুকতে পারল। তিনি শুক্নো কণ্ঠে জেগে উঠলেন। তখনও বুক ধড়ফড় করছে। শ্বাস যেন চেপে আছে। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, সত্যই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

অধিমনোবিজ্ঞান মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তার সন্ধানে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। এক সময় ইউরোপের নানা স্থানে মিডিয়ামেরা নিজেদের দেহ থেকে একটোপ্লাজম বের করে সূক্ষ্ম সত্তা তৈরি করতে পারত বলে বিরাট গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এর মধ্যে অধিকাংশই প্রতারণা বলে পরে ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা না গেলেও অধিমনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর পরীক্ষা করে নানা ধরনের সত্যতা ধরা পড়েছে। একে বলা হয় ESP বা Extra Sensory Perception. এতে দূরবর্তী স্থানে বসে কোন ছবি বা জিনিস স্পর্শ করলে হাজার মাইল দূর থেকে আর একটি লোক তা বলে দিতে পারে এমন দেখা যায়। একে কেউ বলেছেন টেলিপ্যাথি, কেউ বা সমান্তরাল তরঙ্গস্পর্শ। আবার কেউ একে সূক্ষ্মদেহের Astral travel বলে বর্ণনা করে ঘটনাকে অত্যন্ত রহস্যময় করে তুলেছেন। তবে মানুষের মধ্যে যে এই অলৌকিক শক্তি আছে, তা নিঃসন্দেহে আজ প্রমাণিত। এক্ষেত্রে লেখকের নিজেরও অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে। একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক, অধ্যাপক ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ কালচারাল ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি কোন বাড়ির এক বৃদ্ধা মহিলাকে

লেখকের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি লণ্ডন প্রবাসিনী তাঁর কন্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লেখক জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মেয়ে শিক্ষকতা করে। ছোট একটি ছেলে আছে। সর্দির ধাঁচ। জুন মাসে দ্বিতীয় বাড়ি কিনেছেন। এতে ওঁরা খুব অবাক হয়ে যান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, কি করে লেখকের পক্ষে তা বলা সম্ভব হয়েছে। কি করে যে বলা সম্ভব হয়েছে তা বলা সত্যিই কষ্টকর।

সাধারণের ধারণা হবে লেখকের সূক্ষ্মদেহ সেই সময় লণ্ডনে গিয়ে থাকবে। কিন্তু লেখকের নিজের ধারণা এটা তরঙ্গের সমান্তরাল ভাব হেতু। অর্থাৎ যে মুহূর্তে বৃদ্ধাটি তাঁর কন্যার কথা ভাবছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর কন্যা সম্পর্কিত রূপজ তরঙ্গের ঢেউ লেখকের মস্তিষ্কস্নায়ুতে আঘাত করে কন্যার রূপের অনুরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ফলে সেই তরঙ্গ অনুরূপ রূপতরঙ্গ যেখানে আছে সেখানে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে। টেলিভিশনের মত সঙ্গে সঙ্গে ছবি ভেসে ওঠে। লেখক সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পান। এই প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ করে লেখক তার 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষী' গ্রন্থে তা যথাযথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু মাত্র স্থূল জগতের ক্ষেত্রেই যে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ করে তা নয়, সূক্ষ্ম জগতেও এই তত্ত্ব বা Principle ক্রিয়াশীল। যার অদ্ভুত প্রমাণ লেখক বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন। যার মধ্যে দুটি উদাহরণ তাঁকে সত্যিই চমকিত করেছে।

লেখকের কাছে এক সময় অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের এক অধ্যাপিকা আসেন তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থ পড়ে। তাঁর নাম মণিকা দাস। লেখক তখন সারাদিন ধরে বহু জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন, সুতরাং ভাবলেন, ভদ্রমহিলাও কিছু জানতে এসেছেন। বললেন, আপনি দু'জন পুরুষ সম্পর্কে কিছু জানতে চান।

ভদ্রমহিলা বললেন, না। একদম ভুল করেছেন। আমি সেজন্য আসিনি।

লেখক বললেন, মানুষ তার অবচেতন মনের কথা জানে না। আপনার অবচেতন মনে এঁদের সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে।

—এরা কারা ?

—একজন আপনার স্বামী, একজন সাধক।

—বলুন তো, আবার স্বামী দেখতে কি রকম ছিলেন ?

লেখক একটা বর্ণনা দিলেন।

—তাঁর আয়ু সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?

—হ্যাঁ, Around fifty six.

ভদ্রমহিলা কর গুণে কি হিসেব করে বললেন, হ্যাঁ। 57 + 1.

—কিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ?

— রক্ত চাপ। অর্থাৎ হার্টের রোগ, স্ট্রোক।

—আর কিছু বলতে পারেন ?

—যেমন ?

—কতদিন মারা গেছেন বলতে পারেন ?

—না। 'তিন' লেখা রয়েছে। তিন মাসও হতে পারে তিন বছরও হতে পারে।

ভদ্রমহিলা বললেন, তিন মাস। তিনি কোন্ স্তরে আছেন বলতে পারেন ?

মহিলা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মণিপুর চক্র থেকে অনাহত চক্রের মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ লেখক একটি মুখ দেখতে পান। তাঁর কপালে ভ্রূর উপরে কাটা দাগ। যেন কেউ তরোয়ালেব কোপ বসিয়েছে। সেকথা তাঁকে বলেন।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বলেন, দেখতে পাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও দাগ কিসের ?

ভদ্রমহিলা বললেন, ডাকাতেরা তরোয়াল দিয়ে কোপ দিয়েছিল। কিন্তু, আমি কি তাঁকে দেখতে পাব ?

—হ্যাঁ।

—কি করে ?

— ক্রিয়াযোগের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করলেই।

—আমাকে তা বলুন।

লেখক তখন তাঁকে ক্রিয়াযোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ভদ্রমহিলার আত্মা উন্নত। অল্প দিনের মধ্যেই বহুকিছু দেখতে পান। এবং তিনবার তিনি তাঁর স্বামীর সূক্ষ্মদেহও দেখতে পেয়েছিলেন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার এক ডাক্তার-পত্নীর ক্ষেত্রে। তাঁর স্বামী বিখ্যাত চোখের ডাক্তার। একদিন তিনি এলেন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে। পূর্বাহ্নেই লেখক তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি এসে দেখা করতেই বলেন, আপনার ছোট ছেলে গাড়ি উল্টে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে।

—কেন ?

—কারণ তার হাতে একটি লাল পলা পরিয়েছিলেন বলে। রাহু মঙ্গলের যোগ হতেই দুর্ঘটনা ঘটে। এর পরা উচিত ছিল সাদা পলা। দেখুন সেইদিন আপনার বড় ছেলে আপনার গাড়িতে ছিল বলে তার কোন বিপদ হয়নি।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে লাগলেন। তারপর সম্ভবত লেখককে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, বলুন তো সে দেখতে কেমন ছিল ?

লেখক বর্ণনা দিলেন। কিন্তু তিনি যে বর্ণনা দিলেন প্রথম দিকে ছেলেটি সে বর্ণনার অনুরূপ ছিল না। পরে নাকি আমেরিকা গিয়ে অনুরূপ স্বাস্থ্যেরই অধিকারী হয়েছিল।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, সে এখন কোথায় আছে ?

লেখক বললেন, পঞ্চম স্তরে মায়ের কাছে। ছেলেটির মূল মন্ত্র ছিল মাতৃমন্ত্র। কিন্তু তাকে কৃষ্ণ মন্ত্র দেওয়া হয়। গান বাজনাতে ছেলেটি খুব আকৃষ্ট ছিল। যথার্থ ধর্মপ্রাণও ছিল। সূক্ষ্মদেহে ছেলেটি একটি অলৌকিক কাজ করেছিল। মৃত্যুর পরে তার হাতে লেখা একটি চিঠি এসেছিল বাবা মার কাছে। সন্তুনার ভাষায় লেখা চিঠি। অদ্ভুত চিঠিটিই প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থাকে। এবং এই অস্তিত্ব আত্মশক্তির দ্বারা অর্থাৎ Psycho Kinesis দ্বারা মানুষের মত কাজও করতে পারে। নইলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হাতের লেখা চিঠি আসা অসম্ভব। ছেলেটির এক আত্মীয়ার চিঠি এই প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি যাতে প্রমাণ হয় যে, লেখক মিথ্যা বলছেন না।

নয়াদিল্লী

মান্যবরেষু —

নিগূঢ়ানন্দজী, আমার পরিচয় আমি একজন শোকসন্তপ্তা পুত্রহারা জননী। তাছাড়া ডাঃ অনুতোষ দত্তের স্ত্রী নন্দিতা দত্ত আমার ভাইঝি। আমার বোন নন্দিতার সঙ্গে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

আপনি বয়সে আমার পুত্রস্থানীয় কিন্তু গুণে অনেক বড়। উপরন্তু আপনি প্রফেসর মানুষ। সময়াভাব। তথাপি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বাধিতা হব এবং শান্তি পাব।

আমার ছেলের নাম গৌতম রায়। রূপে গুণে অতুলনীয়। তার নয় বৎসরের একটি ছেলে ও স্ত্রী আছে। ১৪ দিনের কাজ হওয়ার পরই সে তার বাপের বাড়ী চলে যায়। আজ এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও আমার খোঁজ নেয়নি। ২৯শে আগষ্ট ছেলের বাৎসরিক কাজে অনুনয় বিনয় করে বলা সত্ত্বেও নাতিকে নিয়ে কাজ করতে আসেনি—অথচ কাজের পূর্বদিন তাদের পরিচিত ভাইকে দিয়ে ফোনে খবর পাঠায় ২৯ তারিখ আসবে।

বাড়ীতে আমি একলা যখের ধনের মত বাড়ী নিয়ে পড়ে আছি এই আশায়, নাতি কোনদিন ভোগ করবে। আমার বোন আমার দেখাশোনা করে।

আপনি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, বাড়ীটা দূষিত। একটা কালোছায়ার মত দেখেছিলেন। এবং তার বিহিতও বলে দিয়েছিলেন। শনি মঙ্গলবারে বাড়ীর ধুলো নিয়ে বারুইপাড়ার পাল মহাশয়ের কাছে যেতে বলেছিলেন। সেই অনুসারে আমার বোন ধুলো নিয়ে গিয়েছিল। পালমশায় বল্লেন, অতদূরে আমার কাজের ফল পৌঁছুবে না। তথাপি বাড়ীটা যাতে দোষমুক্ত হয় আমি কাজ করে দিচ্ছি। কিন্তু ওনার কাজে কোন ফল হয়নি বলে আমার মনে হয়, কেননা পুজোর ঘরে আমি যখন পুজো করতে বসি এক একদিন এক এক রকম বেশ ধরে এসে সে আমার পুজোর ব্যাঘাত করে এবং নানারকম কথা বলে।

আমিও জানি এবং আপনিও বলেছেন, আমার ছেলে ইচ্ছে করে যায়নি তাকে জোর করে নিয়েছে। এই লোকটি আমার ছেলে যাওয়ার এক বৎসর পূর্ব থেকে আমাদের বাড়ীতে সূক্ষ্ম শরীরে বাসা বেঁধেছে। পূর্বে আমি এই লোকটিকে মিত্র মনে করতাম। ছেলের মঙ্গলের জন্য তার কথামত কাজ করেছি। কিন্তু বিপরীত ফলই ফলেছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ছেলেকে নেবার ব্যাপারে এই লোকটির সম্পূর্ণ হাত রয়েছে। কাল এসে বলছে, আমাকে তাড়াস না, আমি তোকে মাকে দর্শন করিয়ে দেব।

সংসারে তো আমার আর সুখ নেই। একটু পূজো সন্ধ্যা করে মনের শান্তি নিতে পারছি না।

এখন আপনার কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা বাড়ীটি কি এখনও দূষিত ? আমার আর যারা আছে তাদের তো এই লোকটি কোন অনিষ্ট করবে না ? একে কিভাবে তাড়ানো যায় ?

দ্বিতীয়তঃ আমার নাতি ও ছেলের বৌ কি আর আসবে না ? আসে যদি, কবে পর্যন্ত আসবে ?

তৃতীয়তঃ আমার ছেলে এখন কোন স্তরে কিভাবে আছে ? সে শান্তিতে আছে কিনা ? পরজন্ম কেমন হবে ? আপনি যোগী পুরুষ—সবই বলতে পারেন। আপনার অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করলাম। মনের শান্তির অন্বেষণে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে—
গৌতমের মা

এই চিঠি তুলে দেবার অর্থ এই নয় যে, লেখক তাঁর নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছেন। এটা লেখকের পেশা নয়। তাছাড়া গুরুগিরিতে তাঁর আস্থা নেই। বৈজ্ঞানিকভাবে একটি সূক্ষ্ম জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সত্য জানাই তাঁর লক্ষ্য। এবং এই সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান কিভাবে পাওয়া যায় সেটা জানানোই তাঁর ইচ্ছা, যাতে পরে আরও নির্ভুল অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। এই সূক্ষ্ম জগৎ এবং সূক্ষ্ম আত্মা সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক যে বিশ্লেষণ তা তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এই উপক্রমণিকার শেষ অংশে সেই তত্ত্ব পুনরায় উল্লেখিত হবে। এই তথ্যকে উদ্ঘাটিত করার অর্থ সূক্ষ্ম জগতের যথার্থ যে একটা অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণ করা। এবং আদিকাল থেকে মানুষের সমাজ সেই সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিল বলেই মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে অতটা ভয় ও ভাবনা করেছিল। তাদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা ও সূক্ষ্মসত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস কি ধরনের ছিল তা জানাবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির 'মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়া' সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অংশে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে চিন্তা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয় তা প্রমাণের জন্যই বিজ্ঞান ও অধিমনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার সাহায্য নিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ লেখা

হচ্ছে। তবে পরলোক সম্পর্কে যথার্থ চিত্র পরে উল্লেখিত মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঐতিহাসিক উল্লেখে কোথাও নেই। যথার্থ পরলোক ও তার অবস্থান কি ধরনের, লেখকের যোগলব্ধ অভিজ্ঞতায় এই অংশের শেষে তা আলোচনা করা হবে। বর্তমানে যে অধিমনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সূক্ষ্মসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল তাই করা যাক।

অধিমনোবিজ্ঞানে জোসেফকা নামে এক মহিলাকে তার আত্মিক শক্তি চর্চায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। যে ঘটনা ঘটবে, পূর্বাহ্নেই তাকে তার কোন এক বন্ধু সম্পর্কে সে বিষয়ে দেখে নিতে বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে যে মনঃসংযোগ করা দরকার তা করবার পরই তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। তার এক মহিলা বন্ধু পঞ্চাশ মাইল দূরে বাস করত। সে যেন স্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেল। মহিলা বন্ধুটি একটি রেস্তোরাঁতে কাজ করত। জোসেফকা দেখল, একজন অপরিচিত লোক এসে তার সঙ্গে কথা বলছে। তাকে তার সঙ্গে যেতে বলছে। জোসেফকা আচ্ছন্নভাবের মধ্যেই বলে উঠল, 'তার যাওয়া উচিত নয়'। কিন্তু দেখা গেল, তার বান্ধবীটি সেই লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। গেল শহরের বাইরে। তারা থামল। তারপরই জোসেফকা যেন বেদনায় চিৎকার করে উঠল 'হাঁ ঈশ্বর লোকটি ওর স্কার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে।' ভয়াবহ এক বলাৎকারের দৃশ্য সে বর্ণনা করল। তারপর পরদিন সে বান্ধবীটিকে ফোন করে জানতে চাইল ঘটনাটি ঠিক কিনা। বান্ধবীটি জানালো—অনেক দেরী হয়ে গেছে। সে যা দেখেছে তা সত্য। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর বলে কোন লাভ নেই।

জোসেফকা তার এই আত্মিক শক্তি বা 'PSI' বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিল প্রাগের ডঃ মিলান রিজল (Dr. Milan Ryzle)-এর কাছে। কিন্তু শিক্ষা যার কাছেই হোক, এই অবিশ্বাস্য দর্শন তার হল কি করে? লেখকের ধারণা, ঘটনাটি ঘটেছিল তরঙ্গ-সমতাহেতু, যে তত্ত্বের কথা তিনি 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনেকেই ভেবে থাকেন যে, মানুষের সূক্ষ্মদেহ এই সময় তাঁর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে অকুতোস্থানে যায়। এই সূক্ষ্ম দেহই মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা হিসেবে থাকে, যে প্রেতাত্মাভীতি থেকেই অতি প্রাচীনকালে মানুষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনুষ্ঠানপদ্ধতি চালু করেছিল যাতে সেই সূক্ষ্মসত্তা মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের কোন ক্ষতি করতে না পারে, অপর পক্ষে যারা ভাল করবে তারা যেন তাদের সঙ্গে গৃহেই থাকে।

মানুষের এই আত্মিক শক্তি সম্পর্কে স্থূলতাবাদী যে কম্যুনিস্ট তারাও অনুসন্ধান করতে ইতস্তত করেনি। ১৯৩০ খ্রীঃ থেকেই রুশ অধিমনোবিজ্ঞানীরা এই আত্মিক শক্তির সন্ধানে কাজ শুরু করেছিলেন। রুশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এমন করা হয়েছিল। রুশরা এই আত্মিক শক্তিচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল এই লক্ষ্যে যে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আত্মিক প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগতে পারে। এক্ষেত্রে পুরোধা ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন সেই ডঃ এল. এল. ভ্যাসিলিয়েভ (L. L. Vasiliev) মনে করতেন

যে, আত্মিক শক্তি বা Psi faculty কাজ করে দেহকে কেন্দ্র করেই। এক ধরনের শক্তি এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে কাজ করে। তবে সেই শক্তির যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (ইংরেজীতে প্রকাশিত ১৯৬২ খ্রীঃ) তার নাম 'Experiment in Mental Suggestion.' প্রথম তাঁর বই বেরয় সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এ পুস্তক বের করেন, কারণ একটি উড়োকথা বা রিউমার যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য টেলিপর্যায়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। যাতে কম্যুনিস্টদের বস্তুবাদ অস্বীকৃত না হয় সে জন্য তিনি এই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে wave length তত্ত্ব দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ওয়েভলেংথ তারা কিছুটা ধরেছেন কোন মানুষকে ধ্যানমগ্ন করে তার E. E. G. (Electroencephalograph) করে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক তরঙ্গের রেকর্ড করে। তবে স্থূলতা ভিত্তিক wavelength তত্ত্ব অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে কোন ঘরকে Electromagnetive radiation মুক্ত করে, যাতে স্থূল কোন ওয়েভলেংথ সেখানে পেঁছুতে না পারে। কিন্তু তবু দেখা গেছে অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে সেখানকার জিনিসও দূরবর্তী স্থানে বসে কেউ দেখতে পাচ্ছে। এ জন্য স্থূলসত্তার ঊর্ধ্বে একটি সূক্ষ্ম সত্তা যেন সগৌরবে নিজের অস্তিত্বের কথা আধুনিক বিজ্ঞানীমহলও ঘোষণা করতে পারছে।

রাশিয়ানরা ওয়েভলেংথ তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখেছে E. E. G. দ্বারা। দূরবর্তী স্থানে কেউ হয়তো একটি চিত্রে মনঃসংযোগ করছে। আর এক ব্যক্তিকে তা ভিন্ন স্থানে বসে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, E. E. G. রেকর্ডে দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্কের দর্শনস্নায়ু-কেন্দ্রটি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে কোন শব্দ করা হলে দূরবর্তী স্থানে বসা অন্য কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের শ্রুতিস্নায়ুকেন্দ্রটি আলোড়িত হয়ে উঠছে। ফলে অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে রুশরা wavelength তত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু Electromagnetic radiation ছাড়াই যখন তা কাজ করে তখন শুধু বিস্ময় ছাড়া বৈজ্ঞানিকদের জন্য অন্য কিছু থাকে না।

অধিমনোবিজ্ঞানের আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার হল আত্মশক্তি—psycho-kinesis or P. K. এতে দেখা যাচ্ছে, দেহ ছাড়াই মানুষ দেহের কাজ করতে পারে। এই দেহহীন শক্তির খেলা সোভিয়েত অধিবিজ্ঞানীরাও লক্ষ্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের চমকে দিয়েছেন এক মহিলা—যার নাম মিসেস মিখাইলোভা (Mrs. Mikhailova)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে একটি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার পরই হাসপাতালে সে এই শক্তি আবিষ্কার করে। একদিন রেগে গিয়ে সে কাবার্ডের দিকে তাকাতে তাকাতে এগুতে থাকে। এই সময় তার দৃষ্টির সামনে প'ড়ে কাবার্ডের উপরে বসানো একটি কলসী সরতে সরতে গিয়ে কাবার্ডের প্রান্তভাগে পেঁছায়। তারপর ভেঙে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। এর পরই ধীরে ধীরে মিখাইলোভার মনে হতে থাকে যে, সে তার মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে। Dr. Gerady Surgeyev নামে এক

সোভিয়েত স্নায়ুতত্ত্ববিদ মিখাইলোভার উপর নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, তার দেহের চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। সেই চৌম্বক ক্ষমতা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষমতার চেয়ে মাত্র দশগুণ কম। তার মস্তিষ্কের পেছন দিক থেকে যে তরঙ্গ (wavelength) নির্গত হয় তা সাধারণ দেহতরঙ্গ থেকে ৫০ ভাগ বেশি। এই শক্তির সাহায্যে দেখা গেল যে, মিখাইলোভা ডিমের সাদা অংশ থেকে শুধু তাকিয়ে থেকেই কুসুমটুকু বের করে আনতে পারছে। তবে এ করতে গেলে তার দেহের ওজন কয়েক পাউন্ড কমে যায়। আবেগের দিক থেকেও সে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার হাসপাতালে থাকা কালে শুধু মাত্র অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করে একটি এমব্রোইডারির নানা সুতোর নানা রঙ বলে দেয়। এই অদ্ভুত আত্মিক শক্তি সোভিয়েত অধিমনোবিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

সোভিয়েত অধিমনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, প্রত্যেকটি প্রাণীরই দেহের চারদিকে একটা বৈদ্যুতিক বলয় (Electrical Aura) আছে। এই বলয়ের রঙ মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয়। মানসিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্রের উপর এই বৈদ্যুতিক বলয়ের রঙ পাল্টে যায়। এই রঙ পরিবর্তন যেমন চিত্রে ধরা যায় তেমনই তার পরিমাপও করা যায়। সোভিয়েত স্নায়ুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক গুলিয়েভ (Prof. Gulyaive) মনে করেন যে, এই বর্ণবলয় দ্বারা সংকেত বা খবরাখবর পাঠানো সম্ভব। (ভারতীয় যোগীরা এই বর্ণকেন্দ্রগুলিকে দেহের মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রে লক্ষ্য করেছিলেন। যেমন— গুহ্য ও লিঙ্গ মধ্যবর্তী অঞ্চলে (মূলাধারে) এর রঙ লাল। লিঙ্গমূল ও নাভিদেশের মধ্যস্থলে (স্বাধিষ্ঠান চক্রে) এর রঙ সবুজ। নাভিদেশে (মণিপুর চক্রে) এর রঙ শরতের আকাশে সাদা মেঘের মত। বক্ষস্থলে (অনাহত চক্রে) নীলাভ। কণ্ঠে (বিশুদ্ধ চক্রে) গভীর নীল। ভ্রূমধ্যস্থ অংশে (আজ্ঞা চক্রে) বহুবর্ণের বিচ্ছুরণ (পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের কাছে)। তার উপর নিম্নোক্ত পাঁচটি বা তারও বেশি রঙের (যেমন—হলুদ, বেগুনী প্রভৃতি) নতুন অভিনয় হবার পর দেহের শক্তি অর্থাৎ বায়ু যদি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছাকাছি গিয়ে পেঁছায় তবে প্রথম দেখা যায় জ্যোতি, দ্বিতীয়ে স্বচ্ছতা ও তৃতীয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে শূন্যতা। পশুপাখি কীটপতঙ্গ এই রঙের সাহায্যেই তাদের ভাব বিনিময় করে থাকে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মনের কার্যকলাপ দ্বারা এই বর্ণবলয়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাকে বাড়িয়ে এমন শক্তির পর্যায়েও নিয়ে আসা যেতে পারে, যার দ্বারা দেহহীন অবস্থাতেও শুধুমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারা কোন জিনিসকে ভাঙা, বাঁকিয়ে দেওয়া বা ঠেলে দেওয়াও সম্ভব। এই শক্তি যে রঙের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে তাকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাই Bioplasmic Body নামে আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় হিন্দুরা একেই বলেছেন সূক্ষ্ম জীবাত্মা। এই জীবাত্মাই এই সব কাজ করে বলে অনেকে মনে করেন। সূক্ষ্ম প্রেতদেহ যে অনেককে স্পর্শ করে বা গলা টিপে মারে বলে প্রবাদ শোনা যায় তাও এই বর্ণবলয়কৃত সূক্ষ্মদেহের আত্মিক শক্তিবলেই হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে মানুষের Psi শক্তিকে স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু Psi শক্তি আছে। এখন তাদের লক্ষ্য হল Psi শক্তি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান। তাদের পরীক্ষাগারে অদ্ভুতভাবে তারা এই Psi-শক্তির পরীক্ষা করছেন। যেমন—সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে কাউকে বসিয়ে দিয়ে তার চোখ কান ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হল—যাতে তার বহিরিন্দ্রিয় কাজ করতে না পারে। ভিন্ন ঘরে আর এক জনকে বসিয়ে দিয়ে কোন চিত্র বা জিনিসের উপর মনোনিবেশ করতে বলা হল। এ দিকে সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে থাকা ব্যক্তিকে আধ ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করা হল যে, পাশের ঘরের ব্যক্তিটি কোন্ জিনিসের উপর মনোনিবেশ করেছে? দেখা যাচ্ছে চোখ বন্ধ থাকলেও এ ঘর থেকে সেই ব্যক্তিটি ও ঘরে অপর ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্টিনিবদ্ধ ছবি বা বিষয়ের উপর দিব্যি বলে যাচ্ছেন। কি করে এটা সম্ভব? চোখ বন্ধ থাকলেও এবং দৃষ্টির আড়ালে ভিন্ন ঘরে থাকলেও এটা অপর ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে কি করে? বৈজ্ঞানিকেরা একে বলেছেন টেলিপ্যাথি বা তরঙ্গ মারফৎ শব্দ প্রেরণ। এই তরঙ্গ অপর ব্যক্তির মস্তিষ্ক স্নায়ুতে আঘাত করে তাকে সব দেখিয়ে দিচ্ছে। তাহলে চর্মচক্ষুই দৃষ্টির প্রধান বাহক নয়। সে রয়েছে অন্যত্র। কিংবা স্থূলদেহের ঊর্ধ্বে যে একটি সূক্ষ্মদেহ আছে সে-ই সব প্রত্যক্ষ করছে?

স্থূলদেহের ঊর্ধ্বে যে সূক্ষ্মদেহ আছে তার প্রমাণ দিয়েছেন ফিলিপিন ও ব্রেজিলের স্থানীয় চিকিৎসকেরা। বিনা অস্ত্রে দেহে শুধু হাত বুলিয়ে তারা টিউমার সারিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ দেহ স্পর্শ না করে দেহের উপর সূক্ষ্মদেহে অপারেশন করে রোগ নিরাময় করছেন। এই শেষোক্ত ঘটনা বহু ইউরোপীয় ডাক্তারই করেছেন ল্যাটিন আমেরিকাতে। তাঁরা অপারেশন জাতীয় জিনিস স্থূলদেহে না করে সূক্ষ্মদেহে করে থাকেন। এ-জন্য তাঁদের স্থূলদেহ স্পর্শ করারও প্রয়োজন হয় না। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, দেহের উপরেও একটা সূক্ষ্মসত্তা আছে।

আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সচেতন ইন্দ্রিয়গুলিকে দৈহিক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা গেলে অন্তস্তলের মানসিক প্রক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হলে বা তাকে অকেজো করে রাখতে পারলে বহির্জগতের অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব সে সহজেই অনুভব করতে পারে।

কখনও কখনও সূক্ষ্মসত্তার উপর বাইরের এই প্রভাব প্রতীকের মাধ্যমে পড়ে। বর্তমান লেখক একে 'দৈবী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, একবার কাম্পুচিয়াতে গোপন বোমা বর্ষণের একটি চিত্রকে আমেরিকাতে ভিন্ন ঘরে বসে পরীক্ষক তাঁর লক্ষ্যস্থল করলে অপর ঘরে বহিরিন্দ্রিয় রুদ্ধ করা পরীক্ষার্থী ব্যক্তি মানসনেত্রে যে চিত্র দেখেন তা হল, প্রেসিডেণ্ট নিকসন তাঁর নাক ঝাড়ছেন। অনরটন (Honorton) নামে এক অধিমনোবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও বর্তমান লেখকের ধারণা, এক্ষেত্রে প্রতীকের মাধ্যমে বক্তব্য বলে দেওয়া হয়েছে। এবং তা যদি হয়, তাহলে শুধু স্থূলদেহী

ব্যক্তিরই যে সূক্ষ্মসত্তা আছে তা নয়, এর বাইরেও একটি সূক্ষ্ম চেতনা আছে, যা তাঁর অদ্ভুত সংকেতময় ভাষাতে কথা বলে। এই সংকেতগুলি যিনি পড়তে পারেন তিনি 'দিব্য ভাষা বিশারদ' একথা বলা যেতে পারে।

অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানীরা PSI-বা আত্মিক শক্তি সম্পর্কে অনেক বেশি বিস্তৃত ধারণা পোষণ করছেন। এই আত্মিক শক্তি মানুষকে নানা ধরনেই শক্তিশালী করে তুলতে পারে বলে বিশ্বাস। তবে এই শক্তি স্বতন্ত্র কোন সূক্ষ্মদেহে আশ্রয় করে থাকে কিংবা তা জৈবিক দেহেরই বিশেষ গুণ, এ নিয়ে যদি তাঁদের প্রশ্ন করা হয়, তবে তাঁরা আগের মত হয়তো বলবেন না যে, জৈবদেহের মৃত্যুর পর একটি সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব আছে, তবে অন্তস্থ শক্তিকে বৃদ্ধি করা গেলে যে মৃত্যুর পূর্বেই জীবনশক্তিকে বৃদ্ধি করা যায় একথা অবশ্যই বলবেন। অধিমনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণাই বিপ্লবস্বরূপ।

অথচ মৃত্যুর পর জীবন নিয়ে নানা কাহিনীর অন্ত নেই। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি এ ধরনের কাহিনী অজস্র। কাহিনীগুলির বহু সাক্ষী থাকলেও বিজ্ঞানমানসে তাকে সহজে গ্রহণ করতে বাধে। আধুনিক আমেরিকাতে, নিউইয়র্কে ১৯৬৪ সালে অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে Lyall Watson তাঁর গ্রন্থ 'The Romeo Error'-এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই : ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কে একজন সার্জেন্ট একটি মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করছিলেন। অকস্মাৎ মৃতদেহটি উঠে বসে দুই হাতে সার্জেন্টের গলা টিপে ধরে। এতে সার্জেন্টটি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, মানসিক ভীতির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ আমেরিকাতে তো এ ধরনের কাহিনীর অন্তই ছিল না। এ ধরনের কাহিনীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী পাওয়া গেছে আমেরিকার নিউজার্সির প্যাটারসন অঞ্চল থেকে। এখানে ডি. জে. ডেমারেস্ট (D. J. Demarest) নামে এক মুদিখানার মালিকের মেয়ের মৃত্যু হয় (১৮৭৮ খ্রীঃ)। তার মৃত্যু হয় হৃদরোগে। মঙ্গলবার দিন তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহকে কবর দেবার জন্য যথাযথ সমাধি-পোশাক পরিয়ে একটি কফিনে তাকে রাখা হয়। শুক্রবার দিন ডেমারেস্ট কফিনের কাছ থেকে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। হঠাৎ সে দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ পায়। মুখ তুলে তাকাতেই দেখে যে, দরজা খুলে যাচ্ছে এবং সমাধি-পোশাক পরে মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। টলতে টলতে এসে সে তার বাবার কাছে দাঁড়াল। এবং বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগে বাবার গলাও জড়িয়ে ধরল। কিন্তু কিছুকাল পরেই পেছন দিকে ঢলে পড়ল। বাবা তাকে তুলে ধরলেন, কিন্তু সে আর দাঁড়াতে পারল না। অলস ভঙ্গীতে ঢলেই পড়ল। এক্ষেত্রে এ ঘটনাটি যারা পরীক্ষা করেছিলেন, তাদের ধারণা— এখানে জৈবদেহের বাইরে সূক্ষ্ম কোন দেহের খেলা নেই। আসলে মেয়েটি একেবারে মরেনি। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। ভুল করে তাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে ঢলে পড়ে তখন তার সত্যিই মৃত্যু হয়। ফলে মেয়েকে দ্বিতীয়বার

মৃত বলে ঘোষণা করতে হয়। সেইদিনই তাকে কবরস্থ করতে হয়। এই গল্প লণ্ডন পর্যন্ত পোঁছে 'ইলাস্ট্রেটেড পোলিস নিউজে' প্রকাশিত হয়ে এক সময় রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

প্রেতাত্মা নিয়ে আবহমানকাল থেকে বয়ে আসা নানা কাহিনীকে আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে এ ব্যাপারে বেশ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়েই এর অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এজন্য প্রেতাত্মা সম্পর্কে একটি 'সুমারী' (census)-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুসন্ধান কার্য চালান 'সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ''। ব্রিটেনে সতের হাজার ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল—'ঠিক যখন জেগে ছিলেন এমন কোন ভাব কি আপনার হয়েছে, বা এমন কোন জিনিস কি আপনি দেখেছেন যাতে মনে হয়েছে কোন জীবিত ব্যক্তি আপনাকে স্পর্শ করেছে বা কোন প্রাণহীন কিছু আপনাকে ছুঁয়েছে ? আপনি কি কারো কণ্ঠ শুনেছেন ? এদের মধ্যে কোনটিকে আপনার মনে হয়েছে যে, এটি সত্যিই অতীন্দ্রিয় ব্যাপার !' এই প্রশ্নের উত্তরে ১৭০০০ ব্যক্তির মধ্যে ১৬৮৪ জন ব্যক্তি, অর্থাৎ দশভাগের সামান্য কম ব্যক্তি জবাব দিয়েছেন, 'হ্যাঁ'। জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও অনুরূপ অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এদেশগুলির ক্ষেত্রে ১১·৯৬ শতাংশ লোকে জবাব দিয়েছে 'হ্যাঁ'। সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ২৭,০০০ লোকের মধ্যে। ব্রিটেনে যারা 'হ্যাঁ' বলেছিল তাদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত কাহিনী বলতে বলা হয়। তারা এক্ষেত্রে যে-সব গল্প বলেছিলেন 'সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ'' তাদের বক্তব্যগুলি যথেষ্ট পরীক্ষা করে গ্রহণ করেন। এই সমীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্য ছিল টেলিপ্যাথি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং দেখা যে, কোন ব্যক্তি নিজের প্রতিচ্ছায়া (image) দূরে অন্যত্র কারো কাছে ছুঁড়ে দিতে পারে কিনা। কারণ ভূত বলে যা ধরা হয় তার অনেকগুলোই এইভাবে অপরের জীবিত দেহ থেকে নিক্ষিপ্ত ছবি, যাকে আকাশ পরিক্রমা বা Astral Travel বলা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৃতের সূক্ষ্ম সত্তার দর্শন বা স্পর্শ পাওয়া গেছে এমন অভিজ্ঞতারও অভাব নেই। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাহিনী যিনি বর্ণনা করেছিলেন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনৈকা ছাত্রী মিস মরটন (নকল নাম)। গল্পটি এই ধরনের ঃ

১৮৮২ থেকে ১৮৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সাত বছর তাদের বাড়িতে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী ভূতের উপদ্রব চলেছিল। কালো পোশাক পরে সে আসত। প্রত্যেকদিন উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে সে নিচে নেমে এসে ড্রইংরুমের সামনে জানালার কাছে দাঁড়াতো, তারপর ড্রইংরুম ছেড়ে দরজা দিয়ে বাইরে বাগানে চলে যেত। [অনুরূপ অভিজ্ঞতা অরুণ সাঁতরা নামে একটি ছেলে টালিগঞ্জ সুলতান আলম রোডে—ডঃ দীপেন বাগচির বাড়ির পাশে যে ঘরে সে থাকে সেখানে আজও দেখে। নিত্য রাত এগার-বারটায় সে যখন কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে ফেরে, তখন সিঁড়ির পাশে একটি মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকত দেখে। একদিন বর্তমান লেখক তাঁর নিজের ঘরে বসে অরুণের বাড়ির দিকে মনোনিবেশ করাতে

অল্পবয়সী এক অপরূপ সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পান। শক্তি প্রয়োগ করে তখন তিনি তাকে উর্ধ্বলোকে উঠে যেতে বলেন। এরপর অরুণ আর বহুদিন এই মহিলা-প্রেত্মাতাটিকে দেখেনি]। মিস মরটন বহুদিন একই সময় একভাবে সেই দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলাটিকে চলাফেরা করতে দেখেছিলেন। প্রেতাত্মাটির মুখ রুমাল দিয়ে আড়াল করা থাকত। তার বাঁ হাত জামার হাতায় সবটাই ঢাকা থাকত। তাকে দেখে মনে হত বিধবা। মাথায় কোন টুপি থাকত না। তবে পোশাকটি এমন করে পরা থাকত যে. মনে হত এক ধরনের ঘোমটা টেনে আছে। কপালের বাঁ দিকের উর্ধ্ব অংশ দেখা যেত। তার উপর সামান্য চুলও নজরে পড়ত। প্রায় দু'বছর এই প্রেতাত্মাটিকে এতটাই স্থূল মনে হত যে, জীবন্ত বলেই ভুল হত। ১৮৮৪ সালের পর ক্রমশ এই ভৌতিক ছায়া হাল্কা ও অস্পষ্ট হয়ে আসে। দেখা যেতও কম।

শুধু মিস মরটন নয়, বহু লোকই এই ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর যাঁরা দেখেছিলেন মিস মরটনের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। তবে মিস মরটনের বাবা কখনও এই ছায়ামূর্তিটি দেখতে পাননি।

মিস মরটন অনেকবার এই ছায়ামূর্তিটির রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করেছেন। বহুবার পেছনে ধাওয়া করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। সিঁড়িতে আড়াআড়ি ভাবে সুতো বেঁধে রেখে দেখেছেন, সুতো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, অথচ মূর্তিটি চলাফেরা করছে। যতবার এই ভৌতিক ছায়াকে তিনি ছোঁবার চেষ্টা করেছেন ততবারই দেখেছেন হাতের নাগালের সামান্য একটু দূরে রয়েছে সে। কথা বলে দেখেছেন, তাতে সে থেমে যায়। মনে হয় কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারে না। পরে অনেক খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, ছায়ামূর্তিটি মিঃ এস-এর পত্নী মিসেস এস-এর— যিনি তাঁর মদ্যপ স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন।

মৃতের সূক্ষ্মদেহের একটি দিবাচিত্রও এক সময় লণ্ডনকে আলোড়িত করে তুলেছিল। ফটোটি তুলেছিলেন মিসেস ম্যাবেল চিন্নারি (Mrs. Mabel Chinnery)। মায়ের সমাধির উপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা ফিরছিলেন। ফেরার সময় গাড়িতে মিসেস চিন্নারি তাঁর স্বামীর ফটো তোলেন। কিন্তু যখন নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট তোলা হয়, তখন দেখা যায় ; পেছনে তার মাও গাড়িতে বসে আছেন। ফটোগ্রাফিতে অভিজ্ঞ 'সানডে পিকটোরিয়ালে' ১৯৫৯ খ্রীঃ ছবিটি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞদের মতে ছবিটি যথার্থই ছবি। বিভ্রান্ত করার জন্য কৃত্রিম কিছু নয়। এই ফটো দেখে টম হার্ডিম্যান স্কট বলেছিলেন, 'এ ধরনের উল্লেখযোগ্য ফটোগ্রাফের স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।'

এনড্রু মেকেনজি নামে পরলোক সম্পর্কিত একজন লেখক 'Apparitions and Ghosts' নামে একটি গ্রন্থে অদ্ভুত একটি ভৌতিক কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কাহিনীটি এই রকম ঃ মিসেস ডীন (Mrs. Deane) নামে এক মহিলা একবার ওহিও-এর ক্লীভল্যাণ্ডে তার মেয়ের এক নার্স, মিসেস মিলস (Mrs. Mills) নামে এক

মহিলার গৃহে সপ্তাহ শেষে বিশ্রামের জন্য এসেছিলেন। মিসেস মিলস বিধবা। তরুণ এক পুত্রকে নিয়ে থাকতেন। এছাড়া মিসেস ডীন তাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানতেন না।

প্রথম সন্ধ্যায় মিসেস ডীন যখন শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন দরজার হাতল ঘোরানো হচ্ছে এমন এক শব্দ পান। দরজা খুলে যেতেই তিনি দেখেন যে, একটি ছোট সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিসেস ডীন তাকে দেখে বলেন 'হ্যালো, তুমি কে?' মেয়েটি বলল, 'আমি লোত্তি (Lottie)। এটা আমার ঘর।' মিসেস ডীন বললেন 'ভেতরে আসবে না?' মেয়েটি সে-কথা শুনে সামান্য একটু হাসল, তারপর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মিসেস ডীন যে সেজন্য ভয় পেলেন তা নয়। বরং নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন। পরদিন সকালে তিনি মিসেস মিলসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোত্তি কে?'

মিসেস মিলস বললেন— আমার মেয়ে চারলোট্টির ডাক নাম ছিল লোত্তি। কয়েক বছর আগে সে মারা যায়। কিন্তু আপনি তাকে জানলেন কেমন করে?' মিসেস ডীন তাঁকে সমস্ত কাহিনী ভেঙে বললেন। মিসেস মিলস তখন তাঁকে চারলোট্টির একটি ফটো দেখালেন। মিসেস ডীন বললেন—তিনি ঠিক এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন।

মিসেস মিলস ঘটনা শুনে কেমন ভেঙে পড়লেন, এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে চাইলেন না। চল্লিশ বছর পরে মিসেস ডীনের রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যানড্রু ম্যাকেনজি ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করেন। কিভাবে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল জানতে চান। ক্লীভল্যাণ্ডের রেজিস্ট্রারের সহায়তা সত্বেও এ ব্যাপারে তিনি কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। না পারার কারণ তখন মিসেস মিলস ও তাঁর পুত্রকে আর পাওয়া যায় নি।

রহস্য যাই থাক মিসেস ডীন যে ছবিটি দেখেছিলেন তা মিথ্যে ছিল না। দরজা খোলার শব্দ কতদূর সত্য সন্দেহ হতে পারে। হয়তো এ শব্দ উত্তেজিত মস্তিষ্কের কোনও ভ্রান্তি। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়তো তাঁর মানসিক কল্পনার প্রতিফলন। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাজার হাজার লোকের মুখে যে ভূতের গল্প শোনা যায়—তার সঙ্গে এমন এক জগতের সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কে বিজ্ঞান আজও কোন হদিস করতে পারে নি। ভূত যাই হোক না কেন জীবনের ক্ষেত্রে ভৌতিক অভিজ্ঞতা যে একটি ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'Phantasm of the Living' নামক গ্রন্থে গার্নি মায়ার্স ও পোডমোর (Gurney Myers and Podmore) অদ্ভুত এক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি এই ঃ—ইংল্যাণ্ডের দেশের বাড়িতে গ্রামের রাস্তায় বছর দশেকের একটি মেয়ে জ্যামিতি বই পড়তে পড়তে পায়চারি করছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখের উপর থেকে যেন প্রাকৃতিক দৃশ্য উঠে গেল। চোখে পড়ল বাড়ির শোবার ঘর—যার নাম হোয়াইট রুম। মেয়েটি দেখল সেখানে তার মা মেঝেতে মড়ার মত পড়ে আছে।

মেয়েটি সত্য মিথ্যা ভুলে গিয়ে তক্ষুনি ছুটল ডাক্তারের কাছে, এবং তাকে নিয়ে বাড়ি এল। তাঁরা বাড়ি এসে মেয়েটির বাবার সঙ্গে সোজা চলে গেল হোয়াইট রুমে। সত্যি সত্যিই দেখা গেল মেয়েটির মা মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। আসলে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সময়মত ডাক্তার আনাতে বেঁচে গেলেন।

অধিমনোবিজ্ঞানীদের কাছে ঘটনাটি এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, মেয়েটির দেখা ছবির সঙ্গে ঘটনাটি যে হুবহু মিলে গেছে সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা যে, মেয়েটি, যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল তখন তার মা সম্পূর্ণ সুস্থ। মেয়েটি, মায়ের কথা একটুও চিন্তা করেনি। তার বাবা তো এইজন্য ডাক্তার দেখে রীতিমত অবাক হয়েছিলেন। এমন কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ডাক্তার কেন ? অসুখ কার ?' তাহলে মেয়েটি এই অসুখের কথা জানতে পারল কিভাবে ? এর দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, মেয়েটির মা মুমূর্ষু অবস্থাতে মেয়েটির কথা ভেবেছিলেন, ফলে তাঁর সূক্ষ্মদেহ মেয়েটির কাছে চলে গিয়েছিল।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা এই জন্য দু'ধরনের সূক্ষ্ম সত্তা বা ভৌতিক সত্তার কথা বলেছেন, যেমন,—(১) 'Crisis Apparition' ও (২) Delayed Crisis Apparition. Crisis Apparition'-এর কাজ হয় কোন লোক যখন ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, আঘাত পায়, মরণাপন্ন হয় সেই সময়। এই সময় তারা এক ধরনের টেলিপ্যাথিক ছবি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় তারা জানে না যে, তাদের অবচেতন মন কিভাবে এই ছবি পাঠিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় নিজেদের সূক্ষ্ম সত্তাকে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। তাদের সূক্ষ্ম সত্তা লক্ষিত ব্যক্তির কাছে পেঁছুবার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। যিনি সেই ছবি দেখেন এবং তার খোঁজ নেন, তখন জানতে পারেন যে, তার মৃত্যু হয়েছে। এই ধরনের সূক্ষ্ম সত্তা দেখাকে বলে 'Delayed Crisis Apparition'।

অবচেতন মনে যদি কেউ নিজের প্রতিচ্ছায়াকে বা সূক্ষ্ম সত্তাকে অন্যত্র পাঠাতে পারে, তাহলে সচেতনভাবে পারবে না কেন ? বহু ভারতীয় যোগী-পুরুষ সচেতনভাবে নিজের সত্তাকে বাইরে পাঠিয়েছেন এ ধরনের খবর জানা যায়। নানা পুস্তকে এ ধরনের কাহিনী লিখিতও আছে। ভারতবর্ষে অধিকাংশ মানুষই এ-সব ব্যাপারকে বিশ্বাস্য বলে ধরেই নিয়েছে। সুতরাং এ-ব্যাপারে তারা কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এ বিষয়ে অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের খোঁজখবর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

'সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ' এ ব্যাপারে Mr. Cirk-এর একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করে গেছেন। উনবিংশ বিংশ শতকের শেষের দিকে মিঃ কার্ক, কোন এক মহিলা, ধরা যাক মিস জি, তার কাছে গভীর মনঃসংযোগের সাহায্যে নিজেকে পাঠাবার

চেষ্টা করেন। মিস জি-র উপর মনোনিবেশ করার জন্য তাকে তিনি কয়েকবার দেখা সত্ত্বেও মিস 'জি' কিন্তু কখনও তাকে দেখতে পান নি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একদিন মিস 'জি' তাকে দেখে ফেললেন। মাসটা ছিল জুন মাসের ১১ তারিখ। অডিটিং অফিসে কাজ করতে করতে মিঃ কার্ক ক্লান্ত বোধ করেন। তখন সময় ৩-৩০ থেকে ৪টে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে থাকেন। এমন সময় তার মনে হল মিস 'জি' উপর চিন্তা করা যাক। মিস 'জি' তখন কোথায় থাকতে পারেন বুঝতে না পেরে তিনি মন ফেললেন তার শোবার ঘরের উপর। তারপর ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল এ ব্যাপারে 'সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চে' নিম্নভাবে রিপোর্ট লিখিত আছেঃ রিপোর্ট দিয়েছেন মিস জি। সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করে তিনি ক্লান্ত ছিলেন। বিকেলে তিনি যখন ঘরের সামনে জানালার কাছে ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু অকস্মাৎই জেগে ওঠেন। দেখেন মিঃ কার্ক তাঁর চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তার গায়ে ছিল গভীর ধূসর রঙের কোট। জানালার দিকে পেছন ফিরে তিনি যেন মিস 'জি'-র দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন। এরপর ঘর ছাড়িয়ে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ ছিল। দরজার দিকে ফুট চারেক যাওয়া মাত্রই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এতে অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করে মিস 'জি' মিঃ কার্কের অফিসে চলে যান, কারণ, তিনি জানতেন যে, এ সময় মিঃ কার্ক অফিসেই থাকেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু আসল ঘটনাটি চেপে যান। পরে এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘটনাটি তাঁকে বলে ফেলেন।

এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, মানুষ ইচ্ছাশক্তিবলে তার যে সূক্ষ্ম একটা সত্তা আছে তাকে স্থূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে যে-কোন স্থানে পাঠাতে পারে। এই দেহ বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মতে মানুষের স্থূলদেহের উপরেই থাকে। স্থূল চোখে তাকে দেখা যায় না এই যা। মানুষের দেহের চারিদিকে যে বর্ণবলয় থাকে কিরলিয়ান বা কার্লিয়ান ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হবার আগে অনেকেই তা জানত না। এই বর্ণবলয়ই মূলত মানুষের সূক্ষ্ম সত্তা, স্থূল দেহের মৃত্যু হলে হাল্কা এই দেহ ওজন অনুযায়ী কম বেশী ঊর্ধ্বস্থানে থাকে। বর্তমান লেখক নিজে চোখ বন্ধ করে সুদূর আমেরিকায় বসে থাকা মানুষের দেহের এই বর্ণবলয় দেখে তার কি ধরনের রোগ আছে তা বলে দিয়েছিলেন। প্রায় প্রতিদিন বহুলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এই বর্ণবলয় লক্ষ্য করে তাদের রোগ সম্পর্কে তিনি বলে থাকেন। এবং তিনি আশ্চর্য হয়ে আরো লক্ষ্য করেছেন যে, চর্ম ও মাংসাবৃত দেহের অভ্যন্তরেও কার কোথায় কি রোগ আছে সে পর্যন্ত তিনি দেখতে পান। এ দ্বারা বোঝায় যে, এই সূক্ষ্ম সত্তার এক্সরে-র মত যে-কোন স্থূল বাধা অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা আছে। এই জন্যই বোধ হয় ভৌতিক দেহ সম্পর্কে এ ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে।

সে যাই হোক, স্বেচ্ছায় এই সূক্ষ্মদেহকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার আরও অনেক চমৎকার কাহিনী রয়েছে। এ বিষয়ে আরও একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাচ্ছে

ম্যাকেঞ্জির 'Apparitions and Ghosts' গ্রন্থ থেকে। ঘটনাটি এই ধরনের : একদিন মিসেস ক্লোন রান্নাঘরে কাজ করছেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখের ওপর তাঁর এক বান্ধবীর আবক্ষ মূর্তি ভেসে উঠল। মুখে যেন চিন্তার রেখা। বান্ধবীটি থাকেন দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনে। ঘটনাটি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের। ঐ চিন্তিত মুখ দেখে হঠাৎ মিসেস ক্লোনের মনে হল যে, পাশের ঘরে তার সন্তানের কোন বিপদ হয়েছে, যা সেই বান্ধবীটির চোখে পড়াতে তাকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। সুতরাং তিনি পাশের ঘরে ছুটে গেলেন। দেখলেন, তাঁর আঠারো মাসের শিশুটি ঘেরাটোপ থেকে হাত বাড়িয়ে কাছের একটি ড্রয়ার থেকে ধারালো সব ছুরি বের করে নিয়ে তার শোয়ার ঘেরাটোপে রাখছে। যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারত। কিন্তু সময়মত ইঙ্গিত পাওয়াতে তিনি শিশুটিকে বাঁচাতে পারেন।

সূক্ষ্ম সত্তার এক ধরনের মিথ্যা উপস্থিতির কথাও অধিমনোবিজ্ঞান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। একে বলা হয় 'Flase Arrival'। সাধারণত এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি আসার ঘণ্টাখানেক বা আধঘণ্টা আগে অন্য ব্যক্তি তাকে দেখে থাকেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে ওসলো ইউনিভার্সিটির (University of Oslo) জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কোন ব্যক্তি কারো গৃহে যাবার আগে, বেরুবার মুখে তার সম্পর্কে চিন্তা করে, ফলে এক ধরনের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটে যায়। এই কারণেই বহু ব্যক্তি যথার্থ আগমনের আগে মিথ্যা আগমন লক্ষ্য করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—যাকে দেখা যায়, তিনি যে মুহূর্তে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন সেই মুহূর্তেই তাঁকে দেখা যায়।

জার্মান মহাকবি গ্যয়টের যখন ২২ বছর বয়স, তখন তিনি নিজেরই এক ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তখন তিনি স্ট্রাসবুর্গে থেকে লেখাপড়া করতেন। পাশের গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়েছিল। স্ট্রাসবুর্গ ছেড়ে যাবার আগে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কারণ স্ট্রাসবুর্গে তার পড়াশুনা শেষ হয়েছিল। মেয়েটির নাম ফ্রেডেরিকা। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পথে দেখেন বিচিত্র এক পোশাকে তিনি উল্টো দিক থেকে আসছেন। এ ধরনের দেখাকে অনেকে অমঙ্গল-জনক বলে মনে করেন। একে মৃত্যুবার্তাবাহক বলে মনে করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে রকমই মনে করতেন, এবং তাঁর জীবনে সত্যিই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। একবার তিনি ঘাটশিলাতে পাহাড়ের উপরে বেড়াতে গিয়ে দেখেন যে নিজেই একটি খাটের উপর শুয়ে আছেন। এতে তাঁর মনে হয় মৃত্যু আগত। বস্তুত, তার কয়েক দিন পরেই তিনি মারা যান। গ্যয়টে অবশ্য এ ধরনের কোন সংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। তবে এই দৃশ্যটি তাঁকে চমকিত করে দিয়েছিল আট বছর পরে। আট বছর পরে সত্যি তিনি ঐ পোশাকে ঐ পথ ধরেই মেয়েটিকে আর একবার দেখতে এসেছিলেন। আট বছর পরে যা ঘটবে আট বছর আগেই তিনি তার ছায়া দেখেছিলেন। গ্যয়টে তাঁর 'আত্মজীবনীতে' এই কাহিনীটির উল্লেখ করে গিয়েছেন।

এ ধরনের ঘটনার বহু উল্লেখ ইতিহাসে আছে। অধিমনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তাও করেছেন। অনেক পুরাণ কাহিনীতেও পরলোকগত মানুষের প্রেতাত্মা-দর্শনের কথা আছে। ইহুদীদের রাজা সল (Saul)-এর সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, একবার ফিলিস্টিনদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে গুণিন ডেকে তিনি সে সম্পর্কে জানতে চান। গুণিনকে স্যামুয়েলের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়, যাতে তাঁর পরামর্শ পাওয়া যায়। জাদু প্রভাবে স্যামুয়েলের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হয়ে সলকে তিরস্কার করে বলেন যে. ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে সে অপরাধ করেছে। ফিলিস্টিনদের কাছে সে জন্য সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রেতাত্মার এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যিই ফলেছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নিজের প্রেতাত্মা দেখার উল্লেখেরও ইতিহাসে অভাব নেই। রোমান নেতা ব্রুটাস নিজের তাঁবুতে বসে নিজেরই প্রেতাত্মা দেখেছিলেন। ফিলিপ্পির যুদ্ধে নিহত হবার আগের রাতেও নিজের দ্বিতীয় সত্তা বা আত্মাকে তিনি দেখেছিলেন। তবে এই সূক্ষ্মদেহ যে অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসে তা সত্য নয়। যোগীরা যখন ধ্যানে বসেন, তখন নিজের এই দ্বিতীয় সত্তাকে দেখতে পান। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের কাছে আধ্যাত্ম শিক্ষা লাভ করেছেন এমন বহুলোক তাঁকে ধ্যানকালে তাঁদের নিজেদের সূক্ষ্ম সত্তা দর্শনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক শ্রীযুক্ত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক যে একথা গুরুগিরির মানসিকতা নিয়ে বলছেন তা নয়। তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকেই অধিবিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখার জন্যই এমন করছেন। নানা ধরনের পরীক্ষা থেকে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, স্থূলদেহের ঊর্ধ্বেও মানুষের একটি দ্বিতীয় সত্তা আছে। সুতরাং প্রাচীনতম কাল থেকে মানুষ মৃত্যুর পর প্রেতাত্মার যে ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আসছে তা মিথ্যা নয়। এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এ বিষয়ে আরো নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়ে এ ব্যাপারে তাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে। স্থূল দেহের পরে একটি সূক্ষ্ম সত্তা ও কর্মফল অনুযায়ী প্রেতাত্মার ভোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যদি জানিয়ে দিতে পারেন, তাহলে বর্তমান উদ্‌ভ্রান্ত দুনিয়ার চিন্তাধারা সম্পূর্ণই পাল্টে যাবে। পৃথিবী মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে। এর ফলে মানুষের জীবনে অশুভ শক্তির প্রভাব কমে যাবে। মানুষ নিজের জীবনে সাম্য আনবার চেষ্টা করবে।

মানুষ বিজ্ঞানের জগতে যতই উন্নতি করুক না কেন, আধুনিককালেও বহু অত্যাধুনিক মানুষ সূক্ষ্ম সত্তার পরিচয় পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কখনও কখনও দলবদ্ধ মানুষও এই ভয়ে ভীত হয়েছে। ভীত হয়েছে এমন মানুষ যাদের ভীত হবার কথা নয়। যেমন একদল সৈন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ১৯৪০ খ্রীঃ এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন লেফটেনাণ্ট জন স্কোলে (L. John Scollay)। দলবল নিয়ে লেফটেনাণ্ট তখন ডানকার্কের একটি জঙ্গলে লুকিয়ে

আছেন। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডারদের যারা বীরত্বের জন্য সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আর এই জঙ্গলে থেকে তারা সবাই ভয় পাচ্ছিল। সারজেণ্ট মেজর বার বার স্কোলেকে তাড়া দিচ্ছিলেন স্থানটি ছেড়ে পিছিয়ে যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাকে পিছুতে হয়েছিল। তবে তাতেও যে তিনি সেনাবাহিনীর সবাইকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন তা নয়। শেষ পর্যন্ত স্কোলেকে জার্মানীর হাতে ধরা দিতে হয়। জার্মান P. W. D. শিবিরে তাঁকে সময় কাটাতে হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি যখন ছাড়া পান, সেই কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলটিতে আবার যান। স্থানটি সম্পর্কে খোঁজ করতে করতে তিনি জানতে পারেন যে, ১৪১৫ খ্রীঃ এজিনকোর্টের যুদ্ধের কিছু আগে এই কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলেই ইংরাজ সৈন্যরা ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে এ স্থানে ভূতের উপদ্রব আছে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তাহলে স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যরা কিভাবে এটা অনুমান করেছিল? নতুন যুদ্ধের ভয়াবহতায় আবার কি মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের প্রেতাত্মারা জেগে উঠেছিল? এই জেগে ওঠার কারণ হিসেবে অধিমনোবিজ্ঞানীদের ধারণা, যে সব ভূত উপদ্রব করে, তারা কোন স্থানে জীবিতকালে অ-সুখ বোধ করলে বার বার সেখানে আসে। অপর পক্ষে কোন স্থানের প্রতি ভালবাসার টান থাকলেও প্রেতাত্মারা সেখানে এসে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরব, মানসম্ভ্রম, ব্যথা-বেদনা সবইথাকে। সেই জন্যই প্রেতাত্মরা সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

ইংরেজদের নিজেদের গৃহযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত একটি যুদ্ধক্ষেত্রেও অনুরূপ ভৌতিক দৃশ্যের অবতারণা হত। যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এজহিলে (Edgehill)। যুদ্ধ হয়ে যাবার কয়েক মাস পরেও লোকে স্থানটিতে ভৌতিক যুদ্ধের চিত্র দেখত। তার মধ্যে তারা রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি যুবরাজ রিউপার্টকেও দেখতে পেত। অথচ যখন এই ভৌতিক চিত্র দেখা যেত তখনও যুবরাজ রিউপার্ট জীবিত ছিলেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় সংঘটিত শিলোহ্ (Shiloh)-র যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কেও অনুরূপ ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল।

বহু কারাগার, বহু বধ্যভূমি, বহু বড়লোকের বাড়িতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত বলে সে সব গৃহে ভূতের উপদ্রবের কথা প্রত্যেক দেশেই শোনা যায়। বহু পোড়ো বাড়ি এজন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'ও এই ভৌতিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই লিখিত।

তবে প্রশ্ন হল, ভূত বা প্রেতাত্মা কি শুধু মানুষেরই হয়? যদি স্থূল জীবনের সূক্ষ্ম আত্মা থাকে তাহলে অন্য সব জীবনেরও তা থাকা সম্ভব। সুতরাং পৃথিবীতে বহু ইতরপ্রাণীর প্রেতাত্মার কাহিনীও আছে। পশ্চিম আমেরিকায় তো এই কাহিনীর ছড়াছড়ি। কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, নানা প্রাণীর ভূত বহুজনেই দেখেছে বলে গল্প

আছে। ইংল্যাণ্ডের উইণ্ডসর অরণ্যে 'হারনে' সম্পর্কিত ভুতের কাহিনী বহু প্রচলিত। ঘোড়ায় চেপে তার প্রেতাত্মাকে বহু ব্যক্তিই নাকি দেখেছে। টম ম্যাক অ্যাসির চিত্রে কিল্লাকির কালো বেড়ালের ভূত তো জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে। ভৌতিক ঘোড়াব গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এরকম গল্পেরও অজস্র ছড়াছড়ি হয়েছে।

বহু নরকরোটির মধ্যে ভুতের আশ্রয়ের কাহিনী আছে। ভারতীয় তান্ত্রিকদের নরকরোটি মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে ধরে রাখে বলে বিশ্বাস। তান্ত্রিকরা এই প্রেতাত্মাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেয়। বেট্টিসকোম্বের (Bettiscombe) নরকরোটি তো এজন্য ইতিহাসবিখ্যাত হয়ে আছে। এই নরকরোটি নাকি একটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রীতদাসের। অষ্টাদশ শতকে এই ভৃত্যকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল। জন পিন্নে (Jon Pinney)-এর তৈলচিত্রের নিচে এটি বসানো আছে। পিন্নে এই ক্রীতদাসকে ইংল্যাণ্ডে এনেছিলেন। যদি এই নরকরোটিটিকে স্থান চ্যুত করা যায় তবে নাকি সে চিৎকার করে ওঠে। এ রকম ঘটনার কথা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বহু স্থানে প্রচলিত আছে। পারিবারিক ভূতেরা কারো মৃত্যুর আগে নাকি আর্তনাদ করে জানান দিয়ে যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভুতুড়ে বাড়ি রেনহাম হল (Raynham Hall)-এব সিঁড়ির ফটো তুলতে এসে এক ফটোগ্রাফার একটি স্বচ্ছ মহিলার ছবি সিঁড়িতে রয়েছে, ফটো প্রিন্টিংয়ে এমন দেখেছিলেন। ছবিটি অদ্যাবধি রয়ে গেছে।

উপযোগবাদী দার্শনিক জেরোম বেন্থামের ইচ্ছাক্রমেই তাঁর মৃতদেহ মমীকৃত অবস্থায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রবেশপথে রয়েছে। আজও প্রবাদ যে, তাঁব প্রেতাত্মা এই কলেজ প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায়।

ভুতেরা চেঁচামেচি করছে, জিনিসপত্র ভাঙছে, ছুঁড়ে দিচ্ছে এমন অনেক কাহিনীও পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত আছে। তবে অধিমনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, এই সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ভূতেদের কাহিনী অনেক সময়ই কিছু শয়তান লোকের হাতসাফাই দ্বারা হয়ে থাকে। তবে এই সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ভুত, যাদের ইংরেজীতে বলা হয় পোলটারগাইস্ট (poltargeist), অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাহিনী সত্যিই রহস্যে ভরা। সম্ভবত মৃতের সূক্ষ্ম সত্তা এখানে আত্মিক শক্তি বা P. K. দ্বারা এই ধরনের কাজ করে থাকে। তবে বহু ক্ষেত্রে হাতের কলাকৌশলে অনেকে মিথ্যে ভুতের উপদ্রব করে ধরা পড়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাতে বৈজ্ঞানিক মহলে এ বিষয়ে বিশ্বাসের চাইতে সন্দেহের অবকাশই বেশি আছে।

তবে এক্ষেত্রে ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের একটি ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের এলাইস (Alais) নামক স্থানে। গাই দ্য টোরনো (Guy de Torno) নামে এক বণিক মারা যাবার পর সে তার স্ত্রীকে উৎপাত করতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কোন দেহ ধরে সে আসত না। শুধু তার কণ্ঠস্বর শোনা যেত। ঘটনাটির কথা অল্প দিনের মধ্যেই সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে দু'জন পোপ ছিলেন, একজন রোমে আর একজন ফ্রান্সের এভিগননে (Avignon).

এভিগননের পোপ ছিলেন তখন দ্বাবিংশতম জন। তিনি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার নির্দেশ দেন। একজন বেনেডিকটাইন যাজক 'জন'কে তিনি এ ব্যাপারে কাজে লাগান। এ ব্যাপারে তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তার নাম 'Annales Ecclesiastici'।

জন সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তিনজন বেনেডিকটাইন যাজক ও শহরের গণ্যমান্য একশ ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি মৃতের বিধবা পত্নীর গৃহে যান। প্রথম তিনি বাড়িটির নানা স্থান তন্ন তন্ন করে খোঁজেন। খোঁজেন এই কারণে যে, কোথাও কোন কারচুপি আছে কিনা তাই দেখতে। তিনি নিঃসন্দেহ হন যে, কোথাও কোন কারচুপি নেই। মৃতের বিধবা স্ত্রীর কক্ষে জন, তিন জন বেনেডিকটাইন পুরোহিত ও একজন বৃদ্ধা মহিলা পাহারা দিতে থাকেন। যে ঘরে এই সূক্ষ্মাত্মার উৎপাত হত সেই ঘরেই তারা পাহারায় বসেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা মাথার উপরে এক ধরনের শব্দ শুনতে পান। যেন কেউ শক্ত ঝাড়ু দিয়ে কিছু ঝাড়ছে। শব্দটি বিধবা মহিলাটির বিছানার দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। একজন যাজক নির্ভয় দিয়ে সেই প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি মহিলাটির স্বামী? এতে জবাব এল—হ্যাঁ, আমিই সেই।

এই খবর পাওয়া মাত্র বাইরের লোকেরা ঘরের ভিতর এসে ভিড় জমালো। জন তাদের শান্ত করে মহিলাটির বিছানার চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে দিলেন? এবং আবার প্রশ্ন করতে লাগলেন। যাজকেরা প্রত্যেকেই সেই সূক্ষ্মাত্মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, সেই প্রেতাত্মা কোন অশুভ প্রেতাত্মা নয়। গাই-দ্য-টোরনোরই আত্মা, পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। তিনি যে পাপ করছিলেন সেই পাপের জন্যই তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে। তবে সেজন্য পাপমুক্তি অনুষ্ঠান হলেই তিনি স্বর্গে যেতে পারেন বলে মনে করেন। তিনি যে পাপ করেছিলেন—তা হল ভিন্ন নারীর সঙ্গে সহবাস। সেই প্রেতাত্মার মনে হল ব্রাদার জন তাঁর পোশাকের নিচে ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের কিছু জিনিস লুকিয়ে রেখেছেন।* এই অনুষ্ঠানকৃত সামগ্রীটি তিনি একটি রুপোর বাক্সে রেখেছেন। পরস্ত্রী সহবাস মধ্যযুগের ইউরোপে ঘোরতর অন্যায় বলে বিবেচিত হত। ফলে ইউকারিস্ট সভা বা ভোজে এরা যোগ দিতে পারত না। কিন্তু ইউকারিস্ট প্রসাদের উপস্থিতি ও জনসমাবেশে প্রেতাত্মা তার পাপের কথা স্বীকার করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এরপর স্বস্তির এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চলে গেল।

প্রেতাত্মা সম্পর্কিত এই অনুসন্ধান বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, এতে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে কোন কারচুপি ঘটতে না

* ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানে যিশুখ্রীষ্টের প্রতীক মাংস (রুটি) ও রক্ত (পানীয়) পান করা হয়।

পারে। দ্বিতীয়ত, এটা বিশ্বাস হয়েছিল এই কারণে যে, প্রেতাত্মা জনের পোশাকের নিচে লুকানো রুপোর বাক্সে ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের প্রসাদ দেখতে পেয়েছিলেন—যা অন্য কেউ জানত না।

জনের এই অনুসন্ধান তৎকালে একটা চমক সৃষ্টি করলেও অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় নি। দীর্ঘশ্বাসের ব্যাপারটিকে তারা তদঞ্চলের শোকার্ত হাওয়ার শব্দ বলে ধরে নিয়েছিল। হয়তো স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ মহিলাটি মৃত্যুর পর প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন করেছিল। তবে তখনকার দিনে প্রেতাত্মার নামে কোন গুণিনকে ডেকে আনা রীতিমত ভয়ের ব্যাপার ছিল। সুতরাং মনে হয় না যে, মহিলাটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। তা যদি হত তবে বহুজনকে সাক্ষী রেখে সে এ কাজে এগুতো না।

এই ধরনের প্রেতাত্মার কাহিনী পৃথিবীর বহু দেশেই রয়েছে। হাতে নাতে ধরে এর প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর। আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেও নি। ফলে সীমিত, কিছু অভিজ্ঞতা—সীমিত ব্যক্তিদের মধ্যেই রয়ে গেছে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক নিজে কখনও ভৌতিক সমস্যার সম্মুখীন হন নি। তবে কিছুদিন আগে ডাঃ অনিমা চক্রবর্তীর (বিবেকানন্দ পার্ক) মেয়ের শাশুড়ী তাঁর এক দিদিকে নিয়ে লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখক দেখতে পান যে, তাঁর নিজস্ব সত্তার বাইরে একটি ভিন্ন সত্তা তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন যে, একে ভুতে ধরেছে। আশ্চর্য! সেই মহিলার কণ্ঠ দিয়ে দশটি ভিন্ন ভিন্ন সুর লেখকের অনুমানকে সমর্থন জানিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমরা প্রেতাত্মা। এর দেহে আশ্রয় করেছি। বর্তমান লেখক প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর পর তাদের সূক্ষ্ম দেহ তিনি দেখেছেন। বহু অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের বর্ণনা দিয়ে বলে দিয়েছেন (তবে সর্বক্ষেত্রেই যে বলা সম্ভব তা নয়, কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে দেখা যায় মাস দুয়েক আগে D/17 ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেট-এর শ্রীযুক্ত মহাদেব ভট্টাচার্য ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য লেখকের সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাদের মৃত কন্যার অদ্ভুত এক নৃত্যময় ভঙ্গীর কথা বলেন। কারণ সূক্ষ্ম দেহে সেই নৃত্যায়িত ভঙ্গীতে মেয়েটিকে তিনি দেখতে পান। মেয়েটি অনুরূপ ভঙ্গীতে নাচতে ভালবাসতো। এমন ভঙ্গীতে তার একটা ফটোও তোলা আছে। পরে মেয়েটির বাবা মা সেই ছবিটি এনে লেখককে দেখান। পরলোকগতা শ্রীরূপা ভট্টাচার্যের সেই নৃত্যায়িত ছবিটি বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া হল)। এভাবে অপরের দেহে প্রেতাত্মা আশ্রয় করেছে এর আগে এমন দৃশ্য তিনি দেখেন নি। শুধু মাত্র উডরফের 'সারপেণ্ট পাওয়ার' গ্রন্থ পড়ে জেনেছেন যে, শব সাধকেরা মৃতের দেহকে সূক্ষ্মশক্তির আধার হিসেবে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ভিন্ন শক্তিকে শবদেহে এনে তাঁদের কার্য সিদ্ধ করেন।

কিন্তু এ-সবই ব্যক্তিগত নয়তো সমষ্টিগত সামান্য কিছু মানসিকতা মাত্র। সাধারণের কাছে এই সূক্ষ্ম সত্তার প্রমাণ দেবার উপায় কি? এ ব্যাপারে

'সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ'' যে তথ্য উত্থাপন করেছেন তা এই ধরনের—ভৌতিক ছায়া দেখা যায় তাদেরই যারা কোন না কোন ভাবে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দুর্ঘটনায় পড়েছে, বা যাদের মৃত্যু হয়েছে। ভৌতিক ছায়া ও যারা এই ভৌতিক ছায়া দেখে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে অধিমনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই ছায়া আসে টেলিপ্যাথির দ্বারা। মৃত্যুকালে বা সংকটজনক রোগের সময় অসুস্থ বা মুমূর্ষু ব্যক্তি যাদের কথা বেশি চিন্তা করে তারাই এই ছায়া দেখে থাকে। টেলিপ্যাথিতে এক ব্যক্তির ছায়া আর এক ব্যক্তির কাছে এসে উপস্থিত হয়। তবে টেলিপ্যাথিতে কি করে ব্যক্তির ছায়া এসে উপস্থিত হয়, আজও তা বিজ্ঞানীমহল আবিষ্কার করতে পারেন নি। যারা এ ধরনের ছায়া দেখে নি, তাদের এ ব্যাপারে কোন রকমেই বিশ্বাস করানোর উপায় নেই। যা সামনে নেই তার স্থূল চিত্র সামনে দেখা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে একথাও তো সত্য যে, স্বপ্নে দ্রষ্টব্য বিষয় সামনে না থাকলেও আমরা দেখে থাকি। তাহলে তাই বা সম্ভব হয় কি করে? শুধু স্বপ্ন কেন জাগ্রত অবস্থাতেও মনের চোখ দিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই যার স্থূল সত্তা আমাদের চোখের সামনে থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আচ্ছন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ হিপনোটাইজ্ড ব্যক্তি সম্মোহন ভঙ্গের পরও শুধু সম্মোহনকারী ছাড়া অপর কাউকে দেখতে পায় না, যদিও বহু মানুষ আশেপাশেই থাকে। সম্মোহনকারী যা তাকে দেখতে বলে সে শুধু তাই দেখে। তবে বহু দূর থেকে সম্মোহনকারী ব্যক্তি টেলিপ্যাথিতে নিজের ছবি পাঠাতে পারে এমন বিশ্বাস হতে চায় না। ঘটনাপ্রবাহ বিচার করে মনে হয়, টেলিপ্যাথিতে ছবি প্রেরণকারী অপেক্ষা ছবি গ্রহণকারীর ভূমিকাই এতে বেশি থাকে। মনে করা হয়, যিনি তার সূক্ষ্ম সত্তা প্রক্ষেপ করেন তিনি সেই সূক্ষ্ম সত্তা বা ছবিধারকের মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ আলোড়িত করেন। ফলে দর্শনীয় ব্যক্তির হুবহু সত্তাই দেখা যায়। স্থূলদেহী যেমন দর্পণে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে, তেমনই ভূত-দর্শনকারীর মানসসৃষ্ট দেহও দর্পণে প্রতিফলিত হতে পারে। তবে এ বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করেছেন এমন এক লেখক G. N. M. Tyrrell তাঁর 'Apparitions' গ্রন্থে বলেছেন যে, ভূতের কোন ছায়া পড়তে পারে না, দর্পণে কোন প্রতিবিম্বও ফুটতে পারে না। অনেক সময় কারো সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ থাকলেও তার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে। তার সম্পর্কে যে ধরনের বিপদের চিন্তা করা যায় সেই ধরনের বিপদের ছবি নিয়েই ভেসে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে এ ধরনের ভৌতিক দর্শন দর্শকের নিজের মানসজাত।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, একদল লোক একত্রে ভূত দেখছে। এ ধরনের ১০০টি ঘটনা 'সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চে''র উদ্যোগে সংগৃহীত হয়েছে। ভূত যদি কারো একার মানসপ্রতিফলনের ব্যাপার হয়, তাহলে একই সঙ্গে সমবেত বহুলোক তা দেখবে কি করে? এ সম্পর্কে টাইরেল অবশ্য মনে করেন যে, একজনের মস্তিষ্কতরঙ্গ সমবেত সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে এই দৃশ্য দেখিয়েছে।

সমবেত ভূত দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা 'সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ'' যা সংগ্রহ করেছে তার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির কেপটাউনের ঘটনা। ঘটনাটি উনবিংশ শতকের। ক্যাপ্টেন টার্ডনস-এর মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পরে ঘটনাটি ঘটে। ক্যাপ্টেন টার্ডনস-এর জামাতা চার্লস লেত (Lett) ঘটনাটি সোসাইটিকে জানিয়েছিলেন। একদিন মিসেস লেত মিস বার্থন নামে আর এক মহিলাকে নিয়ে টার্ডনসের একটি ঘরে ঢোকেন। ঘরে গ্যাস লাইট জ্বলছিল। সেই লাইটে তারা মসৃণ ওয়ারড্রোবের ওপর মৃত ক্যাপ্টেন টার্ডনসের আবক্ষ ছবি দেখতে পান। যেন দেয়ালে কেউ তাঁর ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। তবে ক্যাপ্টেনের মুখ কেমন ম্লান। পরনে ছিল ধূসর বর্ণের সেই জ্যাকেট যে জ্যাকেট পরে তিনি শুতে যেতেন। প্রথমে মিসেস লেত ও মিস বার্থন ভাবেন সত্যি বুঝি কোন ছবি। কিন্তু ওখানে কোন ছবি ছিল না। তাঁরা যখন এই দৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত বোধ করছেন তখন ঘরে ঢোকেন মিস টার্ডনস। সে সেই ছবি দেখে চিৎকার করে ওঠে : কি সৌভাগ্য ! বাবাকে দেখতে পাচ্ছ ? বাড়ির এক ঝি সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দৃশ্যটি দেখার জন্য ডাকা হয়। সেও চিৎকার করে ওঠে—'ওহ্, মিস, মাস্টার!' এইভাবে গতায়ু ক্যাপ্টেনের দাস দাসী, চাকর-বাকর সকলেই এই দৃশ্য দেখে অবাক হন। শেষ পর্যন্ত মিসেস টার্ডনসকে ডাকা হয়। তিনি এসে সেই ছবিটির দিকে এগিয়ে যান। ছবিটিকে ছোঁবার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। তখন ধীরে ধীরে ছবিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁকে দেখা যায় নি। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে প্রাচীনকালে মানুষেরা কেন পূর্ব-পুরুষ পূজার পদ্ধতি প্রচলিত করেছিল তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়। এবং মৃত্যু সম্পর্কে এই বিচিত্র চিন্তাভাবনা বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থাই বা করা হয়েছিল কেন সেটাও সহজবোধ্য।

তবে এসব ঘটনা যখন বিজ্ঞানীদের কাছে আসে তখন তাঁরা যথার্থ সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে একে স্থূলদেহের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চান। উপরোক্ত ঘটনাটির ক্ষেত্রে মুখ্য দ্রষ্টা মিসেস লেত বা মিস বার্থন-এর মধ্যে কেউ একজন অপরের মধ্যে ছবিটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন। যথার্থ সূক্ষ্মসত্তার কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না।

এ নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ চলেছে তাতে ভূত সম্পর্কে সন্দেহবাদীরা মনে করেন, ভূত দর্শন কারো মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে যদি হয় তবে তা মৃত্যুর মুহূর্তে মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রেরিত টেলিপ্যাথি মাত্র—যাকে অধিমনোবিজ্ঞানে একদল বলেছেন Crisis Apparitions (Myers Gurney and Podmore—Phantasms of the Living) বা Post Mortem Apparitions। এই দৃশ্যগুলি মুমূর্ষ ব্যক্তি প্রেরিত চিন্তাতরঙ্গ মাত্র।

Lyall Watson তাঁর 'The Romeo Error' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, মৃত্যুকে আমরা যেমন সহজ বলে ভাবি, তেমন সহজ নয়। মৃত্যু যারা দৈহিক মৃত্যু

(Biological death) বোঝালেও সেই দৈহিক মৃত্যু ঠিক কখন হয় তা বলা দুঃসাধ্য। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেও দেহের নানা অংশ তখনও সক্রিয় থাকে। ডাক্তারি মতে মৃত্যু হলেও ব্রেনের যে অংশ থেকে টেলিপ্যাথি পাঠানো হয় সে অংশ আরও বহুক্ষণ সক্রিয় থেকে টেলিপ্যাথি পাঠাতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব দীর্ঘদিন মৃত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে কাজ করে না। এক্ষেত্রে তার চিত্র স্মৃতিবাহকদের মস্তিষ্কতরঙ্গ নিক্ষিপ্ত ছবি বলে ভাবা যেতে পারে। তবে এমন সব ঘটনাও ঘটে যে ক্ষেত্রে এসব তত্ত্বের কোনটাই কাজে লাগে না।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেট্রইট (Detroit) অটোমোবাইল ফ্যাক্টরির এক কর্মীর অভিজ্ঞতা অদ্ভুত ধরনের। কাজ করতে করতে একবার তার মনে হল, কালো একজন কালিঝুলি মাখানো লোক তাকে যেন ঠেলে দিচ্ছে। সে সহকর্মীদের ঐ ব্যক্তির যে বর্ণনা দেয় তা শুনে তারা লোকটিক চিনতে পারে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ আকৃতির একটি লোক এই কাজ করতে করতে মেশিনে কাটা পড়ে। এক্ষেত্রে সেই সূক্ষ্মদেহীর হাতের স্পর্শ ছিল স্থূল শক্তিশালী ব্যক্তির হাতের স্পর্শের মত। ভূতের হাতে এ ধরনের স্থূলভার অনুভূতিই বা এল কি করে? এর ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকেরা P. K. বা আত্মিক শক্তির দ্বারা দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যাও যে নির্ভুল এমন প্রমাণ তাঁরা দিতে পারবেন না। বর্তমান লেখক তার 'গীতা চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী' গ্রন্থে কবি নির্মল বসাকের মৃত শিশুকন্যা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সে উল্লেখের প্রমাণ আজও তাঁর শ্বশুরালয়ে রয়ে গেছে। এ ধরনের অজস্র ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় আছে। এর কিছুটা নিশ্চয়ই হয়তো মানসিক প্রতিফলন, কিছুটা কল্পনাজনিত, তবে কিছুটা যে সত্য একথাও ঠিক। বেহালা ঠাকুরপুকুরে ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিসট্রেস অলকা দাশগুপ্ত তাঁর স্বামীর প্রেতাত্মা সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা রীতিমত চমকপ্রদ। বহু বিপদের সময় তাঁর স্বামীর ছায়া এসে তাঁকে নানা ধরনের নির্দেশ দিতেন। একবার এক মহা মূল্যবান দলিলের সন্ধান তিনি তাঁর কাছ থেকেই পান। যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীমতী অলকা দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। তাছাড়া পাঠকদের নিজেদের অনেকেরই যে এই ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তাও বলা যায় না। সেক্ষেত্রে হয় তো তাদের আর কোন প্রশ্নই থাকবে না।

তবে বৈজ্ঞানিকেরা যাই ব্যাখ্যা করুন না কেন, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেসভিল (Hydesville), নিউইয়র্ক-এ কক্স পরিবারের একটি ঘটনা আত্মার জগতের ইতিহাসে যথার্থ অর্থে যুগান্তর নিয়ে আসে, যে ঘটনার পর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। তাদের গৃহে অদ্ভুত একটা শব্দ হত। রাতের পর রাত এই শব্দ হত। তাদের নিজেদের ঘরে যদি কোন শব্দ হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেত। তাদের সাত বছরের ছোট মেয়ে কেটি (Kate) হাততালি দিয়ে বলত, 'আমি

যেমন হাততালি দিচ্ছি তেমনি দাও।' সে যতটা হাততালি দিত ততটাই হাততালি শোনা যেত। দশ বছরের বোন মার্গারেট যখন গুণে গুণে হাততালি দিয়ে তাকে অনুরূপ করতে বলত, তেমনই শব্দ হত।

পরিবারের লোকেরা যদি এই অদৃশ্য শক্তি বা আত্মাকে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বলত, তবে হাততালি দিয়ে ইঙ্গিতে তার জবাব দিত। অর্থাৎ 'হ্যাঁ' বোঝাতে চাইলে দুটি। এই 'সংকেতশব্দ' দ্বারাই তারা জানতে পারে যে, অদৃশ্য আত্মাটি একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার। তাকে হত্যা করে ঘরের নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে।

খবরটি সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শহরটিতে ছড়িয়ে পড়ে। কক্স প্রতিবেশীদের ডেকে এনে আত্মাটির সঙ্গে তাদের নিজেদের কথাবার্তা শোনাতো। আত্মার বক্তব্য মত কক্স ঘরের মেঝে খুঁড়ে সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকবার খোঁড়াখুঁড়ি করার পর দুই দেওয়ালের নিচে একটি মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর 'বোস্টন জার্নালে' খবরটি বেরয়।

আত্মাটি যে সংকেত করে তার অস্তিত্ব বোঝাতে চাইত, তার অর্থও বোঝা যায়। অর্থাৎ তার হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে তার বিচার হয়। কিন্তু হত্যাকারীকে পাওয়া যায় নি। প্রেতাত্মাটির নাম জানা যায়—চার্লস. বি. রোসমা। এ বাড়িতে বছর চারেক আগে জনৈক ভাড়াটের ঝি হিসেবে কাজ করত এমন এক মহিলা লুক্রেসিয়া পুলভারের কাছ থেকে জানা যায় যে—তখন বাড়ির মালিক ছিল মিঃ ও মিসেস বেল। একদিন সত্যিই তাদের বাড়ি একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা আসে। সে এক রাত এখানে ছিল। সেই রাতে পুলভারকে তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন যখন সে ফিরে আসে তখন সে শুনতে পায় যে, লোকটি চলে গেছে।

এরপর থেকেই বাড়িটিতে ভুতের উপদ্রব শুরু হয়। এর পরে যে ভাড়াটে আসে ভয় পেয়ে সে চলে যায়। তবে কক্স পরিবার এতে ভয় না পেয়ে সেই আত্মাটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ভাব বিনিময় করে আত্মাটির উদ্দেশ্যের কথা জানতে চায়। সেই আত্মাটির সঙ্গে তারা প্রথম যোগাযোগ করে—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। সেই থেকে আত্মা-চর্চা শুরু হয়। তবে এজগৎ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই জনৈক সুইডিশ, সোয়েডেনবোর্গ চর্চা শুরু করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থাতেও বহু বিগত আত্মা দেখতে পেতেন বলে দাবি করতেন। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গ অথবা নরকে কিংবা সংশোধনী ক্ষেত্রে যায়। পার্থিব জীবন অপেক্ষা এই সূক্ষ্ম আত্মার জীবন সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় থাকে। এর ডাইমেনশন তিন নয়, বহু। এ পৃথিবীর সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। সোয়েডেনবোর্গই প্রথম বোঝান যে, মৃত্যুর পরেও আত্মা পার্থিব জীবনের মতই জীবন-যাপন করে এবং তার বিশ্বাস যে, মৃতের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগও করা যেতে পারে।

সোয়েডেনবোর্গের মৃত্যুর ৭৫ বৎসর পরে তিনিই অপর এক ব্যক্তির রহস্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়েছিলেন। এই ব্যক্তির নাম অ্যানড্রু জ্যাকসন ডেভিস।

পেশায় ছিলেন জুতো তৈরিকারক। বয়স ১৮। লোকে তাঁকে বলত পাওকিপ্সি সীয়ার (Poughkeepsie Seer)। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একদিন আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সে তার গৃহ পাওকিপ্সি, নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে যায়। পরদিন ভোরে চল্লিশ মাইল দূরে একটি পাহাড়ে চলে আসে। পরে সে বলত, এখানে সে সোয়েডেনবোর্গের এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রীক চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেনের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সেই সময় তার মন অদ্ভুতভাবে যেন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ডেভিস তেমন কোন লেখাপড়া জানত না, অথচ এরপর চমৎকারভাবে সে মানবদেহের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর লিখতে এবং বলতে আরম্ভ করে। আচ্ছন্ন অবস্থায় সে এ-সব বলে যেত। তার সেই উক্তি থেকে ১৮৪৫ খ্রীঃ 'The Principle of Nature, Her Divine Revelations and a Voice to Mankind' গ্রন্থ বেরয়। এই গ্রন্থ বেরুতে পনের মাস সময় লেগেছিল। এতে ডেভিস যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা এই ঃ—'একথা সত্য যে, আত্মা জৈবিক দেহসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। তবে জীবদেহধারী ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন নাও হতে পারে। এই সত্য অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে। জগৎ আনন্দে এই নতুন যুগকে স্বাগত জানাবে। মানুষের অন্তর্জগৎ তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সূক্ষ্মাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তিনি যে নোট দিয়েছিলেন তাতে এই কথা লেখা ছিল। 'আজ সকালবেলার আলোতে আমার মুখের উপর দিয়ে যেন গরম হাওয়া বয়ে গেল। আমি মোলায়েম অথচ দৃঢ় কণ্ঠ শুনতে পেলাম—'দেখ, জীবন্ত ঘটনার জন্ম হচ্ছে।' আমি এ কথার অর্থ কি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কক্স পরিবার সেইদিনই আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে। এই ঘটনাই আত্মচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কক্স পরিবারই আধুনিক প্ল্যানচেট বিদ্যার উদ্ভাবন করে। প্ল্যানচেটে সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম বসা হয়—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর। এ ব্যাপারে প্রথম দিকে বিশ্বাসের অভাব ছিল না। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের এ প্রচেষ্টা এগিয়েই চলেছে। আজও বহু চাঞ্চল্যপূর্ণ তথ্য প্ল্যানচেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে এর উপর যে সম্পূর্ণ আস্থা এসেছে তা নয়। না আসার কারণ, যিনি সরাসরি এ ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন নি তিনি এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিশ্বাস করতে চান না। মিডিয়ামের মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতি বহুভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার পর্যায়ে এলেও তা সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নয় বলে সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে অনেক সময় ক্যামেরার চোখেও বহু সূক্ষ্মাত্মার ছবি ধরা পড়েছে। কিন্তু সকলেই সে-সব ছবিতে বিশ্বাস করতে চায় না। এইসব সূক্ষ্মাত্মাদের ছবির মধ্যে প্রাক্তন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রয়াত লিংকনের ছবিও আছে। এছাড়া আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে অসংখ্য অগোণ মানুষের ছবি তো রয়েছেই। কিন্তু এ ধরনের ছবি সবার ক্যামেরায় আসে না বলে ছবিগুলোর পেছনে কোন ধরনের কারচুপি রয়েছে বলে অধিকাংশেরই ধারণা।

মৃত্যুর পর কিছু একটা থাকে, এ কথা সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে। শুধু ঊনবিংশ শতকীয় বিজ্ঞানের উদ্ভবের পরই পাশ্চাত্য জগতে চিন্তা এসেছে যে. মৃত্যুর পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এবং এরই প্রতিবাদ স্বরূপ গড়ে উঠেছে আত্মা-চর্চা কেন্দ্র।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব দেশেই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাস ছিল বলেই রাজরাজড়াদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁর দাসদাসী, চাকরবাকর, স্ত্রী প্রভৃতিকে হত্যা করে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত। বিশ্বাস ছিল এই যে, মৃত্যু যখন নেই, তখন সূক্ষ্মদেহে তারা মৃতের সঙ্গেই থাকবে। তবে একটি ধারণা তাদের সত্য হলেও অর্থাৎ মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না, সূক্ষ্ম সত্তা থাকে, আর একটি ক্ষেত্রের কথা তারা চিন্তা করতে পারে নি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তার ওজন অনুযায়ী তা উপরে বা নিচে থাকে। ফলে রাজার সঙ্গে কাউকে হত্যা করে পাঠালেই যে সে তাঁর সঙ্গে থাকবে এমন নাও হতে পারে। এটা কেন হয়, অর্থাৎ আত্মার নানা স্তরে অবস্থান সম্পর্কে জানতে বর্তমান লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থ পড়লে পাঠক স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। তবে এ ধারণা আদিকালে বা প্রাচীনকালে সকলের মধ্যে ছিল না বলেই তারা এমন কাজ করত। সূক্ষ্ম আত্মার এই সহাবস্থানের কথা চিন্তা করেই বোধ হয় ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা এসেছিল। সতীদাহের প্রথম উল্লেখ পাই মহাভারতে, মাদ্রীর সহমরণে।

শুধু আত্মার এই অস্তিত্বই নয় আত্মার জন্মান্তরেও বর্তমানে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, কিছু একটা আছে। কারণ অধিমনোবিজ্ঞানের চর্চায় জানা গেছে যে, বহু লোক পূর্বজন্মের স্মৃতি নিখুঁতভাবে স্মরণ করতে পারে। পূর্বে এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। এটা বিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে, যখন বিশেষ ভাষাভাষি কোন জাতিস্মর তার সম্মোহন ভাবের সময় তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্ন ভাষায় সে কথা বলতে আরম্ভ করে। অধিমনোবিজ্ঞানে এ ধরনের বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করা আছে। আমেরিকান গৃহবধূ মিসেস ডোলোরেস (Mrs. Dolores) তো এক্ষেত্রে বিস্ময়কর উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি সাধারণ আমেরিকান মহিলা। চার সন্তানের জননী। কিন্তু যখন সম্মোহন ভাবের মধ্যে পড়তেন তখন তাঁর বর্তমান সত্তা বিস্মৃত হয়ে যেন জার্মানীতে চলে যেতেন। এবং তাঁর প্রাক্তন জার্মান জীবনের কথা বলতে আরম্ভ করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে জার্মান ভাষা তিনি জানেন না, সেই জার্মান ভাষাতে কথা বলতেন।[১] তিব্বতের লামাদের ক্ষেত্রে তো প্রাক্তন কোন লামা বা বুদ্ধের সূক্ষ্মদেহ নবজাতকের মধ্যে থাকার কথা সর্বতিব্বতীয় বিশ্বাস। হিন্দুরাও এতে বিশ্বাস করে।

স্থূলদেহের মৃত্যু হলে ব্যক্তিসত্তা যে-সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করে তাকে বৈজ্ঞানিকেরা Ectoplasm আখ্যা দিয়েছেন। এই Ectoplasm ঘনীভূত হয়ে দেহ ধারণ করে

১ Mysteries of the Afterlife. Frank Smyth and Roy Stemman p. 147 (1979)

লোককে দেখা দিচ্ছে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত ইউরোপ আমেরিকার নানা ক্ষেত্রে স্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সবের পেছনে যে প্রতারণার হাত কাজ করে শেষ পর্যন্ত তা ধরা পড়ে গেছে। যেমন, ভারতবর্ষে মাদাম ব্লাভাৎস্কির occult power সম্পর্কিত কিন্তু কারচুপি ধরা পড়ে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত এদেশ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। তবে সূক্ষ্ম একটা সত্তা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখক স্বয়ং এ ব্যাপারে বহু সূক্ষ্মদেহ দর্শন করে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুদের তৃপ্তি দান করতে পেরেছেন। মজার কথা এই যে, শুধু যে মানুষেরই সূক্ষ্মদেহ আছে, তা নয়। যাতে প্রাণ আছে তারই সূক্ষ্মদেহ আছে। মৃত বলে বাহ্যত যাকে মনে হয়, যেমন, শুকনো কাঠ, গাছের মরা পাতা, তারও চতুর্দিকে জ্যোতি বা বর্ণবলয় আছে। এটা নিশ্চিতই প্রমাণ করে যে, স্থূলসত্তার বাইরেও একটি সত্তা আছে। এই সত্তা আলোময় অথচ স্থূল দৃষ্টিতে গ্রাহ্য নয়। দিব্যদৃষ্টি হলে বর্ণে বা ধোঁয়ার আকৃতিতে তা দেখা যায়। লেখকের বন্ধু মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর কথা আমার 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি তাঁর ভাইজী মারা যাবার পর তার মা স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় লেখককে তাঁর মেয়ে কোন্ অবস্থায় আছে তা জানাবার জন্য প্রশ্ন করেন। সেই মুহূর্তে লেখক চোখ বুজে তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ মস্তিষ্ক স্নায়ুতে জ্যোতিদ্বারা অঙ্কিত ছবিতে দেখেন যে, মেয়েটি গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং বাড়ির পেছন দিকের কোণায় অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। লেখক সেখানে একটি গাছ দেখতে পান। তখন সে গাছের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এক সময় ওখানে সত্যিই গাছটি ছিল। যে ছবি লেখক দেখেছেন তা হয়তো গাছটির সূক্ষ্মসত্তা। এই সূক্ষ্মসত্তা অর্থাৎ ঝরা পাতার একটি কার্লিয়ান ফটোগ্রাফি তুলে দিয়েছেন Mysteries of the After life গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠাতে Frank Smyth ও Roy Stemman.

মৃতের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব কতদূর সত্য বর্তমান আগস্ট মাসেই (৮।৮।৮৯) লেখক তার প্রমাণ দিয়েছেন গাছতলা, টালিগঞ্জ নিবাসী রথীন রায়-এর সঙ্গে আসা এক ভদ্রলোককে। তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চলেছেন। বর্তমানে সেটি তারাতলা অঞ্চলে গড়েও উঠেছে। সেটা সফল হবে কিনা জানতে চাইলে লেখক তাঁকে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী দারুণ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রয়েছেন কেন? ভদ্রলোক জানান যে, মৃত্যুকালে তিনি তৃষ্ণার্ত হয়েই মারা যান। ভদ্রলোকের ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি রকম আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন? লেখক সামান্য মনোনিবেশ করতেই আয়তচক্ষু একটি মহিলাকে দেখতে পান এবং তার উপরে অতি ফর্সা আর এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেন। তাদের যে বর্ণনা লেখক দেন তাতে সবাই চমকিত হয়ে যান। সত্যি ভদ্রমহিলার আয়তচক্ষু ছিল, এবং বৃদ্ধা অপর যে মহিলার কথা তিনি বলেন তিনি হলেন ভদ্রলোকের ঠাকুমা। স্বামী যোগানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন—যিনি 'An Autobiography of a Yogi' নামক গ্রন্থ লিখে বিখ্যাত, পরে যার বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'যোগী কথামৃত' নামে।

একটা কিছু যে আছে এ ব্যাপারে লেখক নিঃসন্দেহ। কিন্তু অপরকে চোখে আঙুল দিয়ে তো তিনি তা দেখাতে পারেন না। তা ছাড়া এটাও তো সত্য যে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে তিনি দেখতেও পান না। যারা লেখকের কাছে অদ্ভুত কিছু পেয়ে চমকে যান, তারা তাঁকে ভাবেন মহাপুরুষ। আবার যাঁরা তা পান না ভাবেন সবই ভ্রান্তি। অলৌকিক বলে কিছু নেই। কিন্তু লেখক এসব অলৌকিকত্ব প্রদর্শন বা আত্মপ্রচারের জন্য করেছেন নি, করেন একটি সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য, যে সত্যের অস্তিত্ব সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। বর্তমান লেখক সূক্ষ্ম যোগক্রিয়ায় মস্তিষ্ককে অতীন্দ্রিয় জগতের চিত্রসমূহ ধারণের উপযোগী করে তুললেও যতক্ষণ না অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে এবং নির্ভুলভাবে সেই যন্ত্র দিয়ে সব ধরা যাচ্ছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তথাপি বর্তমানে বহু ব্যক্তিই সূক্ষ্ম আত্মার ফটো তুলে দেখিয়েছেন বলে দাবি করেন। 'অহুজা বোর্ডে'[১] প্রেতাত্মার সূক্ষ্মসত্তা আনিয়ে ছবিও দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া মিডিয়াম দেহ নিঃসৃত একটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহের চিত্র তো অসংখ্যই রয়েছে। কিন্তু বর্তমান লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অপরের সূক্ষ্মসত্তাতে স্থূলদেহের ন্যায় রূপ ধরাবার জন্য নিজের দেহের একটোপ্লাজম নির্গত করার কোন কারণ নেই। মানুষের স্থূলদেহের উপর রামধনুর রঙের মত অন্তত আরও ছয়টি সূক্ষ্মসত্তা আছে। স্থূলদেহের বাইরে এই সূক্ষ্মসত্তাকে আট ভাগে ভাগ করলেও ভুল হয় না। শেষের সত্তাটি নির্ভেজাল স্বচ্ছতা মাত্র। কামনা-বাসনাই মানুষের সূক্ষ্মসত্তার ওজন (vibration-এর নিশ্চয়ই ওজন আছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। যার কামনা-বাসনা যত বেশী তার সূক্ষ্মসত্তার ওজন তত বেশি। যার কম, তার সূক্ষ্মসত্তার ওজন কম। যার কোন কামনা-বাসনা নেই, তার কোন সূক্ষ্মসত্তাও নেই। মৃত্যুর পর সে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়—ভারতীয় শাস্ত্রে যার নাম দেওয়া হয়েছে মোক্ষ, বৌদ্ধশাস্ত্রে 'নির্বাণ', জৈনশাস্ত্রে 'কৈবল্য'। লেখকের মতে স্থূলদেহের উপর সাতটি সূক্ষ্মদেহ নিম্নরূপ ঃ এই সূক্ষ্মদেহগুলি দেহের সাতটি স্তরের নিজস্ব বর্ণাঞ্চলে থাকে। এই বর্ণাঞ্চল নিম্নরূপ ঃ

মূলাধারে লাল, স্বাধিষ্ঠানে সবুজ, মণিপুরে সাদা, অনাহতে ফিকে নীল, বিশুদ্ধে গাঢ় নীল, আজ্ঞাতে নানা বর্ণ। আনন্দে জ্যোতি ও চিৎ-এ স্বচ্ছ।

বিভিন্ন বর্ণাঞ্চলে সূক্ষ্মদেহরূপ শক্তির আণবিক উপাদান সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্মতর। মূলাধারস্থ দেহের শক্তিকে যাঁরা যোগ বলে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নিতে পেরেছেন তাঁরা এই প্রত্যেকটি অঞ্চলেরই স্বরূপ জানেন। এইসব অঞ্চলে অধিষ্ঠানকারী সূক্ষ্ম-আত্মাদেরও দেখতে পান। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই বর্ণনা তিনি যোগ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা নামক অংশে 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বর্ণনা

১ Mysteries of the Afterlife. Frank Smyth and Roy Stemman (1979) p. 208-9.

করেছেন। দেহশক্তির উদ্বোধনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর যে সূক্ষ্মতা জন্মেছে, এবং তা দ্বারা তিনি যে সকল অলৌকিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা থেকে তাঁর বিশ্বাস যে, বর্তমান গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মৃত্যুচিন্তা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যে কাহিনী তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের কাছে অজ্ঞতার প্রমাণ বলে মনে হলেও অতি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়, কারণ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানের বহু কিছুকে আজ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিয়ে এমন এক জগতের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে অবিশ্বাস্য বিশ্বাস্য প্রমাণিত হচ্ছে। এবং এ লক্ষ্য করে বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও বোধহয় ঊনবিংশ শতকের অস্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর মেটারনিকের মত বলে উঠবেন—'There is no answering for anything'.

লেখক তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছেন তাতে পরলোক দেহের ভাসমান আত্মার এক একটি স্তব মাত্র। নিম্ন তিন স্তরে আত্মা বাসনা-কামনা দ্বারা এতটাই আক্রান্ত হয় এবং দেহ না থাকার জন্য দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে পারে না বলে এতটাই যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তাই নরকতুল্য। লঘু আত্মা চতুর্থ স্তর থেকে প্রশান্তি ভোগ করতে আরম্ভ করে শেষে চৈতন্যসত্তায় আনন্দে থাকে। কামনা-বাসনা না থাকলে মহা প্রশান্তি—উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'শান্তো ইয়ম আত্মা', জীবাত্মা সেই শান্তিতে থাকে। অনেক সময় নিম্ন তিনটি স্তরে মানস প্রক্ষেপণজাত জগৎ সৃষ্টি করেও তারা বাস করে। স্বর্গ ও নরক বলে ভিন্ন কিছু নেই। এজন্য যথার্থ অর্থে কোন সেতু, নদী ইত্যাদি পার হতে হয় না। যা পার হতে হয় লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এই মহাবিশ্বের এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জীবন্ত জীব আছে, উন্নত এবং অবনত সব ধরনের। পৃথিবীর প্রাণী কখনও কখনও সেখানেও জন্মান্তরিত হতে পারে। যোগদৃষ্টিতে লেখক সেইসব গ্রহ ও তাদের জীবজগৎ যেমনভাবে দেখেছেন তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। আরও বিস্তারিতভাবে তা জানতে গেলে পাঠক সে গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। সুতরাং একথা প্রায় স্বীকৃত হতে যাচ্ছে যে, সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকে মানুষ যে স্থূল দেহের বাইরে সূক্ষ্ম একটি অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে আসছে তা মিথ্যে নয়। তার কল্পনা অনুযায়ী না হলেও তা আছে। সুতরাং জৈবদেহের যেমন মৃত্যু আছে, তেমনই পরলোকও আছে, একথা জেনেই মানুষকে অগ্রসর হতে হবে।

যোগ ও পরলোক

মানুষ যে তার চর্মচক্ষু দিয়ে কোন কিছু দর্শন করে তা নয়। দর্শন করে মূলত তার দর্শনেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়—ভিস্যুয়াল নার্ভ নামে পরিচিত। এই ভিস্যুয়াল নার্ভ থাকে মস্তিষ্কস্নায়ুতে। দুটি চোখ শুধু যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এ যেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। যার ম্যাগনিফায়িং ক্ষমতা বেশি তার চোখরূপ যন্ত্র অধিক সূক্ষ্ম জিনিস ধরিয়ে দিতে পারে। মানুষের চোখও ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মত। এর ম্যাগনিফায়িং বিদ্যুৎকেন্দ্র হল মস্তিষ্কের ভিস্যুয়াল নার্ভ। এই নার্ভের শক্তি বৃদ্ধি পায় তার মূলাধারস্থ শক্তি বৃদ্ধি পেলে। মূলাধারস্থ এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে পরিচিত। এর অর্থ কুল (শক্তি) যা কুণ্ডে (গর্ত) থাকে। এই শক্তির স্থান গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত এই স্থানে আঘাত হেনে দেহে শক্তিতরঙ্গ বা এনার্জি তৈরি করে। এই শক্তিতরঙ্গ মস্তিষ্ক-স্নায়ুতে যে ধরনের বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করতে পারে সেই বৈদ্যুতিক শক্তি বা ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে তার বুদ্ধিবৃত্তি কাজ করে এবং সে অনুরূপভাবে দেখতে পায়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই শ্বাস-প্রশ্বাস-ঘর্ষণ-জনিত বিদ্যুৎতরঙ্গ তার পূর্ণ ক্ষমতার মধ্যে এক শতাংশ থেকে দশ শতাংশ পর্যন্ত জাগরিত করতে পারে। যার ক্ষেত্রে এই শক্তির শতাংশ বেশি তাঁর ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা সৃজন-প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি তত বেশী। এঁরাই মনীষী ব্যক্তি, বড় বড় রাষ্ট্রনেতা, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হয়ে থাকেন। বাকিরা চলমান জীব হিসেবে সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করে।

যোগে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ হলে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সূক্ষ্ম হয়। তার শক্তি বা পোটেন্সি বৃদ্ধি পায়। তখন মূলাধারস্থ শক্তিতে সে বেশি জোরে আঘাত হেনে শক্তিকে উর্ধ্বমুখী করে। শক্তি প্রথম দিকে বায়ুর সাহায্যে পেটের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বদিকে ওঠে। তখন দেহ দুই দিকে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে। যে শক্তি অন্ত্র দিয়ে উর্ধ্বে ওঠে, মস্তিষ্ক-স্নায়ুতে তার শক্তিতরঙ্গ সৃষ্টি কিছুটা ব্যাহত হয়। তথাপি মস্তিষ্কের ভিস্যুয়াল নার্ভ তখন আরও সূক্ষ্ম ফ্রিকোয়েন্সির জিনিস দর্শন করতে পারে। পরে যখন শক্তি মূলাধার থেকে মেরুদণ্ড দিয়ে বাধা বা মজ্জা অপসারণ করতে করতে উর্ধ্বদিকে অগ্রসর হয় তখন দেহ রীতিমত ঝাঁকুনি দিয়ে কম্পিত হয়। এরপর মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ প্রণালী মজ্জামুক্ত হলে বায়ু উর্ধ্বে উঠতে আর বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তখন মুহূর্তের মধ্যে মন কোন জিনিসে নিবিষ্ট হলেই বায়ু সূক্ষ্ম হয়ে মূলাধারে আঘাত হানা মাত্রই দ্রুত তা মস্তিষ্কে উঠে যায়। যখন মস্তিষ্কের সর্বোত্তম স্থান 'কূট' অঞ্চলে তা প্রবেশ করে তখন সাধকব্যক্তির সমাধি হয়। সমাধির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থূল জগতের সূক্ষ্ম অংশগুলি দেহশক্তিতরঙ্গের উর্ধ্বমুখী হবার কালে অনুরূপ ফ্রিকোয়েন্সির নানা সূক্ষ্ম জিনিস দর্শন করিয়ে থাকে। এই সময়ই যোগীদের দূর-দর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

বিশ্বসৃষ্টির সময় মূল কেন্দ্র থেকে শূন্যস্থ শক্তি বিস্ফোরিত হয়ে ঊর্ধ্ব থেকে ধাপে ধাপে গোলাকার বিশ্বের প্রান্তভাগের দিকে নেমে এসেছিল। এই নেমে আসার সময় কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে সে যেভাবে নেমে এসেছিল প্রান্তভাগ থেকে উৎসের দিকে চেতনা এগুতে থাকলে পুনরায় সেই সব বিভিন্ন ধাপের অবস্থা সে লক্ষ্য করে। মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত অংশ এমন করে তৈরি যাতে বিশ্বসৃষ্টি ক্রমবিকাশের পথে যে যে ধাপে প্রান্তভাগের দিকে অগ্রসর হয়েছিল সেই সেই ভাবে সেই সেই ধাপ মানুষের দেহের মধ্যেও রয়েছে। মূলত এই ধাপগুলি ৫১টি। কিন্তু এর স্থূল বিভাগ সাতটি। এর উপর চিৎ ও শূন্যতার স্থান। সাতটি ধাপের একটি ধাপ আবার সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত। ফলে ৭×৭ – ৪৯ ধাপ+চিৎ+শূন্যতা মিলে ৫১টি ধাপ। শেষ ধাপ নিষ্ক্রিয় পরম শূন্যতা।

বিশ্বে স্থূল দেহে যা কিছু বিরাজমান, তার একটি সূক্ষ্ম সত্তা তার উপরে থাকে। সেই সূক্ষ্ম সত্তাই স্থূলরূপ ধারণ করে, যেমন মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা শব্দ ও লিপির আকারে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থূলরূপ ধারণ করে, তেমনই।

মানুষের স্থূল দেহের ঊর্ধ্বেও তার কতকগুলি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব আছে। অধুনা বিজ্ঞানে তাকেই বাইওপ্লাজমিক বডি বলা হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিতে এগুলিকে দেখা যায় না। সূক্ষ্ম দৃষ্টি হলে তবেই তাদের দেখা যায়। মানুষের স্থূল দেহের নাশ হলে এই সূক্ষ্ম দেহগুলি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু নাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম দেহগুলির ওজন হল তার কামনা-বাসনার ফ্রিকোয়েন্সি। যার কামনা-বাসনা বেশী তার চিন্তার ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভলেংথ দীর্ঘতর। সে ক্ষেত্রে তার ওজন বেশি। সুতরাং স্থূল দেহের মৃত্যু হলে এই সূক্ষ্ম দেহ ওজন অনুযায়ী সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলের নিচের দিকে থাকে। যাদের ভাব পশুভাবাপন্ন, তাদের সূক্ষ্ম দেহ পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলেই থাকে। দিব্য সাধকেরা এই সব দেহকে সাধনার প্রথম স্তরেই দেখতে পান। এদের আত্মা পার্থিব ভোগ তৃপ্ত না হওয়ার জন্য যন্ত্রণায় ছটফট করে। এবং এই অতৃপ্তির জন্য অনেক সময় বিকট আকৃতি ধারণ করে। এদের সূক্ষ্মদেহ থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বেরয়। ধ্যানকালে শিক্ষানুরাগী বা শিক্ষানবীশ যোগীরা এদের দেহে আঁশটে ধরনের দুর্গন্ধ পান। যদি কোন মহাত্মাব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মা সেই সময় কাছে আসেন তাহলে শিক্ষানবীশ যোগী সুগন্ধ লাভ করেন। অতি ভারি এই সূক্ষ্মাত্মা প্রেতাত্মা নামে পরিচিত। অনেক সময়ই এদের ছায়ারূপে দেখা যায়। এই জন্যই প্রাচীনকালের লোকেরা মনে করত যে ছায়া হল স্থূল দেহের দ্বিতীয় সত্তা। স্থূল দেহের মৃত্যু হলে এই ছায়ার মধ্যে তার আত্মা ঘুরে বেড়ায়। এই জন্য অনেক প্রাচীন আদিবাসী রাত্রিবেলা মৃতদেহের সৎকার করত অন্ধকারের মধ্যে, যাতে দেহের কোন ছায়া তখন না থাকে। এদের বিশ্বাস ছিল, এতে প্রেতাত্মা ছায়াদেহে ভর করে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

জীবের কামনা বাসনা কম হলে তার সূক্ষ্ম দেহ যা একটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত তা

প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উঠতে পারে। এই স্তর ভারতীয় যোগের চক্র অনুসারে স্বাধিষ্ঠান-স্তর অর্থাৎ যে অঞ্চলে জলের সূক্ষ্ম সত্তা রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মা এই স্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি তারা হেঁটে বেড়ালেও একে অপরকে দেখতে পারে না। লেখক ধ্যানকালে এই স্তরে বহু আত্মাকে এমনই ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। দেহের তৃতীয় স্তরে (মণিপুর চক্রে) শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনীকে ওঠানো গেলে বিশ্বজগতের তৃতীয় স্তরে জীবের আরো হাল্কা আত্মাকে দেখা যায়। এরা অনেক বেশি সক্রিয়। ততটা বিভ্রান্ত নয়। চেতনা কাজ করে। কিন্তু বাসনা-কামনার তাড়নাহেতু ছটফট করে বেড়ায়। ভারতীয় মতে এই তিনটি স্তরই নরকস্তর। যমরূপ কেউ যে এদের তাড়না করে বা শাস্তি দেয় তা নয়। স্থূলদেহ না থাকাতে স্থূল দেহের ভোগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্য এরা ছটফট করে। কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যে এরা ভোগ করতে পারে না, তা নয়। সেই ভোগ হল স্থূল দেহে মানস ভোগের মত। অর্থাৎ মনে মনে যৌন সাধ বা অন্যান্য সাধ পূর্ণ করার মত। যেখানে স্থূলভোগের পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

যে সব জীবের কামনা-বাসনা আরও কম, তারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেলুনের মত অতি দ্রুত চতুর্থ স্তরে উঠে যায়। এই স্তরের বর্ণ আকাশী-নীল। যোগীরা যখন মূলাধারস্থ শক্তিকে অনাহত চক্রে আনতে পারেন তার শক্তি মস্তিষ্কের ভিসুয়াল নার্ভে এমন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে যার ফলে এই চতুর্থ স্তর তারা দেখতে পান। এই চতুর্থ স্তরের ভাসমান আত্মাদেরও তাঁদের চোখে পড়ে। এই অঞ্চলে আত্মা আত্মস্থ অবস্থায় অদ্ভুত এক ধরনের শান্তি অনুভব করে, যে শান্তি বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগলে যেরকম হয় সেই প্রকার। তবে চতুর্থ স্তরে আত্মা বেশি দিন বিরাজ করতে পারে না। তাদের স্বল্প কামনা-বাসনার অন্তস্তলে ভারি কামনা-বাসনা বাস করে। স্থূল দেহের মানুষ যেমন তার অবচেতন মানসিকতাকে জানে না, অথচ তারই তাড়নাতে অনেক অদ্ভুত ব্যবহার করে থাকে, তেমনই একদিন এইসব আত্মা অনুভব করতে পারে, যে তাদের সুপ্ত ভারি বাসনা আত্মার সূক্ষ্মস্তরের মধ্যে না থেকে মেঘের বুকে জমে থাকা বৃষ্টিকণার মত নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। লেখক নিজে ধ্যান কালে এমন অনেক জীবাত্মাকে অকস্মাৎ নিচে পড়তে দেখেছেন। অপর পক্ষে অনেক কর্ম আছে যা ব্যাহত ভারি পর্যায়ের কিন্তু অবচেতন অবস্থাতে সূক্ষ্ম পর্যায়ের। অর্থাৎ এদের কামনা-বাসনার ভার এমন নয় যে, ক্রমশ ভারি হয়ে নিচে নামবে। বরং সামান্য ভারাক্রান্ত কামনা-বাসনা যা তার সূক্ষ্ম হাল্কা কামনা-বাসনার উপর আবরণ হিসাবে কাজ করেছিল তা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূক্ষ্মতর আত্মা উর্ধ্বতর স্তরে উঠে যায়। যেন ফুটবলের ভেতর ব্লাডারে আটকে থাকা হাওয়ার মত, যা ব্লাডার ফেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে উপরে উঠে যায়। এমন বহু আত্মাকে যোগকালে লেখকের নজরে পড়েছে। অনাহত স্তর থেকে শক্তি (কুলকুণ্ডলিনী) আরও উর্ধ্বগামী হলে বিশুদ্ধ ও অনাহত চক্রের মাঝখানে যে স্তর আছে—সেই অঞ্চলে অর্ধ সফল বহু সাধকের

সূক্ষ্মাত্মা দর্শন করা যায়। এঁরা ঘূর্ণায়মান বিশ্বস্রোতের সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান অবস্থাতে দৃষ্ট হন।

শক্তি বিশুদ্ধ চক্রে উঠলে সাধকের মস্তিষ্কস্নায়ুতে আরও সূক্ষ্মতর জগতের নানা জিনিস চোখে পড়ে। এই সময় বড় বড় গোলক আকারের আলো দেখা যায়। আসলে তাঁরাও সূক্ষ্ম সত্তা। গোল দেখার কারণ বিজ্ঞানের একটি নিয়ম। আত্মা স্থূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ত্রিমাত্রিক অবস্থা থেকে বহুমাত্রিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ত্রিমাত্রিক চৈতন্যে বহুমাত্রিক সত্তাকে তার নিজস্ব রূপে দেখা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী যদি দ্বিমাত্রিক কোন সচেতন জীবকে ত্রিমাত্রিক কোন জীব স্পর্শ করে তাহলে দ্বিমাত্রিক জীব ত্রিমাত্রিক জীবের যথার্থ রূপ দেখতে পাবে না। বরং তাকে গোলাকার বস্তু হিসেবে দেখবে। তেমনই সাধকের চৈতন্য বিশুদ্ধ পর্যায় পর্যন্ত উঠলেও অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব চেতনা বহুমাত্রা লাভ করলেও ততোধিক মাত্রার জীবকে তিনিও গোলাকার আলোকপিণ্ডরূপে দেখতে পাবেন। বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান ছাব্বিশটি মাত্রার কথা বলছে। তার মধ্যে দশটি মাত্রার কথা উল্লেখ করতে পেরেছে যেমন, length, breadth, depth, space-time, gravity, electro magnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force, consciousness and void. এই আকাশে বহু সূক্ষ্ম মূর্তি দেখা যায় যারা পৃথিবীর স্থূল দেহের কোন জীবাত্মা নয়। এই অঞ্চলেরই সূক্ষ্মাত্মা—যাঁদের আমরা দেবদেবী বলি। বস্তুত স্থূল জগতের প্রান্ত ভাগ থেকে ধ্যাননেত্রে দেশের (space) বহু স্থানে এঁদের নানা ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

কুলকুণ্ডলিনী আরও এগিয়ে গেলে বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞাচক্রের মাঝামাঝি এলে এখানে সিদ্ধ সাধকদের ধ্যানরত মূর্তি দেখা যায়। এরও ঊর্ধ্বে আরও সূক্ষ্ম পুণ্যাত্মারা জগতের ঘূর্ণায়মান স্রোতে ঘূর্ণিত হচ্ছেন এমন চোখে পড়ে। এঁরা সবাই আত্মস্থ অবস্থায় থাকেন। পুরাণ কাহিনীর বহু ঋষি থেকে ঐতিহাসিক কালের বহু যোগী সাধকদের এই অঞ্চলে দেখা যায়। এঁরা স্বেচ্ছাচারী, অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নিচে নামতে পারেন, নয়তো অনুরূপ অবস্থাতেই শান্ত তন্ময় ভাবের মধ্যে থাকতে পারেন। তবে বর্তমানে জগৎ হিতায় চ এঁদের প্রায় সবাই নিচের স্তরে নেমে এসে মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করছেন। আবার অনেককে আলোকবৃত্তের মধ্যে ছায়ামূর্তিতে দেখা যায়, যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে।

এরও ঊর্ধ্বস্তরে সপ্তলোকের জ্যোতি। এখানে আরো উচ্চকোটির আত্মার সাক্ষাৎ মেলে যেমন লেখক স্বয়ং বিন্দুর প্রান্তে যিশুখ্রীষ্ট (উদ্ধারকারী) এবং বিন্দুর মধ্যে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়েছিলেন। যুগসন্ধিক্ষণে অবতার হিসেবে এঁরাই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পরলোকের এগুলিই হল বিভিন্ন স্তর। তথাকথিত পুরাণ বর্ণিত কোন যমলোক বা স্বর্গলোক নয়।

কোন সাধক জ্যোতির্মণ্ডলে অর্থাৎ সৃষ্টির তৃতীয় পর্যায়ে বিন্দুতে স্থিত হতে

পারলে তার মধ্যে এক ধরনের দৈবশক্তি জন্মায়। তখন জাগ্রত অবস্থাতেও চোখ বুজে তিনি যদি কোন সূক্ষ্মাত্মার চিন্তা করেন তবে আলো বা কিছুটা ধূম্রাকৃতি দেহে অনেক সময় ছায়াদেহে বহু আত্মা অকস্মাৎ তাঁদের চোখের উপর নেমে আসে। এমন অভিজ্ঞতা লেখকের নিজের হয়েছিল অধ্যাপিকা মণিকা দাসের (বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাতঃবিভাগ) স্বামীর ক্ষেত্রে। তাঁর মৃত পিতার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের রোগের কথা এবং হার্টের রোগের কথা বলতে পেরেছিলেন। মাসখানেক আগে পাইকপাড়ার D1/17, Indralok Housing Estate-এর মহাদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী মণিকা ভট্টাচার্য লেখকের সঙ্গে দেখা করতে এলে হঠাৎ লেখকের চোখে পড়ে যে, তাদের সন্তান নেই। একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল—সে মারা গেছে। সে গান বাজনা ভালবাসতো ও নাচতে পছন্দ করতো। হাল্কা ধরনের মিনি ফ্রক পরতো। লেখক তাদের সে কথা বলাতে তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান। সত্যি তাঁদের একমাত্র কন্যা মারা গেছে। বিশেষ এক ধরনের নৃত্যের ভঙ্গীতে লেখক তাঁকে দেখতে পেয়ে ওদের সে কথা বলেন। পরে তাঁরা ঠিক সেই ধরনের নৃত্যরতা মেয়ের ছবিটি এনে লেখককে দেখান। ছবিটি বর্তমান সংস্করণে প্রকাশ করা হল।

বিজ্ঞান যেমন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পেরেছে যে, স্থূলদেহের বাইরেও কিছু আছে তেমনই পুরাকালে সরলমতি বহু মানুষই সামান্য মনঃসংযোগের ফলে তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই সব সূক্ষ্ম দেহ দর্শন করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও কিছু থাকে, এবং কখনও তা কল্যাণময় হয় কখনও ভয়ংকর। কিন্তু স্থূলদেহের মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না। সেই জন্য তারা মৃত্যু নিয়ে নানা-ভাবে চিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করেছিল। সে সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনা এরপরই দেওয়া হল। দেওয়া হল এই কারণে যে, কম বেশি সকল মানুষের মধ্যেই প্রায় একই ধরনের চিন্তা ছিল, এবং ক্ষীণভাবে সেই বিশ্বাসের ধারা আজো আধুনিককালের মানুষ পর্যন্ত বয়ে চলেছে। এবং একথাও বলা যায় যে, তাদের চিন্তা অনেক অংশে ভ্রান্ত হলেও মিথ্যা যে ছিল তা নয়। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের সেই পারলৌকিক চিন্তা এবং সে জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা সত্যিই বর্তমান মানুষের কাছে একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যুভীতির কারণ কি ?

মানুষের কাছে মৃত্যু এক নির্মম ভয়াবহ ঘটনা। কেন ? মৃত্যু তার কাছে এত ভয়াবহ কেন ? এর প্রধান উত্তর বোধ হয় এই নয় যে, মানুষ তার স্থূলদেহ নিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে থাকতে পারছে না, ভোগ করতে পারছে না অথবা এত কাল যাদের মধ্যে সে থেকেছে তাদের মধ্যে আর সে থাকতে পারছে না। আত্মীয়-স্বজন চিরদিনের মত তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিচ্ছেদের এই বেদনা, বিরহ, সে তো জীবিত থাকলেও হয়। কেউ যদি দূর দেশে যায়, প্রবাসী হয়, বিবাহ দ্বারা গোত্রান্তরিত হয়ে পরগৃহবাসিনী হয়—তাহলেও তো অদর্শনজনিত বেদনা থাকেই ? সুতরাং সঙ্গসুখ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই যে মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে ভয়, চিন্তা, বেদনা, দুঃখ, তা নয়। দুঃখ এবং ভীতির কারণ ভিন্ন।

মৃত্যু এমনই একটি ঘটনা, যেখানে দেখা যাচ্ছে, যে-মানুষ একদিন চলে ফিরে বেড়াতো, কথা বলত, সে আর চলতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, খেতে পারছে না, উঠতে পারছে না, বসতে পারছে না। শুধু তাই নয়—দেহটা ক্রমশ পচে, ফুলে, গলে মাংসস্তর খসে গিয়ে কংকালে পরিণত হচ্ছে। একদিন কংকালটিও ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

তাহলে দেহটাই সব কিছু নয়। দেহের মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্যই এমন হচ্ছে। দেহের মধ্যে সে জিনিসটি থাকলে দেহ চলে, বলে, কাজ করে। সে জিনিসটি না থাকলেই দেহ জড়বৎ হয়। তাহলে সেই জিনিসটি কি যার জন্য দেহ জীবন্ত প্রতীয়মান হয় ? রক্ত ? হৃৎপিণ্ড ? শ্বাস-প্রশ্বাস ? এমন অনেক প্রাণও তো আছে যার রক্ত প্রায় নেই অথচ গতি আছে ? এমন অনেক প্রাণীও তো আছে যার বায়ুর সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রয়োজন হয় না। বায়ুমণ্ডলে তাদের ওঠালেই তারা মারা যায় ?—যেমন মাছ। হৃৎপিণ্ড ছাড়া প্রাণও তো আছে - যেমন গাছ। তাহলে কী একটা জিনিস, যার অভাব হলে মানুষ, পশু, গাছ-গাছালি সবই মরে যায় ? তা কি তাহলে কোন সূক্ষ্ম সত্তা ? সেই সূক্ষ্ম সত্তা তাহলে দেখতে কি রকম ? সে কি এই দেহেরই মতন ? সে কি কোন ক্ষুদ্র দেহ ? জীবদেহের চালক হিসেবে দেহের মধ্যে সে থাকে ? দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেই দেহ জড়বৎ হয় ? মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এরই নামকরণ করেছে আত্মা—জীবাত্মা।

যদি জীবাত্মা থেকে থাকে, দেহ ছেড়ে সে তবে কোথায় যায় ? উপরে অথবা নিচে ? সেই জীবাত্মার আবাসস্থলই বা কি রকম ? এই দেহ থাকতে তার যেমন নানা রকম ভোগ ছিল, খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন হত, মৃত্যুর পরও কি তেমন প্রয়োজন হয় ?

প্রাচীনতম মানব থেকে আধুনিকতম মানুষ পর্যন্ত মৃত্যু, জীবাত্মা ও পরলোক

সম্পর্কে তাদের কৌতূহল মূলত প্রায় অনুত্তরই থেকে গেছে। নানা জাতি, উপজাতি নানা ভাবে এই জীবাত্মা ও পরলোক সম্পর্কে চিন্তা করেছে। কিন্তু সেই চিন্তা কতদূর খাঁটি তার উত্তর কোন দর্শন বা বিজ্ঞান আজও দিতে পারেনি। ঐতিহ্যের ধারা থেকে কতকগুলি বিশ্বাস নিয়ে মানুষ এযাবৎকাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ আবার এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথাও ঘামান নি। তাদের মতে জগৎ একটা স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে, আবার স্বাভাবিক নিয়মেই তার ধ্বংস হয়। জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। পঞ্চভূত নিয়ে দেহ গঠিত। দেহযন্ত্র বিকল হলেই তা থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়, যেমন কাঠ ভিজে গেলে তার মধ্যে আর আগুন থাকে না। কোন কারণে দেহে প্রাণের উত্তাপ ধরে রাখার উপাদানের অভাব হলেই দেহের তাপ সরে যায়। যে উপাদান নিয়ে দেহ তৈরি সেই উপাদানগুলি উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব বোধ করলেই দেহ থেকে উবে যায়। যেমন, দেহের মৃত্তিকার অংশ চলে যায় মাটিতে, অগ্নির অংশ তেজে, বায়ুর অংশ বায়ুতে। আকাশের কোন বস্তুগ্রাহ্য উপাদান নেই বলে অনেকে পঞ্চভূত না মেনে চতুর্ভূত মেনে থাকেন, যেমন ভারতের একদল বস্তুবাদী সন্ন্যাসী যাঁদের মধ্যে বিশেষ রূপে খ্যাত হলেন অজিত কেশকম্বলিন। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সন্ন্যাসী বলতেন, মানুষ চারটি মৌল উপাদান দিয়ে গঠিত। যেমন, মাটি, জল, আগুন ও বায়ু। সে মরে গেলে মাটির অংশ মাটিতে মিশে যায়, জলের অংশ জলে, বায়ুর অংশ বায়ুতে এবং আগুনের অংশ অগ্নিতে। মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনা মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। মৃত্যু হলে কিছু থাকে না। মূর্খ, পণ্ডিত সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর জীবাত্মা বলে কিছু নেই। ভারতীয় লোকায়াত দর্শনের স্থূলতাবাদী দার্শনিকেরাও এমনই মনে করতেন। এদেরই দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিক হলেন চার্বাক। তিনি বলেছিলেন, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। অধুনা বস্তুবাদে বিশ্বাসী সাম্যবাদীরা অনুরূপ বিশ্বাসে আস্থা রাখেন।

কিন্তু বস্তুবাদীরা সংখ্যায় যতই হোক না কেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আজও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে, জীবাত্মা নিয়ে ভাবে, পরলোক সম্পর্কে চিন্তা পোষণ করে। কিন্তু এব্যাপারে সঠিক কোন উত্তর তারা যে জানে তা বলা যায় না। অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানীরা জীবাত্মার স্বরূপ নিয়ে নানা তত্ত্ব, তথ্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাদের সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে নির্ভুলভাবে ফলিত বিজ্ঞানের মত অভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে তা নয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস ও বিশ্বাসীর বিশ্বাস কোনটাকেই তেমনভাবে গ্রহণ করা যায় না। আবার উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশই মৃত্যুর পর জীবাত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। সাধু-সন্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন

যাঁরা দাবি করেন, স্থূল দেহের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম জীবাত্মা তাঁদের চোখে পড়ে। কিন্তু যে চোখে তাঁদের কাছে এ-সব ধরা পড়ে সে চোখ যদি সবাইকে না দেওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেকেই অভ্রান্ত সত্য বলে জীবাত্মা ও পরলোককে স্বীকার করে নেবে কি করে? প্রশ্ন হল সে চোখ কি সত্যই আছে? সে-চোখে কি সত্যই দেখা যায়? লেখকের উত্তর, সে চোখ সত্যই আছে। সে চোখে সত্যই দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের প্রশ্ন আসবে সে চোখ কি রকম? কিভাবে সে-চোখ সৃষ্টি করা যায়, কিভাবেই বা সে চোখ দিয়ে দেখা যায়? পরলোকের সে দৃশ্যই বা কেমন? জীবাত্মা কি উপাদান দিয়েই বা গঠিত? একদল যেমন বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর পরলোকে জীবাত্মা বাস করে, সেখান থেকে আবার পুনর্জন্ম হয়। আর একদল আবার বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা পার্থিব সমাধিতেই থাকে। রোজকেয়ামৎ বা রেজারেকশনের দিনে তাদের পাপপুণ্যের বিচার হয়ে কেউ যায় শাশ্বত স্বর্গে, কেউ বা অনন্ত নরকে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ প্রত্যেকেই জীবাত্মা বা পরলোকে বিশ্বাস করে। তবে খ্রীষ্টান বা মুসলমানরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে না।

এই যে নানা মত নানা বর্ণনা—এদের দ্বন্দ্ব মেটাবার পথই বা কি? বা এদের সত্যতা প্রমাণের উপায়ই বা কি? সত্য তো এক। যদি কোন জিনিস সত্য হয়ে থাকে তাহলে সকলের কাছে তা সমানভাবে গ্রহণীয় হবে। এইসব তর্ক-বিতর্কের সমাধান কোথায়?

সমাধান একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। সে সমাধানের কথা উপক্রমণিকা অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এবার প্রাচীনতম কাল থেকে অদ্যাবধি মৃত্যু, জীবাত্মা ও পরলোক সম্পর্কে নানা মানুষের নানা ধ্যানধারণার কথা ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচনা করা যাক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, যাযাবর ও বর্বরদের মৃত্যু ও পরলোক-চিন্তা

মৃত্যুর পর জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে যে মানুষের নিশ্চিত রূপে ধারণা ছিল—প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস বিচার করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তারপর এর আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে তুলনামূলকভাবে আরো পরবর্তীকালে ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য, মানুষের কথা, উপকথা, পুরাণ ও ইতিহাস দেখেও। প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতম কাল থেকে এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের ধারণা থেকে যা জানা যায় সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করে নেওয়া যাক। মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়, এই বিশ্বাস বোধ হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও কিছু একটা থেকে যায়, যাকে বলা যায় জীবাত্মা, প্রাণ ইত্যাদি। এ বিশ্বাস যে তাদের মধ্যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনতম মানুষের মৃত স্থূলদেহ কবর দেবার রীতি দেখে বা কবরের মধ্যেও অন্য কিছুর উপস্থিতি লক্ষ্য করে। প্রাচীনতম মানবপ্রজাতির মধ্যে পিকিং-মানবদের (পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে) চৌ-কো-তিয়েন (Chou Kou Tien) গুহার কাছে পাওয়া কিছু নর-করোটি দেখেও এ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এগুলো ছিল ভাঙা, আঘাত করে ভাঙলে যেমন দেখা যায় তেমনই। অধুনা সীমিত সংখ্যক যে নরখাদক মানুষ আছে তাদের দেখা যায় মানুষের মাথার ঘিলু খাচ্ছে। সম্ভবত এই বিশ্বাস থেকেই তারা একাজ করে যে, মৃত ব্যক্তির শক্তি ও সাহস তাদের মস্তিষ্ক-ঘিলু বা মাংস ভক্ষণ করলে যারা তা খায় তাদের মধ্যে তা এসে যায়। হয়তো পিকিং-মানবেরা বিশ্বাস করত যে, মানুষের প্রাণশক্তি থাকে তার মস্তিষ্কেই।

নিয়ানডার্টাল মানব ও প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে, বা এযুগের শেষ ভাগে মানুষের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা দেখেও এ ধরনের বিশ্বাস জন্মে যে, মৃত্যুর পরও কিছু একটা থেকে যায় সেকালের মানুষ এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করত। এ জন্য তারা মৃত দেহের সৎকার করত বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে, যেমন বর্তমান উত্তর ইরাকের শনিদার গুহায় (Cave of Shanidar) এমন একটি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে যে কবরে মৃতদেহের নিচে রাখা হয়েছিল ফুল ও উপরে স্তুপের আকারে ছোট ছোট পাথর। তুর্কিস্তানের তেচিক টাচ (Techik Tach)-এ এমন এক শিশুর কবর পাওয়া গেছে যাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে পাঁচজোড়া পার্বত্য ছাগলের শিঙ দিয়ে। শিঙগুলো বসানো হয়েছে বৃত্তের আকারে। ইটালির মন্টে সিসেরোর এক গুহাতে এমন নরমুণ্ড পাওয়া গেছে যা ছোট ছোট পাথরের বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এই মুণ্ড কবর দেবার পদ্ধতি সারা প্রত্নপ্রস্তর যুগ ধরেই ছিল বলে বিশ্বাস।

প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষদিকে কবরে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায়, যেমন ফ্রান্সের

লা শাপেল অ সেন্টস (La chapelle aux saints)-এ। এখানে দেখা যাচ্ছে, মৃতদেহকে ভাঁজ করে কবর দেওয়া হয়েছে। দেহ রঙ করে দেওয়া হয়েছে লাল মাটি দিয়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, এ ধরনের কবর দেবার রীতির উদ্ভব হয়েছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের ভবিষ্যৎ একটা জীবন আছে। যে অবস্থায় মানুষ জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে ছিল সেই অবস্থায় তাকে কবর দেওয়া হলে সে অন্য কোন পৃথিবীমাতার গর্ভে ফিরে যাবে এবং যেমন রক্তরঞ্জিত হয়ে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তেমনই ভাবে ভিন্ন জগতে আবির্ভূত হয়ে স্থায়ী একটি অস্তিত্ব লাভ করবে। এ সময়ই কবরে এমন জিনিস বা চিহ্ন রাখা হত যাকে বলা যেতে পারে পবিত্র। যেমন—গোলাকৃতি কঙ্কাল ও লৌহ উপাদান মিশ্রিত কিছু দ্রব্য। হাঙ্গেরির টাটা (Tata, Hungary) নামক স্থানে এ ধরনের বৃত্তাকার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই মৃতদেহটিকে কবর দেওয়া হয়েছিল ক্রুশচিহ্ন এঁকে তার উপর। এই ক্রুশ চিহ্নের অর্থ প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে চারটি দিক দ্বারা বেষ্টিত বিশ্বজগৎ।

মৃত্যুর পর আত্মার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব শুধু যে মানুষের মধ্যেই ছিল প্রাচীন লোকেরা এমনতর বিশ্বাস দ্বারাই সীমিত ছিলেন না। গতি আছে, প্রাণ আছে, এমন কোন প্রাণীর মধ্যেই তারা এ ধরনের সূক্ষ্ম আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এ জন্য শিকারী মানুষেরা শিকার্য জীবের দেহাবশিষ্টও বিশেষভাবে কবরস্থ করত। সুইজারল্যান্ডের ড্রাচেনলক গুহায় (Drachenloch Cave) দেখা গেছে যে, ভালুকের করোটিকে কবর দেওয়া হয়েছে পাথরের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে এবং পাথরের চাঁই দিয়ে চাপা দিয়ে। এ যুগে এ ধরনের বিশ্বাস সমগ্র মধ্য ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। বাস্তববাদীরা এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেও (অর্থাৎ মৃত্যুর পর শীতার্ত পরিবেশে ভালুকগুলির দেহের চতুর্দিকে এবং উপরে স্বাভাবিকভাবেই এমনতর ঘটেছে বলে বিশ্বাস করলেও) বহুজনেই এর অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। জার্মানীর বীমারে (Weimar) এবং ফ্রান্সের ডরডোনে (Dordogne)-এ ধরনের ভালুকমুণ্ড কবর দেবার রীতি দেখে এঁদের ধারণা যে, সুচিন্তিতভাবেই এদের কবর দেওয়া হত। সম্ভবত এই বিশ্বাসেই কবর দেওয়া হত যে, মৃত ভালুক আবার জীবন ফিরে পাবে, বা তাদের সূক্ষ্ম আত্মা সজীব ভালুক-আত্মাদের মানুষের শিকার্য হবার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করবে।

ইউরোপের জীবজগতের রঙ্গমঞ্চ নিয়ানডার্টাল মানবেরা ত্যাগ করে যাবার পরই আরম্ভ হয়—হস্তশিল্পাভিজ্ঞ (Aurignacian, 30,000 B.c.) পত্রাকৃতি সুন্দর যন্ত্রপাতি তৈরির যুগ (Solutrean, 20,000 B.c.) এবং নকশাকরা পাথরের টুকরো, হাড়, হাতির দাঁত প্রভৃতি মৃৎশিল্পের যুগ (Magdalenian, 10,000 B.c.)। এ যুগে কবর দেবার পদ্ধতি থেকে একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্বে এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের মেনটন[১]-এর

১ রুশ ঐতিহাসিকদের মতে Mentone উত্তর-পশ্চিম ইটালীতে।

কাছে কয়েকটি গুহায় এমন লোহরঞ্জিত অর্থাৎ মরচে জড়ানো কংকাল পাওয়া গেছে যেগুলিকে নানা শক্ত খোলস, নকশা করা বালা এবং স্বচ্ছ পাথর দিয়ে সাজানো হয়েছে। ইতালী এবং রাশিয়াতেও মৃতদেহকে মূল্যবান সম্পদ সহকারে কবরস্থ করার রীতি দেখা যায়। মৃত ব্যক্তিরা ভিন্ন জগতে এসব নিয়ে যাবে এ বিশ্বাস ছিল বলেই তারা এমন করত।

পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও নব্যপ্রস্তর যুগের কবরস্থানগুলি বিশ্লেষণ করলে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে সে যুগের মানুষের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের প্রান্তে থাকত মৃতের সৎকার ক্ষেত্র। অনেক সময় অবশ্য ঘরের মেঝে খুঁড়েও মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা হত। সমাধিতে নানা উপহার, দানসামগ্রী, হাতির দাঁতের চিরুনী, ফলের দানা, শংখ জাতীয় জীবের খোলস, বাসনপত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে কিছু নারীমূর্তি। এই নারীমূর্তিগুলি হয়তো পরিচারিকা হিসেবে অথবা মৃতের অধিকর্ত্রী দেবী হিসেবে সেখানে স্থান পেত।[১]

সভ্যতার দিকে ইতিহাস যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই সমাধিকরণের মধ্যে শ্রেণীভেদ ফুটে ওঠে। তাছাড়া—নতুন চিন্তাধারা দেখা দেয়। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, শস্যচারা পুঁতে দিলে যেমন নতুন শস্য জন্মায় তেমনই কবরস্থ মানুষ নতুন করে গজিয়ে উঠবে। অবশ্য তারা গজিয়ে উঠবে ভিন্ন জগতে। এবার থেকে দেহ কবরস্থ করার জন্য কফিনের ব্যবহার শুরু হয়। কোন কোন স্থানে অবশ্য মৃতদেহকে পুড়িয়েও সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। কি উদ্দেশ্যে এটা করা হত, প্রথম দিকের মানুষের মনে এ ব্যাপারে কি ধরনের চিন্তা ছিল তা বোঝা কষ্টসাধ্য। সম্ভবত ঊর্ধমুখী অগ্নিশিখা এবং ধোঁয়া জীবের সূক্ষ্ম দেহকে আকাশের দিকে (যাকে স্বর্গ বলে কল্পনা করা হত) উড়িয়ে নিয়ে যাবে এই ভাবনাতেই এমন করা হত। এখন অবশ্য এর অনেক যুক্তিগ্রাহ্য সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের কাছ থেকে। সে সম্পর্কে পরে বলা হবে।

নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে কোথাও কোথাও মৃতের দেহ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বৃত্তাকারে চতুর্দিকে সাজিয়ে রাখা হত। মুখগুলোকে কেন্দ্রাভিমুখী করা হত। সম্ভবত প্রত্নপ্রস্তর যুগের কবর দেবার ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবেই কোথাও কোথাও এরকম ব্যবস্থা চলত। কেন যে এরকম করা হত তা ঠিক স্পষ্ট নয়। সম্ভবত বৃত্তটি ছিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক এবং কেন্দ্রই লক্ষ্য যেখানে জীবাত্মা স্থান লাভ করবে। (এধরনের চিন্তা প্রত্নপ্রস্তর যুগের পক্ষে অবশ্যই অতি উচ্চ চিন্তা, কারণ, এ চিন্তার যথার্থ বিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে হিন্দু যোগীদের কাছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এ ধরনের কেন্দ্র সম্পর্কে অধুনা Big Bang Theory, Grand Unified Theory-

১ রুশ ঐতিহাসিকদের মতে এই নারীমূর্তিগুলি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগ্ন, বৃহৎ স্তন ও স্ফীত উদরযুক্ত। —History of Religion, Sergei Tokarev—p. 12.

ও কাজ করছে।) সুতরাং এতটা উন্নত চিন্তা প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে একধরনের সমাধিসৌধ তৈরি করা হত। এটা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ইউরোপে। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম ইউরোপেও এরকম সৌধের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রিট্টানিতে (Brittany) সারি সারি স্তম্ভ বসানো দেখা যায়। স্তম্ভগুলির মাথা মনুষ্য মুখাকৃতি। কি উদ্দেশ্যে যে এ ধরনের স্তম্ভ করা হত আজও তা অজ্ঞাত। বর্তমানে হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও কাঠের দণ্ডের উপর এ ধরনের মুখ আঁকতে দেখা যায়। এগুলো পুঁতেও রাখা হয়। অবশ্য এ ধরনের স্তম্ভসৌধের কতকগুলি যে উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত তা বোঝা যায়। তাতে খোদাই করা কিছু দেবদেবীর মূর্তিও আছে। হয়তো পুরোহিতদের মূর্তিও খোদাই করা আছে। বড় বড় এই পাথরের স্তম্ভগুলির কয়েকটি সম্ভবত জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক কোন কাজে লাগত। হয়তো বা এগুলি দিনপঞ্জি এবং কৃষি-ঋতুর সময়নির্দেশকও ছিল। এই বড় বড় স্তম্ভগুলি পশ্চিমে গ্রেটব্রিটেন থেকে পূর্বে ভারতের অসম প্রদেশ অবধি লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মেলানেশিয়া, এমন কি আমেরিকার নানা স্থানেও এধরনের স্তম্ভ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তীকালে এগুলিই হয়তো মিশর ও আমেরিকায় পিরামিডের আকৃতি নিয়েছিল—যে পিরামিডগুলি কবরস্থান হিসাবে কাজ করত। এর সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যারও কিছু সম্পর্ক ছিল।

মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে প্রাচীনতম এবং প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চিন্তাধারা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। রহস্যময় মৃত্যুর এই কারণ এবং সূক্ষ্ম আত্মার 'বাসস্থান' পরলোক সম্পর্কে বোঝাবার জন্য পরবর্তীকালে উপজাতীয় ও যাযাবর মানুষ থেকে আরম্ভ করে সভ্য মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই নানা রকম গল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে। এই গল্পগুলির অন্তরালে কি সত্য লুকানো আছে আজ আর তা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তবে গল্পগুলি বিশ্বাসযোগ্যও নয়। কিন্তু একথা সত্য যে, মৃত্যুর পর যে স্থূল প্রাণিদেহের একটা সূক্ষ্ম সত্তা থাকে একথা যেমন প্রাচীন মানব প্রজাতি চিন্তা করেছিল তা আজ বিজ্ঞানে পর্যন্ত ধরা পড়ছে। বিজ্ঞান এই সূক্ষ্ম সত্তার নাম দিয়েছে Bio-Plasmic body। এই সূক্ষ্মসত্তার উপাদানকে বলেছে ectoplasm। বেদে এই আত্মাকে বলা হয়েছে ধূম্রাকৃতি। আর্যদের সর্বত্রই প্রায় এই ধরনের বিশ্বাস ছিল।[১]

বর্বরদের মৃত্যুতত্ত্ব:

প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের মৃত্যু-চিন্তা সম্পর্কে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় সত্য, তবে মৃত্যুতত্ত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে কিছু জানা যায় না। কিন্তু এদেরই

১ Religion before History—Ake Hultkrantz vide the World's Religion—Edt. by R. Pieree Beaver and others pp 22-28.

সরাসরি উত্তর পুরুষ হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে যেসব অসভ্য, বর্বর ও উপজাতীয় মানুষ বাস করে—আজ তাদের মৃত্যুতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। এটা আজ স্পষ্ট যে, সভ্য অসভ্য সবার মধ্যেই স্থূলদেহের মৃত্যুর পর কোন একটা অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভেদে নানা শ্রেণীর একটা ধারণা আছেই। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, স্থূলদেহের মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। একান্ত যারা বস্তুবাদী তারাই শুধু স্থূলদেহ নাশের পর কোন সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তবে বিজ্ঞান **Bio-plasmic** দেহ আবিষ্কার করার পর যাঁরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল তারা নতুন করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু অসভ্য বর্বরদের মধ্যে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই এসেছে—না হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সভ্যজাতির মৃত্যু-চিন্তার প্রভাব থেকে এসেছে তা বলা কষ্টকর। যেভাবেই এসে থাকুক না কেন, তাদের মধ্যেও আজ মৃত্যু সম্পর্কিত একটা তাত্ত্বিক চিন্তা আছে।

মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম সত্তা বা জীবাত্মার অবস্থা তাদের সৎকার কার্যের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে—এধারণা বেশ প্রবল। শ্রেণী, সম্পদ ও ক্ষমতার ভিত্তিতেও জীবাত্মার ভিন্ন গতি হতে পারে। মৃতদেহের যথার্থ সৎকার হলে জীবাত্মার এক গতি হতে পারে, পোড়ালে এক, সমাধিস্থ করলে এক, আবার ফেলে রাখলে আর এক, যেমন, আমাদের মধ্যে শ্রেণী, বিত্ত ও ক্ষমতাবিশেষে নানা ধরনের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধে গোদান করা হলে অর্থাৎ বৃষোৎসর্গ করা হলে গরুর লেজ ধরে জীবাত্মা বৈতরণী পার হতে পারে এ ধারণা থেকেই বড়লোকেরা প্রচুর ব্যয় করে শ্রাদ্ধ করে থাকেন।[১] এ ধরনের বিশ্বাস সভ্যতার উন্মেষের ঊষালগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে চলে আসছে। মৃত্যুর পর কর্ম অনুযায়ী যে জীবাত্মার বিচার হয়, অর্থাৎ কেউ স্বর্গে যায়, কেউ নরকে বাস করে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। প্রাচীন টিউটন এবং মেক্সিকানরা বিশ্বাস করত যে, ভীরুতা স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে। শুধু তাই নয় শাস্তিরও কারণ হয়। এ ধরনের চিন্তা অর্থাৎ সাহসিকতা স্বর্গের পথ প্রশস্ত করে—এই ভাবনা বর্বরচিন্তা সন্দেহ নেই। এ জগতে যেমন দেবদেবীরা পাপকার্যের জন্য শাস্তি দেন, তেমনই প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করলে মরণোত্তর পর্যায়ে সূক্ষ্ম সত্তা অর্থাৎ জীবাত্মার ক্ষেত্রেও এই রীতি প্রচলিত। বর্বরদের বিশ্বাস ছিল যে, পুজো-

১ বৈতরণীর যথার্থ অর্থ কিন্তু হিন্দুমতে ভিন্ন। স্থূল জগৎ ও শূন্যতা হল ব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্ত। এর মাঝখানে সূক্ষ্ম স্তরগুলিতে ভারতীয় যোগীরা ধ্যান কালে এক ধরনের ভাসমান অবস্থা বোধ করেন। এই ভাসমান অবস্থার স্তর পার হলে আত্মা শূন্যতায় মোক্ষলাভ করে। এই ভাসমান স্তর নদীতুল্য। কামনা-বাসনা ত্যাগ করলে তবে জীবাত্মা এই নদী তুল্য স্তর পার হতে পারে। কোন তরণী দ্বারা এই স্তর পার হওয়া যায় না বলেই একে বৈ (ব্যতীত) তরণী (নৌকো) নামে বর্ণনা করা হয়েছে। লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আচারে অবহেলা দেখানো হলে, রীতি ভঙ্গ করলে, ছুৎ অচ্ছুৎ না মানলে ভিন্ন জগতে গিয়েও শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি নেই। আবার এগুলি মানলে আত্মা পরলোকে শান্তিতে বাস করে। মেলানেশিয়া ও আফ্রিকাতে এ বিশ্বাস সাধারণত সবার মধ্যেই রয়েছে। কোথাও কোথাও এমন কোন অন্যায় যা উপজাতীয় লোকেরা পছন্দ করে না, তা তাদের দেবদেবীর কাছেও অবাঞ্ছনীয়। এই সমাজে এ ধরনের পাপের জন্য রীতিমত অত্যাচার করে শাস্তি দেওয়া হয়। সুতরাং তারা মনে করে যে, কবরস্থ হবার পরে পরলোকেও তারা অনুরূপ শাস্তি পাবে। একই উপজাতির মধ্যে হত্যা, চুরি, তুকতাক, চরিত্রহীনতা, বেআইনী যৌন সম্পর্ক, মিথ্যাচার, কার্পণ্য প্রভৃতি এই ধরনের অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকায় এমন কিছু উপজাতি আছে যারা গোপনে ভবিষ্যতে জীবাত্মার ভাগ্যে কি ধরনের শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তা শিখিয়ে থাকে। অনেকের ধারণা অসভ্য বর্বরদের এই ধরনের ভাবনা থেকেই উন্নত ধর্ম সমূহের ক্ষেত্রেও (যেমন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি) মৃত্যুর পর জীবাত্মার বিচারের চিন্তা এসেছে।

পরলোকে জীবাত্মার বিচারের চিত্র কি ধরনের? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের চিন্তা করা হয়েছে যে, স্বর্গের দুয়ারে বিশেষ কোন উন্নত জীব বা জন্তু থাকে।[১] সে পাসপোর্ট পরীক্ষার মত জীবাত্মাকে পরীক্ষা করে দেখে থাকে যে, স্বর্গে যাবার তার যথার্থ কোন যোগ্যতা আছে কিনা। স্বর্গে যাবার মাপকাঠি হল ইহলোকে তার সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী পুণ্যকর্ম। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন চিন্তাও আছে যে, কোন দেবতা বা অতীন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা নানা ধরনের পরীক্ষা পার হয়ে জীবাত্মাকে স্বর্গে যাবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। যেমন এক সময় এই ভারতবর্ষেই নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য অভিযুক্তকে অগ্নিপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা ইত্যাদি দিতে হত অর্থাৎ অগ্নির উপর দিয়ে দগ্ধ না হয়ে হেঁটে যাওয়া, বিষ পান করে বেঁচে থাকা প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ধারণাও আছে যে, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গের পথ ধরে এবং পাপাত্মাকে নরকের পথ ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাত্মার জন্য স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে সেতু তৈরী করা আছে। পুণ্যাত্মা সহজেই এই সেতু অতিক্রম করে স্বর্গে যায়, পাপাত্মা এ সেতু অতিক্রম করতে পারে না—ঠিক যেন বহুদিন আগে আমাদের দেশে লছমন ঝুলার দড়ির ঝুলা পার হবার মতন। অনেক দৃঢ়প্রত্যয় পুণ্যার্থী মনের জোরে অবলীলাক্রমে এই ঝুলা পার হয়ে যেত। অপর পক্ষে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা তা পার হতে পারত না। অনেক সময় দেখা যায় সূক্ষ্ম জগতের এই সেতুর মুখে সেতু-দেবতা দাঁড়িয়ে থেকে পাপাত্মাদের বাধা দান করছেন। এমন চিন্তাও দেখা যায় যেখানে নিহত ব্যক্তির আত্মা তার হত্যাকারীকে স্বর্গে যেতে বাধা দিচ্ছে। অন্যান্য অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরও তারা স্বর্গে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এদের হয় তারা কোন

---

১ এই জন্তু সম্ভবত তাদের আদি অভিজ্ঞান—যা থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছে বলে তারা মনে করে।

অবাঞ্ছিত স্থানে ঠেলে দিচ্ছে বা প্রেতাত্মারূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে যেখানে তারা অস্থিরচিত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মৃত্যু, জীবাত্মা ও পরলোক সম্পর্কে আন্দামানের আদি অধিবাসীদের ধারণা এই যে, জীবাত্মা ছাড়াও একধরনের শক্তি আছে। মানুষের স্থূলদেহের মৃত্যু হলে শক্তিসমূহ পৃথিবীর নিচে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অরণ্যে চলে যাবে। এই অরণ্য সমতলভুমির উপর। তবে একদিন এক মহা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। প্রচণ্ড রকমের ভুমিকম্প হবে। পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে তারা মারা যাবে। পৃথিবী উল্টে যাবে। মৃতদের সঙ্গে বর্তমানে জীবিতদের স্থান পরিবর্তন হবে। মৃতদের আত্মার সঙ্গে শক্তিগুলির পুনর্মিলন ঘটবে। নতুন জগতে আবার তারা পুনর্বাসন শুরু করবে। এই নতুন জগতে রোগ ও মৃত্যুর কোন স্থান থাকবে না।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু উপজাতীয় সম্প্রদায় মনে করে যে মহা বিপর্যয়ে একদিন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। মূলত এই বিপর্যয় আসবে অগ্নিকাণ্ডের ফলে। আগে যেমন পৃথিবী মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল এবার তেমনি ধ্বংস হবে অগ্ন্যুৎপাতে। মহাপ্লাবন থেকে বেঁচে থেকে যেমন অল্প কিছু লোক পুনরায় ধরণীকে মানবসমৃদ্ধ করে তুলেছিল—তেমনি মহাঅগ্নিকাণ্ড থেকেও কিছু লোক আত্মগোপন করে রক্ষা পাবে এবং নব মানবপ্রজাতি দিয়ে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলবে।[১] (অধি-দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লোক আদিম সমাজে বাস করত। আজও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন বহু লোক দেখতে পাওয়া যায়—যারা এক ধরনের আত্মশক্তি ও দূরদর্শনের অধিকারী। এই ধরনের লোকের মধ্য থেকেই আউল বাউল শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়েছে। যাদের মধ্য থেকেই এসেছেন লালন ফকির জাতীয় সাধক যিনি আত্মদর্পণে বিশ্বদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সব মানুষের কাছে বহু দূরের ভবিষ্যৎও ফলিত ঘটনার মত হয়ে দেখা দেয়। এই শক্তিবলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন এবং মানুষের কর্মফলের জন্য তার ভবিষ্যৎ পরিণতি কি, অর্জুনকে তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধরনের ক্ষমতা অর্জন করতে হলে বস্তুবাদী বিজ্ঞান অপেক্ষা আত্মশক্তিচর্চা বেশি প্রয়োজন। আদিম বর্বর মানুষের মধ্যে অনেকেই আধুনিক অর্থে শিক্ষিত না হলেও আত্মশক্তির উদ্বোধনের কলাকৌশল জানত। সেইজন্য অবিশ্বাস্যরূপে বর্ণিত হলেও তাদের কতকগুলি দূরদৃষ্টি আছে। সেই শক্তির সন্ধান করার জন্য অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানীরা আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত, তিব্বত প্রভৃতি দেশের আদি মানুষের আত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের এই অগ্ন্যুৎপাতজনিত মহাবিপর্যয়ের দাবি কি যথার্থই সত্য? আণবিক যুদ্ধের অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই কি এইভাবে বিশ্ব ধ্বংস হবে? এবং সামান্য যে কয়জন মানুষ গুহাগহ্বরে লুকিয়ে থেকে বেঁচে যাবে—তারাই আবার নতুন পৃথিবীতে নতুন মানবপ্রজাতির জন্ম দেবে?) চকটও (Chactaw) পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে: 'মৃতেরা তখন নতুন পৃথিবীতে নতুন দেহ লাভ করে বাস

১ Myths of the New World, Philad, 1986, p. 253 f.

করবে।[১] মহাপ্লাবন দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর নতুন বিশ্ব এমনই ভাবে নব মানব-প্রজাতি দ্বারা ভরে যাবে বলে এস্কিমোরাও বিশ্বাস করত। তাদের অভিমতে এই নতুন পৃথিবী হবে পূত পৃথিবী। এস্কিমোদের এই বিশ্বাস খ্রীষ্টানদের মহাপ্লাবনের গল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন। মেক্সিকানদের মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল যাতে তারা মনে করত যে, যুগে যুগে অথবা কল্পে কল্পে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই ধ্বংসের মধ্য থেকে যারা বেঁচেছে তারাই আবার নতুন পৃথিবীতে নানা প্রজাতি সৃষ্টি করেছে। তবে বর্তমানকাল অর্থাৎ কলিযুগ কখন শেষ হবে এ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তারা শুধু জানত যে প্রতিটি কল্পের ৫২ বছর সময়ের মধ্যে এটা ঘটবে। এই মহাবিধ্বংসের পর মৃত আত্মাদের কি হবে এবিষয়ে তাদের কোন ধারণা ছিল না। কলম্বাসের আমেরিকা পৌঁছুবার পূর্বে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কোয়েৎজলকোয়াটল-এর যে গল্প আছে, এ গল্পের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সেখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, নব পৃথিবীতে কোয়েৎজলকোয়াটল ফিরে আসবেন এবং স্বর্ণযুগের সূচনা হবে।[২]

আমেরিকার পেরুভিয়ানরাও পৃথিবী যে একদিন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এ তত্ত্বে বিশ্বাস করত। তবে এ ধ্বংস তাদের মতে পূর্বে হয়েছিল মহাপ্লাবনের ফলে। ভবিষ্যতে হবে চন্দ্রসূর্য ডুবে গিয়ে। সূর্য আকাশ থেকে হারিয়ে যাবে। চন্দ্র গগনচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে পড়ে যাবে। ফলে হয় ঘটবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, নয়তো অভূতপূর্ব খরা। এরই ফলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩] (অনাবৃষ্টি ও খরাতে বর্তমান পৃথিবী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে এধরনের সন্দেহ বহু বৈজ্ঞানিকই বর্তমানে পোষণ করছেন।) পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে, জগৎ ধ্বংসের এই ধরনের অনুমান বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করেই আদিম মানুষের মনে এসেছিল। ইউরোপের প্রাচীন কেল্ট জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও মহাপ্রলয় ও সৃষ্টিধ্বংস সম্পর্কিত ধারণা ছিল। তারা মনে করত যে, জগৎ নিয়ন্ত্রক নানা দেবতাও একদিন ধ্বংস হবে।[৪] এই দিনের নাম রগনরোক (Raganrok)। দেবতাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জীবজগৎও

১ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পরও জীবের সূক্ষ্মাত্মা পার্থিব জীবের মতই জীবন যাপন করে। ভাল যোদ্ধা বা শিকারী হলে পরকালে জীবন সুখের হবে, তবে উপজাতীয় রীতিনীতি না মানলে, ভীরু স্বভাবের হলে বা অদক্ষ শিকারী হলে, মাথার চাঁদি হারালে বা লজ্জাজনক অবস্থায় মারা গেলে পরলোকে তার জীবন দুঃখময় হবে। —**History of Religion, Sergei Tokarev, p. 67.**

২ **Muller, Amer, Urrel, Basel, 1855, p. 511 f.**

৩ **Muller, 396, Brinton 254.**

৪ ভারতীয় তন্ত্রেও এই ধরনের চিন্তা রয়েছে, **Woodroffe**-এর **Serpent Power** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য বা লেখকের 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আবার নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর উদয় হবে। জগৎবৃক্ষে স্থিত পুরুষ ও নারীর মিলনে নব মানবপ্রজাতি জন্ম নেবে।

জগৎ ধ্বংস হবে, মানুষ মরবে, কিন্তু দেহের মৃত্যুতে তার জীবাত্মার মৃত্যু হবে না। নতুন করে তার জন্ম হবে। স্বর্গে সুখ, নরকে দুঃখ পাবে এমনতর বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সব আদিম অধিবাসীদের মনেই ছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা কোন স্থানেই এ বিশ্বাসের অভাব ছিল না—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও নেই। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের এই জীবাত্মার স্বরূপ চমৎকারভাবে একটি প্রাচীন কবিতায় ফুটে উঠেছে। যে কবিতায় বলা হয়েছে :—

যারা মারা গেছে, তারা সত্যিই মরে যায়নি
তারা বেঁচে আছে অরণ্যের ঘন ছায়ায়।
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা বেঁচে আছে দোলায়মান বৃক্ষে
মর্মরিত অরণ্য শাখায়।
তারা রয়েছে বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতির মধ্যে,
রয়েছে স্থির সায়রে,
রয়েছে কুটিরে, জনারণ্যে।
মৃত, মৃত নয়।
যারা মৃত তারা চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে যায়নি।
তারা বেঁচে রয়েছে মায়েদের বুকে,
বেঁচে রয়েছে ক্রন্দনাতুর শিশুর মধ্যে,
বেঁচে আছে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডে।
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা রয়েছে নিভন্ত অগ্নির মধ্যে
তারা রয়েছে ভেজা ঘাসে
রয়েছে পাহাড়ের গোঙানো প্রতিবাদের মধ্যে
রয়েছে অরণ্যে এবং গৃহে।
মৃতেরা মৃত নয়।[১]

মৃত্যুর উৎস : আদিবাসীদের মৃত্যু-চিন্তা

মৃত্যুভীতি সর্বমানবিক। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত (কেবল মাত্র যথার্থ সত্যের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তারা ছাড়া, যেমন ভারতের মহান যোগীবৃন্দ)। মৃত্যুযন্ত্রণা ভয়ে যে তারা শঙ্কিত, তা নয়। মৃত্যুর রহস্য নিয়েই

১ **From Chants D'ombre Suivis de Hosties Noires, ed. Leopold Senghor.**

তারা ভীত। মৃত্যু কি, কেনই বা আসে, মৃত্যুর পর কি হয় সেই অজানার ভয়েই তারা শঙ্কিত। মৃত্যুর কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মানতে চায় না। তারা অমোঘ মৃত্যুর ঘটনা নিয়ত লক্ষ্য করেও মৃত্যুকে এড়াবার চেষ্টা করে। রোগের উৎসকেও তারা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে ভাবতে চায় না। এই জন্যই তারা কেন মৃত্যু হয় তাই নিয়ে নানা ভাবে ভাববার চেষ্টা করেছে।

প্রাচীন মানুষ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে যে তত্ত্ব পেয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত বাইবেলের তিন নম্বর জেনেসিসের গল্প (Gn 3)। এখানে মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে ঃ—মানুষ ঈশ্বরের নির্দেশ উপেক্ষা করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেই মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। বাইবেলের এই বিশ্বাস প্রাচীন মানবজাতিব অধিকাংশের মধ্যেই একদিন প্রচলিত ছিল।

নিউ সাউথ ওয়েলস-এর বহু উপজাতিই বিশ্বাস করে যে, মানুষ শাশ্বত জীবন নিয়েই এসেছিল। তবে তাদের বিশেষ একটি ফাঁপা গাছের কাছে যেতে বারণ করা হয়েছিল। বন্য মৌমাছিরা সেই গাছে বাসা বেঁধেছিল। মহিলারা মধু লোভে আকৃষ্ট হয়। পুরুষ মানুষেরা সাবধান করা সত্ত্বেও এক মহিলা ছোট একটি কুড়োল দিয়ে সেই গাছে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছ থেকে একটি বিরাটকায় বাদুড় বেরিয়ে আসে। আসলে এই বাদুড় ছিল স্বয়ং মৃত্যু। এর পর থেকে সে স্বাধীন-ভাবে উড়ে বেড়াবার সুযোগ লাভ করে। তার পাখা দিয়ে যাকে ছোঁয় তারই মৃত্যু হতে থাকে।[১]

মধ্য আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুর আবির্ভাব সম্পর্কে যে গল্প আছে তা এইরকম ঃ—প্রথম মানব কিণ্টু নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর স্বর্গদেবতা মুগুলুর কন্যা নাম্বিকে বিবাহ করে। নানা উপহার দিয়ে মুগুলু তাদের মর্তে পাঠিয়ে দেয়। উপহারের মধ্যে একটি মুরগিও ছিল। মুগুলু তাদের অতি শীঘ্র মর্তে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে পথে নাম্বির ভাই ওয়ারুম্বে অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে তাদের দেখা না হয়। ওয়ারুম্বে তখন বাড়ির বাইরে ছিল। মুগুলু কিণ্টু ও নাম্বিকে সাবধান করে দেন যে, কোন কিছু ফেলে গেলে তা নেবার জন্য তারা যেন আর ফিরে না আসে। পথিমধ্যে হঠাৎ নাম্বির মনে পড়ে যায় যে, মুরগিকে খাওয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু মুগির খাবার বাজরা আনতে সে ভুলে গিয়েছিল। নাম্বির অনুমতি নিয়ে কিণ্টু খুব তাড়াতাড়ি সেই বাজরা নিয়ে আসবে বলে স্বর্গে ফিরে যায়। কিণ্টু ফিরে গেলে মুগুলু ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। ওয়ারুম্বে তখন ফিরে এসেছে। সে জেদ ধরে কিণ্টুর সঙ্গে যাবে। বাধা দিয়েও কোন ফল হয় না। ফলে কিণ্টু ও নাম্বির সঙ্গে ওয়ারুম্বেও মর্তে আসে। নাম্বি তিনটি সন্তানের জন্ম দেয়। ওয়ারুম্বে একটি সন্তানকে চায়। কিণ্টু তাতে রাজি হয় না। কালক্রমে কিণ্টু ও নাম্বির আরো অনেক

১ K Langloh Parker, The Euahloyi Tribe, London, 1005, p. 98. R. Brough Smyth, The Aborigines of Victoria, London, 1878 1.428.

সন্তান হয়। ওয়ারুম্বে পুনরায় একটি সন্তানের জন্য অনুরোধ জানালে কিণ্টু এবারও রাজি হয় না। ওয়ারুম্বে তখন ভয় দেখায় যে, সে তাহলে সব কটি সন্তানকে নিয়ে যাবে। এর পরই কিণ্টু ও নাম্বির সন্তানেরা মরতে আরম্ভ করে। নানা অনুনয় বিনয় করার পর মুগুলু ওয়ারুম্বেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর আর এক ছেলে কইকিজুকে পৃথিবীতে পাঠায়। কিন্তু ওয়ারুম্বে মাটির নিচে ডুবে যায়। নিঃশব্দে সকলকে অপেক্ষা করতে বলে কইকিজু ওয়ারুম্বেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেও মাটির নিচে চলে যায়। সে জোর করে ওয়ারুম্বেকে তুলে আনে। কিন্তু যে স্থান দিয়ে সে ওয়ারুম্বেকে তুলে আনে সেখানে তখন কিণ্টু ও নাম্বির কয়েকটি সন্তান ছাগল চরাচ্ছিল। ওয়ারুম্বেকে দেখে তারা কেঁদে ওঠে। যে মন্ত্র দ্বারা কইকিজু ওয়ারুম্বেকে তুলে আনছিল সেই মন্ত্রের গুণ তখন নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ারুম্বে আবার মাটির নিচে ফিরে যায়। মুগুলু তখন সেখানেই তাকে থাকতে নির্দেশ দেন। সেই থেকে মানুষ মৃত্যুর কবলিত হয়।[১] মৃত্যুর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে মাটির নিচে সমাধিস্থ করা হত বলেই বোধহয় মৃত্যুদেবতা মাটির নিচে আছে অধিকাংশ মানুষের মনে এই চিন্তা এসেছিল। এই চিন্তা থেকেই মাটির নিচে রসাতল, মৃত্যুলোক ইত্যাদির ধারণা এসেছে।

উগান্ডায় মাসাইদের মধ্যে গল্প আছে যে, একজন দেবতা কোন শিশু মারা গেলে জনৈক মাসাইকে বিশেষ একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে মৃতদেহটি ফেলে দিতে বলে। মন্ত্রটি ছিল এই ঃ 'মানুষ মরেও আবার ফিরে আসে, কিন্তু চাঁদ মরে গেলে দূরে থাকে।' কিন্তু নিজের সন্তান না মরে অপর একজনের সন্তান মারা গেলে সেই মাসাইটি মন্ত্রটি উল্টোভাবে উচ্চারণ করে অর্থাৎ বলে যে, চাঁদ মরে গেলে আবার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষ মরে গেলে দূরে থাকে। ফলে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সেই মাসাইয়ের নিজের সন্তান মারা গেলে সে যখন যথার্থ মন্ত্র উচ্চারণ করে, দেখা যায় যে, মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। এর পরই দেখা যায় চাঁদ মরে গেলে অর্থাৎ ডুবে গেলে আবার সে ফিরে আসে, কিন্তু মানুষ মারা গেলে আর সে ফেরে না।[২]

পূর্বোক্ত গল্পগুলিতে যেমন দেবতার নির্দেশ অমান্য করার ফলে মানুষ মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল, অনেক উপজাতীয় গল্পে সে ধরনের কোন দেবতার নির্দেশ অমান্য করার কথা নেই। তবে দেবতার অভিশাপে মৃত্যু মানুষের দুয়ারে এসেছে এমন গল্প আছে। যেমন, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের পালওয়ান নামক স্থানের বাটকরা মনে করে যে, তাদের দেবতা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতেন। কিন্তু তারা একবার তার সঙ্গে প্রতারণা করে। মৃতদেহের পরিবর্তে একটি হাঙরকে জড়িয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। দেবতা যখন তাদের এই প্রতারণা বুঝতে পারেন তখন অভিশাপ দেন যে, এরপর থেকে চিরকাল তারা মৃত্যুর কবলিত হবে এবং দুঃখ কষ্ট পাবে।[৩]

১ Johnston, Uganda Prot., London, 1902 ii 700.
২ Hollis Masai, Oxford, 1905, p. 271.
৩ Ethnol. Survey, philippine islands. ii, 1905, p. 188.

জাপানীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর আগমন সম্পর্কে কাব্যিক বর্ণনা আছে রাজপুত্র নিনিঘি সম্পর্কে। তিনি পর্বতকন্যার প্রেমে পড়েন, ফুলের মত যিনি বেড়ে উঠেছিলেন। পর্বতরাজ এ বিয়েতে সম্মতি দেন। বিয়ের পর কন্যার সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠাভগ্নীকেও পাঠান। এই ভগিনী ছিলেন পর্বতের মতই লম্বা। তা ছাড়া দেখতেও তিনি ছিলেন ভয়াবহভাবে বিশ্রী। যুবরাজ সে জন্য তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতরাজ অভিশাপ দেন যে, তাঁর বংশধরেরা ফুলের মত ঝরে পড়বে। ফুলের মত তারা দুর্বলও হবে।[১] অর্থাৎ তারা মৃত্যুর কবলিত হবে।

কিন্তু জাপানে মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের গল্পও আছে। গল্প এই ধরনের ঃ—দাঁড়কাক মানুষ তৈরি করেছিল। (সম্ভবত এই দাঁড়কাক ছিল তাদের অভিজ্ঞান—যার থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে তারা চিন্তা করত। প্রাচীন মানবের অধিকাংশই এই ধরনের পশুপাখিরূপ অভিজ্ঞানকে তাদের উৎস বলে মনে করত)। মানুষ তৈরি করার পর ঘোষণা করেছিল যে, তারা কখনও মরবে না। একটি ধূসর বর্ণের ছোট গায়ক পাখির অনুরোধে তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। সে দাবি করে যে, মানুষের সমাধিভূমির স্মারকচিহ্নে কোথাও তাকে বিশ্রাম করার স্থান করে দিতে হবে। তার দাবি রাখতে গিয়েই মানুষের জন্য মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হয়।[২]

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কুইনল্ট ভারতীয়রা মনে করে যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উৎসই ঈগল ও দাঁড়কাক। সৃষ্টি করার সময় ঈগল প্রস্তাব দেয় যে, মানুষ মরে গেলে আবার জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু দাঁড়কাক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ফলে মৃত্যু থেকে যায়। পরে অবশ্য দাঁড়কাককে এ জন্য অনুশোচনা করতে হয়েছিল। কারণ, তার নিজের কন্যা মারা গেলে তাকে আর বাঁচানো যায়নি।

অনেক উপজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, ইতরপ্রাণী বা পশুকুলের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা বা তাদের মন্থরতা কিংবা আলস্যের জন্যই মৃত্যু জগতে আসতে পেরেছিল। এধরনের গল্প কমবেশি পরিবর্তিত আকারে আফ্রিকার নিগ্রো, বান্টু ও হোটেনটটদের মধ্যে পাওয়া যায়। হোটেনটটরা মনে করে যে, চন্দ্র খরগোশকে একটি বার্তা দিয়ে মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল এই রকম ঃ 'আমি যেমন মরে আবার বেঁচে উঠি, তোমরাও তেমনই মরার পর পুনর্জীবন লাভ করবে।' কিন্তু খরগোশটি মানুষকে চন্দ্রর সেই বার্তা ঠিক উল্টো করে শোনায়, 'আমি মরে গেলে যেমন পুনরায় জীবন ফিরে পাই না তেমনই তোমরা মরে গেলেও পুনরুজ্জীবিত হবে না।' এতে ক্ষেপে গিয়ে চাঁদ ঘুষি মেরে খরগোশের ঠোঁট ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ক্ষতি আর শোধরানোর নয়। এই জন্য হোটেনটটরা মনে করে খরগোশ তাদের কাছে অচ্ছুৎ জন্তু।

১ R. H. R. liv (1906) 169.

২ Jesup, Exped. V (1905) 210, 238.

বাণ্টুদের মধ্যে ঠিক অনুরূপ গল্পই আছে ভিন্নভাবে। এখানে বার্তাবহ খরগোশ না হয়ে বৃহৎ আকারের গুঁই সাপ বা বহুরূপী। এর গতি শ্লথ। তার কাছে মানুষের জন্য স্বর্গের কোন দেবতা বা ভগবান অমরত্বের বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই টিকটিকির মাধ্যমে তিনি মৃত্যুর বাণী পাঠান। টিকটিকির গতি বেশি। সে গুঁই সাপকে পিছনে ফেলে মৃত্যুর বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে পেঁছায়। পরে গুঁই সাপ যখন তার বার্তা এনে দেয় তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। ফলে অপ্রতিরোধ্য প্রথম বার্তাটিকে আর প্রত্যাহার করানো যায়নি।[১]

কালাবারে এই বার্তাবহ ছিল একটি কুকুর ও একটি ভেড়া। এক্ষেত্রে কুকুরের দ্রুতিতে মৃত্যুর বাণী মানুষের কাছে এসে পেঁছায়।[২]

আইভরি কোস্টের একদল উপজাতি মনে করে যে, হরিণের অসদিচ্ছার জন্যই মৃত্যু মানুষের কাছে নেমে এসেছিল। একজন লোককে কাবাল্লাতে জাদু ক্ষমতাসম্পন্ন এক বস্তুর কাছে পাঠানো হয়েছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে মন্ত্র শেখার জন্য। সেই জাদু ক্ষমতা-সম্পন্ন বস্তু বা ব্যক্তিটি লোকটির হাতে একটি পাথর দেয় এবং যে পথ দিয়ে মৃত্যু আসে এই পাথর দিয়ে সেই পথ বন্ধ করে দিতে বলে। কিন্তু হরিণটি পাথরটি বয়ে নিয়ে যাবার নাম করে ঈর্ষাকাতর হয়ে এমন এক মন্ত্র গান করে যার ফলে পাথরটিকে আর নাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে মৃত্যুকেও এড়ানো যায় না।[৩]

নিউ পমেরানিয়ার মেলানেশিয়ানদের মধ্যে গল্প প্রচলিত আছে যে, পরমজ্ঞানী কোন দেবতা বিধান করেছিলেন যে, সাপেরা মারা যাবে কিন্তু মানুষ খোলস ছাড়িয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু তার ভাই 'চুরি' সেই বিধান পাল্টে দেন। তার ফলে মানুষ মৃত্যুর কবলিত হয়।[৪]

শর্টল্যান্ড দ্বীপের মেলানেশিয়ানরা মনে করে যে, তাদের মহাপ্রপিতামহী মাঝে মাঝেই খোলস পরিত্যাগ করে অনন্তযৌবনের অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকতেন। ভারতীয় যোগীদের কায়া কল্পযোগে দেহ পরিবর্তন করার অর্থাৎ নবকলেবর ধারণ করার গল্পের সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু একবার তিনি যখন তার খোলস পরিত্যাগ করছিলেন তখন তাঁর এক সন্তান কেঁদে ওঠে। এতে খোলস পরিত্যাগ করার কাজ ব্যাহত হয়। দুর্ভাগ্যবশত খোলস পরিবর্তন করার সময় শিশুটি দেখতে পেয়েছিল বলে তিনি মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েন। এরপর থেকেই মানুষ মৃত্যুর অধীনে চলে আসে।[৫]

১ Bleek, Reynard the Fox, London, 1864. pp 71 74.
২ Journal, African Society, Vol. V (1906) (194).
৩ " " " VI (1907) (77).
৪ ARW. X [1907] 309).
৫ FL. xvi (1905) 115).

কঙ্গোর সীমান্ত অঞ্চলে বালুবাদের মধ্যেও অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে। সেখানে অবশ্য খোলস পরিবর্তন করার কাজ তার এক সতীনের দ্বারা ব্যাহত হয়।[১]

কালিফোর্নিয়ার হুপাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, বৃদ্ধ হলে মানুষ নতুন করে যৌবন ফিরিয়ে আনত। এই যৌবন তারা ফিরিয়ে আনত একটি মিষ্টি ঘরে ঘুমিয়ে। কিন্তু এই সুখকর অবস্থার অবসান ঘটে বিশেষ একটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া থেকে। পুরাকালে কোন এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে পছন্দ করত না। ফলে তারা ব্যক্তিটির দুটি সন্তানকে নিয়ে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়। শিশু দুটি যখন কবর থেকে ফিরে আসে, আবার তারা তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, এরপর থেকে সকলেই অনুরূপভাবে কবরস্থ হবে।[২]

গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল মানবপ্রজাতির প্রথম এক মহিলা। ডেকে এনেছিল এই বলে ঃ—এখন যারা বেঁচে আছে, নতুন প্রজন্মের জন্য তারা মৃত্যুবরণ করুক।[৩]

উপরে যে সব আদিবাসী জাতীয় মানুষের গল্প বলা হল তাতে দেখা যায় যে, মৃত্যু মানুষের দুয়ারে এসেছিল হয় কোন দেবদেবীর অভিশাপের ফলে নয়তো কোন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা। এস্কিমোদেরই ভিন্ন একটি গল্পে দেখা যায় যে, মৃত্যু এসেছিল দুটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া থেকে। এদের মধ্যে একজন চেয়েছিল যে, মানুষ অমর হোক। অপর জন চেয়েছিল—মানুষের মৃত্যু হোক। তাদের এই বাক্য উচ্চারণ ছিল হয়তো মন্ত্রেরই উচ্চারণ। যার মন্ত্রের তেজ বেশি ছিল তারই জয় হয় অর্থাৎ যে মৃত্যু চেয়েছিল তার।

উত্তর আমেরিকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সর্বপ্রথম যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তাকে মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর জগৎ থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে শর্ত ছিল তা ভঙ্গ করা হয়। ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অভিনন্দন জানানো যাবে না এটাই ছিল শর্ত। কিন্তু মৃতের আত্মা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সেই শর্তের কথা ভুলে গিয়ে তড়িঘড়ি তাকে অভিনন্দন জানায়। ফলে আত্মা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে মৃতদের আত্মা মৃত্যুর জগৎ থেকে আর কখনও ফিরে আসতে পারে না।[৫]

এস্কিমোদের অনুরূপ গল্প অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কইটিশ ও উনমৎজেরা-রা বলে বেড়ায় যে, আগে মানুষকে কবরস্থ করা হলে

১ Globus, ixxxvii [1905] 193.
২ Goddard, Hupa Texts, University of California Publication I [1903-4] 75, 366.
৩ Crantz, Greenland, London, 1820, I, 204.
৪ Rink, Tales, Edin, 1875, P. 41.
৫ Cherokee stories [19 RBEW, 1900, pp 252, 436]

তিনদিনের মধ্যে আবার কবর থেকে ফিরে আসত। কইটিশরা মনে করে যে, শাশ্বত মৃত্যু আসে একজন বৃদ্ধ মানুষের জন্য। তিনি মরার পর ফিরে আসাটা পছন্দ করতেন না। মানুষ মারা গেলে আত্মা চিরদিনের জন্যই চলে যাক তিনি এটাই চাইতেন। এই উদ্দেশ্যে সদ্য যাকে কবরস্থ করা হয়েছে এমন এক মৃতদেহকে তিনি লাথি মেরে সমুদ্রে ফেলে দেন।[১] ফলে মৃত্যু চিরন্তন হয়ে দেখা দেয়।

অস্ট্রেলিয়ার ওটজোবালুকদের মধ্যেও অনুরূপ গল্প প্রচলিত। তারা মনে করে যে, মানুষ মারা যাবার পর কবরস্থ হলে চন্দ্র বললেন 'আবার ওঠ' কিন্তু একজন বৃদ্ধ বললেন 'তারা মৃতই থাক'। সেই থেকে চন্দ্র বাদে আর কেউ মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসেনি।[২]

চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করেই বোধহয় আদিম মানুষের মধ্যে এই সব গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশ্বাসের ক্ষীণ ধারাই সম্ভবত খ্রীষ্টানদের রেজারেকসনের চিন্তার মধ্যেও কাজ করেছে। আবার নবকলেবর ধারণের বিশ্বাস অদ্যাবধি ভারতীয়দের মধ্যেও বেঁচে আছে। পুরানো দেহ পরিত্যাগ করে যোগীরা নতুন দেহ ধারণ করেন, এ বিশ্বাস ভারতীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এই নতুন দেহ ধারণকে তারা 'কায়াকল্পযোগ' আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রায় সব সভ্য মানুষই যে অনুরূপ ঘটনা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করেনি, তা বলাই বাহুল্য। ফলে মনে করা যেতে পারে যে, এই অবিশ্বাস্য গল্পগুলোর উদ্ভব প্রাকৃতিক ঘটনা থেকেই এসে থাকবে। শস্যের দানা মাটির নিচে থেকে নবকলেবরে গজিয়ে ওঠে, এই দেখেই বোধহয় কবরস্থ জীবের ফিরে আসার কাহিনী মানুষের মনে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ কবর থেকে আর ফিরে আসে না দেখেই তার অনন্ত মৃত্যুর কারণ হিসেবে নানা ধরনের গল্পকথা তৈরি করেছে। আদিবাসী মানুষের কল্পনাশক্তি—দার্শনিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বোধিত ছিল না বলেই তারা হয়তো পশুপাখি নিয়ে এমনতর গল্প তৈরি করেছে। কোন কোন পশুপাখির মধ্যে তারা বিশেষ কিছু শক্তি লক্ষ্য করেই হয়তো গল্পগুলো পশুপাখিদের লক্ষ্য করেই তৈরি করেছিল। আজও ইতর প্রাণীসমূহের চলাফেরার মধ্যে মানুষ অনেক শুভ অশুভ ইঙ্গিত লাভ করে থাকে। যেমন, যাত্রাকালে টিকটিকির হাঁচি, ডাইনে বা বাঁয়ে সর্প, ঘরের চালের উপর শকুন বসা বা কাকের চিৎকার। ভারতীয়েরা তো কাকের মধ্যে প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান হয় এমন চিন্তা করে মৃতের জন্য অশৌচ পালনের সময় কাককে আগে খাইয়ে থাকে। এ-সবের যথার্থ ভিত্তি বিজ্ঞান দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো কাকতালীয় কোন ঘটনাই এ-সবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে আজও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এমন কিছু তুকতাক কাজ করছে—বিজ্ঞানে যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এমন কিছু ঘটনা লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলে মৃত্যু সম্পর্কে এদের যে ধারণা, সেটা কোন রকমেই গ্রহণযোগ্য

১ Spencer-Gillen b, 513.
২ Howitt, 429.

নয়। স্থূলদেহের মৃত্যুই শেষ নয়, একথা ঠিক। তখনও সূক্ষ্মসত্তা থাকে। তাই বলে কিছু সংখ্যক অশিক্ষিত মানুষ স্বর্গ ও নরকের যে ধরনের কল্পনা করে থাকে তা ঠিক নয়। ভারতীয় যোগীরা তাদের বিশেষ এক ধরনের যোগকৌশল দ্বারা এ সব প্রত্যক্ষ করেছেন।[১] অধুনা বিজ্ঞান মানুষের সূক্ষ্মসত্তার সন্ধান পেয়েছে। বস্তুবাদী রুশরা পর্যন্ত Bioplasmic body-র কথা স্বীকার করছে। সে সব দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা উপক্রমণিকা অংশে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কিছু সংখ্যক আদিবাসী বা উপজাতীয় মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণার কথাই আর একটু খুঁজে দেখা যাক।

এইসব আদিবাসী প্রাচীনতম কাল থেকেই তাদের সঙ্গে এই বিশ্বাস বয়ে নিয়ে চলেছে। এদের পাশাপাশিই প্রাচীন কালে যে সব সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, যেমন, সুমেরীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, রোমক, ভারতীয় ইত্যাদি, তাদের মধ্যেও মৃত্যু-চিন্তা আর একটু ভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছিল। এই মৃত্যুচিন্তা আধুনিক বিশ্বধর্মগুলির মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু তাদের চিন্তাও কতদূর সত্য—তা নানা ভাবে বিচার্য। তর্কের বিচার অপেক্ষা প্রমাণের বিচারই যে এখানে বেশি মূল্যবান হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সব উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে। এখন সেই আদিমতম কাল থেকে মানুষের মৃত্যু-চিন্তা ও পরলোক-চিন্তা যে ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অস্ট্রেলিয়ার 'অরুণটা' নামে এক উপজাতির মধ্যে এখনও এই গল্প প্রচলিত আছে যে, আকাশে যখন কোন চন্দ্র ছিল না, তখন একটি লোক মারা যায় এবং তাকে কবর দেওয়া হয়। অল্পক্ষণ পরেই একটি বালকের বেশে সে কবর থেকে উঠে আসে। তাকে দেখে ভয়ে লোকেরা পালাতে থাকে। সে তাদের পিছু ছুটতে ছুটতে বলতে থাকে যে, পালিও না, পালালে তোমরা সবাই মৃত্যুর কবলিত হবে। আমি যদি আবার মারা যাই, তবে আকাশে উঠে যাব। কিন্তু ভীত লোকেরা তার কথায় আস্থা স্থাপন করে আর ফিরে আসেনি। সুতরাং সে যখন মারা গেল তখন চাঁদ হয়ে আকাশে উঠল। কিন্তু যারা দৌড়ে পালিয়েছিল—মৃত্যুর পর তারা আর কেউ ফিরে আসতে পারেনি।[২] সেই থেকে মৃত্যু মানুষের শাশ্বত সঙ্গী হয়ে থাকে। 'চাম' সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, চাঁদের বুকে একটি মহিলার ছায়া দেখা যায় (ভারতীয়দের চাঁদের বুড়ি)।

---

১ মানুষের স্থূলদেহের মৃত্যু হলে বিশ্বজগতের কেন্দ্রাভিমুখি সাতটি স্তরে আত্মা তার কর্ম অনুযায়ী ভাসমান হয়। কামনা-বাসনা যত কম হয় মানুষের সূক্ষ্মসত্তা ততই বেশী হাল্কা হয় এবং ততই বেশি কেন্দ্রাভিমুখি হতে পারে। জীবাত্মা, অণু-পরিমাণ বা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ নয়—মানুষের দেহেরই পরিমাণ। যোগীর দিব্যনয়নে তাদের স্পষ্ট দেখা যায়। বর্তমান লেখকের এমন বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর 'দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থের দুটি খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ Spencer-Gillen a 554

এই মহিলা আসলে একজন দেবী। তিনি মৃতদের কবর থেকে তুলে আনতেন এবং পুনর্জীবন দান করতেন। জগতের শাশ্বত নিয়মের উপর তার এই বারংবার হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে স্বর্গদেবতা তাকে চাঁদের বুকে সরিয়ে দেন। সেই থেকে সে চাঁদের বুকেই বসে আছে। মর্ত্যের মানুষ সেই থেকে কবর থেকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে পারে না।

ভারতবর্ষে নীলগিরি পর্বতের টোডারা মনে করে যে, প্রথম দিকে কোন টোডারই মৃত্যু হত না। কিছুদিন পরে জনৈক ব্যক্তি মারা যায়। কাঁদতে কাঁদতে টোডারা তাকে কবর দিতে নিয়ে যায়। তাদের দুঃখ দেখে দেবী তিকিরজীর দয়া হয়। এবং লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক কাঁদলেও বেশ কিছু সংখ্যক লোককে খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সুতরাং তিনি তাঁর মন পরিবর্তন করেন। লোকটিকে না বাঁচিয়ে তিনি তাঁর সৎকারের নির্দেশ দিয়ে চলে যান। সেই থেকে টোডারা মৃত্যুর কবলিত হয়।[১]

অনুরূপ গল্প স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের পুরাণ-কাহিনীতেও পাওয়া যায়। তাদের গল্প এই রকম ঃ—যখন স্ক্যান্ডিনেভীয় দেবতা ওডিনের পুত্র বলডুরের মৃত্যু হয় দেবী হেল প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দেবেন যদি সবাই তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।

মৃত্যু কি করে শাশ্বত হয়েছে একথা বোঝানোর জন্যই এ-সব গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। এ-সব গল্প অনগ্রসর মানবপ্রজাতির চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। মৃত্যু যে স্বাভাবিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, একথা বোঝানোর জন্যই এই সব গল্পকথা আত্মপ্রকাশ করেছে।

মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা নয় ঃ

অনগ্রসর সংস্কৃতির মানুষের ধারণা, মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা নয়। মৃত্যুর কারণ কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি, যেমন, দেবদেবী, তুক্‌তাক্ ইত্যাদি। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন, মধ্য আফ্রিকার ওয়াদজগ্‌গ (Wadjagga)-রা মনে করে যে, মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ বার্ধক্যের দুর্বলতা।[২] কেউ কেউ আবার রোগকে দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হিসেবে ভেবে থাকে। তারই সঙ্গে থাকে মৃত্যু স্বয়ং। কানাডার হরেসকিন (Hareskin)-রা মনে করে যে, মৃত্যু ও দুর্বলতার জন্যই রোগের আবির্ভাব ঘটে। চিকিৎসকের কর্তব্য বিভ্রান্তভাবে ঘূর্ণায়মান আত্মাকে ধরে আনা এবং মৃত্যু-দেবতা এৎসুনে (Ettsune)-কে রুগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে আত্মাকে পুনঃস্থাপিত করতে বাধ্য করা।[৩]

১ Rivers, Todas, London, p. 400.

২ Globus ixxxix (1906) 198.

৩ Petilot, Trad. Ind. Paris, 1886, P. 278 ef. P. 434.

সাইবেরিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, পুগেৎসাউন্ড থেকে পূর্ব-ভারতীয় মসল্লা দ্বীপ পর্যন্ত মানুষ অনলস চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা বিভ্রান্ত ভাবে ঘুরে না বেড়ায়। যে কারণে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সেই কারণ থেকে তাকে সরিয়ে যথাস্থানে এনে স্থাপন করার চেষ্টার ক্ষেত্রেও তাদের ত্রুটি নেই। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মানে হল শাশ্বত মৃত্যু।

অনেক লোকের মধ্যে এই ধারণা আছে যে, আত্মা একটি মাত্র নয়, বহু। এই বহু আত্মার মধ্যে একটিই শুধু মানুষের দেহের মধ্যে বা দেহ ঘিরে বাস করে [এ চিন্তা বোধ হয় স্থূলদেহের ঊর্ধ্বে মানুষের কয়েকটি সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থেকেই এসেছে। যোগসিদ্ধ পুরুষেরা এই দেহ দেখে থাকেন। অধুনা বিজ্ঞানে Bioplasmic body-এর আবিষ্কারে এই সূক্ষ্ম সত্তাগুলির অস্তিত্ব যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে]! ক্যামেরুনের বলঙেরা মনে করে যে, একটি আত্মা মানুষের দেহের মধ্যে বাস করে। হয়তো দ্বিতীয় আত্মা বাস করে হাতির মধ্যে, তৃতীয় আত্মা বন্য শূকরের মধ্যে, চতুর্থ চিতাবাঘে। এবং এইভাবে নানা আত্মা নানা স্থানে বসবাস করে। (এই বিশ্বাস থেকেই বোধহয় দৈত্যদানোর আত্মা নানা স্থানে লুকিয়ে রাখা হত এমন ধরনের উপকথার জন্ম হয়েছে)। আত্মার এই বহুত্বের জন্য মানুষের ভাগ্যে নানা দুর্ভাগ্য এসে থাকে বলেও অনেক মনে করত। মূলদেহ বাদে অন্য সব যে দেহে এই আত্মা বাস করে তাদের নানা দুর্ভাগ্য মূল দেহকেও ভোগ করতে হয়। এ-সব কারণে মূল দেহের মৃত্যুও হতে পারে। ওদের এধরনের চিন্তাব কারণ সম্পর্কে ওরা যা ভাবে তা এই রকম ঃ—ধরা যাক কেউ শিকার শেষে ঘরে ফিরে এসে বলল—'আমি খুব তাড়াতাড়িই মারা যাব।' এবং সত্যি সত্যিই যদি তার মৃত্যু হয়—তাহলে বুঝতে হবে যে, তার যে আত্মা বাইরের কোন জন্তুর মধ্যে রয়েছে, সেই জন্তুটি কোন শিকারীর হাতে মারা পড়েছে।[১]

অনগ্রসর সংস্কৃতিতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে কোন দেবতা বা অপশক্তির হাত আছে, তখনও এমন ভাবা হত বা এখনও হয়। হঠাৎ যদি বজ্রাঘাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় তাহলে কোন দেবতার ক্রোধকেই এজন্য দায়ী করা হয়। অবশ্য শুধু দেবতা নয়, কোন প্রেতাত্মা বা জাদুকরের তুকতাকের ফলেও এমন হতে পারে।

কাইজার দ্বীপে (মোলাক্কাদের মধ্যে একটি) রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করা হয় 'লিমসিরওয়ালি' নামে এক ক্ষতিকর শক্তিকে। তাছাড়া অনেক সময় স্বর্ণদেবতা বা সূর্যও এর কারণ হতে পারে বলে মনে করা হয়। সূর্যদেবতা এসব রোগ পাঠিয়ে থাকেন যদি কোন উপজাতীয় লোক পুরনো কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তবেই। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যথার্থ সমাদর না দেখানো হলেও এমন হতে পারে। মোলাক্কার কোলা ও কবরুর আদিবাসীরা মনে করে যে, 'নিতু' অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের আত্মারা তাদের জীবিত উত্তরাধিকারীদের অনেক সময়ই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হত্যা করে থাকে।

১ Globus, Ixix (1896) 277

তারা ক্ষুধার্ত হলে জীবিতদের হত্যা করে তাদের আত্মা ভক্ষণ করে। নবাহো নামে এক উপজাতি মৃত্যুর জন্য দায়ী করে 'চিনডে' নামে এক শয়তান শক্তিকে। আফ্রিকার নানা উপজাতি মৃত্যুর পেছনে কোন আত্মীয়ের প্রেতাত্মা বা জাদুক্ষমতাময় বস্তুর হাত আছে বলে মনে করে। ভারতীয় আন্দামানীয়রা সকল মৃত্যুর পেছনেই দুষ্ট শক্তির হাত আছে বলে ভাবে, এবং অকস্মাৎ-মৃত্যুর পেছনে দুষ্ট শক্তি রয়েছে বলে ধারণা করে। এই দুষ্ট শক্তি সাধারণত বনে বা সাগরে বাস করে।[১] অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক রোগের পেছনেই রয়েছে জুনো (Juno) নামক দুষ্ট শক্তি। কখনও একে ওয়াররুগা (Warruga) বা ওয়াররুঙ্গা (Warrunga)-ও বলা হয়।[২]

রোগ ও মৃত্যুর যত কারণই আদিবাসীরা খুঁজে বের করুক না কেন, সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় তারা মনে করে ডাইনীবিদ্যাকে। কোন দুষ্ট ব্যক্তি রহস্যময় জাদুবিদ্যার সাহায্যে এই তুকতাক করে থাকে। এক্ষেত্রে ডাইনীবিদ্যাবিশারদকে দুষ্ট আত্মারা সাহায্য করে। কোথাও কোথাও তারা এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে জাদুবিদদের প্রেরণা দেয়। (বর্তমান লেখকের মতে ডাইনীবিদ্যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও নিচু শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে এই বিদ্যা বিদ্যমান। বাণ মারা, কিছু খাইয়ে দেওয়া, এসব এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বাণ মারার পেছনে রয়েছে আত্মশক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে Psychokinesis. লেখক স্বয়ং এর প্রয়োগ ও নিরাময় কৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অপবিদ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় যদি কেউ পেতে চান তাহলে (হুগলিতে বারুইপাড়া স্টেশন থেকে বোরা হাইস্কুলের কাছে গিয়ে মধুসূদন পালের খোঁজ করতে পারেন) অপবিদ্যা দ্বারা আহত বহু ব্যক্তিকে লেখক তার কাছে পাঠিয়ে আশ্চর্যভাবে নিরাময় করেছেন, যে আরোগ্য আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা হয়নি। মিরজা নাথনের 'বাহারিস্তান-ই-ঘয়বি'[৩] নামক গ্রন্থে মোগল যুগে এই অপবিদ্যা প্রয়োগের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং আদিম সকল ধারণাই হেসে উড়িয়ে দেবার যোগ্য লেখক এমন মনে করেন না। এবং এ জন্যই বোধহয় আধুনিক বিজ্ঞানীরা আফ্রিকা, আমেরিকার আদিবাসী, ভারতীয় ও তিব্বতীদের মধ্যে প্রাচীনকালের কিছু বিদ্যার উৎস সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। আদিবাসীদের এই বিদ্যা occult faculty-পর্যায়ে পড়ে।

কালিফোর্নিয়ার কিছু আদিবাসী (Mission Indians of Culifornia) মনে করে যে, জগতে প্রথম মৃত্যু দেখা দিয়েছিল এই ডাইনীবিদ্যার সাহায্যেই। এই বিদ্যা প্রযুক্ত হবার আগে, কোন মানুষ মৃত্যুকবলিত হত না।[৪]

---

১ *JAI, xi [1832] 288, 289.*
২ Internat. Archive xvi [1904] 8.
৩ Baharistan-I-Ghaybi vol II. p. 672. Tr. by Dr. M. I. Borah.
৪ JAFL, xix [1906] 55.

আদিবাসীদের মতে ডাইনীবিদ্যার কবলে পড়ে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে এর হাত থেকে রক্ষা পেলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হবে সেই গুণিনকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া। এরকম ঘটনা ঘটলে প্রাচীন গলেরা বিধবা মহিলাদের প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। যদি অপরাধী ধরা পড়ত তবে হয় তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হত নয়তো নানাপ্রকার অত্যাচার করে মারা হত।[১]

অদ্যাবধি বালোঙ্গ থেকে সাইবেরিয়ার কোরিয়াকরা এই কারণে কারো মৃত্যু বা অসুখ হলে এর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে। ভিক্টোরিয়ার বিম্মেরা (Wimmera) জেলাতে (অস্ট্রেলিয়া) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা সারারাত ধরে মৃতদেহকে লক্ষ্য করে। যদি কেউ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তার ছায়ামূর্তি তার তুকতাকের ফল লক্ষ্য করার জন্য এগিয়ে আসবেই। সে যদি তার তুকতাকের ফল লক্ষ্য করে খুশি হয়, তবে সে যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর শিকারক্ষেত্রের দিকে চলে যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা বুঝতে পারে যে, কোন্ গোষ্ঠী বা উপজাতিভুক্ত ব্যক্তি এজন্য দায়ী। তারা তখন সেই গোষ্ঠী বা উপজাতির ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের থারুম্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ গাছের বাকল পোড়ানো ছাই ও চর্বি দিয়ে মালিশ করে। তারপর দেহের শুকনো অংশ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে বৃদ্ধেরা (গুণিন) নিভন্ত অগ্নিতে তা ছুঁড়ে দেয়। এর পর ধোঁয়া উঠে যেদিকে যায় তা লক্ষ্য করে মৃত ব্যক্তির গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা ঠিক করে যে, কোন্ গোষ্ঠী তুকতাক করে এই মৃত্যু ঘটিয়েছে। সেই দিক লক্ষ্য করে—প্রতিশোধ নেবার জন্য একটি দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বার বার এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পর তারা যখন হত্যাকারীকে চিনতে পারে তখন এরাও তুকতাক করে তাকে খতম করার চেষ্টা করে বা ভয় দেখায়, যাতে সে বুঝতে পারে যে, তার অপকর্মের ফল হিসেবে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে।[২]

ওয়ারবামুঙ্গাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত শত্রুর অনুসন্ধান চলে ভিন্ন ভাবে। যে ব্যক্তি মারা যায় তার মৃত্যুর স্থানে তারা মাটির ঢিবি তৈরি করে। দু-এক দিনের মধ্যে সেখানে কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। তার পর কোন জীবন্ত প্রাণী সেখান দিয়ে যাতায়াত করেছে কিনা অনুসন্ধান করে। যে জন্তুর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, তা দেখে অনুমান করা হয় যে, সেই জন্তুর অভিজ্ঞানধারী কোন ব্যক্তিই এই কাজ করেছে। ওয়ারবামুঙ্গারা মৃতদেহকে মাটিতে না পুঁতে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। ক্রিয়ানুষ্ঠান করে সেখানেও বার বার গিয়ে তারা লক্ষ্য করে তুকতাককারী ব্যক্তির কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা। যদি তারা অপকর্মকারী ব্যক্তি বা তার গোষ্ঠীর অনুসন্ধান না পায় তাহলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা এক ধরনের গুবুরে পোকাকে সেই ব্যক্তির

১ Caesar, de Bell Gal, vi, 19.

২ Mathews, Ethnological Notes, 1905, pp 145, 72.

প্রতিভু হিসেবে ধরে তাকে হত্যা করে। তারা মনে করে যে, যে এই অপরাধের জন্য দায়ী এতে তার মৃত্যু হবেই। এতেও যদি কোন ফল না পাওয়া যায়, তা হলে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে আবার তারা মৃতদেহের কাছে যায়। এবং তার দেহে অগ্নিদগ্ধ কোন শলাকা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেদের শিবিরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। দুদিন তারা নির্জলা উপোস করে কাটায়। এর পর এই ক্রিয়ানুষ্ঠানে যারা যোগ দিয়েছিল তারা মুখভর্তি জল নিয়ে গোপনে চারদিকে ছিটিয়ে দেয়। এই শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হলে তারা মনে করে যে অপরাধীর কোনক্রমেই আর অব্যাহতি নেই। এর পর তারা সেই অপরাধীর মৃত্যু-চিৎকার শুনতে পাবে আশা করে।[১]

[গাণিনরা যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে বর্তমান এই সভ্য জগতেও তার এক আশ্চর্য ঘটনা লেখক শুনেছিলেন শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জির কাছ থেকে। ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি বর্তমানে (১৯৯১ খ্রীঃ) খিদিরপুর Employment Exchange-এ কাজ করে। মন্ত্রবলে কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জনের জন্য নানা স্থানে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা কয় বন্ধু মিলে মন্ত্রদ্বারা অতিলৌকিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করত। এদের মধ্যে একজন থাকত বজবজে—নাম নির্মল ভট্টাচার্য। সে যখন একদিন রাতে তার ছাদে বসে কাজ করছিল—অকস্মাৎ দেখে তার সামনে এক ভৌতিক ছায়া। সেই ভৌতিক ছায়া তাকে বলে যে, কোন গুণিন দ্বারা সে প্রেরিত হয়েছে তাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সে যদি তার উৎসর্গীকৃত ঘটের জল তার গায়ে ছিটিয়ে দেয় তাহলে সে মুক্তি পাবে এবং কোন ক্ষতি করবে না। ইন্দ্রজিতের সেই বন্ধু কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে একদিনের সময় চায়। ভৌতিক ছায়াটি বলে পরদিন আবার সে আসবে পাশের একটি বাঁশ বনে। সেখানে যে বাঁশটি নুয়ে থাকবে, মনে করতে হবে যে, সেই বাঁশে সে ভর করেছে। সেই বাঁশের উপর জল ছিটিয়ে দিলেই তার মুক্তি ঘটবে।

পর দিন ইন্দ্রজিতের সেই বন্ধু—ইন্দ্রজিৎ এবং আর এক বন্ধু গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে। গোপাল তাকে তৎক্ষণাৎ জল না ছিটিয়ে দেবার জন্য ভর্ৎসনা করে। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গোপাল, ইন্দ্রজিৎ ও তাদের সেই বন্ধু সেই বাঁশ ঝাড়ের কাছে যায়। তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, একটি বাঁশ নুইয়ে আছে। গোপাল সেই বাঁশে নিজের হাতে বন্ধুটির ঘটের জল ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। সুতরাং মৃত্যুর কারণ হিসেবে আদিবাসীদের এই যে তুক্‌তাকের ধারণা তা যে সর্বৈব মিথ্যা—ব্যাপকভাবে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান না চালিয়ে সে কথা বলা যায় না।]

আদিবাসীদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যায় যে, অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মাই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তির অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। নিগ্রোদের সকলের মধ্যেই প্রায় এমনতর বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

১ Spencer-Gillen[b], 526 ff

শেক্সপীয়রের নাটকেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। ইউয়ি গোষ্ঠীয় (Ewhe-Stock) নানা দল একধরনের বিশেষ জাগ্রত দেবতার থানে যায়, যার নাম 'ট্রো' (Tro)। সেখানে পুজো-আর্চা করে তারা খোঁজখবর করে। পুজারী ঘরের ভেতর থেকে ভুতের কণ্ঠে এর জবাব দেয়—আমাদের দেশে যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ভরের মাধ্যমে জবাব খুঁজবার চেষ্টা করা হয়।[১]

[তবে লেখক স্বয়ং অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, ভর-এর অধিকাংশই ভণ্ডামি। তথাকথিত তাবিজ কবজ করিয়েদেরও সবাই প্রায় ভণ্ড। মন্ত্রশক্তিকে কোন তাবিজের মধ্যে আটকে রাখা যায় বলে লেখকের বিশ্বাস নয়। তবে অতীন্দ্রিয় শক্তিতে লেখকের বিশ্বাস আছে এবং এর পেছনে এক ধরনের বিজ্ঞান যে কাজ করে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। এই বিজ্ঞানে যারা ওয়াকিবহাল নয়, তাদের মধ্যেও এটা কাজ করতে পারে। এই বিজ্ঞানের সূত্রজ্ঞান না থাকলেও অনেকের occult faculty থাকে। আফ্রিকানদের মধ্যে এই occult faculty অত্যন্ত প্রবল। অধুনা parapsychology এবিষয়ে অনুসন্ধান করে বহু প্রমাণ পেয়েছে।]

সেদিন পর্যন্ত ইউরোপেও এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কে তাকে হত্যা করেছে প্রেতাত্মা তা জানিয়ে দিতে পারে এবং হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ চাইতে পারে।

নিগ্রোদের মধ্যে সবাই যে কোন থানে পুজারী বা সেবায়েতের কাছে মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী সম্পর্কে জানতে যায়, তা নয়। অনেকেই মৃতদেহের মধ্যেই সেই খবর পেয়ে থাকে। ইন্ডোনিদের অগ্নি-গোষ্ঠীতে মৃতদেহকে দু'জনের মাথায় চাপিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়। এমন করা হয় গুণিনদের নির্দেশে। ছুটতে ছুটতে বা থেমে গিয়ে তারা যদি কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দেয় তাহলেই তারা বুঝতে পারে দোষী কে (আমাদের দেশে বাটি চালান দেবার মত)। নিগ্রোদের মধ্যে গোলাঙ্গো (Ngoulango) রা এক্ষেত্রে যে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে থাকে তা ততটা কষ্টদায়ক নয়। মাটিতে তিনটি দণ্ড পোঁতা হয়। এর একটি কাজ করে শক্তিদণ্ড (আমাদের দেশে থানের শিলার মত) হিসেবে। আর একটি মৃত ব্যক্তির এবং তৃতীয়টি গ্রামের কোন জীবন্ত ব্যক্তির, যাকে সন্দেহ করা হয়েছে। মৃতদেহটি যদি শক্তিদন্ড, বা মৃত ব্যক্তির প্রতিভু দণ্ডটিকে স্পর্শ করে তাহলে আত্মীয়স্বজনেরা কয়েকটি বলি দিয়ে অনুষ্ঠান করে। ব্যাপারটি সেখানেই চুকে যায়। যদি মৃতদেহ সন্দেহভাজন ব্যক্তির দন্ড স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ তাকে ধরা হয়। তাকে কয়েকটি পরীক্ষা দিতে হয় নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা যদি নিঃসন্দেহ হয় যে, ধৃত ব্যক্তিই দায়ী তবে তাকে কোন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।[২]

আফ্রিকাতে নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাধারণত বিষ খাইয়ে পরীক্ষা করা হয়—বিশেষ করে কোন গোষ্ঠীপ্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেলে এই পরীক্ষা নেওয়া

১ Spieth, Ewe-Stamme. 258, 260, 286, 492, 636, 752.
২ Clozel and Villamur, op. cit. 157, 362.

হয়। ওয়াদজগ্গ (Wadjagga) ও পূর্ব আফ্রিকার বান্টুদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা দেওয়া হয় মৃতের উদ্দেশ্যে যে খাবার রান্না করা হয় সেই চুল্লির ছাই স্পর্শ করে।[১]

ইউরোপেও তুকতাক করে মৃত্যু ঘটানো হলে এই ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হত। সাধারণত এই পরীক্ষা নেওয়া হত জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই এ-ব্যবস্থা চলত। ভারতেও অনুরূপ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অন্যত্র দোষ পরীক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির কিছু চিহ্ন গুণিনদের কাছে নিয়ে গেলেই চলত।

ব্রেজিলের উত্তর-পশ্চিমে সিউসি (Siusi)-দের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থা ছিল। অল্পদিন হল মারা গেছে এমন ব্যক্তির পোশাকের কিছু অংশ এবং দেহ থেকে তোলা বিশেষ কিছু মাংস পরীক্ষা করে নিয়ে গুণিনরা দূরবর্তী কোন উপজাতির কাছে পাঠিয়ে দিত—যারা এ সব পরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। তারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা হত্যাকারীকে টেনে আনার চেষ্টা করত এবং প্রথা সহকারে মৃতের দেহ থেকে আহরিত বিষকে আগুনে পোড়াতো। এদের বিশ্বাস ছিল যে, যে মুহূর্তে এই বিষ ছাইয়ে পরিণত হবে সেই মুহূর্তেই দুষ্কৃতকারী শত্রুর মৃত্যু হবে।[২]

সাধারণত সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথা চালু ছিল যে, যে গুণিনরা পরলোকের সঙ্গে অর্থাৎ জীবাত্মা যেখানে বসবাস করে সেই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে দোষীকে খুঁজে বের করবে। প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুবিধান করা হত। সমগ্র পরিবার ও ধনসম্পদ সুদ্ধ তাকে পুড়িয়ে মারা হত। এটা না করা হলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা নিজের আত্মীয়স্বজনের উপর প্রতিশোধ নেবে এই ধরনের বিশ্বাস ছিল।[৩]

প্রাচীন তাহিতি (Tahiti)-তে বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের মৃত্যু হয় দেবতা (Atua)-দের দ্বারা। হয় তারা নিজেরা আপন মনেই এই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, নতুবা শত্রুপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন করেন। গুণিনদের কাজ ছিল বিচার করে দেখা কি কারণে দেবতারা এই মৃত্যু ঘটিয়েছেন। গুণিন নৌকোয় চেপে মৃতদেহকে যে ঘরে রাখা হয়েছে সেই ঘরের কাছে যেত। সেখান থেকে জীবাত্মা কিভাবে উড়ে যাচ্ছে তা দেখবার চেষ্টা করত। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে, গুণিনরা জীবাত্মাকে দেখতে পায় [অধুনা বিজ্ঞানে মৃতদেহ থেকে ectoplasm রূপ এক

১ Globus ixxxix, 198.
২ Globus xc [1906] 328.
৩ Irternational Archiv. xiii [1900]Suprl, 70. Anthropos. i [1906] 880.

ধরনের জিনিস বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। Bio-Plasmic body-র আবিষ্কার এ কথা প্রমাণ করেছে যে, দেহের ওপর কিছু সূক্ষ্ম সত্তা থাকে। লেখক স্বয়ং বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম জগতে দেখতে পেয়েছেন। মস্তিষ্কস্নায়ুকে বিশেষ এক ধরনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করা গেলে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা সূক্ষ্ম সত্তা দেখতে পাওয়া যায়।] আত্মা কি আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করে গুণিনরা মৃত্যুর কারণ বলে দিতে পারত।[১]

বহু অসভ্য জাতির মধ্যে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু কবলিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করার রীতি আছে। ভারতেও এক সময় এ ব্যবস্থা ছিল—যার নাম অন্তর্জলি যাত্রা। অদ্যাবধি মৃত্যু সমাগত দেখলে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে আমাদের দেশে মুক্ত আকাশের নিচে তুলসীতলায় এনে ফেলে রাখা হয়। ভারতে অন্তর্জলি যাত্রা করা হত পবিত্র গঙ্গার জল ছুঁইয়ে আত্মাকে পাপমুক্ত করে স্বর্গে পাঠাবার জন্য। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে একই কারণে উন্মুক্ত উঠানে তুলসীগাছের নিচে এনে ফেলা হয়। বিশ্বাস এই যে, আত্মা দেহত্যাগকালে ঘরের ছাদ ও দেয়ালের বন্ধন দ্বারা ঊর্ধ্বগতি লাভে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তুলসীতলার মত পবিত্র স্থানে মৃত্যু হলে তারা পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে যাবে।

অস্ট্রেলিয়াতে ইয়ার্কলা মিনিং (Yerkla-mining)-রা যখন দেখতে পায় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তখন তারা তাকে একা আগুনের ধারে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। বেশ কিছু দিন তারা নিজেদের অঞ্চলেই বাস করে না।[২] সুদানেব বৌমনেরা (Baumanas) মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে একা ছেড়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ছেড়ে যায় এই কারণে যে, পাছে সে তাদের কোন একজনকে তার সঙ্গে কবরে টেনে নিয়ে যায়। আধুনিক ভারতেও কিন্তু এই বিশ্বাস বর্তমান আছে। যে-কারণে-মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের লোহা পরিয়ে দিয়ে প্রেতাত্মার স্পর্শ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা চলে। ভারতীয়দের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রিয়জনকে কাছে টেনে নিতে চায়।[৩]

টোগোতেও মরণোন্মুখ ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ ভীতি আছে। এখানকার আদিবাসীরাও মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ, তারা মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির ভৌতিক দেহ তাদের ক্ষতি করতে পারে বা তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।[৪]

ব্রহ্মদেশের উপকূল ছেড়ে মারগুই দ্বীপপুঞ্জে (Mergui Archipelago) সেলুঙ্গ (Selung) উপজাতিরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে একটি পরিত্যক্ত দ্বীপে নিয়ে যায় এবং

১ Ellis, Polyn, Res, London, 1810. 398.
২ Howitt,450.
৩ Steinme-tz, Rechtsverhaltnisse, Berlin, 1903 P. 161.
৪ Spieth, 632.

সেখানে তাকে ছেড়ে আসে। মধ্য আমেরিকার ডোরাকেরা মৃত্যু হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে অরণ্যে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে ছেড়ে আসে। সঙ্গে দিয়ে আসে কিছু খাবার ও জল। তাকে তারা সেখানে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আসে।[১]

কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে মৃত্যু হবার আগেই সমাধিস্থ করার রীতি প্রচলিত আছে। রুগ্ণ এবং মৃত্যুমুখিন ব্যক্তিকে একা ছেড়ে আসা থেকে তারা তাকে কবরস্থ কবাই বেশি পছন্দ করে। প্যারাগুয়ের চাকো ভারতীয়েরা যখন কোন রুগী সম্পর্কে আশা ভরসা হারিয়ে ফেলে তখন হতাশা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাকে খাবার-দাবার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পাছে সে রাত্রিবেলা গ্রামে মারা যায় এইজন্য তাকে গ্রাম থেকে দূরে কোন এক নির্জন স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়—যাতে সে সেখানে একা একা মরতে পারে। কিংবা মরবার আগেই তাকে কবরস্থ করা হয়।[২]

ফিজির নাবিতিলেবু (Navitilebu) উপজাতীয় লোকেরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে মরাব আগেই কববস্থ করে। অবশ্য সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ও দিয়ে দেয়। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পাবে ততক্ষণ কবরের মুখ খোলা রাখা হয়। যখন আব নিজের হাতে খাদ্য ও পানীয় তুলে নিয়ে খেতে পারে না তখন জীবন্ত অবস্থাতেই তার কবরের উপর মাটি চাপিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

নিউ পমেরানিয়ার গেজেল উপদ্বীপে (Gazelle Peninsula) মৃত্যুপথযাত্রী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বিলম্বিত হলে তাকে পান্ডানু পাতায় জড়িয়ে মরণঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।[৪]

উত্তর মইদুর লোকেরা দীর্ঘদিন রোগে ভুগছে এমন লোককে ভালুকের চামড়ার 'বসে-থাকা-ভঙ্গীতে' শক্ত করে বাঁধে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু জিনিসও দেওয়া হয়। এরপর মৃত্যু হবার আগেই তাকে কবরস্থ করা হয়।[৫]

হোটেনটটরা অকেজো ও বৃদ্ধ লোকদের হয় মৃত্যুর আগেই করবস্থ কবে কিংবা কয়েকদিনের মত খাবার সঙ্গে দিয়ে তাদের কোন গিরিখাতে রেখে আসে। উদ্দেশ্য, খাবার ফুরিয়ে গেলে সে অনাহাবে মারা যাবে, বা কোন বন্য জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে।[৬]

দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুদের নানা গোষ্ঠীও মরণোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে অনুরূপ

১ IRBEW 115.

২ Grubb, Among the indians of the Paraguayan Chaco. 1904, PP 41, 45.

৩ JAI X [1888] 144.

৪ ARW. X [1907] 309.

৫ Bull. Am. Mus. Nat. Hlst. xvii [1905] 245.

৬ Thunberg, Travels, Lond. 1795-6, ii, 194.

ব্যবহার করত। হয় তারা এমন ব্যক্তিকে একা ফেলে দিত, অথবা জীবন্তই কবর দিয়ে দিত।[১]

এই ধরনের রীতির উদ্ভব হয়তো নানা কারণেই হয়েছিল। অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল যে মরে যাচ্ছে তার চাইতে যারা বেঁচে আছে তাদের দিকে বেশি নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা। এই করুণ প্রয়োজনীয়তা থেকেই ধীরে ধীরে একটি রীতি গড়ে ওঠে। পরে এমন করার প্রয়োজনীয়তা আর না থাকলেও ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখার জন্য সেই নিয়ম তারা বন্ধ করেনি। বহু অনুন্নত সংস্কৃতির মধ্যে এমনিভাবেই কতকগুলি রীতিনীতি গড়ে উঠে তা স্থায়িত্ব লাভ করে আছে। পশ্চিম আফ্রিকাতে দেখা যায় যে, কোন লোক দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত হয়ে থাকলে তার দেখাশুনা করার লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠে। তারা মনে করে যে, স্মৃতিভ্রষ্ট মুমূর্ষ এই ব্যক্তির মধ্যে তার আসল সত্তা অর্থাৎ আত্মা আর থাকে না। তা বেরিয়ে যায়। ফলে দেহ বেঁচে থাকলেও আসলে সে মরেই যায়। সুতরাং তাকে তারা জীবন্ত কবর দেওয়াই সমীচীন মনে করে।[২]

অবশ্য এরকম করার পেছনে বোধহয় সবচাইতে যে কারণটা বড় হয়ে কাজ করে, তা হল মৃত্যুভীতি এবং মৃতদেহ সম্পর্কে ভয়। বিশেষ করে ইয়াকুতদের মধ্যে এই ভীতি অত্যন্ত প্রবল। এদের মধ্যে দেখা যায়, যারা বৃদ্ধ হয়েছে, জরা ও রোগের ভারে ক্লান্ত, তারা সন্তানদের কাছে নিজেরাই মৃত্যু ভিক্ষা করে। ফলে এদের জন্য তিন দিন মরণোৎসব (funeral feast) পালন করা হয়, লোক খাওয়ানো হয়। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি প্রত্যেকের কাছ থেকে সম্মান লাভ করে। সবচেয়ে ভাল খাবার তাকে দেওয়া হয়। তারপর তাকে অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বাহ্নেই সেখানে তার জন্য কবর খোঁড়া থাকে। সেখানে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তার নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, অন্যান্য জিনিস এবং ঘোড়া।[৩]

মরণপথের পথিক ব্যক্তিদের প্রতি বোধহয় অধিকাংশ জাতিরই একটা ভীতি ছিল আদিকাল থেকেই, যার কিছুটা চিহ্ন অদ্যাবধি নানাভাবে বর্তমানেও রয়ে গেছে। উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যে সাধারণত এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তাকে ঘর বা শিবিরের বাইরে নিয়ে আসা। (অদ্যাবধি হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা চালু রয়েছে।)

সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি প্রথা চালু আছে যে, যদি কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে সাময়িকভাবে নির্মিত একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে স্থায়ী গৃহ তার মৃত্যুজনিত ঘটনার দ্বারা দূষিত না হতে পারে।[৪]

১ Combel, Travels Lond. 1815.
২ Nassau, Fetichism in West Africa, London, 1904, P. 54.
৩ DHR. xivi [1902] 212.
৪ Davy, Ceylon, London, 1821. P. 289.

কমৎচাডাল উপজাতিরা যে ঘরে কোন মানুষের মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ তারা মনে করে যে, পাতালের বিচারক তখন সেই ঘরে আবির্ভূত হয়। সেখানে সে যদি কাউকে দেখে তবে তারও সে মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু নতুন ঘর তৈরি করায় নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তারাও বরং মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়, পাছে এ ব্যাপারে দেরি হলে মৃত্যু সবার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।[১]

লুজোন্বীপের সেররানোদের মধ্যে যখন কোন রুগ্ণ ব্যক্তির নিরাময় হবার সম্ভাবনা থাকে না—পরিবারের ব্যক্তিরা তখন একটি বৈঠকে বসে চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। যখন সেই অর্থ ব্যয় হয়ে যায় তখন রুগীকে ঘরের বাইরে একটি চামড়ায় শুইয়ে দেওয়া হয়। একটি বাচ্চা ছেলেকে তার পাশে বসিয়ে রাখা হয় পাখার হাওয়া করার জন্য যাতে মাছিরা তাকে বিরক্ত করতে না পারে। মৃত্যুসময় অবধি এর পর থেকে তাকে শুধু জল খাইয়ে রাখা হয়। [হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখে বারে বারে জল দেওয়া হয়]।[২]

বাসুতো উপজাতির মধ্যে এই প্রথা চালু আছে যে, মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তারা রুগীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘেরা পর্দার মধ্যে রাখে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, ঘরের মধ্যে মৃত্যুদেবতা (যম) সহজে কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে না। তারা ঘেরাটোপের গায়ে ফুটো করে রাখে যাতে মৃত্যু সেই ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। ঘরের দুয়ার দিয়ে মৃত্যুর পক্ষে ভেতরে প্রবেশ করা কষ্টকর হয়। সেখানে দু'জন বৃদ্ধার পরিচর্যাধীন অবস্থায় রুগীর মৃত্যু হয়।[৩]

ঘরের বাইরে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে রাখার এই রীতি ঐতিহাসিকদের বিচারে মৃত্যুভীতি থেকেই এসেছে। তাঁরা মনে করেন যে, আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, ঘরে কারো মৃত্যু হলে মৃত্যুর উপস্থিতিহেতু সেই ঘর কলুষিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইন অনুসন্ধান ভাণ্ডারের সদস্যরা একটি রিপোর্টে এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইহুদীরা যে সময় মিশর থেকে তাদের দাসত্ব মুক্তির স্মরণে একটি ভোজসভায় সমবেত হয়েছিলেন। সেই ভোজসভায় একটি বৃদ্ধ অকস্মাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘর থেকে বের করে নেবার জন্য চিৎকার ওঠে, পাছে ভোজসভায় কোন মৃত্যু ঘটলে সব কিছু অপবিত্র হয়ে যায়। ইহুদীরা মনে করত, ভোজসভায় বা সমাবেশগৃহে কোন মৃত্যু ঘটলে প্রত্যেকেই মৃত্যু দ্বারা প্রভাবিত হবে। মৃত্যু প্রত্যেককেই গ্রাস করতে চাইবে।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে অবশ্য ঘর থেকে বের করা হয় চার-দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য, যাতে তার আত্মা অবাধে স্বর্গের দিকে উঠে

---

১ Georgi. Description de. Russia, st. Petersburg, 1777, iii, 91.
২ Inhabitants of philippines, London, 1900, P. 277.
৩ FL. xv, [1904] 255.

যেতে পারে। অবশ্য মৃত্যুভীতি যে তাদের মধ্যে নেই তা নয়। কারণ মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অশৌচ পালন করার যে রীতি আছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অন্য কোন ভয় না থাকলেও প্রেতাত্মা সম্পর্কে তাদেরও ভয় আছে।

শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয় অন্যান্যদের মধ্যেও মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গৃহ থেকে বাইরে এনে রাখার ভিন্ন ধরনের কারণ আছে। 'রিফ্ দ্বীপপুঞ্জে' পবিত্র গৃহ নামে একটি গৃহ আছে। সেখানে দেবদেবীরা বাস করেন বলে বিশ্বাস। এই ঘরগুলো ফাঁকা থাকে। কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন রোগে ভুগেও মারা না যায়, তাহলে এই ঘরে এনে তাকে রাখা হয়। উদ্দেশ্য এখানে এনে রাখলে তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। [ভারতবর্ষেও এরকম ঘটনা আছে। বৃদ্ধ বয়স হওয়া সত্ত্বেও এবং রোগে ভুগেও সহজে যদি কেউ মারা না যায়, তাহলে যাতে সে মারা যায় সেজন্য কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।][১]

পূর্ব আফ্রিকার ওয়ারুন্ডি উপজাতিরা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ঘরের বাইরে এনে একটি বৃত্তরেখা টেনে তার মধ্যে রেখে যায়। তার পর পুরোহিত এসে নানা মন্ত্রতন্ত্র করে রুগীর রোগের কারণ জানার চেষ্টা করে। বুঝতে চায়, মৃত ব্যক্তির পিতা অথবা তার কোন মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা এজন্য দায়ী কিনা।[২]

অপর পক্ষে অটোমান তুরস্কের অধীন ইহুদীরা এ ব্যাপারে যে ধরনের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করত তা হল এই রকম ঃ—মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তারা সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যেত। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে সেখানে রেখে দিত। হয় সেখানে তার মৃত্যু হত, নয় তো, ভাগ্য প্রসন্ন হলে দ্রুত নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে আসত।[৩]

ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভূমিতে খড়ের ওপর শুইয়ে রাখার রীতি ছিল (হিন্দুরা যেমন মেঝের উপর মাদুরে শুইয়ে দেয়)। আয়ার্ল্যান্ড থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। মালয়েশিয়াতেও দেখা যায় যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর থেকে মশারি তুলে নেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বিছানা থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়।[৪]

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভারতে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কুশশয্যায় বারান্দায় এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা সুবিধাজনক অন্য স্থানে রাখা হয়েছে। তবে ঘরের ভেতর তাঁকে রাখা হয় না।

কোচীনে নায়াররা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সোজাসুজি ঘর থেকে বাইরে এনে মাটির উপর শুইয়ে দেয়। ঘরের ভেতর কেউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তা পাপকর্ম বলে বিবেচিত হয়। কারণ, তারা মনে করে যে, ঘরের ভেতর কেউ মারা গেলে আত্মা ঊর্ধ্বে

১ JAL. xxxiv [1904] 230.
২ Vander Burgt, Warundi, 1904, Article, 'Temple'.
৩ Melusine, vii, [1896, 278].
৪ Skcat, Malay, Magic, 1900, P. 398 n.

উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। [এই অনার্য অভ্যাসটি আজও হিন্দুসমাজের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে।]

ইউরোপে যারা ঘরের বাইরে মুমূর্ষুকে নিয়ে যায় তাদের বিশ্বাস এই যে, কোমল শয্যায় কারো মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শোক প্রকাশ করাও অনুচিত। কারণ এতে তার মৃত্যু কষ্টসাধ্য হয়, এবং দুর্ভাগ্যেরও কারণ হয়। কজমো দেমজাস্‌সক-এর চেরেমিসদের মধ্যে এই বিশ্বাস চালু রয়েছে যে, পালকের বিছানায় মৃত্যু হলে বা মৃত্যুর সময় কেউ উপরে ঝুঁকে পড়লে জীবাত্মা রসাতলে পালক ও চুল গুণতে বাধ্য হয়।[১] আসলে এমন যে কেন করা হত, সেটা ভুলে গিয়ে উত্তরপুরুষেরা বোধ হয় এ ধরনের একটা তত্ত্ব নিজেরাই পরবর্তীকালে দাঁড় করিয়েছে। কারো কারো মতে (Alb. Diaterich) মৃত দেহকে মৃত্তিকায় নামানো হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, মাটির স্পর্শে আত্মা অতি শীঘ্র পাতালে চলে যেতে পারবে। তবে Monseur-এর মতে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মাটিতে রাখার রীতি পালকের বিছানা বা কোমল শয্যা আবিষ্কৃত হবার আগেই ছিল। লোকে ভুলে গেলেও সেই ধারাই চলেছে। তবে জার্মানী, সুইডেন এবং অন্যত্র মুমূর্ষু ব্যক্তিকে খড়ের বিছানায় শোয়াবার যে পদ্ধতি রয়েছে—সে ব্যবস্থা Monseur-এর চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মারা গেলে তার খড়ের বিছানা পুড়িয়ে ফেলা হয়। যেখানে খড় পোড়ানো হয় মৃতদেহধোয়া জল সেই খড়ের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, অগ্নিদগ্ধ সেই খড়ের উপর দিয়ে কয়েকবার পাখি উড়ে যাবার আগে যদি কেউ তা ডিঙিয়ে যায় তাহলে সে শুকিয়ে যাবে। আসলে এর পেছনে যে কারণ রয়েছে তা এই যে, মৃত্যু-দূষণের হাত থেকে বিছানাপত্রকে রক্ষা করার জন্যই এরকম করা হয়। [যে-কারণে হিন্দুরা মৃতের বিছানাপত্র বাইরে শ্মশানে ফেলে দেয়।] প্রাচীনকালে মৃতদেহকে ঘরের বাইরে রেখে আসার যে রীতি ছিল এ সম্ভবত তারই একটি প্রবহমান ক্ষীণধারা। ঘটনাটা এরকম যে, কাউকে মুমূর্ষু অবস্থায় তার বিছানা থেকে নামানো হলে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। ইউরোপে সেই কারণেই এ রীতি চালু আছে। এর পেছনে যে বিশ্বাস রয়েছে তা এই যে, এতে রুগীর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হয়, তার যন্ত্রণা কমে। ফলে এ কাজ নিষ্ঠুরতা নয়, বরং এক ধরনের দয়ার্দ্রতা। মৃত্যুর পূর্বে মাথার নিচ থেকে যে বালিশ সরিয়ে নেওয়া হয় এও সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে প্রাচীন রীতি তারই একটি সামান্য অবশিষ্ট।

আত্মা ও দেহের বিচ্ছেদ :—সাধারণত মৃত্যু বলা হয় তাকেই যখন দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়। [এই আত্মা যে কি জিনিস অদ্যাবধি কারো কাছে তেমনভাবে তা স্পষ্ট নয়। কেউ মনে করে অণু পরিমাণ, কেউ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। কেউ ভাবে তা থাকে বুকের ভেতর, কেউ ভাবে বাইরে। যথার্থ জীবাত্মার স্বরূপ কি, তা উপক্রমণিকা অংশে

১ Smirnov, Pop. Finnoises, Paris, 1898, i, 137

আত্মা ও বিজ্ঞান এবং যোগ ও জীবাত্মা অংশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে]।[১] অনেকে মনে করেন, আত্মা দেহ থেকে এমন এক স্বতন্ত্র জিনিস যা ঘুমের মধ্যেও দেহ থেকে বাইরে যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে আত্মা যখন দেহ ছেড়ে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে তখনই স্বপ্ন দেখা যায়। আত্মা দেহে ফিরে এলে সেই স্মৃতিগুলোকে মনে করতে থাকে। [কথাটার পেছনে কোন সত্যতা আছে কিনা তাও ভেবে দেখার ব্যাপার। অনেকেই স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যতের ঘটনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। হিটলার প্রমুখ অনেক ব্যক্তিই দেখেছিলেন। লেখক যেদিন এই নিবন্ধ লিখছেন সেই দিনই সুভাষ গ্রামের অজয় ঘোষচৌধুরীর কাছ থেকে খুব সকালবেলা (২৯. ৬ ৮৯.) খবরের কাগজ আসার আগেই একটি স্বপ্নের কথা শুনেন। স্বপ্নটি এই রকম ঃ বক্তা দেখছেন একটি শ্মশানে আটটি মৃতদেহ। এদের মধ্যে সাতজনকে পোড়ানো হচ্ছে। শ্মশানের ধারে বসে আছেন ঘোষচৌধুরীর এক দিদি। ঘোষচৌধুরী সেখানে গিয়ে যে মৃত-দেহটিকে পোড়ানো হচ্ছে না সেই শিশুটির নাকে হাত দিয়ে দেখেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। তিনি বলেন যে, সে বেঁচে আছে। সে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এসে শিশুটিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটে। ঘোষচৌধুরী লেখকের কাছে এই স্বপ্নটির অর্থ জানতে চান। ঠিক সেই সময়ই ২৯. ৬ ৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সকালবেলা লেখকের ঘরে আনন্দবাজার কাগজ এসে উপস্থিত হয়। তাতে প্রথম পাতাতেই ছবি দেওয়া আছে ঃ—মেদিনীপুরে এগরার গোরিয়া গ্রামে এক পরিবারের আটজনের মধ্যে সাত জনই মারা গেছে। একমাত্র জীবিত পাঁচবছরের 'সাধনা' দিদিমার কোলে রয়েছে। এ ধরনের আশ্চর্য ঘটনার সত্যি কোন জবাব নেই। সেই জন্যই বোধ হয় লোকের ধারণা, আত্মা নিদ্রাকালে দেহ ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাইরে ঘুরে নানা জিনিস দেখতে পারে।] স্বপ্নের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলেও আবার যেমন ফিরে আসে, মৃত্যু হলে আর দেহে ফিরে আসে না। [কেন, এর জবাব বোধহয় একমাত্র গীতাই দিয়েছে। দেহ জীর্ণ হলে পুরানো বস্ত্রের মত আত্মা জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করে চলে যায় নতুন দেহ ধারণ করবে বলে। পুরানো কাপড় ফেলে নতুন কাপড় পরার মতন ঘটনাটি।] আত্মার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিন্তা থেকে অনেক নিম্ন সংস্কৃতির লোকের ধারণা আছে যে, আত্মাকে ধরা যায়। সুতরাং অনেক আদিবাসীই আত্মাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। 'নিয়া' (Nias)-এর লোকেরা মনে করে যে, গ্রামপ্রধান এবং বিশেষ করে সে ধনী হলে এবং তার অনেক উত্তরাধিকারী থাকলে সেই গোষ্ঠীপ্রধানের বহু আত্মা থাকে। একটি তাদের বংশে উত্তরাধিকারী হিসেবে থেকে যায়। এই আত্মার নাম এহেহা (Eheha)। নিয়ম হল যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির কোন পুত্র মুখে করে এই আত্মাকে গ্রহণ করবে। যদি তার কোন ছেলে না থাকে তবে একটি টাকার থলেতে

১ লেখক নিজের যোগদৃষ্টিতে জীবাত্মাকে যেভাবে দেখতে পেয়েছেন তাতে সূক্ষ্ম আত্মা স্থূলদেহী জীবেরই সমপ্রমাণ। তাকে অণুপ্রমাণ বলা হয় এই কারণে যে, অণুরই মত তা সহজে বিভাজ্য নয়।

এই আত্মাকে ধরা হয়। ধরার অর্থ এই যে, এই আত্মা পারিবারিক সম্পদের দেখাশুনা করবে।[১] প্রাচীন গ্রীসে রীতি প্রচলিত ছিল যে, খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মুমূর্ষু ব্যক্তির শেষ নিঃশ্বাস একটি চুম্বনের মধ্য দিয়ে নিয়ে নেবে।

লোক মারা যাবার পর অনেক উপজাতি আত্মাকে ডেকে ফেরাতে চেষ্টা করে। টঙকিং (Tongking) উপজাতির লোকেরা চিৎকার করে ডাকতে থাকে। অথবা গুণিন ডেকে রীতিমত মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে। বোর্নিওর ডয়াকরা (Dayaks) এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রুগ্ণ ব্যক্তির রোগও সারাবার চেষ্টা করে।[২]

শেষকৃত্যের পূর্বে ক্রিয়ানুষ্ঠান :—পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মৃতদেহ সৎকারের পূর্বে কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। সেই ক্রিয়াগুলি এই ধরনের :—ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জে এবং সমগ্র ইউরোপে ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয় (সেকি এই বিশ্বাসের জন্য যে, মৃতদেহ ছেড়ে চলে যাবার সময় আত্মা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয় ?)। এটা যে শুধু অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিল। ইংল্যান্ডে গীর্জার কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মারা গেলেও এমন করা হত। ফ্রান্স, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডেও এক ধরনের রীতি চালু আছে। সে হল—ঘরের চালের টালি খুলে নেওয়া। এটা অনেক সময় মৃত্যুর আগেও করা হয়। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ আত্মা যেন সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এই ধারণা আজও অনেকের মধ্যে দৃঢ় হয়ে আছে যে, পথ না পেলে আত্মা ঘর থেকে বেরতে পারে না। তবে মজার ব্যাপার এই যে, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হবার পর সামান্য একটু সময়ের জন্যই দরজা জানালা বা টালি খুলে রাখা হয়। অল্প একটু পরেই আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত চিন্তা কাজ করে অর্থাৎ নির্গত আত্মা আবার যেন ঘরের ভেতর ঢুকতে না পারে। চীনে কিছুদিন আগেও (অর্থাৎ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেও) এই রীতি চালু ছিল যে, মৃত্যুর মুহূর্তে ঘরের ছাদ ফুটো করে দেওয়া হত।[৩] অনুরূপ কাজ আফ্রিকার বাসুতো উপজাতিরাও করত।[৪]

মৃত্যুর পর নানা রীতি অনুসরণ :—সমগ্র ইউরোপব্যাপী এটা একটা সাধারণ রীতি যে, কেউ মারা গেলে গৃহের সমস্ত ঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আয়নাগুলো ঢেকে দেওয়া হয় বা উল্টে রাখা হয়। হয়তো এই বিশ্বাস থেকে এটা করা হয় যে, এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে আত্মা বিভ্রান্ত হবে। সহজে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না। এ সময় ঘরে জলপাত্রগুলি সব শূন্য করে রাখা হয় (হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাটির জলপাত্র থাকলে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।) ইউরোপীদের বিশ্বাস

১ Modigliani, Viaggio a Nias, Milan, 1890, p. 277.
২ Furness, Homelife of Borneo Head-hunters, Philad, 1902, p. 50.
৩ Tylor, Primitive culture, 1871, 1, 409,
৪ Journal, African Society, iv, [1965] 204.

যে, আত্মা মৃত্যুকালে তৃষ্ণার্ত বোধ করে (ভারতেও হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যে জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে বার বার চামচে দিয়ে জল দেওয়া হয় বা ভেজা নেকড়া দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে দেওয়া হয়), ফলে জল দেখলেই তা খেতে চেষ্টা করে। তারা স্নান করারও একটা তাগিদ বোধ করে। অবশ্য জীবাত্মার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশেষ ধরনের কলসী তৈরি করে তাতে যথাস্থানে জল রাখা হয়। গ্রীসে মৃতদেহের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে জল ও খাবার রাখা হয়। (হিন্দুদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের সময় পাখির অঙ্গে ভর করে প্রেতাত্মা খাবার গ্রহণ করে বলে মৃতের উত্তরাধিকারীরা নিজেরা খাবার গ্রহণের পূর্বে কাককে খাইয়ে থাকে।)[১] ফ্রান্সের কোন কোন স্থানে মৃতদেহের পাশে জলের পাত্র রাখা হয়।[২] শ্রিডওয়ালের ওয়েন্ডসরা যে চৌকি বা বেঞ্চের উপর মৃতদেহ রাখা হয় তার নিচে এক পাত্র জল রেখে দেয়। এটা স্বাস্থ্যের কারণে করা হয় বলেই অনেকের ধারণা। মর্ডভিনরা মৃত্যুর সময় বা যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ ঘরে থাকে ততক্ষণ জানালার তাকে একটি পাত্র জলপূর্ণ করে রাখে। তারা মনে করে যে, স্থূল দেহ ত্যাগ করার পর আত্মাকে স্নান করে নিতে হয় [ছোট পাত্রে জল রাখা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হিন্দুদের মত তারাও মনে করত জীবাত্মা আকারে ছোট, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত পূর্বে তা আলোচিত হয়েছে]।[৩] হিন্দুদের ক্ষেত্রেও মৃতদাহ করার পর সেখানে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখা হয় (সেটি অবশ্য জীবাত্মার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য।)। অনেক ক্ষেত্রে এই পাত্রটি দড়ির সাহায্যে সিলিং-এ ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই দড়ি প্রাণবায়ুর অধগতিতে সাহায্য করে এরকম ধারণা আছে। কারণ, শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা পার্থিব পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে যায় তারা এরকম মনে করে। শ্রাদ্ধের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আত্মা এই দড়ি বেয়ে নেমে এসে জল পান করবে তারা এরূপ ধারণা পোষণ করে। প্রত্যেক দিন সকালে সেই পাত্রের পাশে সামান্য অন্ন আহার্য হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। রীতিনীতিগুলো লক্ষ্য করলে এটাই বোঝা যায় যে, পরে এই জল ফেলে দেবার কারণ, জীবাত্মার স্পর্শে তা দূষিত হয়।

ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে ল্যান্ডেস জেলাসমূহে বিশেষ একটি রীতি চালু আছে। রীতিটি এই, বাবা বা মা মারা যাবার পর সারা বছর ধরে রান্নার বাসন-কোসন কাপড়ে বেঁধে রাখা হয়। আগে এই পাত্রগুলি যেখানে রাখা হত ঠিক তার উল্টো দিকে সেগুলিকে রেখে দেয়। যদিও এখন মনে করা হয় যে, শোক প্রকাশ করার জন্যই এমন করা হয়, আসলে এসব করা হয় প্রেতাত্মার ভয়ে; তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য।[৪]

১ JAL. xxiii [1894] 37.
২ RTP xiv, 1899] 245.
৩ Smirnov i 357.
৪ Cuzacq, Naissance, Mariages, et deces 1902, P. 162.

মৌমাছিদের আহ্বান করা ঃ—মৃত্যুর পর কত দেশে কত নিয়ম আছে। সেই সব নিয়মের মধ্যে অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটা মিলও আছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বীতি চালু আছে যেগুলি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন ডয়াক (Dayak)-দের মধ্যে নিয়ম আছে যে, মৃতদেহকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে তখন যিনি গৃহপ্রধান তিনি পরিবারের বাচ্চাদের সকলের নাম ধরে ডাকেন। পরিবারের অন্যান্যদেরও ডাকা হয়। উদ্দেশ্য, মৃতব্যক্তির আত্মা যেন তাদের আকর্ষণ করে নিতে না পারে। আত্মা কাউকে আকর্ষণ করলে তার মৃত্যু হয় বলে বিশ্বাস। [এ বিশ্বাস আমাদের দেশেও আছে। এই জন্য নানাভাবে গৃহকে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয় যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা কাউকে আকর্ষণ করতে না পারে।] মৃতদেহ সৎকার করে ফিরে আসার পর ক্রিয়াটি বার বার করা হয়। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে সৎকার করে ঘরে ঢোকার আগে অগ্নি স্পর্শ করতে হয় এবং শিলা বুকে পিঠে স্পর্শ করানো হয়।] ইউরোপে বিশেষ একটি পদ্ধতি চালু আছে। মৃতদেহ সৎকারের পর বাড়িতে মৌমাছিদের তা জানিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও চাকটি সামান্য নাড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি বাড়ির নতুন গৃহকর্তা কে, তা তাদের বলে দেওয়া হয়। যদি মৌমাছিরা বনবন্ শব্দ করে ওঠে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা নতুন গৃহপ্রধানের কথা শুনতে পেয়েছে। এবং চাক ছেড়ে না দিয়ে সেখানেই থাকবে। প্রচলিত ধারণা, এটা না করা হলে মৌমাছিগুলি মারা যাবে, বা চলে যাবে। অনেক সময় শোকের চিহ্নস্বরূপ মৌচাকের গায়ে ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় মৌচাক স্থানান্তরিতও হয়। অনেকের ধারণা, মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে মৌমাছিদের ভাগিয়ে নিতে না পারে সেই জন্য এই সব করা হয়। তবে কেন যে এরকম করা হয় অনেকে তা জানেও না। তারা শুধু চিরাচরিত একটা রীতি অনুসরণ করে যায় মাত্র। এ ধরনের সাবধানতা শুধু মৌমাছিদের ক্ষেত্রেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়। 'কর্নওয়াল' নামক স্থানে পাখির খাঁচা ও গৃহাভ্যন্তরের উদ্ভিদগুলিকে পর্যন্ত কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অনেকে গাছগাছালি থাকলে তাদেরও একথা জানায়। এবং এদের গায়ে শোক-চিহ্ন সেঁটে দেয়। ফ্রান্সের বহু স্থানে এমন রীতিও আছে যাতে গৃহপালিত পশুদেরও এইভাবে সংবাদ দেওয়া হয়। তাদের গায়েও শোক-চিহ্নও সেঁটে দেওয়া হয়।[১] অনেক সময় দেখা যায় জানালায় দাঁড়িয়ে শবদেহ বহনের দৃশ্য দেখাকেও অনেকে অশুভ বলে মনে করেন।

কান্না ও শোকসঙ্গীত ঃ—মৃত্যু হলে কান্নার ব্যাপারটা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। অনেকের মধ্যে যদি কান্নার আবেগ নাও থাকে তবু তারা কাঁদে। এর পেছনেও হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে। শুধুমাত্র যে শোক প্রকাশের জন্য এই

---

১ Choice Notes FL. 1859, PP. 65, 90, 180 etc, Folklore de France, Paris 1904-7, iii, 193, 375. Loyd, Peas, Life in Sweden, London, 1870, P. 131.

কান্না, তা নাও হতে পারে। [ভারতের হিন্দী-ভাষাভাষী নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায় যে, বিবাহ হয়ে কনে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করলে গ্রামের আবালবৃদ্ধাবনিতা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এটা একটা রীতি। কেন এই রীতি কেউ জানে না। কান্নার আবেগ কারো মধ্যে না থাকলে তাকেও কাঁদতে হয়]। অনেক স্থানে মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর আগেই উচ্চৈঃস্বরে কান্না শুরু হয়ে যায়, যেমন হোটেনটট্‌দের ক্ষেত্রে। এরা মুমূর্ষু ব্যক্তির চারদিকে বসে যায়—এবং এমন বিকট স্বরে চিৎকার করতে থাকে যে, সুস্থ ব্যক্তির আত্মাও সে চিৎকার শুনলে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার মৃত্যুর পর সে চিৎকারের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে, মাইলখানেক দূর থেকে অনায়াসে তা শোনা যায়।[১] এর উদ্দেশ্য হয়তো প্রেতাত্মাকে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে তাড়িয়ে দেওয়া।

শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যেদিন কেউ মারা গেছে সেদিন শেষকৃত্য না হলে দমকে দমকে প্রচণ্ড কান্নার রোল তোলে মহিলারা। সেই কান্নার রেশ কেউ কম, কেউ বেশি সময় ধরে টেনে চলে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কান্না চলে কয়েক ঘণ্টাভর, কারো ক্ষেত্রে মাসাবধি বা কয়েক মাস, কারো কারো ক্ষেত্রে বছরাবধি বা কয়েক বছর ধরে [হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন পাক্ষিক, মাসিক, বাৎসরিক বা সারা জীবন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ চলে]। বৎসরাবধি যারা কান্না চালিয়ে যায় তারা সাধারণত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী। তাও যে অনবরত কান্না চালিয়ে যায় তা নয়। বিশেষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা এই কান্নার রোল তোলে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়া বিধবারা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে চিৎকার করে কান্না শোনায়। মৃত্যু-বার্ষিকীর সময় মাঝে মাঝেই উচ্চরোলে কান্নাকাটি করা হয়। কোন কোন জাতি নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বের করে থাকে। সে সময়ও ঠিক এমনিভাবে কান্নাকাটি চলে। কাফিরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুত্র দূরে থাকা কালে যদি পিতার মৃত্যু ঘটে তাহলে সে ফিরে এলে বাড়ি বা সামাধিক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে এসে পেঁছিনো মাত্র কান্না শুরু করে দেয়। ছ-মাস ধরে তাকে এইভাবে কাঁদতে হয়।[২] কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষেরাও কান্নায় যোগ দেয়। কোথাও কোথাও কান্নার দায়িত্ব থাকে শুধু মেয়েদের। কখনও কখনও এমন বিকটভাবে চিৎকার করে কাঁদতে হয় যে, মনে হয় সবাই পাগল হয়ে গেছে। সাধারণত শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এমন কি পিতা পুত্রশোক, মাতা সন্তানবিয়োগ শোক, সবই অল্প দিনের মধ্যে সহ্য করে নে। পৃথিবীর এটি চিরকালীন ধারা, কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী উচ্চরোল-কান্নার পেছনের কারণ হয়তো ভিন্ন। জীবিতদের যাতে কল্যাণ হয়, সেই জন্য হয়তো এমন করা হয়ে থাকে। হয়তো যারা এটা করে, তারা ভাবে যে, এতে প্রেতাত্মা সন্তুষ্ট থাকে, ক্ষতি

১ P. Kolben, Present state of the Cope, London. 1731. P. 312.
২ Kidd, 250f.

করে না বা মাঝে মধ্যে এই কান্নার দমকে সে এত ভয় পেয়ে যায় যে, পরিবারের কারো উপর ভর করার সাহস করতে পারে না।

ডঃ জাংকার সুদানের কোন শাসকের মৃত্যু হলে সে ক্ষেত্রে রাজকীয় পরিবারে মৃত্যুশোকের যে দৃশ্য বর্ণনা করে গেছেন তা এইরকম ঃ—সুদানের আসান্ডে রাজ-পরিবারে রাজার মৃত্যু হলে তাঁর হারেমের দাসদাসী ও রমণীরা (যাদের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর) শুধু যে বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদে তাইই নয়, ধুলায় গড়াগড়ি খায়, ডিগবাজি দেয়, এবং এমন ভাব করে, যেন চতুর্দিক মৃতব্যক্তির আত্মার জন্য তারা খুঁজে ফিরছে। চিৎকার করে আর বলতে থাকে—'হায় প্রভু! আল্লা ফদল কোথায়! কোথায় সে শুয়ে আছে!' তারা হামাগুড়ি দিয়ে চিৎকার করে ও বুক চাপড়ায়। সন্ধ্যাবেলা পুরুষেরা গান গাইতে গাইতে ও নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় [আমাদের দেশের শবদেহবহনকারীদের খোল-করতাল সহ কীর্তনের মত?]। এই নাচগান ও কান্না চলে সারারাত ধরে। পরদিন মৃতরাজার কুলুঙ্গিতে (Wardrove) হানা দিয়ে তার পোশাক পরিচ্ছদের যে যতটুকু পায় তাই নিয়ে 'গোল হয়ে নাচতে থাকে। তাদের মাথাভর্তি থাকে ধুলো, গড়িয়ে গড়িয়ে চলার জন্য গা ভর্তি কাদা। এইভাবে চলে এক পক্ষকাল ধরে। এর মধ্যে ধীরে ধীরে শোকপ্রকাশের বেগ কমতে থাকে। বরং এবার ফুটে উঠতে থাকে আনন্দের চিহ্ন। শেষপর্যন্ত মৃতের সদ্গতি কামনায় যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে এই আনন্দ আনন্দোৎসবের রূপ নেয়। শ্রাদ্ধবাসর নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।[১]

আরু দ্বীপপুঞ্জে গৃহের কেউ মারা গেলে পরিবারের মহিলারা চুল খুলে এলো করে রাখে। তারপর বায়াল পাড়ার মত সমুদ্রতীরে গিয়ে সামনে এবং পেছনে এমনভাবে উথাল পাথাল করে যে, সেই খোলা চুল পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে। তারা সারা দেহে কাদা ও ময়লা মেখে নেয়।[২] শুধুমাত্র যে অসভ্য বর্বরদের ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে তা নয়—অনেক সভ্য মানুষের মধ্যেও শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে এমনতর আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। মাল্টাতে কেউ মারা গেলে দু' তিন জন মেয়েছেলেকে ভাড়া করা হয় কান্নাকাটি করার জন্য। দীর্ঘ শোকবস্ত্র পরিধান করে তারা মৃতের গৃহে প্রবেশ করে এবং শোকসঙ্গীত গাইতে থাকে। মৃতের সম্পত্তির কিছু অংশের ক্ষতিসাধন করে তারা কফিনে শায়িত মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর নিজেদের চুলের কিছু অংশ কেটে কফিনের উপর ছড়িয়ে দেয়।[৩] চুল শক্তির প্রতীক। এই চুল জীবাত্মার শক্তি বৃদ্ধি করে বলে ধারণা। চুল শক্তিস্বরূপ একথা মনে করা হয় এই দেখে যে, যুবক-যুবতীরা যখন শক্তিশালী তখনই তাদের মাথায় বেশি চুল

১ Frobenius, Heiden-Negerd, Agypt. Sudan, Berlin, 1898, p. 408.

২ Riedel, Sluik-in-Kroesharige rassen, 268.

৩ Busuttil, Holiday custom in Malta. 1894, P. 128

থাকে। বৃদ্ধ বয়সে চুল হাল্কা হয়ে যায় বা থাকেই না। এই সময় লোকের দেহও দুর্বল হয়।

এই যে শোকপালন রীতি, এটা স্বভাবতই মানুষের আবেগ থেকেই জন্ম নিয়েছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে এটা একটা প্রথায় এসে দাঁড়িয়েছে। শোকের ক্ষেত্রে এই যে প্রচন্ড উচ্ছ্বাস, এটা মূলত ঘটে পুরুষমানুষের মৃত্যু হলে। তাদের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে মাঝে মাঝেই শোকপ্রকাশ করার রীতি প্রচলিত আছে। মৃতের জন্য শোকসঙ্গীতের ব্যবস্থাও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কান্নার ধারা এই ঃ—

'হায় হায় আমার কি হবে? কেন তুমি আমায় ছেড়ে গেলে! তোমার কি খাওয়া পরার অভাব ছিল? তবে আমাদের ছেড়ে গেলে কেন! হায় আমার পোড়া কপাল! তোমার কি সুন্দরী স্ত্রীর অভাব ছিল?' প্রাচীন প্রাশিয়ার বর্বর বুথেনিয়ানরা এই ধরনের বক্তব্য রেখে তাদের শোকপ্রকাশ করত।[১] দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে হেরেরোরা এইভাবে কাঁদতো 'হায় কি ভাল লোকই না মারা গেল! সব সময়ই সে গরু ভেড়া মারত। আর বলত, নাও, নাও।[২]

দক্ষিণ আমেরিকার মুনডুরুকুদের মধ্যে কেউ যুদ্ধে মারা গেলে গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা এই বলে শোকসঙ্গীত গাইত, 'তুমি মরেছ বটে, কিন্তু আমরা এর বদলা নেব। আমরা যারা বেঁচে আছি তাদেব কাজই হল আমাদের কেউ যুদ্ধে মারা গেলে প্রতিশোধ নেওয়া। আমাদের শত্রুরা যে বেশী প্রবল তা নয়। তাদের জনবলও বেশি নেই। হে ভ্রাত, হে পুত্র, আমরা তোমাকে সমাধিস্থ করতে এসেছি। তুমি মরে গেছ। মরবার জন্যই এসেছিলে। তুমি যুদ্ধে মারা গেছ। কারণ তুমি ছিলে বীর। এজন্যই তো আমাদের বাবা-মা-রা আমদের জন্ম দিয়েছেন। শত্রুকে নিশ্চয়ই আমরা ভয় করব না। যুদ্ধে যে প্রাণত্যাগ করে সে সসম্মানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, রোগে ভুগে রুগ্ণ ব্যক্তির মত সে মরে না।' এই শোকসংগীত পুরুষেরা গাইত। মৃতের হয়ে মহিলারা জবাব দিত এই বলে ঃ—হে মাত, পত্নে, তোমরা সুখশয্যায় প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু আমি মরেছি যুদ্ধে, কারণ আমি বীর।[৩]

সাধারণত শোক প্রকাশ করা হয়ে থাকে এই ভাবে ঃ—মৃত্যুসংবাদ পাবার পর শুভানুধ্যায়ী ও প্রতিবেশিরা নীরবে শোক প্রকাশ করে। এর পর মৃতের প্রিয়জনকে শোক প্রকাশ করার অবকাশ দিয়ে তারা চলে যায়। আইরিশদের ক্ষেত্রে মৃতের উদ্দেশে বিস্তৃত গুণকীর্তন করা হয়। যদি যুদ্ধে তার মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দান কবা হয়ে থাকে। তবে সংস্কৃতির একেবারে নিম্ন পর্যায়ে

১ Folk Lore, xii, [1901], 300.
২ South African Folk Lore Journal, i, [18?9] 53
৩ International Archive, xiii, Supplementary, 114.

যারা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শোক প্রকাশের রীতি তেমন উন্নত নয়। কয়েকটি মাত্র শব্দ বার বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে শোক প্রকাশ করা হয়। শোকপ্রকাশ যে মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত একটি আবশ্যিক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনই যখন দেখা যায় মৃতের জন্য শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ভাড়াটে মহিলাদের আনা হয়েছে। যেমন মাল্টার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ডাকোটার গ্রোস (Gros) এবং মান্ডানদের মধ্যে মৃতের জন্য যারা শোক প্রকাশ করে তাদের অর্থ দেওয়া হয়। এই অর্থ দেয় মৃতের বন্ধুরা। সবচেয়ে যে বেশি কাঁদতে পারে তাকে বেশি অর্থ দেওয়া হয়।[১] দক্ষিণ আমেরিকার চিরিগুয়ানোরা দিনে তিনবার করে কান্নার ব্যবস্থা করে—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। মৃতের সমাধিক্ষেত্রে কয়েক মাস যাবৎ এই কান্নাকাটি করার জন্য মহিলাদের ভাড়া করা হয়।[২] মাল্টা থেকে নিকট প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই মৃতের জন্য শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ভাড়া করে লোক নেওয়া হয়। আবিসিনিয়ার বেদুইনদের মধ্যে লোকে এজন্য বারবনিতাদের ভাড়া করে।[৩] ক্যালাব্রিয়াতে (Calabria) শোকপ্রকাশ এতটাই বাধ্যতামূলক যে কোন বিদেশীও তাদের মধ্যে এসে মারা গেলে তার শববহনের সময়ও কান্নার জন্য মহিলাদের ভাড়া করা হয়।[৪] এই জন্যই শোক-বিলাপের অনেকটাই রীতিতে পরিণত হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই শোক-বিলাপের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানা ধরনের আলোচনা করেছেন। এ-জন্য তারা যে অনুমান করেছেন—সেগুলিকে নিম্নোক্তভাবে ধরা যেতে পারে :—

(১) অতিরিক্ত শোক-বিলাপ করা হয় জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্য।

(২) মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুকতাক-এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যও এমন করে ক্রন্দন করা হয়ে থাকে, যেমন তুকতাক ও ডাইনীবিদ্যা-প্রধান কঙ্গো উপত্যকাতে করা হয়।

(৩) ভুত তাড়ানোর জন্যও উচ্চরোলে শোকপ্রকাশ করা হয়, যেমন অ্যাঙ্গোলাতে হয়ে থাকে।

(৪) দৈত্যদানোর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যও এমন করা হয়। যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে করা হত। করত ব্রামাৎ ভারতীয়েরা,—কারণ তারা মনে করত যে, মৃতের শেষকৃত্যের তিন দিন পর্যন্ত আত্মা দৈত্যের হাতে পড়তে পারে, যাকে তারা বলত ও-মাহ্-অ। এজন্য তারা কবরের কাছে আগুন

১ 1 RBEW, 161.
২ International Archive, xiii, Supplementary, 105.
৩ Munzinger Ostafrican Studies, 2 Besel, 1883, P. 150.
৪ Ramage, Wanderings. 1868, P. 73.

জ্বালিয়ে রাখত। মৃতের বন্ধু-বান্ধবেরা তিন দিন যাবৎ কবরের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখত যাতে দৈত্যদানো সেখানে আসতে না পারে।[১]

(৫) ক্রন্দন করা হত পাছে মৃত আত্মারা ক্রুদ্ধ হয় এই ভয়ে—যে বিশ্বাস বাসুতো (Basuto)-রা করে থাকে। তারা মনে করে যে, মৃতের জন্য শোক প্রকাশ না করা হলে সদ্যমৃত ব্যক্তির আত্মা ও পূর্বপুরুষদের আত্মারা ক্রুদ্ধ হয়ে পরিবারের কাউকে ভয়ানক অসুস্থ করে দিতে পারে।[২]

(৬) কোথাও এই শোক-বিলাপ করা হয় জীবাত্মাকে সচেতন করে দেবার জন্য যে, সে স্থূলদেহ ত্যাগ করেছে, যেমন মোলাক্কা (Moluccas)-দের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

শোক-বিলাপ যে আত্মাকে উদ্দেশ্য করেই হয়ে থাকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে বহু শোকসঙ্গীতের বক্তব্য থেকে,—কারণ সেখানে সরাসরি মৃত ব্যক্তির উল্লেখ থাকে। মৃতের উদ্দেশে শোকবাক্য, তার কর্মের প্রশংসা, ফিরে আসার জন্য আবেদন, প্রভৃতি জীবাত্মাকে প্রভাবিত করার জন্য করা হয়। এ বিশ্বাস প্রায় সর্বত্রই বর্তমান যে, মৃতের আত্মা আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অংশ নেয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভারতীয়েরা অর্থাৎ আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, আত্মা শোকসঙ্গীত বুঝতে পারে। সেইজন্য তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই শোক-বিলাপের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি শত্রু মারা গেলেও তার প্রশংসা করা হয়, পাছে সে ক্ষতি করে।[৩] এ ধারণা যে কত সত্য তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছে পূর্ব আফ্রিকার জা লুও (Ja Luo)-রা। কেউ মারা গেলে সেখানে নিয়ম অনুযায়ী সারা গ্রাম কান্নায় ভেঙে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রহরে প্রহরে কান্নার রোল ওঠানো হয়। তবে যদি কোন নিঃসন্তান মহিলা মারা যায় তবে সাধারণভাবে কান্না শোনানো হয়। মৃত্যুব খবর পাওয়া মাত্র মৃতের ভাইবোনেরা দ্রুত ছুটে আসে। প্রথম যে আসে সে এক ধরনের কাঁটা (acacia-thorn) সঙ্গে নিয়ে মৃতের কাছে এসে পৌঁছোয়। তার পায়ের নিচে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তা ভেঙে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে যায়। কান্নার পুনরাবৃত্তি আর কখনও হয় না।[৪] এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট হবলি (Hobley) দিয়েছেন তাতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, মৃতের আত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য কাঁটা ফুটিয়ে তাকে খোঁড়া করে দেওয়া হয়। সম্ভবত নিঃসন্তান মহিলাকে অশুভ বলে মনে করা হয় বলেই এমন করা হয়। [আমাদের দেশেও অশুভ বলে ধরে নিয়ে—কোন মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভে এদের মুখদর্শন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

১ 1 RBEW, 107.

২ Martin, Basutoland, 1903, P. 92.

৩ International Archive, Supplementary xiii, Supplementary PP. 114, 117.

৪ JAI xxxiii, 344.

করা হয়]। নানা দেশের আদিবাসীরা মনে করে যে, নিঃসন্তান মহিলারা ঈর্ষাকাতর ও ক্ষতিকর হয়। উত্তরাধিকারী থাকে না বলে শুভ কামনায় এদের জন্য কিছু করতে দেওয়া হয় না। ফলে কোন ক্ষতি না করে তার প্রেতাত্মা যাতে কবর ছেড়ে চলে যায় এই জন্য অনেকেই এ ধরনের ব্যবস্থা করে।

তবে একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র প্রেতাত্মা-ভীতি থেকেই যে-শোক কান্না করা হয়, তা নয়। এরকম বিশ্বাসও প্রচুর আছে যে, মৃতের আত্মারা স্বজন ও উত্তরাধিকারীদের স্নেহের দৃষ্টিতেও দেখে থাকে। অবশ্য তারা যে-কোন মুহূর্তে খেয়ালী হয়ে উঠতে পারে। প্রেতাত্মারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও নানা পারলৌকিক কাজের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।[১] কারণ, সঠিক পারলৌকিক ক্রিয়ার উপর পরলোকে তাদের সুখশান্তি নির্ভর করে। যদি সঠিকভাবে পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় তবে তারা পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যই শোক-ক্রন্দন একটি। এই শোকক্রন্দন হল পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন। ফলে পরলোক থেকে সেও অনুরূপভাবে উত্তরাধিকারীদের জন্য শুভ কামনা করে।

মৃত্যুর পূর্বে ক্রিয়া বা মৃতদেহের প্রসাধন ক্রিয়া : মৃত ব্যক্তির জন্য সর্বত্রই প্রায় এক ধরনের প্রসাধন ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। ইয়াকুত সম্প্রদায় কোন ব্যক্তি মারা যাবার আগে তার মুমূর্ষ অবস্থাতেই এই প্রসাধন ক্রিয়া করে থাকে। এই প্রসাধন ক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে দেহ প্রক্ষালন। সভ্যতার উন্মেষকালে মৃতদেহকে নানা রঙে, বা বিশেষ কোন রঙে (যেমন লাল) রঞ্জিত করা হত। নব্যপ্রস্তর যুগের মানবের যে অস্থি মাটির স্তর থেকে পাওয়া গেছে তা রক্তরঙে রঞ্জিত দেখা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিবাসী মৃত্যুর পর মৃতদেহ ঘষতে থাকে। ফলে চামড়ার উপরিভাগ উঠে গিয়ে সাদা আবরণ বেরিয়ে পড়ে। এর কারণ হয়তো এই যে, তাদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি সাদা রঙ নিয়ে ফিরে আসে, যে রঙে সাধারণত প্রেতাত্মাদের দেখা যায়।[২] মৃতদেহের চোখ বুজিয়ে দেওয়া হয়। যাতে চোখের পাতা খুলে না যায় সে জন্য তা ভারি করে দেয়। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে মৃতদেহকে স্নান করাবার পর নানাভাবে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে তার উপর তুলসীপাতা লাগিয়ে দেয়।] শুধু কিছু উপজাতি বা হিন্দুদের ক্ষেত্রে নয়, মৃতদেহের চোখের পাতা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বুজিয়ে দেওয়া হয়। এটা করা হয় এই কারণে যে, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে আত্মা যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ তা ত্যাগ করে যায় না। যাতে সেই চোখ দিয়ে সে দেখতে না পায় সেই জন্যই এমন করা হয়।[৩] নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কতদূর সত্য কে জানে, তবে সেই তাকিয়ে থাকাটা যে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক

১ পরলোকের যথার্থ চিত্র উপক্রমণিকা অংশে দেওয়া আছে।
২ Parker, Euahlayi, 91.
৩ Indian Census, 1901, iii, 208.

তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যই চোখ বুজিয়ে দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তির সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্ত্র তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায়ই আত্মীয়স্বজন এই সময় মৃতদেহের জন্য নতুন বস্ত্র দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেমন চীন (কমুনিস্ট-পূর্ব) ও ইউরোপে, মৃতব্যক্তি জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রসাধন ক্রিয়ার জন্য সুন্দর পোশাক তৈরি করে গেছেন। এটা করা হয় সাধারণত এই বিশ্বাস থেকে যে পরলোকে সুন্দর পোশাক পরে যেতে হয়। [এ ধারণা কতদূর সত্য বা মিথ্যা পূর্বে যোগদর্শনে জীবাত্মা সম্পর্কে আলোচনাকালে তা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।] জার্মানীর কিছু কিছু অংশে এই রীতি চালু আছে যে, বিবাহের দিন যে পোশাক পরে বিবাহ হয়েছিল সেই পোশাক পরিয়ে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে মৃতদেহকে অলংকার ভূষিত করে শেষকৃত্যে পাঠানো হয়। [ভারতবর্ষে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যদি সে সধবা হয় এই প্রথা বর্তমানেও চালু আছে।] দারিদ্র্যের জন্য কোন কোন জাতি মৃতদেহকে কবরে বা শ্মশানে দেবার আগে তার দেহ থেকে সমস্ত মূল্যবান জিনিস সরিয়ে নেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃতদেহের সঙ্গেই সেগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে জুতো পরা হয়, সেখানে মৃতদেহের পায়ে জুতো পরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তারা মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকের দিকে দীর্ঘপথ হেঁটে অতিক্রম করতে হবে। ইউরোপের নানা স্থানেই এই প্রথা চালু আছে। গ্রেট ব্রিটেনে কেল্টিক যুগ থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। যেভাবে সমাধি দেওয়া হবে বা শ্মশানে পোড়ানো হবে সেই অনুসারেই প্রসাধন ক্রিয়া করা হয়। অনুন্নত সভ্যজাতির ক্ষেত্রে মৃতদেহকে বসে থাকার ভঙ্গীতে ভাঁজ করা হয়। ইউরোপে প্রাগৈতিহাসিক কবরে এধরনের সমাধি দেবার রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মাতৃগর্ভে শিশু এই অবস্থায় বিশ্রামরত থাকে, এই ধারণা থেকেই এরকম করা হত বলে বিশ্বাস। কিংবা এই বিশ্বাস-এর পেছনে রয়েছে যে, পৃথিবীমাতার গর্ভে তাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শস্য মাটিতে পুঁতে দিলে যেমন আবার গজায় তেমনই মৃতদেহও আবার গজিয়ে উঠবে। মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেলে এরকম করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন আফ্রিকার বান্টু ও বেচুয়ানাতে মাংসপেশী বা পিঠের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাটা হয়।[১] জার্মানীর শ্লাভ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং মাসুরদের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, মৃতদেহ ধুইয়ে জল যে-পাত্রে রাখা হয় তা মৃতদেহ রাস্তায় বের করার সময় তারা ফেলে দেয়। এটা করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, প্রেতাত্মা যাতে হানা না দেয়। সাইলেশিয়ায় মৃতদেহ ধোয়া জল জলপাত্রের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হয়। পাছে কেউ তা ডিঙিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় ভয়ের কারণ সেটাই। ওয়েন্ডসরা এ জল কোথাও পড়লে বাজরা ছিটিয়ে দেয়, যাতে পাখিরা তা খেয়ে না ফেলে।

জামাইকার নিগ্রোরা মোমদানির পেছনে বা কবরের উপর এই জল ছিটিয়ে দেয়। ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে অলি (Oleai)-দের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রথা চালু আছে।

১ Journal, African Society, v 337.

মৃতশিশুকে যে জলে স্নান করানো হয় সেই জল তারা পান করে।[১] সম্ভবত এই বিশ্বাসে এটা করা হয় যে, নতুন করে আবার সেই ঘরে শিশু জন্ম নেবে।

দেহের মমিকরণ: এক সময় মৃতদেহকে শুকিয়ে মমি তৈরি করার প্রথা পৃথিবীর বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছিল। মিশরের মমি তো অদ্যাবধি একটি বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে। এ নিয়ে নানা ভৌতিক কাহিনীও বিদ্যমান। তবে মিশরের নাম সর্বাগ্রে হলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন মানুষের মধ্যেও মমিকরণের রীতি ছিল। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে 'উনুঘি'রা (Unghi) প্রায়ই চন্দন জাতীয় গাছেব সবুজ ডালপালায় আগুন ধরিয়ে মৃতদেহকে শুকাতো, তারপর মৃতব্যক্তি যে স্থানে প্রায়ই যেতে ভালবাসত সেখানে নিয়ে যেত। কইয়াবারা গোষ্ঠীর লোকেরাও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির দেহ শুকিয়ে নিয়ে ছয়মাসকাল বহন করত।[২] পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েও এই মমিকরণপ্রথা ছিল। ঊর্ধ্বনীলনদ উপত্যকার কোন নিয়ামনিয়াম-প্রধান ও পূর্ব আফ্রিকার ওয়ারুন্ডি রাজাদের মৃতদেহকেও এইভাবে মমি করে কবর দেওয়া হত।[৩] মধ্য আফ্রিকার অনেক উপজাতিই সেদ্ধ করা ভুট্টা দিয়ে দেহ ঘষে ঘষে মমি তৈরি করত।[৪] বাগান্ডার রাজারা মারা গেলে তাঁদের দেহ মুচড়ে মুচড়ে শুকিয়ে নেওয়া হত। হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও অন্ত্র বাইরে এনে মাখন ঘষে দেওয়া হত, তাবপর আবার যথাস্থানে রাখা হত। আইভরি কোস্টের বোর্ডেলেরা দেহের ভেতর থেকে অন্ত্র বের করে এনে এক ধরনের মদ দিয়ে ধুইয়ে দিত। দেহের ভেতর যেসব স্থানে ফাঁক থাকে সে-সব জায়গায় মদ আর নুন ভরে দিত। তারপর অন্ত্র যথাস্থানে বসিয়ে রেখে পেট সেলাই করে দেওয়া হত। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে দেহের পচন বন্ধ করতে পারত তা নয়। তবুও তিন সপ্তাহের মধ্যে যতটুকু পচন হওয়া সম্ভব তা হয়ে পচনক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত। দেহ মমিতে পরিণত হত।[৫]

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে দেহ শুকানো হত আগুনে। বেতসিলিও এবং মাদাগাস্কারের আন্তনকরণ (Antankarana)-দের মধ্যে মৃতদেহ শুকানো হত হাওয়ায়। দেহের অভ্যন্তরস্থ তরল বা জলীয় অংশ বের হয়ে গেলে দেহ এমনিতেই শুকিয়ে যেত। এই পদ্ধতিতেই এরাব (Erub) ও মুরে (Murry) দ্বীপপুঞ্জে দেহ শুকানো হত, যেমন করে লংকা শুকানো হয়। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জে গোষ্ঠীপ্রধানদের দেহ শুকানো হত রোদে। অবশ্য দেহের যে-সব অংশ সহজে পচতে পারে সেগুলি ফেলে দেওয়া হত। আর দেহের জলজ অংশ টেনে বের করে নেওয়া হত। তা ছাড়া এক

১ Folk Lore, xv 208, 88.
২ Globus 1 xxxviii [1901] (20).
৩ Howitt, 469.
৪ Frobenius, 400, van deo Burgt, 40
৫ Werner, British Central Africa, London, 1906, P. 163
Journal of African Society v. 434.

ধরনের সুগন্ধি মলম গায়ে মেখে দেওয়া হত। পলিনেশিয়াতেও এরকম চলত।[১] উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু জাতিও মৃতদেহ শুকাতো। তারা দেহ শুকানোর জন্য আগুনের সাহায্য নিত। ভার্জিনিয়ার আদিবাসী ও আটলান্টিক উপকূলবর্তী দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের কোন রাজা বা বিখ্যাত কোন লোক মারা গেলে বেশ খরচা করে মমি তৈরি করত। দেহের ফাঁকফোকরে তারা নানা জিনিস ভরে দিত। কখনও কখনও চামড়ার খোলসটি অন্য কিছু দিয়ে ভর্তি করে মাংস ফেলে দিত। কেউ কেউ এই মাংস ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করত (স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ? তিব্বতে ধর্মীয় গুরু মারা গেলে তাঁর শিষ্যেরা যেমন গুরুর দেহের নানা অংশ কেটে নিয়ে সংরক্ষণ করে থাকে ?]।[২] দেহের এই শুকনো করাব প্রথা অতি প্রাচীন। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রগুলিতে যেমন এধরনের মমি দেখা গেছে তেমনই উত্তর আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক কবরগুলিতেও এর সাক্ষাৎ মিলেছে।

দেহের মমিকরণ হত এই বিশ্বাস থেকে যে, আত্মা এতে এসে বসবাস করতে পারবে, বা যখন খুশি তখন এসে এতে বিশ্রাম নিতে পারবে। যে সকল স্থানে, যেমন মিশরে, মৃত ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করা হত সেখানে যারা এই দেহ শুকানোর কাজ করত তারা নিজেরা যে-কোন দেহ সহজেই মমি করে রেখে দিতে পারত।

প্রাচীন ম্যাক্রোবিয়ই (Macrobioi)-রা দেহ শুকিয়ে এর উপর প্লাস্টার করে মৃত ব্যক্তির অনুরূপ আকৃতিতে রঙ করত। তারপর সেই দেহ স্ফটিকের একটি পাত্রের উপরে ঢাকনা চাপিয়ে দিয়ে রেখে দিত। এক বছর এ মমি ঘরে রাখা হত। এ সময় এই মমির কাছে রীতিমত নানা ধরনের জিনিস দেওয়া হত, যেমন পশুবলি ইত্যাদি। তারপর গৃহ থেকে এই দেহ বের করে শহর ঘুরে কোন জায়গায় রেখে দিত।[৩] ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলিনার আদিবাসীরাও বড় একটি ঘরে এই দেহ রেখে দিয়ে নিত্য নানা ক্রিয়ানুষ্ঠান করত। এই মমিগুলি থাকত পুরোহিত ও বৈদ্যদের তত্ত্বাবধানে।[৪]

উর্ধ্ব কঙ্গোর বাঙালা, আফ্রিকার অন্যত্র নানা উপজাতি, দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও দেহের মমি তৈরি করা হত। এরা দেহ শুকিয়ে রাখত একটি শুভ সময় দেখে শেষকৃত্য করবে বলে। নানা কারণে এই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান মাসের পর মাস বা বছরের পর বছব পিছিয়ে যেত বলেই তারা দেহ শুকিয়ে রাখত। অবশ্য মৃত ব্যক্তির আত্মার আশ্রয় হিসেবেও যে এমন করা হত তাতে সন্দেহ নেই।

মৃত ব্যক্তির ভোজন : মৃতব্যক্তিদের নিয়ে নানা দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠান-ক্রিয়া আছে। এদের মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন, মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ

১ Polyn, Res I, 400.
২ 1 RBEW 131, 132, International Archives, xiii, Supplementary PP. 55, 56, 62, 79 etc.
৩ Herod, iii, 24.
৪ 1 RBEW, 131.

করার পূর্বে তার দেহ 'বসে রয়েছে' এইভাবে ভাঁজ করা হত, যেমন, আরু দ্বীপপুঞ্জে মোলাক্কাদের মধ্যে। মৃতব্যক্তিকে এইভাবে বসানোর পর পরিবারের সদস্যেরা তার সামনে খাবার পাত্র রেখে দিত। অনুন্নত সংস্কৃতিতে প্রায় সর্বত্রই মৃতকে লক্ষ্য করে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে যেমন টনকিংয়ের 'থো'-দের মধ্যে মৃতদেহের মুখেও খাবার গুঁজে দেওয়া হত। পৃথিবীর এই গোলার্ধেই এমন রীতি বেশী প্রচলিত থাকতে দেখা যায়, অর্থাৎ মৃতকে ভোজ্য দান। আধুনিক ইউরোপেও মৃতের উদ্দেশে খাদ্য দানের প্রথা এখনও কোথাও কোথাও চালু আছে। ফ্রান্সের লয়ের-এট এবং শের (Loir-et, Cher)-এর নানা স্থানে খাদ্যদ্রব্য মড়ার ঘরে নিক্ষেপ করা হয়।[১] ফরাসী লেখক ডে লা মার্তিনেয়ার (De la Martiniere) উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর রাশিয়াতে মৃত্যুর পর মৃতদেহের জন্য পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র আনা হত। উদ্দেশ্য, আত্মাকে স্নান করানো। তারপর মৃতদেহের মাথায় এক টুকরো রুটি রাখত। এটা করা হত এই বিশ্বাসে যে, তার সামনে যে পরলোকের দিকে দীর্ঘ যাত্রাপথ আছে, সেই পথে হাঁটতে গিয়ে ক্ষুধায় সে যেন কাতর না হয়ে পড়ে। যাতে অন্যান্য প্রেতাত্মা সেই খাদ্য পরখ করে দেখার চেষ্টা না করে সেই জন্য পূর্ব প্রাশিয়ায় মৃতদেহরক্ষাকারীরা মদ্যপান বন্ধ রাখত।[২]

স্কটল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে লোকেরা এ ব্যাপারে ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিত। মৃত ব্যক্তির গৃহে সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে লোহা ছুঁইয়ে রাখা হত [হিন্দুরাও প্রেতাত্মার ভয়ে লোহা অঙ্গে রাখে]। অবশ্য বর্তমানে এই লোহা ছোঁয়ানোর মানে স্কটল্যান্ডের লোকের কাছে দূষণক্রিয়া বন্ধ করা। অদ্যাবধি পৃথিবীর নানা দেশেই লোহাকে প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে কল্পনা করা হয়। যে কারণে, আমাদের দেশে লোকেরা শিশুদের কোমরে জালের কাঠি পরায়। কারণ, সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, শিশুরা সহজেই অপদেবতা বা প্রেতাত্মার কবলিত হতে পারে।

মৃতদেহের পাশে রাত্রি জাগরণ : কোন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি মারা গেলে সর্বত্রই প্রায় দেখা যায় যে, আত্মীয় স্বজনকে জানানো হচ্ছে। জানানোর পদ্ধতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ বা লোক পাঠিয়ে খবর দেয়, কেউ বা ড্রাম পিটিয়ে। অনুন্নত সংস্কৃতির লোকেরা গুলি ছুঁড়ে শব্দ করে। শেষকৃত্যের জন্য মৃতদেহকে তৈরী করার সময় মৃতদেহের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখা হয় [হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোন আত্মীয় দেহ স্পর্শ করে থাকে যাতে অন্য কোন প্রেতাত্মা সেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সেই দেহকে স্পর্শ করে থাকে তার দেহের বিদ্যুৎতরঙ্গ মৃতদেহে প্রবেশ করলে ভিন্ন তরঙ্গের কোন আত্মা তাতে প্রবেশ করতে পারে না। সেই জন্য যোগীরা যখন স্থূল দেহ ছেড়ে আকাশ-ভ্রমণে বের হন তখন শিষ্যদের দেহ ছুঁয়ে থাকতে বলেন। অবশ্য বর্তমান লেখক জীবাত্মার সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও—

১ RTP, xv, [1906] 382.
২ Am. Urugnell 11, [1891] 80.

এক্ষেত্রে কোন ধরনের আত্মা যে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাতে এখনও বিশ্বাস করেন না। বরং মস্তিষ্ক-তরঙ্গের সমতা হেতু সমতরঙ্গের নানা কিছু দর্শন করে থাকেন এরূপ বিশ্বাস করেন। অবশ্য যোগীরা এমন সময় নিজের সূক্ষ্ম সত্তাকেও দেখতে পান। কিন্তু তখনও তার নিজের দেহে চৈতন্য থাকে, বিচারবুদ্ধি থাকে। না হলে দেখতে পায় কে? তবে স্বকীয় স্থূল সত্তায় থেকে নিজের সূক্ষ্ম সত্তা দেখার ফলে একটা বিশ্বাস জন্মাতে চায় যে, প্রাচীন কালের অসভ্যরা যে বিশ্বাস করত, একই দেহে নানা ধরনের আত্মা বাস করে, তা সত্য হতে পারে।

যে সব জাতি মৃত্যুকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করে না, বাইরের কোন অপশক্তির প্রয়োগে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এমন বিশ্বাস করে, তারা মৃত্যু হওয়া মাত্রই দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে না। দীর্ঘ সময় ধরে দেহ লক্ষ্য করে বুঝতে চায় যে, কে বা কারা এই মৃত্যুর কারণ। তাদের ক্ষেত্রেই মৃতদেহ নিয়ে জাগরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের বিমেরা (Wimmera) আদিবাসীদের গুণিনরা এবং তার আত্মীয়স্বজনেরা প্রয়োজন হলে দিনরাত বিনিদ্র চোখে মৃতদেহের পাশে বসে থেকে বুঝবার চেষ্টা করে যে, কে বা কারা কোন্ দিক থেকে তুক্‌তাক্ করে মৃত্যু ঘটিয়েছে।[১] আবার এই অস্ট্রেলিয়ারই অন্যত্র মৃতদেহের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনেরা জাগ্রত থেকে দেহকে পাহারা দেয় পাছে অন্য কোন প্রেতাত্মা এসে সেই দেহে প্রবেশ করে। কালিফোর্নিয়ার সাবোবস (Sabobas)-দের মত তারাও বিশ্বাস করে, মৃতদেহের আশে পাশে অন্যান্য প্রেতাত্মা বা ব্রহ্মদৈত্যরা তাতে প্রবেশ করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। [মৃতদেহের মধ্যে ভিন্নধরনের শক্তি প্রবেশ করতে পারে এই বিশ্বাস থেকেই শ্মশানচারী হিন্দু তান্ত্রিকেরা শ্মশানে শবসাধনা করে থাকে। অতীন্দ্রিয় প্রচণ্ড শক্তির অনেক ক্ষেত্রেই রূপ থাকে না। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত সেই শক্তি অদৃশ্য। কোন বাল্‌ব পেলে যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি আলো রূপে ফুটে বেরোয় তেমনই সেই শক্তি দেহ পেলে সাধকের মন্ত্রবলে তাতে প্রবেশ করে তাঁকে মৃতদেহের মুখ দিয়ে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে বলে বরদান করে।] আসামের গারোদের মধ্যে মৃতদেহ পাহারাদারদের জাগ্রত রাখার জন্য তরুণেরা জন্তু-জানোয়ারের পোশাক পরে মৃতের গৃহে প্রবেশ করে ও নানা ধরনের চিৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করে পরিবারের মহিলাদের ভয় দেখায়। এর মূলে উদ্দেশ্য হয়তো অন্যান্য দুষ্টাত্মাদের ভয় দেখিয়ে দূরে রাখা।[২]

কোরিয়াকরা মৃতদেহ পুড়িয়ে থাকে। তারা মৃতদেহের সৎকার সেই দিনই অথবা দু'এক দিন পরে করে। ঘরে মৃতদেহ থাকা পর্যন্ত তারা কাউকে ঘুমোতে দেয় না। মৃত ব্যক্তিকে তখন পর্যন্তও পরিবারের একজন বলেই মনে করা হয়। তাকে আনন্দ দেবার জন্য তারা তার দেহের উপর তাস পর্যন্ত খেলে। মৃত্যুকে কেন্দ্র

১ Gregor, F.L. N.E. Scotland, 1881. p. 206.
২ Playfair, The Garos, London, 1909, p. 103.

করে তাস খেলার এই পদ্ধতি রাশিয়ানদের কাছ থেকে এসেছে বলে পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা। তাস খেলা ছাড়া ভিন্ন ধরনের আমোদের ব্যবস্থাও করে তারা। এসবই করা হয় মৃতদেহ ঘরে থাকা পর্যন্ত সকলকে জাগিয়ে রাখার জন্য। মোলাক্কানদের মধ্যে দেখা যায় ছেলেপেলেদের মৃতদেহ লক্ষ্য করতে বসিয়ে রেখে অন্যান্যরা ধূমপান ও মদ্য পান করে। প্রয়োজন বোধ করলে তাসও খেলে। মৃতদেহের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত তারা রাত্রি জাগরণের জন্যও এমন করে থাকে। অন্যান্য দ্বীপে নানা রকম ধাঁধা তুলে ও খেলাধুলা করে মৃতদেহের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা জেগে থাকে। দুদিন পর্যন্ত মৃতদেহকে নানা অলংকারে ভূষিত করে রাখা হয়। তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা প্রথম রাত্রিতে গৃহে থাকে। সে রাতে কেউ যদি ঘুমায় সে স্বপ্নে মৃতের ছবি দেখতে পায়। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মোলাক্কার কোন কোন দ্বীপে এমন বিশ্বাসও আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আত্মা হতচকিত হয়ে থমকে যায়, যেমন গাছ থেকে অকস্মাৎ পড়ে গেলে লোকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহের পাশে সারা রাত জেগে কাটায় এই কারণে যে, ইতিমধ্যে আত্মার সংবিৎ ফিরে আসবে।[১]

ইউরোপে যারা মৃতদেহকে কেন্দ্র করে রাত্রি জাগরণ করে তারাও অনুরূপ নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ওয়েন্ডরা সকলকেই জাগিয়ে রাখে পাছে অপর কেউ মৃত্যু-ঘুমে ঢলে না পড়ে। এই মৃত্যু-ঘুমের কারণ হিসাবে তারা মনে করে যে, ঘুমের মধ্যে মৃতের আত্মা তাদের মৃত্যু বরণ করার জন্য ডাকে। [এই জন্য ফাঁসী দেওয়া লোকের মৃত্যুস্থলে সহসা কেউ যেতে চায় না, বা ভূতের পাল্লায় পড়তে চায় না। কারণ, তারা নাকি এক ধরনের মৃত্যু-আকর্ষণ তৈরী করে।] ডয়াকদের মধ্যেও এই বিশ্বাস চালু আছে।[২] অনেক জায়গায় গরু ভেড়া পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা হয় এবং লোকে শস্য-দানা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত বুলগাররা কেবলমাত্র অতি নিকট আত্মীয়দেরই কাছে বসে থাকতে দেয়। এরা জাগরণের একঘেয়েমি দূর করে খেলাধুলা করে, যাতে মৃতের আত্মা অপর কোন দুষ্ট আত্মার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পরে।[৩] ল্যান্ডিসদের (Landes) ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা মৃতদেহ পাহারা দেয়। মৃত আত্মার উদ্দেশে এই সময় নানা ধরনের পানোৎসব করা হয়।[৪] আইরিশদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই জাগরণকালে এমন সব কাজ করা হয় যা অশ্লীলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তবে ইংরেজদের ক্ষেত্রে এই জাগরণের সময় হয় খুব অল্প। মৃতকে কেন্দ্র করে এই ধরনের জাগরণ-উৎসব লক্ষ্য করলে মনে হয় মৃতদেহ ঘরে থাকা পর্যন্ত নীরবতাকে বোধহয় পাপ বলে গণ্য করে তারা। বিশেষ করে গিলিয়াক

---

১ Riedel, 80, 267, 210.

২ International Archives, vi, 182.

৩ Globus, xc 140.

৪ Cuzaq 159.

(Gilyaks) সম্প্রদায় তাই মনে করে। সেই জন্যই এই ধরনের মৃত্যুকেন্দ্রিক জাগরণের উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

মৃত্যু কেন্দ্রিক ছুৎমার্গ : মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে ধরনের আচার-অনুষ্ঠানই পালন করা হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সর্বত্রই মৃত্যু সম্পর্কে একটা বিরাট ধরনের ভীতি রয়েছে। মৃতদেহ স্পর্শ করলে এই জন্য একধরনের নিয়ম পালন করতে হয়। যাকে পলিনেশিয়ানরা বলে টপু (Tapu)। ইংরেজীতে এর অর্থ হল দূষিতকরণ। তবে পলিনেশিয়ানরা টপু বলতে যা বোঝায় অন্য কোন ভাষায় এক কথায় তার কোন যথার্থ প্রতিশব্দ নেই। এই টপু শব্দকে সেই জন্য আধুনিক ভাষাকোষে গ্রহণ করা হয়েছে। এই টপুই ইংরেজীতে হয়েছে Tabu/Taboo. টপু বা ট্যাবু বলতে বোঝায় এমন কোন পূজোআর্চার জিনিস বা ভয়ের জিনিস যাকে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখা হয়। তাছাড়া যা দেখলে ঘৃণা বোধ হয় তাও Tabu-এর অন্তর্ভুক্ত। যে-কোন কারণেই হোক মৃতদেহও সেই জন্যই অচ্ছুৎ অর্থাৎ সকলে এই মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে না। প্রথম ভয় এর সংক্রামকতা। এই সংক্রামকতা দু'ধরনের হতে পারে ঃ—রোগ বীজাণুর ও প্রেতাত্মার। প্রেতাত্মাভীতি এতটাই প্রবল যে, সেই জন্য মৃতদেহের কাছে অতি সাবধানে যেতে হয়। সেই জন্যই একটা রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, একজন অপর আর একজনকে হত্যা করলে এমনকি যুদ্ধে হত্যা করলেও—এক ধরনের শৌচকার্য করতেই হয়। কখনও কখনও এই ছুৎমার্গজাত দূষণের হাত থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, সমাজ, গোষ্ঠী, এমন কি সম্প্রদায়ের মানুষকেও শুদ্ধিকরণের আশ্রয় নিতে হয়। নইলে সমগ্র ভূমি, এমনকি স্বর্গের পথও রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অ-কবরস্থ মৃতদেহ ইয়াকুৎদের কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা মনে করে যে, এতে প্রকৃতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঝড় ওঠে, দাবদাহ শুরু হয়। নানা রকম চিৎকার শোনা যায়। এ সবকেই এক ধরনের ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করে তারা। কোন কোন সময় অর্থাৎ পুরোহিত মারা গিয়ে তার সৎকার না হলে প্রকৃতির এই ক্ষিপ্ততা অবিশ্বাস্য রকমের ভয়াবহ হয়ে ওঠে।[১] মৃত আত্মার প্রতি প্রকৃতির এই সহানুভূতি লক্ষ্য করেই মানুষ ঠিক করেছে যে, যতক্ষণ না মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে ততক্ষণ কোন কাজই করা যাবে না। কোন কোরিয়াক মারা গেলে সেই জন্য তার সৎকার না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ থাকত। কেউ শিকারে যেত না, কাঠ সংগ্রহ করত না। এমন কি মেয়েরা তাদের সেলাইয়ের কাজ পর্যন্ত বন্ধ রাখত।[২] মধ্যাঞ্চলের এস্কিমোদের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, কেউ মারা গেলে প্রথম কয়দিন নাচগান বন্ধ থাকবে। তিনদিন কেউ লোহা, কাঠ, হাড়, পাথর, বরফ, চামড়া প্রভৃতি দিয়ে কাজ করবে না। এমন কি ভেড়াগুলিকে পর্যন্ত স্নান করাবে না। মহিলারা মুখ ধোবে না এবং কেশ

১ RHR xivi, 211.
২ Jessup, Expeditions, vi, 104.

পরিচর্যা করবে না। গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকবে [হিন্দুদের অশৌচ পালনের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে]। এরা মনে করে যে, মৃত্যুর পর তিনদিন আত্মা দেহের মধ্যেই থাকে। এই তিনদিনের মধ্যে নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করলে আত্মা এত ব্যথা পায় যে, প্রতিশোধের জন্য প্রচণ্ড তুষারপাত, রোগ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।[১] আবিসিনিয়ার বেরিয়া (Barea) ও কুনামা (Kunama)-দের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে চাষবাস, এমন কি শস্য মাড়াই পর্যন্ত বন্ধ থাকে। মৃতদেহের সৎকার হলে তবে আবার সব কাজ আরম্ভ হয়। মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে বহু গোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে।[২]

প্রাচীন নথিপত্র ঘাঁটলে আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। সিসেরোর লেখা থেকে জানা যায়—মৃতদেহ কবরস্থ করার পর কবরের উপর শস্যবীজ পোঁতা হত, কিংবা কোন গাছের চারা লাগানো হত, এটা করা হত এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। সম্ভবত আত্মাকে শান্ত করার জন্যই এমন করা হত, যাতে সে জীবিতদের জন্য শস্য জন্মাতে সাহায্য করে। হয়তো প্রাচীন কালে এমন বিশ্বাসও ছিল যে, মৃতদেহের সৎকার না হলে লাঙল চালানো নিষিদ্ধ। মৃতদেহ কবরস্থ করে তার উপর বীজ পুঁতে বা শস্য চারা লাগিয়ে পুনরায় কর্মারম্ভ হত [যেমন আমাদের দেশে হিন্দুদের ক্ষেত্রে অশৌচের সময় মৎস্য আহার নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর সেই উদ্দেশ্যে মৎস্যমুখ করা হয়। অর্থাৎ মাছ মাংস শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত tabu-এর আওতায় পড়ে।][৩] কঙ্গো উপত্যকায় বাম্বালা (এক ধরনের বান্টু জাতীয় মানুষ)-দের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, সব লোক শোকপ্রকাশকালে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাবে। এই সময় তারা মুক্ত আকাশের নিচে শয়ন করবে।[৪] মহাদেশীয় ইউরোপে রীতি চালু আছে যে, কেউ মারা গেলে গৃহশীর্ষে কাঠের বা খড়ের ক্রুশ বসানো হবে। অপর পক্ষে হল্যান্ড ও ফ্ল্যান্ডার্সে এই সময় গৃহের সামনে খড়ের স্তুপ রাখা হয়।[৫] প্রাচীন রোমানরা কেউ মারা গেলে বাড়ির সামনে সাইপ্রেস বা পাইন গাছের ডালপালা ঝুলিয়ে রাখত। এটা হয়তো করা হত লোকজনকে অশৌচের কথা জানাবার জন্য। এই একই কারণে ব্রিটেনে কোন গৃহে কোন ব্যক্তি মারা গেলে গৃহশীর্ষে মৃতের কোট ঝুলিয়ে রাখা হয়।

এই নিষিদ্ধকরণ, Tabu বা অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি করা হয় যখন কোন রাজা বা গোষ্ঠীপ্রধানের মৃত্যু হয়। কাফির (Kaffir)-দের কোন প্রধান বা

১ Boas, Eskimo of Banffin Land, 1901, pp. 131, 144.
২ Riedel, pp. 168, 197, 223 etc.
৩ Farnell, Cults of Greek states, 1896-1907, iii, 23.
৪ JAI, xxxv, 417.
৫ Bull, de, Folk Lore, ii (1893-95) 346.

গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে ক্রল গোষ্ঠীভুক্ত সব লোকই মাথা কামিয়ে ফেলে। এ সময় তারা স্নান করে না, দুধও খায় না। বা অন্য কোন ক্রল-এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। গুণিন এসে তাদের পরিচ্ছন্ন করে দিলে আবার তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ হয়।[১] নিলোটিক কাবিরোণ্ডো (Nilotic Kavirondo)-দের মধ্যে নিয়ম আছে যে, কোন নামীদামী লোক মারা গেলে তিনদিন গ্রামের লোকেরা মাঠে হাল দেবে না। যদি মৃতব্যক্তি গোষ্ঠীপ্রধান, হন তাহলে দশদিন ধরে কেউ চাষবাস করবে না। তিব্বতে দালাই লামা বা তাষি লামার মৃত্যু হলে সাতদিন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে। [সেই সব প্রথাই বর্তমানে পৃথিবীর কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর গুরুত্ব অনুযায়ী তিনদিন, সাতদিন ইত্যাদি করে সরকারি অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে অনুসরণ করা হয়।] মহিলারা এই সময় মাসাবধি কোন অলংকার পরতে পারে না। নরনারী সকলের ক্ষেত্রেই এ সময় (মাসাবধি) নতুন কাপড় পরা মানা। সকল শ্রেণীর লোকই এ সময় যে-কোন প্রকার বিলাসব্যসন, শিকার, প্রমোদ-ভ্রমণ, এমন কি প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক পর্যন্ত বন্ধ রাখে। ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা তাদের কেউ মারা গেলে বছরাবধি বিবাহোৎসব বা যে-কোন ধরনের উৎসবকর্ম থেকে বিরত থাকে। কোন দূর দেশেও কেউ যায় না।[২] [আমাদের ভারতেও হিন্দুদের মধ্যে কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে ছেলেরা এক বছর বিবাহ করতে পারে না।]

মৃতদেহের সংকার : নানা ধরনের ক্রিয়ার উদ্দেশ্য : কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে নানা ধরনের এই যে সব অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করা হয় এর মূলে উদ্দেশ্য হল মৃতের উত্তরাধিকারীরা যাতে দূষণমুক্ত থাকতে পারে। এবং পরলোকে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায়। সব জাতিই মনে করে যে, (অবশ্য নাস্তিক বস্তুবাদীরা ছাড়া), মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাযথ পালিত না হলে আত্মা পরলোকে তার যথার্থ স্থানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না, পিতৃ পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না, বা গৃহেও তাদের যে মর্যাদা পাওয়া উচিত (যারা পিতৃপুরুষের পুজো করে) সে মর্যাদা তারা পায় না। ফলে অতৃপ্ত আত্মা উত্তরপুরুষদের নানা ভাবে উত্ত্যক্ত করে। সংস্কৃতি যেখানে আজও যথেষ্ট অনুন্নত রয়েছে সেখানে এ ধরনের বিশ্বাস এখনও বেশ প্রবল। হিন্দুদের মত উন্নত সংস্কৃতির লোকেরা অজ্ঞও যথার্থ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অভাবে নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে ভুগে থাকে। [যেমন, শ্রাদ্ধে গোদান হলে গোরুর লেজ ধরে আত্মা বৈতরণী পার হবে। গো এবং বৈতরণী এই দুই শব্দের যথার্থ মানে না জানার ফলে এমন হয়। এমন কি সাত পাকে বিবাহপ্রথার অর্থও বোধ হয় ভারতবর্ষে কোন পুরোহিতই জানে না। গো অর্থ আলো যাকে বিন্দু বলে। তার অভ্যন্তরস্থ শূন্যতাই মোক্ষস্বরূপ। বৈতরণী হল পৃথিবী ও এই শূন্যতার মাঝামাঝি সূক্ষ্মস্তর যেখানে আত্মা ভাসমান অবস্থা বোধ করে। বিবাহের

১ Kidd Essential Kaffir, 1904, pp. 247, 249

২ Chandra Das, Journey to Lhasa, 1902, p. 256

সাত পাক হল দেহের সাতটি স্তর বা সপ্ততলের সঙ্গে গৃহিণীকে জড়িয়ে দেওয়া যাতে স্থূল সূক্ষ্ম এই সাতটি সত্তার সঙ্গেই সে চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে যায়।] প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের ক্ষেত্রে তো এই সব অনুষ্ঠান পুরাতত্ত্বের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এখনও তো খ্রীষ্টান-ইউরোপে গীর্জার নানা ক্রিয়া শেষে কবরভূমি পূতকরণের পর তবে মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হয়।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এইসব ক্রিয়ানুষ্ঠান বন্ধ থাকে ? স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য এই সব ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা থাকলেও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিশেষ বিশেষ ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকে। যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রে। যে-সব শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই মারা গেছে এবং যারা সমাজের নিয়ম অনুযায়ী দীক্ষিত হয়নি তাদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের কোনটাই প্রযোজ্য নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না এই কারণে যে, তারা কোন সংস্কার দ্বারা বন্ধ হবার সুযোগ পায় না। পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় সংস্কার-বন্ধন কাটিয়ে আত্মাকে মুক্তি দানের জন্য। যেখানে সংস্কার নেই সেখানে পারলৌকিক ক্রিয়ারও প্রয়োজনীয়তা হয় না। তাদের শুধু সমাধিস্থ করা হয়। [হিন্দুদের মধ্যে যাদের মৃতদেহের অগ্নিসংকারের ব্যবস্থা আছে তাদের ক্ষেত্রেও শিশুর মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এর পেছনে অবশ্য কারণ এই যে, শিশু কোন সংস্কার দ্বারা আবন্ধ নয়। প্রাক্তন সংস্কারের স্ফুরণও এখানে ঘটে না। সেই জন্য তাকে দাহ করা হয় না। যারা যথার্থ সাধক, তাদেরও এইজন্য সমাধিস্থ করা হয়—যাতে ভক্তেরা তাঁর সমাধিস্থানে এসে তাঁর সত্যচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। পোড়ানো হয় তাদের যারা নানা সংস্কারে বন্ধ। তারা মৃতদেহ পোড়ানো না হলে সংস্কারের চাপে সেই দেহের কাছেই ঘুরঘুর করে। তাদের বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যই পুড়ানো হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর আত্মা যখন তার স্থূল দেহের সাক্ষাৎ পায় না তখন বিভ্রান্ত হয়ে কর্মভার অনুযায়ী তার নিজস্ব স্তরে উঠে যায়।] ঐতিহাসিকদের ধারণা, মৃতদেহগুলিকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় শস্যবীজের মত তারা যাতে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠতে পারে সেই জন্য। যে গৃহে এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে সেই গৃহের কাছেই সেই জন্য তাকে কবর দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, সেই গৃহেই সে যেন নতুন করে জন্মাতে পারে। হিন্দুদের এই নিয়ম পৃথিবীর বহু দেশে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। টঙকিঙের থো (Tho)-রা শিশুমৃত্যুতে শেষকৃত্য করে না। এখানে ১৮ বছরের নিচে হলেই তাকে শিশু বলে কল্পনা করা হয়। অবিবাহিতা কুমারী কন্যা মারা গেলেও কোন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় না। [এ প্রথা ভারতবর্ষেও বিদ্যমান]। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো ও নিওলিটিক বান্টুদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে যে, শিশুদের মৃত্যুতে কোন পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না। এদের সাধারণত কবরস্থও করা হয় না। কোন জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়। ওয়াদজগুগরা মৃত শিশুকে নর্দমায় পুঁতে রাখে। পরে নর্দমা খুঁড়ে হাড়গোড় তুলে বাইরে ফেলে

দেওয়া হয়।[১] সভ্য ইউরোপেও খ্রীষ্টধর্মে অদীক্ষিত শিশুকে কোন পারলৌকিক ক্রিয়া না করেই সমাধি দেওয়া হয়।

নানা স্থানে পারলৌকিক ক্রিয়া ক্রীতদাস ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও করা হয় না। মাসেটের (Masset) হইদাদের মধ্যে ক্রীতদাসদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।[২] আফ্রিকায় প্রায়ই ক্রীতদাস, ভৃত্য ও গরীব সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর পর ফেলে দেওয়া হয়। বন্য পশুরা তাদের ভক্ষণ করে। [সম্ভবত আর্থিক অসঙ্গতি হেতুই এমন করা হয়।] মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ মানুষ মারা গেলে একটি মাদুরে মুড়ে মুখ সেলাই করে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ভ্যাংকুবারের সাধারণ মানুষ, বা বুড়িরা মারা গেলে কম্বলে মুড়ে তাদের মাটিতে ফেলে রাখা হয়।[৩] নিউ হেব্রাইডিস-এ (Hebrides) অপদার্থ লোকেদের কোন পারলৌকিক ক্রিয়া ছাড়াই সমাধিস্থ করা হয়। ওয়াদজগ্গরা সন্তানহীন পুরুষ বা মহিলাকে অরণ্যে ফেলে দেয়।

এদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবহার করার কারণ বোধহয় এই যে, আদিবাসী বা অন্যান্য সমাজের ধারণা, জীবিতকালে এরা যেমন নিবীর্য ছিল মৃত্যুর পরেও তাই থাকবে। কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এমন সব ক্ষেত্র আছে যেখানে এই কারণেই যে যথার্থ পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না, তা নয়।

অশুভ মৃত্যুর ক্ষেত্রেও পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না। তবে এই অশুভ এক এক জনের কাছে এক এক ধরনের হতে পারে। যেমন খ্রীষ্টানরা বর্বর আফ্রিকানদের মধ্যে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়াতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। কখনও কখনও কোন ক্রিয়াই করে না। আত্মহত্যা কেন করা হয়, তা নিয়েও নানা জনের নানা ভাবনা আছে। অসভ্য বর্বর, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে এ ভাবনা সমান নয়। টোগোল্যান্ডের ইউহি (Ewhe)-রা মনে করে যে, হতাশাক্রান্ত হয়ে পাগল হলে, বা ভূত-প্রেতে ধরলে, বা ঈশ্বর সেরকম ইচ্ছা করলে তবেই লোকে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যাজনিত ঘটনা ঘটলে ভূমি কলঙ্কিত হয়, অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এজন্য আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে খেসারত দাবি করা হয়। সরুমুখ কোন দণ্ড মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ কোন জঙ্গলে খুঁড়েরাখা গর্তে তাড়াহুড়ো করে ঢুকিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেয়। এর পর পারলৌকিক ক্রিয়া যা করা হয় তা নামমাত্র। কোন ঢাক বাজানো হয় না, নাচগান হয় না, রাস্তায় আলো জ্বলে না। মৃতের আত্মার উদ্দেশে কোন বলিদানও করা হয় না। কয়েকটি কলা, এক ধরনের বাদাম এবং কিছু ভুট্টা কবরের পাশে রেখে দেওয়া

১ Leonard, Lower Niger, 1906, p. 168, Cunninghum, Uganda, 1905, p. 344, Globus, ixxu, 1987, 199.
২ Jesup, Expedition, v, (1906) 179.
৩ Sproat, Scenes and Studies of Savage life, [Lond, 1868, P. 259]

হয় মাত্র। দুবার বন্দুক ছোড়া হয়। এর পরই ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়।[১] উত্তর আমেরিকার চোকটওরা (choctaws) মৃতদেহকে বধ্যভূমিতে সমাধি দেয়, তারপর এক সময় মাটি খুঁড়ে রীতিমত অনুষ্ঠান করে হাড়গুলি সংগ্রহ করে। তবে যারা আত্মহত্যা করে তাদের কোন রকম পারলৌকিক ক্রিয়া ছাড়াই কবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।[২] বজ্রাঘাতে কারো মৃত্যু হলে তাকে সরাসরি ঈশ্বরপ্রদত্ত মৃত্যু বলে ধরা হয়। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলে বেচুয়ানার অধিবাসীরা একটুও শোক প্রকাশ করে না। কারণ তারা মনে করে যে, ঈশ্বরের যথার্থ বিচার তার উপর নেমে এসেছে। নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি কোন অন্যায় করেছিল, না হলে এমন হতে পারে না। সাধারণত চুরি করাকেই তারা এই অপরাধ বলে মনে করে। এদের প্রতিবেশী—বাসুতো, জুলু ও বারোঙ্গারাও অনুরূপ তত্ত্বে বিশ্বাস করে।[৩]

ঈশ্বরের ক্রোধ নানাভাবে মানুষের উপর নেমে আসে, যেমন, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বন্য জন্তুর আক্রমণ, সর্প দংশন, জলে ডুবে মরা, গাছ থেকে পড়া ইত্যাদি। দক্ষিণ-পূর্ব ডয়াকরা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃতদের কবরস্থ করে না। বনে নিয়ে গিয়ে তাদের ফেলে দেয়। পার্টালি রাজ্যে কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাদেরও সমাধিস্থ করা হয় না। কোন নোংরা জায়গায় তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয় বা কুকুর ও শকুনের খাদ্য হিসেবে ফেলে রাখা হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত ধারণা আছে যে, লোকে জলে ডুবে মারা যায় জল-দেবতার ক্রোধের জন্য। এই জন্য ডুবন্ত কোন মানুষকে তারা উদ্ধারও করতে যায় না। জলে ডুবে, গাছ থেকে পড়ে ও বন্যপশুর আক্রমণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে বাবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা একে যুদ্ধের দেবতা রারাওলিয়াই (Rarawoliai)-এর দূতদের দ্বারা নিহত হয়েছে বলে মনে করে। এই হত্যা করা হয় তার আত্মা এরা খাবে বলে। এইসব মৃতব্যক্তির দেহ বাড়িতে রাখা হয় না বা বাচ্চাদের দেখানো হয় না। উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখে। তাদের লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে বধ্যভূমিতে রাখা হয়। এদের আত্মার কল্যাণে উপুলেরো (Upulero) দেবার উদ্দেশে শুয়র বলি দেওয়া হয়। এই শুয়র এরা খায় না, কারণ শুয়রকে তারা দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত সেই মৃতদেহ রারাওলিয়াই-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয়।[৪] হালমাহেরার উত্তর উপদ্বীপে কামপঙ থেকে দূরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের আত্মার কল্যাণে ভোজদানের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে যুদ্ধে মারা গেলে স্বতন্ত্র কথা। তখন যথারীতি তাদের সৎকার ও পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয়।[৫]

১ Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. iv, James Hastings Edt. P. 419.
২ 1 RBEW, 168.
৩ Arbonsset, Exploratory tour, Cape town, 1846, P. 225, Casalis, Basutos, 1861, P. 242 and others.
৪ Riedel—361.
৫ International Archives, ii, 209.

সর্বত্রই, বিশেষ করে আফ্রিকাতে নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য কেউ যদি বিষ পরীক্ষা দিতে গিয়ে মারা যায় তাহলে মনে করা হয় যে, কোন থান-শক্তি তাকে মেরেছে। সেই মৃতকে নির্দিষ্ট কবরখানায় সমাধিস্থ করা হয় না। জঙ্গলে নিয়ে কোন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। কিছু কিছু রোগে মারা গেলেও সেই ব্যক্তি অচ্ছুৎ পর্যায়ে পড়ে, যেমন, কলেরা, গুটিরোগ, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি। মাদাগাস্কারের কাছে নোসিবে দ্বীপের লোকেরা এইসব মৃত্যুকে দূষিত মৃত্যু বলে মনে করে অচ্ছুৎ পর্যায়ে ফেলে।[১] কোচিন চীনে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুও অচ্ছুৎ পর্যায়ে পড়ত।

আইভরি কোস্টের অগ্নিগোষ্ঠী যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু কোন তুক্‌তাক্‌ দ্বারা হয়েছে বলে মনে করে এবং কার দ্বারা সেই তুক্‌তাক্‌ করা হয়েছে তা যদি বের করতে না পারে, তবে মনে করে যে, কোন দৈবরোষে তার মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং দেবতার কাছে অন্যায় করার জন্য তাকে কবর দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পরেও এটা তার আর এক ধরনের শাস্তি।[২] হয়তো এ ধরনের ব্যবহার তারা সেই নিষ্ঠুর দৈবশক্তির ভয়েই করে। [ভারতবর্ষেও সেদিন পর্যন্ত গুটিরোগে এধরনের ভীতি ছিল। গুটিরোগকে বলা হত শীতলা মায়ের দয়া। যিনি গুটিরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তার উপর শীতলা মায়ের ভর হয়েছে মনে করে তাকে ধূপধুনো দিযে পুজো করে সকলে তার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করত]।

প্রাচীন গ্রীসে কোন অপরাধের জন্য রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিলে সেই মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হলেও নিয়ম মাফিক পারলৌকিক ক্রিয়া করা হত না। [ভারতে এমন ব্যক্তির দেহ চন্দনকাষ্ঠে দাহ করা হত]। বিশ্বাসঘাতক ও রাষ্ট্রধর্মদ্রোহীদেরও পারিবারিক কবরখানায় কবর দেওয়া হত না। নোসিবে দ্বীপেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে পারিবারিক কবরে সমাধিস্থ করা বারণ ছিল। পারিবারিক কবরে কাউকে কবর না দিলে 'পরলোকে গিয়েও আত্মা শান্তি পায় না' সেকালে এধরনের বিশ্বাস ছিল। ইউহি (Ewhe)-রাও এধরনের কোন মৃত দেহকে কোন রকম পারলৌকিক ক্রিয়া না করেই কবর দেয়।[৩] এই সেদিন পর্যন্ত বর্তমান ইউরোপেও রাষ্ট্র দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দেহকে শহরের তোরণদ্বার বা জনগণের প্রকাশ্য বিক্রয় স্থানে ফেলে রাখা হত। সেখানেই দেহ পচে গেলে তবে সরানো হত। কোন নিষিদ্ধ আওতাভুক্ত নিয়মভঙ্গ করলে বা দেবতার রোষে কারো মৃত্যু হয়েছে এমন ভাবা হলে তবেই তারা মৃতদেহের সঙ্গে এই ধরনেয় ব্যবহার বহুকাল ধরে করে এসেছে।

উপরে যেমন নিষিদ্ধ আওতার মধ্যে মৃত্যু হলে লোকে তার প্রতি পূর্বোক্ত ব্যবহার করত তেমনই অতি পবিত্র ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তাঁর মরদেহকে অনেক সময়ই

১ Steinmetz, 378.

২ Clozel and Villamur, op. cit. P. 120.

৩ Rohde, psyche? Freib, 1991, i. 217. Steinmetz Loc. cit, Globus, ixxii 42.

অচ্ছুৎ পর্যায়ে ফেলত। সেই পবিত্র দেহকে ছুঁয়ে কেউ পাপের ভাগী হতে চাইত না। আফ্রিকার মাসাইরা (Masai) সাধারণ মানুষকে কবর দিত না এই ভয়ে যে, এতে মৃত্তিকা বিষাক্ত হবে। তবে এরা গুণিন ও ধনী ব্যক্তিকে কবর দিত।[১] আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে একটু দূরে করসিকা (Corsica)-তে মহাত্মা ব্যক্তি ও যমজদের কবর দেওয়া হত পবিত্র কোন বৃক্ষের নিচে।[২] দ্বীপবাসী ডয়াকরা তাদের পুরোহিতদের মৃতদেহ উচ্চস্থানে রেখে দিত, কবর দিত না। বাকীদের কবর দেওয়া হত। তবে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকে কবর না দিয়ে ঘটনাস্থলেই কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত, যাতে বন্য জন্তুরা মৃতদেহের কাছে যেতে না পারে।[৩] বিশেষ সম্মান দেখানোর জন্য বিহারের সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়ারা তাদের পুরোহিতদের কবর না দিয়ে বটগাছের নিচে ছায়াতে রেখে দেয়। উত্তর আমেরিকার কাড্ডেরা (Caddes) যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকে কবর দেয় না। কয়েকটি আফ্রিকান উপজাতি, যেমন, লাটুকা ও ওয়াদজগুগরাও যুদ্ধে নিহতদের কবর দেয় না। এই কবর না দেবার কারণ এই যে, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের কবরে তারাও একদিন অনুরূপ দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়বে।[৪]

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় আফ্রিকাতেই নিয়ম আছে যে, শিশু জন্ম দিয়ে বা জন্ম দেবার কালে কোন মহিলার মৃত্যু হলে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র থেকে একটু দূরে তাকে সমাহিত করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না। তারা বিশ্বাস করে যে, কোন প্রকার অভিযোগের ফলে তাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর এরা প্রেতাত্মায় পরিণত হয় বা বাদুড় হয়ে যায়। সুতরাং এরকম কোন মৃত্যু হলে সে জন্য পরিবারে বিশেষ রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে তার প্রেতাত্মাকে শান্ত রাখার জন্য বলিও দেওয়া হয়, বিশেষ করে উন্নানে (Yunnan)।[৫]

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ সব ধ্যানধারণার কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। তবে Tabu বা ছুৎমার্গ রয়েই গেছে। অনেক উপজাতির মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে যে, ঋণ মাথায় নিয়ে যার মৃত্যু হয়, ঋণদাতাদের খুশি না করা পর্যন্ত তাকে কবর দেওয়া যাবে না। পারলৌকিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই যে নির্মম চিন্তা, এর কারণ, ভবিষ্যতে সে যাতে সুখে থাকতে পারে। মধ্যযুগীয় ইউরোপেও এই প্রথা চালু ছিল। দেখা যাচ্ছে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দেও ঋণশোধ করতে না পারার জন্য মৃতদেহকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছিল শোরেডিচ নামক স্থানে। এতে প্রমাণ হয়, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত থাকলে তার মৃত্যুর পর সে পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে

১ Hollis, 305
২ Nassau, 41.
৩ TES, new series, ii, 1863, 936.
৪ Frobenius, 541, Cunningham-370, Globus ixxxix, 199.
৫ Anderson, Report on Expedition to W. Yunnan, 1871, P. 101.

পারে। সেলেবিস দ্বীপ ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও ঋণী ব্যক্তি মারা গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঋণ শোধ করা হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কবর দেওয়া যায় না। ফ্যাটিসদের মধ্যে রীতি আছে, যদি কেউ তা সত্ত্বেও মৃতদেহকে কবর দেয় তাহলে তার ঋণ কবরদাতাকেই শোধ করতে হবে।[১] ঘটনাটি প্রচলিত হয়েছিল সম্ভবত কোন লোককথা থেকে। এ ধরনের লোককথা ভারতবর্ষ থেকে আয়ারল্যান্ড অবধি ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় সাহিত্যের বড় প্লট হিসেবেও কাজ করেছে।

সৎকারের নানা প্রকারভেদ : মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকারের নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। ঐতিহাসিকেরা পর্যালোচনা করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন নরখাদকতা, কোন স্থানে মৃতদেহ ফেলে রাখা, গুহাসৎকার, মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া, গৃহে মৃতদেহ রক্ষা করা এবং মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা।

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নরখাদকতা ছিল। নানা কারণে এই নরমাংস ভক্ষণ করা হত। ক্ষুধার জ্বালায়, প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া না গেলে, প্রতিহিংসাবশে শত্রুকে নিধন করে, বন্ধুবান্ধবের দেহ ও আত্মীয়দের দেহ ভক্ষণ করে। সম্ভবত শেষ দুটি ক্ষেত্রে তাদের তেজ ও শক্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার জন্য নরমাংস খাওয়া হত। নরবলি দিয়েও নরমাংস ভোজন করা হত। সেই জন্য কেউ মারা গেলেই তার সৎকার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

মুক্ত আবহাওয়ায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নিচে মৃত দেহ ফেলে রাখা হত এক সময়। এসময় মানুষ বর্বরতার পর্যায়ে ছিল। তারা তখন সভ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া আজও অনেক উপজাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি অর্থাৎ রাজা, সামন্ত-প্রভু ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ লোককে মৃত্যুর পর বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এ-জন্য কোন ক্রিয়া করা হয় না। মাসাইরা শুধু গুণিনদেরই কবর দেয়। কারণ তাদের তারা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অংশ হিসেবে মনে করে থাকে। অর্থাৎ একধরনের ঈশ্বরের পুত্র। তবে এমন কথাও মনে করার কারণ নেই যে, কবর দেবার প্রথা সভ্য জাতিদের মধ্যেই আছে। কালিফোর্নিয়া গালফের সেরিদের মধ্যে দেখা যায়, অত্যন্ত অনুন্নত সংস্কৃতির হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়।[২] জরথুস্ত্রবাদীরাও দেহ সৎকার না করে পশুপাখিদের খাবার হিসেবে ডেথ-টাওয়ারে রাখে। উদ্দেশ্য, মৃত্যুর পরও যেন মৃতদেহ জীবের কল্যাণে আসে। সিংহলের বেড্ডারাও মৃতদেহকে জঙ্গলে নিয়ে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখে।[৩] অস্ট্রেলিয়ার উপজাতীয়দের মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ফেলে দেওয়া, খেয়ে ফেলা,

---

১ Cruickshank, Eighteen years on the Gold Coast, Lond, 1853, ii, 221.

২ 17 RBEW 288*.

৩ Davy, An Account of the Interior of Ceylon, Lond 1821, 117.

কবর দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা। যেখানে মৃতদেহ ফেলে রাখার রীতি ছিল সেখানে হয়তো কোন তক্তাতে তাকে শুইয়ে দেওয়া হত, বা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হত। উনমৎজেরা-রা বৃদ্ধ, পঙ্গু ও সমাজের রীতিভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সৎকারের ব্যবস্থা করত। অপর পক্ষে আন্দামান দ্বীপের অধিবাসীরা যাকে বেশি গণ্যমান্য করে তাঁরই দেহ এইভাবে ঝুলিয়ে রাখে।[১] পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে মৃতদেহকে মাচায় শুইয়ে রাখা, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা বা দুই দিকে দুই বাঁশ পুঁতে তাতে দড়ি টাঙিয়ে সেই দড়িতে বেঁধে রাখা একটা সাধারণ নিয়মের মত। ভারতবর্ষের অসমের কোন কোন অংশেও এমনিভাবে মৃতদেহের সৎকার হয়ে থাকে।

আমেরিকা মহাদেশেও মৃতদেহকে এইভাবে ফেলে রাখা, বা ঝুলিয়ে রাখা একটা সাধারণ রীতির মধ্যে ছিল। উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে এটা ছিল একটা স্বাভাবিক সৎকারব্যবস্থা। দেহকে ঝুলিয়ে রাখা হত এই কারণে যাতে মাংসভুক কোন পশু তাকে খেতে না পারে, রোদে শুকিয়ে দেহ যেন মমির মত হয়ে যায়।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার হুরনরা এবং আরও কিছু গোষ্ঠী তক্তা দিয়ে বেঁধে বা গাছ খোড়ল করে তার মধ্যে মৃতদেহ রেখে সেই দেহ কবর দিত বা তার উপর লতাপাতা চাপিয়ে দিত। ব্ল্যাকফিটদের কাছে কবর দেওয়া ছিল ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ মাটির নিচে দেহ পোকা-মাকড়ে খাবে একথা তারা ভাবতেও পারত না। শুধু বন্য পশু বা পাখিদের ভোজ্য হিসেবে দেহকে তারা উঁচু জায়গায় রেখে দিত, যেমন পাহাড়ের চুড়ো। এস্কিমোরা প্রায়শই মৃতদেহ মাটির উপর ফেলে দিয়ে আসে। কেউ কেউ তাদের মধ্যে এক ধরনের কফিন তৈরি করে কবর দেয়।[২] কামৎচাডালরা মৃতদেহকে কুকুরের খাবার হিসেবে ফেলে রেখে দেয়। সাইবেরিয়ার চুকচি, গিলিয়াক ও অন্যান্যরাও এই ধরনের রীতিতে অভ্যস্ত। না হলে তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। ইয়াকুৎরা কফিনে পুরে মৃতদেহকে বাক্সে ভরে গাছে ঝুলিয়ে রাখে অথবা অরণ্যের মধ্যে বধ্যভূমিতে ফেলে রেখে দেয়।[৩] নিউ ক্যালেডোনিয়াতে মৃতদেহকে কোন পাহাড়ের চুড়ায় লতাপাতা বা শুকনো ঘাসের বিছানায় রাখা হয়।[৪]

মুক্ত আকাশের নিচে, মাটিতে, গাছের ডালে, পাহাড়ের চুড়োয় প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহ এইভাবে ফেলে রাখার রীতি ঐতিহাসিকদের মতে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের উঁচু স্থানে মাসের পর মাস মাটি ঠাণ্ডায় এমন জমে থাকে যে, খুঁড়ে সেখানে কাউকে কবর দেওয়া সম্ভব হয় না। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও বর্তমান কানাডার কোন কোন স্থানে মাটি খোঁড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্য ক্যানাডিয়ানরা শীতের সময় মৃতদেহ মাটির উপরেই ফেলে রাখে। বসন্তের

১ **Indian Census Report, 1901, iii, 65.**
২ **Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edt, James Hestings, vol. iv, P. 424.**
৩ **Jesup, Expedition, vi, 104, RHR, xivi, 211.**
৪ **L. Anthrop, xiii, (1902) 547.**

আবির্ভাব পর্যন্ত মৃতদেহ সেখানেই থাকে। এক্ষেত্রে আধুনিক কানাডার অধিবাসীরা বাধ্য হয়েই তাদের বর্বর পূর্ববর্তী স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি অনুসরণ করে।

নাসকোপিরা অদ্যাবধি শীতের সময় মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গ্রীষ্ম ফিরে এলে সমাধিস্থ করে।[১]

গুহা-সমাধি ঃ মৃতদেহ সংকারের একটি পুরানো রীতি হল গুহাতে সমাধি দেওয়া। নব্যপ্রস্তর যুগে নানা গুহায় এমন বহু সমাধির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। নব্যপ্রস্তর যুগের অনেক পরে হলেও প্রাচীন হিব্রুরা গুহাতে মৃতদেহ রেখে দিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। মোলাক্কা, ফিলিপিন, স্যান্ডউইচ ও প্রবাল দ্বীপে দুর্গম বহু গুহায় এধরনের মৃতদেহ সংকারের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গণ্যমান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে শত্রুর হাতে তাঁর মৃতদেহ যাতে লাঞ্ছিত না হয় সে জন্য এমন দুর্গম স্থানে তা রেখে দেওয়া হত। এই প্রথা অনুসরণ করেই মাদাগাস্কারের বেতসিলিওরা তাদের গোষ্ঠী-প্রধানদের কোন গুহায় রেখে দিয়ে আসত। আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণ সর্বত্রই প্রায় এমন হয়ে থাকে (অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে)। হোটেনটটদের কাছে এটি চিরদিনই প্রচলিত রীতি হিসেবে চলে আসছে। কুইস্সাঙ্গা (Quissanga) ও কুইটেভিদের রাজারানীদের ক্ষেত্রে এধরনের কবর দেওয়া একটি বিশেষ সম্মানের বিষয়।[২] উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আলাস্কা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত এবং এলুসিয়ান (Alutian)-এর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা উপজাতির মধ্যেও এই ধরনের কবর দেবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। আরিজোনা এবং নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো (Pueblo) জাতীয় লোকেদের মধ্যে এ ধরনের কবর দেবার রীতি দেখে ঐতিহাসিকেরা ধারণা করেন যে, এক সময় তারা যে গুহায় বাস করত এ সেই গুহা-বাসেরই একটি স্মৃতি মাত্র। তারা যখন গুহায় বাস করত তখন গুহার গভীর অন্তঃপুরে কোথাও তাদের কবর দেওয়া হত। সেই থেকে প্রাগৈতিহাসিক সেই ধারাই তারা অনুসরণ করে আসছে।

সম্ভবত এই গুহাসমাধির ঐতিহ্য অনুসরণ করেই প্রাচীন মিশরে কৃত্রিম সমাধিসৌধ বা পিরামিড তৈরী করার রীতি চালু হয়েছিল।[৩] সেই পিরামিড রচনার কৌশল মিশরে এক ধরনের স্থাপত্যকলার সৃষ্টি করেছে। সিসিলিতে বিরাট ধরনের পিরামিড তৈরি করা সম্ভব না হলেও এক ধরনের কৃত্রিম কবরখানা তৈরি করার রীতি গড়ে উঠেছিল। সাইরাকুজের কাছে সিকুলিতে (প্যান্টালিকার কাছে) এ ধরনের বহু কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। পর্বতসঙ্কুল স্থানেই সাধারণত এ ধরনের কবর দেবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অন্যত্র যেখানে কৃত্রিম এই পার্বত্য ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করে সমাধি

১ 11 RBEW, 272.

২ Recent South Eastern Africa—vii (1901) 378, 382, Kolbin 313.

৩ American Anthropology—vi, New Series 656.

দেওয়া হত, সেখানে পরিবেশ ও আবহাওয়া এধরনের সমাধিকে সাহায্য করত। আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যত্র সরাসরি উপর থেকে নিচে এক ধরনের কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা ছিল। পাশে একটি গুহার মত তৈরি করা হত। যেখানে মৃতদেহকে রাখা হত। এ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গুহাসমাধির ধারা অনুসরণ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। ফিজি দ্বীপসমূহের নানা স্থানেই এধরনের কবর দেবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের মত ক্রীটেও পাহাড়ের গুহা কুঁদে এক ধরনের কবরস্থান তৈরি করা হত। এও যে গুহাসমাধির স্মৃতিকে মনে রেখেই করা হত তাতে সন্দেহ নেই। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও এধরনের কবর দেবার রীতি চালু হয়েছিল।

সলিলসমাধি : মৃতদেহ সংকারের সহজতম উপায় বোধ হয় জলে ফেলে দেওয়া। বিহারের গরীবদের মধ্যে বহু স্থানে এই ধরনের প্রথা চালু আছে। মৃতদেহ সংকারের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয় বলেই বোধহয় গরীবেরা এমন করে থাকে—বিশেষ করে ভারতে গঙ্গার তীরে। গঙ্গাজল স্পর্শ করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সংগতি লাভ করে এই বিশ্বাস থেকেই বোধ হয় এমন করা আরও সহজ হয়েছে।[১] ভারতে এ ধরনের বিশ্বাস থেকে সলিলসমাধি দেবার ব্যবস্থা হলেও অন্যত্র ভিন্নতর বিশ্বাস থেকেও সলিলসমাধি দেওয়া হত। লোকে ভাবত যে, মৃতদেহ জলে ভেসে গেলে অনেক দূরে চলে যাবে। সেখান থেকে ফিরে এসে—উত্তরপুরুষদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। একথা সহজেই ভাবা যেতে পারে যে, অনুন্নত সভ্যতার মানুষেরাই এমন ধরনের সংস্কারকে মূল্য দিয়ে থাকে। পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে এই বিশ্বাস চালু আছে যে, জলে ফেললে দুষ্টাত্মারা আটকে পড়ে, আর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

তিব্বতে সন্তানবতী মাতা, সন্তানহীনা রমণী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃতদেহকে অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হয়। হয় তাদের কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া বা অধিত্যকা ডিঙিয়ে দূরে কোথাও ফেলা হয়, নয়তো সাঙপো নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। কেন এমন করা হয়? হয়তো এই বিশ্বাস থেকে যে, গর্ভাবস্থায় মৃত্যু হলে দুটি প্রেতাত্মা একত্রে ভয়ানক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এবং সন্তানহীনা রমণী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কুষ্ঠরোগ মহাপাপজাত। এই জন্যই এদের প্রেতাত্মা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ধারণা থেকেই তাদের মধ্যে একধরনের ছুৎবাই জন্মগ্রহণ করেছে।

প্যারাগুয়ের গুইয়াকি ও চেরোকিরা তাদের মৃতদেহকে নিকটবর্তী কোন নদীতে ফেলে দেয়। 'উতা'-এরা তাদের ঝর্ণার জলে রেখে আসে। এদের ক্ষেত্রেও বোধহয় একই ধারণা কাজ করে যে, মৃতদেহ দূরে ভেসে গেলে তাদের আত্মা আর ফিরে এসে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের ভগরপন্থী থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আফ্রিকার বহু উপজাতির মধ্যেই এই ধরনের বিশ্বাস কাজ করে থাকে। তবে

১ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্যে এই গঙ্গা কিন্তু আত্ম-গঙ্গা, **Temples of India, Stella Kramrisch vol. I p 3** দ্রষ্টব্য।

সলিলসমাধির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিশ্বাস কাজ করলেও ভিন্নতর বিশ্বাসও রয়েছে। কোথাও সলিলসমাধিকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ভারতবর্ষে এই প্রথা উঁচু নিচু সকলশ্রেণীর মধ্যেই বর্তমান। সলিলসমাধির সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এই কারণে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোক বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হয়। একই কারণে মৃতদেহের ভস্মাবশেষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়, যেমন নাভি। অনেক ক্ষেত্রে শবভস্ম রেখে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হবে বলে। বিসমার্ক উপদ্বীপের লোকদের মধ্যে অদ্ভুত এক রীতি চালু আছে। অত্যন্ত প্রিয়জন ও খুব সুদর্শন ব্যক্তির মৃতদেহ নৌকো করে নদীপথে তাদের কবরের মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গিয়ে শবদেহকে জলে নিমজ্জিত করে। পলিনেশিয়াতে মৃতদেকে নদীতে ফেলে দেওয়া একটা সাধারণ প্রথা। শোনা যায় গ্রানাডার চিবচাতে ওভিয়েডো (Oviedo)-রা সোনার শবাধারে রেখে গোষ্ঠী-প্রধানদের মৃতদেহ নদীর জলে ডুবিয়ে দিত।[১] ভাইকিংদের পুরাণকাহিনীতে আছে যে, নিহত বলদুরের মৃতদহকে তারা তাঁর স্ত্রী, অশ্ব ও দ্রোপনির নামে ওডিন দেবতার আংটিসহ জাহাজের উপর সাজানো একটি চিতার উপর রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে সেই জাহাজ জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এটি একটি পুরাণ-কাহিনী হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যুদ্ধপ্রিয় ভাইকিংদের বীরযোদ্ধা ও কোন রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এইভাবেই সৎকার করা হত।[২]

পৃথিবীর নানা স্থানেই দেখা যায় যে, মৃতদেহকে নৌকোয় শুইয়ে শেষকৃত করা হচ্ছে। নতুবা মাটিতে ফেলে রাখা হচ্ছে। 'এই নৌকো-শবাধার' জলে ভাসিয়ে মৃতদেহ সৎকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মাত্র ভাইকিংদের ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর অন্যত্রও এ ধরনের ব্যবস্থা যে ছিল উপরোক্ত সৎকাররীতি লক্ষ্য করলে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

কবর বা সমাধিঃ—কবর দেবার প্রথা পৃথিবীর নানা জাতির মধ্যেই রয়েছে। তবে কিভাবে কবর দেওয়া হবে তা নিয়ে নানা ধরনের রীতি রয়েছে। যেমন কোন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কাছে মৃতদেহ কবর দেবার কোন স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। যে যেমনভাবে পারে কবর দেয়। উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকার বান্টু, বাতাবেনে ও বারোৎসেদের কথা উল্লেখ করা যায়। বারোৎসেরা খুব গোপনে মৃতদেহ কবর দেয়। এই গোপনীয়তার কারণ এই যে জাদুকর বা ডাইনীবিদ্যাবিশারদ লোকেরা যেন এর কোন হদিস না পায়। কারণ দেখা যায় যে, আফ্রিকার গুণিনরা মড়ার হাড় দিয়ে জাদুকাঠি তৈরি করে। [ভারতবর্ষেও এক ধরনের কাপালিক আছে যারা নরকঙ্কালকে তাদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যবহার করে। এর কারণ বোধহয় এই যে, যতক্ষণ দেহের স্থুল সত্তার সামান্য কিছুও কোথাও থাকে ততক্ষণ জীবাত্মা সেখানেই থেকে যায়।

১ **Chandra Das op. cit, 255.**
২ **International Archaeology, xiii, Supplementery, 56.**

জাদুকর বা গুণিনরা সেই জীবাত্মা বা প্রেতাত্মাকে বশীভূত করে নানা কাজ করে বলেই কংকাল বা মড়ার হাড় কাছে রাখে। এই কারণেই হিন্দুরা সাধারণত মানুষের দেহকে পুড়িয়ে নিঃশেষিত করে দেয় যাতে জীবাত্মা কোথাও তার স্থূল দেহের সামান্য অংশও খুঁজে না পায়। শুধু সাধু-সন্তদের সমাধি দেওয়া হয় এই কারণে যে, তারা মুক্তাত্মা, স্থূল অনিত্য দেহের স্বরূপ জানে। সেই জন্য দেহের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মৃত্যুর পর তাঁদের জীবাত্মা বাসনাহীন হাল্কা সূক্ষ্ম দেহে নিজস্ব লঘুতার অনুরূপ স্থানে উঠে যায়। কবর দেওয়া হলেও স্থূল দেহের টানে তারা সেখানে ঘোরাফেরা করে না। তাঁদের সমাধি দেওয়া হয় এই কারণে যে, সেই সমাধিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্যবর্গেরা যাতে মিলিত হয়ে তাঁর আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে।] মোলাক্কার কোথাও কোথাও গ্রামের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কবর দেওয়া হয়। চিলকোটিনরা যেখানে কারো মৃত্যু হয়, সেখানেই তাকে কবর দেয়।[১] চৈনিক ও দূরে প্রাচ্যের অন্যান্য কিছু জাতির ক্ষেত্রে দৈবজ্ঞরা সমাধি-স্থান ঠিক করে দেন। চৈনিক ভাষায় এই বিদ্যা বা কলাকে বলে 'ফাঙ সুই'। De Groot একে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রথা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এর উদ্দেশ্য লোকদের দেখানো যে, কোথায় কবর, কোথায় মন্দির বা কোথায় বাসগৃহ হবে। এর আর এক উদ্দেশ্য হল দেবতা, মৃতমানব বা বাসস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কারো যেন কোন অসুবিধা না হয় তা দেখা কিংবা প্রকৃতির শুভ প্রভাব যে অঞ্চলে রয়েছে মৃতদেহকে সেখানে কবরস্থ করা।[২] চীনারা হয়তো বিশ্বাস করত যে, জীবিত মানুষেরা যেমন গৃহে বাস করে মৃত ব্যক্তিরাও তেমনি কবরে বাস করে। এ ধারণা যে শুধু চীন বা আশেপাশের অঞ্চলেই রয়েছে তা নয়। অনুন্নত সংস্কৃতিতে সর্বত্রই এ বিশ্বাস আছে। মানুষের সংস্কার এ ধরনের বিশ্বাসকে সহজে ত্যাগ করতে পারে না যদিও দার্শনিক ও বড় বড় ধর্ম প্রচারক বা প্রবর্তকেরা এ ধরনের বিশ্বাসকে ভাঙবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোথাও কোথাও মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে কোথায় তাকে কবর দেওয়া হবে তা জেনে সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। (যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের দেহাবশেষ সেন্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে এনে ফ্রান্সে সিয়েন নদীর ধারে কবরস্থ করা হয়েছে)। বাবর দ্বীপপুঞ্জে আবার কবরস্থান নির্ণয়ের দায়িত্ব শবাধারের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন মৃতদেহকে জিজ্ঞেস করা হয় কোন্ দিকে সে কবরস্থ হতে চায়। সেই প্রশ্ন অনুসারে কফিন যে দিকে নড়ে উঠে সেই দিকেই তাকে কবর দেওয়া হয় [অবিশ্বাস্য হলেও, কিছুটা আমাদের দেশে বাটি বা কড়ি চালান দেবার মত]। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে তা হল এই ঃ—লোকটি কিভাবে মরেছে, তা ক্ষতিকর বা শুভ কিনা তা দেখে

১ Jesup, Expedition ii, [1900-8] 788.

২ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edt. James Hastings vol IV P. 422.

মৃতের প্রতি আত্মীয়স্বজনের মনোভাবের উপরই মৃতদেহ সংকারের স্থান, কাল ও পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়।

শিশুর কবর: শিশুর কবর নানাস্থানে দেওয়া হয়, যেমন, মায়ের ঘরের ভেতর বা প্রবেশ পথে। এমন করা হয় বোধ হয় এই বিশ্বাসে যে, শিশুর পুনর্জন্ম হবে। উপরোক্ত প্রথায় শিশুর কবর দেওয়ার রীতি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ভারতে পাঞ্জাব, নাগাল্যান্ডের নাগা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কারোবাটক, ক্রীক, জাভা, দক্ষিণ মেক্সিকোর সেমিনোল, চোল, এবং মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে দেখা যায়। কাইজার দ্বীপে রীতি চালু আছে, শিশুর মৃত্যু হলে যে ঘরে মা বাবা থাকেন সেখানে তাদের নিদ্রাশয্যার নিচে তাকে কবর দেওয়া হবে। অপর পক্ষে আরু দ্বীপপুঞ্জে তাদের করবস্থ না করে মা-বাবার শয়নকক্ষের উপরে ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে। তিব্বতে নবজাতক মারা গেলে হয় তাকে ঘরের ভেতর কবর দেওয়া হয় অথবা চালের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রাচীন ইটালীতে মৃত শিশুকে ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হত। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রুশ কৃষকরা মৃত শিশুকে ঘরের মেঝেয় কবর দিত। শিশু ছাড়া অপর কেউ মারা গেলে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, এবং আফ্রিকার নিগ্রো ও বান্টুদের মধ্যে রীতি আছে দূরে তাকে কবর দেওয়া বা কোথাও ফেলে রাখা। তবে এদের মধ্যে পরিবারের কর্তাব্যক্তি মারা গেলে তাকে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও কবর দেওয়া হত। আফ্রিকার নানা উপজাতি এই কবর দেয় গ্রামের কাছে কোন স্থানে। তবে আইভরিকোস্টের উপজাতিরা এই কবর দেয় ঘরের মধ্যেই। [ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও এই রীতি ছিল। গৃহী সাধুদের ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হত, যেমন, লেখকের মেসোমশাইকে ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়েছিল।] পশ্চিম আফ্রিকার বান্টু ও অন্যান্যরা পরিবারের কর্তা মারা গেলে ঘরের মধ্যে রান্নাঘরের কাছাকাছি কোথাও তাকে কবর দেয়। অতি প্রিয় ব্যক্তি বা গৃহকর্তার জন্য এই ব্যবস্থা। এ ধরনের কবর পাওয়া বিশেষ সম্মানজনক। সম্ভবত পিতৃপুরুষ পূজার ধারা বেয়েই এই ধরনের কবর দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। গৃহকর্তার মৃত্যু হলে সবাই প্রায় বাসগৃহেই তাঁকে কবরস্থ করত।[১]

মাদাগাস্কারে এই কবর দেবার রীতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন প্রকার। বেৎসিমিসরকা, সাকলাভা, এবং অন্যান্য গোষ্ঠী একটু দূরে ও নির্জন স্থানে কবর দেয়। কবরস্থানকে এরা ভয় করে থাকে। অথচ এখানকার বেৎসিলিও হোবাস (Hovas)-রা এই কবর দেয় পথের ধারে অথবা দুটি গৃহ বা গ্রামের অন্তর্বর্তী স্থানে।[২]

দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যবাসী ও প্যাম্পাসদের মধ্যেও অনুরূপ সমাধিপ্রথা অর্থাৎ গৃহের মধ্যে সমাধি দেবার ব্যবস্থা ছিল। উনানরা কবর দেয় নদীর মধ্যে কোন ছোট

১ Ency. R: E. Edt Jams Hastings. P. 422. Not. IV

২ Int. Arch. xiii, Supplementery 85.

দ্বীপে। এদের বিশ্বাস প্রেতাত্মা জল অতিক্রম করতে পারে না। কখনও কখনও যে ঘরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাকে সেই ঘরেই কবর দেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে গৃহের অন্যান্য বাসিন্দারা সে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভীতিই কাজ করে। উত্তর আমেরিকার কিছু উপজাতি, যেমন হুপা (Hupa) বিচিত (Wichita) নেজ পারসে (Nez parse) শুস্বাপ (Shuswap) এবং টমসন ইণ্ডিয়ানরা—গ্রামের কাছে বা শিবিরের কাছে তাদের মৃতদেহ কবর দিত। ক্রীক এবং সেমিনোলরা ঘরের মধ্যেই কবর দেবার রীতি অনুসরণ করত। কালিফোর্নিয়ার লোমলাকিরা কবর দিত দূরবর্তী স্থানে। জুনিরা (Zunis) আদিমকালে হয় তো গুহার ভেতরে তাদের মৃতদেহকে কবর দিত। বর্তমানে উঁচু চালওয়ালা ঘরের চালু স্থানে মৃতদেহ রেখে দেয়। উঁচু চাল হয়তো পাহাড়-পর্বতের অনুসরণেই করা হয়।[১] পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপবাসী এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে যে ঘরে সে মারা যায় সেই ঘরেই বা বসতবাটীতে কবর দেয়। তবে সর্বত্রই যে একই নিয়ম চলে তা নয়। ফিজির ভিটি লেভু নামক স্থানের অভ্যন্তর ভাগে 'রা' প্রদেশে লোকেরা ঘরে ঢোকার মুখে মৃতদেহকে কবর দিত। কখনও কখনও এরা পুরুষ-ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকবরে সমাধিস্থ করত। যারা মৃতদেহ বা প্রেতাত্মাকে ভয় করে তারা কবর দিত দূরে কোন স্থানে। ভারতের অসম প্রদেশে (প্রাক্তন আসাম) কোন কোন উপজাতি মৃত ব্যক্তিকে ঘরে ঢোকার মুখে কবর দেয়। প্রাচীন আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে সাধারণ মানুষকে ঘরের মেঝেতেই কবর দেওয়া হত।[২] পশ্চিম চীনের লোলোদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার অনুষ্ঠান করা হলে পরদিন সমাধি স্থানে (Death Chamber) একটি গর্ত খুঁড়ে প্রার্থনা জানানো হত যাতে মৃতের আত্মা নেমে এসে সেখানে সমাধিস্থ হয়। এ করা না হলে প্রেতাত্মা কারো ক্ষতি করবে তারা এরকম বিশ্বাস করত।

সাধারণত কবরস্থান হয় ঝোপঝাড়ে, কাঁটাবনে বা ঘেরাও করা সমাধিস্থলে। বান্টুদের মধ্যে এ ধরনের স্থানে সমাধি লাভের সৌভাগ্য হয় গুণিন, গোষ্ঠীপ্রধান, রাজা বা পুরোহিতদের। রোতুমা দ্বীপে গোষ্ঠী প্রধান ও পুরোহিতেরা পর্বতশিখরে সমাধিস্থ হন।[৩] অভিজাত নরম্যানরা উঁচু কোন অকর্ষিত স্থানে বা পাহাড়ের উপর কোন ঢিবিতে সমাধিস্থ হতে ভালবাসত। উত্তর আমেরিকার আরাপাহো, উইচিত বা বিচিত (Wichita) এবং অন্যান্য উপজাতি সাধারণত পাহাড়ের চূড়াতে বা নদীর কোন উঁচু পাড়ে তাদের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে থাকে।

অনেক জাতির মধ্যে পরিবারগত কবরভূমি আছে। নিজেদের ধারা অনুযায়ী

---

১ BRBEW, 336, 345, 346, 465.
২ ARW.× 105.
৩ JAI, xxvii [1809] 431, 432.

সেখানে তারা মৃতদেহকে কবর দিয়ে থাকে। পরিবারগত কবরভূমি আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে চলে আসছে। আত্মীয়তাবোধ থেকেই এই পরিবারগত কবরভূমির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক, হিব্রু সকলের মধ্যেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। যাদের মধ্যে পূর্বপুরুষপূজার পদ্ধতি চালু আছে তাদের কাছে পরিবারগত এই কবরভূমির বিশেষ একটি মূল্যও আছে।

চীনে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি অতিপ্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। কম্যুনিস্ট পূর্ব অধ্যায় পর্যন্ত এ পদ্ধতি ছিল। সুতরাং তারা পরিবারগত কবরভূমি পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা কখনই বোধ করেনি। [হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন আকারে এই পিতৃপুরুষের পূজার রীতি চালু আছে। সেই জন্যই তর্পণ বিধি আজও বিদ্যমান। [এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং শ্রাদ্ধ থেকে তর্পণক্রিয়া বা গয়ায় পিণ্ডদান জীবাত্মার কোন উপকার করতে পারে কিনা সে কথা যোগ ও পরলোক অংশে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে]। পারলৌকিক ক্রিয়া যা-ই করা হোকনা কেন, জীবাত্মা তার কর্মভার অর্থাৎ বাসনা কামনার ভার কখনই অতিক্রম করতে পারে না। তবে সংস্কারের বিশ্বাস অনেক সময়ই তাদের স্বস্তিদান করতে পারে।[১]

বাগাণ্ডার প্রতিটি গোষ্ঠী এবং সোয়াহিলিদের মধ্যে পরিবারগত কবরভূমিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি অদ্যাবধি বর্তমান।

ককেসাসের চেচেন এবং আবিসিনিয়ার বেরিয়া ও কুনামদের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব কবরখানা রয়েছে।[২] গোল্ডকোস্টে, মাদাগাস্কারে তানালাদের মধ্যে, নিকোবর দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এবং কলম্বিয়ার কিছু উপজাতির মধ্যেও এই পরিবারগত কবরভূমিতে কবর দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের উরালিরাও গোষ্ঠীগত বা পরিবারগত কবরভূমিতে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করে থাকে। এই কবরভূমি রয়েছে নিরগুন্ডিতে। কিন্তু পরিবারের প্রত্যেকটি শাখাই গ্রামের কাছেই তাদের নিজস্ব কবরভূমির ব্যবস্থা করে। এখানেই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ভারতের আরও দক্ষিণে এবং প্রাক্তন আসামে চাম এবং খাসিয়াদের মধ্যে শবদাহের ব্যবস্থা আছে। শবদাহ করে সেই ভস্ম তারা পারিবারিক কোন বেদী বা সমাধিজাতীয় স্থানে রেখে দেয়। সমাজ যতই শৃংখলিত হয়েছে এদের এই প্রথা ততই যেন পারিবারিক গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর বেশি জোর দিয়েছেন স্থানীয় রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়। প্রাচীন সাইথিয়ান রাজা থেকে আধুনিক কাফ্রি শাসক, টোঙ্গাল গোষ্ঠীপ্রধান, এমন কি ইংল্যাণ্ডের লর্ডবংশের লোকেরাও পরিবারগত কবরভূমির জন্য গর্ববোধ করে। যেখানে পরিবারগত কবর বা শ্মশান নেই সেখানে দেখা যায় অনেকেই মৃতের নিজের ভূখণ্ডের মধ্যেই, কোথাও বা পারিবারিক ভূখণ্ডের কোন জায়গায় মৃতের সৎকার্য করে থাকে।

---

১ JAI. xxxii, 51.
২ Anthropos iii [1908] 734.

প্রাচীন নরম্যানদের নিজস্ব জমিতেই মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হত। মধ্য আমেরিকার কিচি (Quiche)-দের মধ্যে ভুট্টার ক্ষেতে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত।[১] ফিলিপিনের বুকিদনো এবং পশ্চিম আফ্রিকার মোসসিরা (Mossi) নিজেদের কর্ষিত শস্যক্ষেত্রে মৃতদেহকে কবর দেয়। এর পেছনে দু'ধরনের চিন্তা কাজ করতে পারে। (ক) মৃতদেহের প্রেতাত্মা শস্যক্ষেত্র রক্ষা ও উর্বর করবে এবং (খ) মৃতদেহ শস্যের চারার মতই নবজন্মে গজিয়ে উঠবে। চামুরা তাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসলি জমিতে বা তার কাছে মৃতদেহকে কবর দেয়। উদ্দেশ্য হয়তো পূর্বোক্ত কবরের মতই। আবার ইগোরোট (Igorot)-দের মধ্যে বিপরীত প্রথা চালু আছে। প্রথা এই ঃ—মৃত ব্যক্তি যদি নিজের শেষকৃত্য বা সমাধিস্থান নির্ণয় না করে যায় তাহলে তার সম্পত্তির মধ্যেই কোন পরিষ্কার স্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়। সে স্থান আর কখনও ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক কর্সিকানরা নিজেদের কোন জমিতে বা চ্যাসোল নামে কোন মৃতদেহ রাখার গৃহে তাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ বা সংরক্ষিত করে থাকে।[২]

মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের কাইজার দ্বীপে প্রত্যেক গ্রামে একটি উন্মুক্ত চতুষ্কোণ স্থানের মাঝখানে নুনু-গাছ নামে একটি করে বিরাট গাছ দেখা যায়। সেই গাছের নিচেই স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা সমাধিস্থ আছেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মারা গেলে এই গাছের চারদিকে অদ্যাবধি তাদের কবর দেওয়া হয়। এ-স্থানকে স্থানীয় অধিবাসীরা পবিত্র বলে গণ্য করে থাকে এবং এখানেই মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে।[৩] পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানেও একই ধরনের সমাধি দেবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে সেখানে সমাধিস্থ না করা হলেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এর চারপাশেই সমাহিত করা হয়। [এর পেছনে হয়তো এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে যে, এই সব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও তাদের প্রজ্ঞাদ্বারা গ্রামের কল্যাণ সাধন করেন।]

গৃহে মৃতদেহ সংরক্ষণ ঃ অনেক ব্যক্তি মৃতদেহকে শুকিয়ে বা মৃতদেহের মমি তৈরি করে কবরের মধ্যেই তাকে রেখে দেয়। কেউ কেউ হয়তো এ-সব না করেও মৃতদেহ ঘরে রাখে। এ রীতির উৎপত্তি হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাল্টে গেছে। আজও যারা এই রীতি বা ধারা অনুসরণ করতে চায়—তারা গৃহের কাছে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়। ডাহিতি নামক স্থানে এই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে আজও মৃতব্যক্তিকে তার বসবাসের ঘরে সাময়িকভাবে একটি মঞ্চে রেখে দেওয়া হয়। এখন এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পারিবারিক মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র কবর তৈরি করা হয়ে থাকে। এই

১ International Archives· 1. [1889] Suppl. 71.
২ RTP. xii (1897) 523.
৩ Riedel, 422.

কবরগুলি ছোট আকারের। এখান থেকে মৃতদেহ বের করে রোদে শুকানো হয়। আত্মীয়স্বজনেরা এসে মাঝে মাঝেই এই মৃতদেহ দেখে। প্রত্যেক দিন এই মৃতদেহকে সুগন্ধি এক ধরনের ভেষজ তেল দিয়ে ঘষা হয়। মৃতের হাড়গুলিকে পারিবারিক কোন স্থানে বা মন্দিরে রাখা হয় কিংবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। শুধু করোটিকে আলাদা রাখা হয়। দেশীয় এক ধরনের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে সেই করোটিকে তারা ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে।

মৃতদেহ গৃহে সংরক্ষণের জন্য যতই ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন এর পচনকালে সমস্ত পরিবেশ নিঃসন্দেহে অসহ্য হয়ে ওঠে। ফলে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায়—যারা কবর দেওয়া পছন্দ করে না, তারা মৃতদেহকে ঘরে রেখে ঘর ছেড়ে চলে যায়, না হয় পচনকালে দূরে নিয়ে কোথাও রাখে। পচনক্রিয়া শেষ হলে হাড়গোড় ঘরে নিয়ে আসা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার ওয়াগোগো রা সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেদের মৃত্যুর পর গৃহে রেখে দেয়। যতক্ষণ না পচনক্রিয়া শেষ হয় ততক্ষণ তারা নাচগান ও পম্বে নামক এক ধরনের পানীয় পান করে। এর পর মৃতদেহকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত যখন শুধুমাত্র হাড়গোড় পড়ে থাকে তখন তা তুলে নিয়ে কবর দেয়। উত্তর আমেরিকার অ্যাটিওয়ান্ডারঙ্ক বা নিরপেক্ষরা যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃতদেহের দুর্গন্ধ দুঃসহ হয়ে ওঠে ততক্ষণ তা ঘরে রেখে দেয়। এরপর তারা বধ্যভূমিতে এনে তা ফেলে রাখে যাতে পচনক্রিয়া সেখানেই শেষ হয়। হাড়গোড়ে যতটুকু মাংস লেগে থাকে চেঁচে নিয়ে কঙ্কালকে ঘরে এনে পারিবারিক সদস্যদের চোখের সামনে রাখে। রাখা হয়, যতদিন না প্রেতাত্মার কল্যাণার্থে ভোজের আয়োজন করা হয়। এর পরই সাধারণভাবে তা কবর দেয়। মাঝে মাঝেই এই শেষ কবর-এর কথা মনে রেখে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুরা যেমন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে থাকে।[৩]

টং কিঙ-এর মুয়ন বা মনরা মৃতদেহকে কফিনে ঢুকিয়ে তিন বছর ঘরে রাখে। রাখে পূর্বপুরুষদের বেদীর কাছে। কফিনের দুর্গন্ধ যাতে পীড়া না দেয় সেজন্য তারা বাঁশের নল কফিনে লাগিয়ে উপরে তুলে দেয়, যাতে দূষিত গ্যাস সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আধুনিক কারখানাগুলিতে ধোঁয়া বেরুবার জন্য যেমন চিমনির ব্যবস্থা করা হয় ঠিক তেমনই।[৪] পশ্চিম আফ্রিকার বাউলেরাও মৃতদেহে মলম মাখিয়ে কয়েক মাস বা বছরভর ঘরে রেখে দেয়। মলম বা সুগন্ধি তেল মাখানো সত্ত্বেও সপ্তাহ

---

১ Ellis op. cit, i, 404. (op=observation post)
(cit=citation)

২ Steinmetz 7, 211.

৩ Hale, Book of Rites, 1883, P. 72.

৪ Lunet, 352.

তিন অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেরয়। তার পর আস্তে আস্তে গন্ধ কমে যায়। দুমাস পরে মৃতদেহ মিশরের মমির মত হয়ে যায়। এই অবস্থায় দেহটিকে রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না শুভ কোন মুহূর্তে তাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়া হয় ঘরেরই মেঝেতে।[১]

দক্ষিণ আমেরিকার যুম্বোরা মৃতদেহ শুকিয়ে ঘরের মধ্যে চালে ঝুলিয়ে রাখত। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জেও রাজা বা যোদ্ধার মৃতদেহকে মাদুরে মুড়িয়ে ঘরের চালের বিমে ঝুলিয়ে রাখা হত। অপর পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী সচ্চরা ঘরে মৃতদেহ রেখে সেই ঘর তার উপর ভেঙে ফেলত—তারপর মৃতের ব্যবহারের জন্য সেই ঘর ত্যাগ করে চলে যেত।[২] মৃতদেহের ব্যবহারের জন্য ঘর ত্যাগ করে যাবার রেওয়াজ বহু লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার ভয়েই তারা ঘর ছেড়ে চলে যেত। কিংবা পচনজনিত দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তারা এমন করত।

দেহ ভস্মীকরণ: শবদাহ করার রীতি একসময় পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতের হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে সকলেই শবদাহ করেই মৃতের সৎকার করে। প্রাচীন ইতিহাসের বৃহত্তর ভারতের টঙকিঙ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আরও নানা স্থানেও ভারতবর্ষের প্রভাবে এই শবদাহ পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানেও আছে। সাইবেরিয়ার বহু লোকই এই শবদাহ প্রথা অনুসরণ করে। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলেও কিছু লোক এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। প্রাচীনকালে উত্তর আমেরিকার নানা স্থানে বহু উপজাতি, মিসিসিপি উপত্যকার বহু মানুষ, এমনকি আটলান্টিক উপকূলের বহু গোষ্ঠীও এই শবদাহপ্রথা অনুসরণ করত। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে কিছু উপজাতির মধ্যেও শবদাহপ্রথা ছিল। তা ছাড়া মেলানেশিয়া, নর্থ নিউ মেকলেনবার্গ, নিউ হ্যানোভার এবং বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপেও বহু মানুষ এই শবদাহপ্রথা অনুসরণ করত। ইউরোপে এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে এককালে শবদাহ করা হত। এই প্রথা দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্ভবত প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই এই প্রথা আরম্ভ হয়েছিল। ব্রোঞ্জ যুগে শবদাহ চলত ব্যাপক আকারে। শবদাহ করার রীতি ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর তারা এটা ত্যাগ করে।

হোমারের যুগে উত্তর দিক থেকে যারা গ্রীসে প্রবেশ ক'রে রাজবংশ ও নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করেছিল সেই গ্রীকেরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই শবদাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিল—যদিও মাইসেনিয়ান যুগে এ অঞ্চলের লোকেদের কাছে এই অগ্নিদাহপ্রথা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। গ্রীস থেকে আল্‌পস অতিক্রম করে এই

১ Clozel and villamur, 115, 106.
২ Int. Arch. xill, Suppl. 85.

শবদাহপ্রথা ইটালিতে প্রবেশ করেছিল। রোমকদের মধ্যে মৃতদেহ দগ্ধ করার রীতি সর্বক্ষেত্রেই সফল না হলেও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই শবদাহপ্রথা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি বড় ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

শবকে দাহ করার পেছনে ঐতিহাসিকরা যে-সব কারণ খুঁজে পেয়েছেন, তা নিম্নরূপ, যেমন—

যাযাবর জাতি, যারা অবিরত ঘুরে বেড়াত তারা এই দাহপ্রথাকে বিশেষ করে মূল্য দিয়েছিল এই কারণে যে, এতে মৃত ব্যক্তির চিহ্নস্বরূপ ভস্মাবশেষের সামান্য অংশ সহজেই বহন করে নেওয়া যেত। তা ছাড়া কোন স্থান ত্যাগ করে গেলে মৃতদেহকে শত্রুরা যে অপমান করবে এমন সম্ভাবনাও থাকত না।

আমেরিকার কোকোপা ভারতীয়—যারা কলোরাডো নদীর নিম্ন উপত্যকায় বাস করত তাদের মধ্যে এধরনের চিন্তা যে কাজ করত তা বেশ স্পষ্ট। প্রতি বছর নদীতে যখন বন্যা হত তখন তারা নিম্ন উপত্যকা থেকে উর্ধ্ব অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হত। এই বন্যা প্রায় প্রতিবছরই হত। ফলে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়িঘর নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এদের মধ্যে কোন বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পদ আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হত। তারপর অবশিষ্ট সম্পদসহ তার কুটীরে আগুন লাগিয়ে দিত। ফলে লাগোয়া ঘরবাড়িগুলিও পুড়ে যেত। তারপর এই সম্প্রদায়েরা লোকেরা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেত।[১]

উত্তর টণ্ডকিণ্ড-এর ম্যানককেরাও যাযাবর জাতি। দীর্ঘদিন যাবৎ তারা পাহাড়ী এলাকায় নিজেদের কৃষিকর্মে ব্যস্ত রাখলেও, প্রায়শই তাদের গ্রাম বা বসতিস্থান স্থানান্তরিত করে থাকে। এতে অবশ্য তাদের পুরানো ধরনের চাষবাসপ্রথা সহায়তা লাভ করে। প্রথম দিকে তারা তাদের মৃতব্যক্তিদের পুড়িয়ে ভস্মাবশেষ বহন করে নিয়ে বেড়াত। পরে অবশ্য এই ভস্ম সংগ্রহ করে রাখার প্রথা পরিত্যক্ত হয়, কারণ— ভস্ম জমতে জমতে তার পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তা আর বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য এখনও লোহিত নদীর পশ্চিম তীরে সেই পুরানো প্রথা কিছু দিন আগে পর্যন্ত চলত। এরা চিতাভস্ম একটি মৃৎপাত্রে ভরে রাখত।[২] উত্তর 'মইদু'রা (Northern Maidu) বাসস্থান থেকে বহুদূরে যাদের মৃত্যু হত, তাদেরই শুধু পোড়াতো। শবদেহ পুড়িয়ে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার ভস্ম থেকে কিছু অংশ গ্রামে বয়ে নিয়ে আসত।[৩] অনুরূপ প্রথা অ্যালগনকিনস ও মাসুসেটের হাইদাদের মধ্যেও দেখা যায়।[৪]

---

১ America, Anthropology, IV, new series, [1902] 480.

২ Lunet, 246.

৩ Bull, Am, Mus, Nat, History, xviii, 242.

৪ Jesup, Expedition V 64.

প্রাচীনকালে অনেকে মনে করত এবং এখনও করে যে, মৃতদেহ নিয়ে গুণিনরা তুকতাক করতে পারে (ভারতের শবসাধনার মত)। ফলে দেহ পুড়িয়ে দিয়ে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা পাওয়া অসম্ভব করে তুলত। আফ্রিকার যে সমস্ত অঞ্চলে শবদাহ প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে দাহের পেছনে এই চিন্তাই ছিল মূল কারণ।

শবদাহ করার পেছনে ঐতিহাসিকদের মতে আর যে তত্ত্ব কাজ করে তা এই যে, শবদেহের প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এমন করা হয়। এ-জন্য লোকে নানা ব্যবস্থা করে। আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে উপরোক্ত চিন্তা কাজ করে। [যদিও হিন্দুদের ক্ষেত্রে এর একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে, যা অধিকাংশ হিন্দুও জানে না। সে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।]

আফ্রিকার ইয়াত ও মঙ্গগঞ্জদের মধ্যে রীতি আছে যে, কোন মহিলা ডাইনীবিদ্যার দায়ে দায়ী হয়ে বিষ-পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হত।[1] এর উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল এই যে, সেই ডাইনীর প্রেতাত্মা যাতে তাদের উৎপাত করতে না পারে। পশ্চিম আফ্রিকায় ডাইনীবিদ্যাবিশারদের মৃত্যু হলে তাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়। এদের মধ্যে অনেককে জীবন্তও পোড়ানো হয়।

লেক টাঙ্গানিকা অঞ্চলে ওয়াকুলওয়ে ও অন্যান্য উপজাতি মনে করে যে, মৃত্যুর এক বা দু'মাসের মধ্যে মৃতের হাড়ে এক ধরনের জীবন সঞ্চার হয়। নুকিউয়া (Nkiua) নামে অদ্ভুত এক শক্তি তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। এবং এই নতুন দেহের সাহায্যে পরিবারের অনেকের ক্ষতি করে, কাউকে কাউকে মেরেও ফেলে। এই জন্য কবর খুঁড়ে তারা নির্দিষ্ট একটি সময়ে হাড়গোড় বের করে পুড়িয়ে ফেলে। এমন করে পোড়ায় যাতে হাড়ের কোন অংশই পড়ে না থাকে। কারণ, তাদের ধারণা এক টুকরো হাড় পড়ে থাকলে তাতেই নুকিউয়া প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। গুণিনরা পবিত্র জলে হাঁড়ি ধুইয়ে এই মন্ত্র আওড়ায় 'শান্তিতে ঘুমোও, শান্তিতে ঘুমোও।' [হিন্দু 'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি'র মতন] অন্তত তিনবার এই শব্দ উচ্চারণ করার অর্থ মানুষের তিনটি গুণের শান্তি কামনা করা। যেমন, সত্ত্বগুণ, রজগুণ ও তমোগুণ।]

আফ্রিকানদের নুকিউয়া ইউরোপে বাদুড় পাখির সমতুল্য। এজন্য ইউরোপে বাদুড় পাখি হতে পারে এমন দেহকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পার্থক্য এই যে, আফ্রিকায় নুকিউয়ার ভয়ে শবদেহের কঙ্কালকেই পোড়ানো হয়।

পূর্বেই দেখেছি যে, যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই তাদের জন্য রীতিমাফিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয় না। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ধরা হয় গুটিরোগে মৃত্যু, শিশুকালে মৃত্যু, খুনজনিত মৃত্যু ও আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু। শবদেহে এধরনের মৃতদেহ সৎকারের রীতি টাঙ্গানিকা অঞ্চলের ওয়াকুলওয়েদের মত শ্যামদেশের লোকেরাও করে। করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, যদি এই সব অপঘাতে মৃতব্যক্তিদের জন্য যে সব—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-রীতি বা ব্যতিক্রম আছে তা না করা হয়,

১ Macdonald, Africana, 1882, i, 104.

তবে মৃতের প্রেতাত্মা ফিরে এসে নানাভাবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের পীড়ন করতে থাকবে।[১]

ব্রহ্মদেশের চিঙপাওদের কবর দেওয়া হয়। কিন্তু গুটিরোগে মারা গেলে তাদের পোড়ানো হয়ে থাকে। হাড়গোড়ের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু মাটির পাত্রে ভরে রাখা হয়। যে পাত্র বা হাঁড়িতে এই হাড় রাখা হয় তার মুখ তারা খুব ভাল করে বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই হাঁড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখে। এটা করা হয় এই কারণে, যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা তার পার্থিব গৃহে আর ফিরে আসতে না পারে। প্রাক্তন ক্যাণ্ডি রাজাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে দেখা গেছে। এঁদের তপ্ত হাড়ের কয়েকটি একটি মাটির হাঁড়িতে রেখে ভাল করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর বাকি ভস্ম মাটির গর্তে চাপা দিয়ে রাখত। মাটির পাত্রটি মুখোশধারী এক ব্যক্তির মাথায় চাপিয়ে দিত। তার দেহে থাকত লাল ও কালো বস্ত্র। এইভাবে সেই হাঁড়িকে মহাওয়েলে গঙ্গা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ফেরি ঘাটে মুখোশধারী ব্যক্তি জোড়া লাগানো দুটি নৌকোয় পা রাখত। তাকে লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। নৌকো দুটিকে তারপর দুজন লোক সাঁতার কেটে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেত। নির্দিষ্ট স্থানে নৌকো দুটিকে রেখেই সাঁতার কেটে লোক দুজন দ্রুত তীরে ফিরে আসত। মুখোসধারী ব্যক্তি তখন এক হাতে একটি তরোয়াল এবং অপর হাতে হাঁড়িটি ধরে তরোয়ালের এক আঘাতে পাত্রটিকে দুটুকরো করেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ডুব সাঁতার দিয়ে যতদূর সম্ভব সে উজানে এগিয়ে যেত। তারপর নদীর অপর পাড়ে গিয়ে উঠত। উঠেই অদৃশ্য হয়ে যেত। নৌকো দুটোকে যথেচ্ছ ভেসে যেতে দেওয়া হত।[২]

পূর্বেই দেখেছি যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুয়েবলো উপজাতিরা গুহাতে তাদের মৃতদেহকে কবর দিত। এর পাশাপাশি এরা অনেক সময় শবদাহও করত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে,[৩] দুটি জাতির সম্মেলনের ফলেই এ রকম ঘটেছিল। এই দুটি জাতির ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল দুরকম। এই দুটি জাতিকে—নিম্ন কলোরাডো অঞ্চলের ইউমান (Yuman) এবং পিমান (Piman) জাতি বা গোষ্ঠী বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে শবদাহপ্রথা ছিল। পুয়েবলোদের মধ্যে কবর দেবার প্রথা চালু ছিল। জুনিরা এক সময় শবদাহপ্রথা অনুসরণ করলেও বর্তমানে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়। এখন কবর দেবার কারণ হিসেবে তারা যে তথ্য দাঁড় করিয়েছে তা এই যে, মৃত দেহকে পুড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হবে না। কারণ এই মৃতব্যক্তির আত্মাই বৃষ্টি তৈরি করে। এই আত্মাকে তারা বলে উয়ান্নামি (Uwannami)। শবদাহ করা হলে জীবের সূক্ষ্ম সত্তাও নাশ হয়ে যাবে বলে তারা মনে করে।[৪]

১ Globus, XIV [1868] 27.
২ Davy, 162.
৩ Cushing
৪ 13, 22, 23, RBEW, '65, 175 (1904) 305 (1904)

শবদাহের পেছনে প্রাচীন লোকেদের যে ধারণা কাজ করত (ভারত বাদে) তা হল এই যে, এতে প্রেতাত্মার ক্ষতি করার সম্ভাবনা দূর হয়। তা ছাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হলে জীবাত্মা বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় এবং মৃত প্রাক্তন পুরুষদের আত্মার সঙ্গে পরলোকে মিলিত হতে পারে।

ফরাসী গায়েনার ওয়েয়ানা (Wayana)-রা মনে করে যে, শবদাহ করা হলে অগ্নির ধোঁয়ার সঙ্গে মৃতের আত্মা ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারে।[১] পূর্ব এশিয়ার লাওসের অধিবাসীদের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্রেণীর লোকেরা তাদের মৃতদেহকে দাহ করে থাকে। এক ধরনের পাখিরূপ পুতুলের বাক্সে পুরে তাদের পোড়ানো হয়। এই পাখির নাম—হাৎসাডিলিং। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তারা মনে করে যে নির্বাণ লাভ করার জন্য এই পাখিকে হত্যা করার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য এই পুতুল পাখিকে কোন এক মহিলা অনুষ্ঠান সহকারে তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করে। এর পরই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুরাণ কাহিনী অনুসারে জনৈকা বীর মহিলা (Heroine) এই পাখিকে হত্যা করেছিলেন। মহিলাটি ছিলেন কোন এক দেবীর অবতারস্বরূপ। সেই মহিলার কথা স্মরণ করেই পাখিরূপ শবাধারে জনৈক মহিলাই তীর ছুড়ে থাকে। তবে পুরাতত্ত্ববিদ হিউবার্টের অনুমান এই যে, এই পাখিকে লাওসের অধিবাসীরা আত্মার বাহক হিসেবে মনে করে। এই বাঁশের পাখিই শবদাহের পর আত্মা দেহবন্ধন মুক্ত হলে তাকে পরলোকে নিয়ে যায়। পাখিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে তীর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় তার কারণ এই যে, যেন সেও মরে যায়। এবং তার আত্মা জীবাত্মাকে বহন করে ঊর্ধ্বে নিয়ে চলে।

মাসুসেট-এর হাইদারা মনে করে যে, যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে জীবের আত্মা ট্যাক্সেট (Taxet) নামে এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যায়। এই স্থান হাওয়াতে ভাসমান। যাতে সেই শূন্যে ঝুলন্ত স্থানে তারা যেতে পারে সেইজন্য এরা মৃতদেহকে দাহ করে থাকে। মৃতদেহকে দাহ না করা হলে এই স্থানে তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। হাইদাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস চালু আছে। তবে দূরে কোথাও যুদ্ধ করতে গিয়ে কারো মৃত্যু হলে হাইদারা তার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শবদাহ রীতি অনুসরণ করে না। সম্ভবত দূরদেশে এই রীতি অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য ছিল বলেই তারা এদের ক্ষেত্রে শবদাহ অনুষ্ঠান করত না।[২]

পূর্ব আফ্রিকার বাভুত্সিরা তাদের রাজাকে কখনই সমাধিস্থ করত না। তার দেহকে ঘরেই রেখে দেওয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে শক্ত হবার লক্ষণ ফুটে ওঠে। দেহে পোকা ধরতে থাকলে ঘরসুদ্ধ সেই দেহ তখন তারা পুড়িয়ে দিত। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রসহই তাঁকে পোড়ানো হত। যখন সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত তখন বাভুত্সিরা মনে করত যে, রাজা স্বর্গে ফিরে গেছেন। তাদের ধারণা, এই স্বর্গ থেকেই তাদের

১ International Archives. xiii, Suppl. 87.
২ Jesup, Expeditions. V, 54.

রাজার পূর্বপুরুষেরা মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন বা সেখান থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আগুনে পোড়ানো হলে রাজা আবার সেখানে ফিরে যেতে পারবেন এই ধারণা থেকেই তারা এই অদ্ভুত ধরনের শবদাহ প্রথা অনুসরণ করত।[১]

অগ্নিদগ্ধ কোন হাড় যদি পড়ে থাকে তাহলে অনেকেই মনে করে যে, তাতে মৃতের প্রেতাত্মা ভর করে। যতক্ষণ না কয়েকটি বিশেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয় ততক্ষণ এই ভূত হাড় ছেড়ে যায় না বলে বিশ্বাস। এই জন্য ক্যাণ্ডির রাজার মৃত্যু হলে তার শ্মশানে বিশেষ কতকগুলি অনুষ্ঠান করা হত। ভারতবর্ষে হিন্দুরা শবদাহ করে কিছু ভস্ম পবিত্র সলিলে ভাসিয়ে দেয়। ভাসিয়ে দেয় এই বিশ্বাসে যে, এতে জীবাত্মা পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। কোথাও কোথাও এই ভস্ম মৃৎপাত্র বা ভিন্ন ধরনের পাত্রে রেখে পুঁতে ফেলা হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেই কোথাও তা পুঁতে রাখে। প্রাচীন সভ্যতায় অনেক জাতির মধ্যেই এই ধরনের প্রথা চালু ছিল। অনেক সময় মৃতপাত্রের ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝেই এতে পূত তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়া হয়। এতে মৃতের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস।

সমাধি বা কবরখানাঃ কবরখানাকে প্রেতাত্মার বাস স্থান বলে ধরা হয়। সুতরাং অনেকেই কবরক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব আরামদায়ক করে তৈরী করার চেষ্টা করে। ফলে কবরে নানাধরনের জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়। গৃহের ভেতরে যাদের কবর দেওয়া হয়, তাদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা হয়, যেমন তাজমহল। এধরনের কবর দেবার রেওয়াজ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিলিপিন অথবা নিউগিনি সর্বত্রই রয়েছে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে না হলেও এ ধরনের কবর নির্মাণ করে অর্থাৎ কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। যেমন, মধ্য আফ্রিকার পূর্বাংশে বাগাণ্ডারা তাদের রাজা ও গোষ্ঠীপ্রধানদের এইভাবে কবর দিয়ে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করত। অনেকের ক্ষেত্রে কবরের উপর এই গৃহ বেদী বা মন্দির হিসাবেও কাজ করে। এখানে মৃতের আত্মাকে স্মরণ করা হয়। মধ্য আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে এই কারণে সাধারণ মানুষের কবরের উপরও ছোট ছোট ঘর তুলতে দেখা যায়। লেণ্ডুরা এই ক্ষুদ্র গৃহ তৈরি করে মৃতের আত্মা সেখানে বাস করবে এই চিন্তা থেকে। কমপক্ষে মৃত্যুর পর দুমাস পর্যন্ত আত্মা সেখানে বাস করে এ বিশ্বাস তো আছেই।[২] নিউগিনি ও অন্যত্র এই কবরগৃহ এমন করে তৈরি করা হয় যাতে শোকার্তরা তাতে প্রবেশ করে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে পারে।[৩] শুধু যে কবরের উপরই গৃহ নির্মাণ করা হয় তা নয় মাটির নিচেও মৃতের জন্য ঘরের অনুরূপ ব্যবস্থা করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

১ **Anthropos, iii, 6**

২ **Cunninghum, 337.**

৩ **Chalmers—116.**

পশ্চিম আফ্রিকার ইউহি (Ewhe)-রা মৃতব্যক্তিকে ঘরের মধ্যেই সমাধি দেয়। ধনীলোকেরা গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে মৃতদেহ স্থাপন করে। কখনও কখনও এই গর্ত ঘরের চৌহদ্দির মাপে হয় অর্থাৎ একটি ঘরের আয়তনে হয়।[১] প্রাগৈতিহাসিক কালে ক্রীট দ্বীপে যে কবর দেওয়া হত সেই কবরক্ষেত্র ছিল গোলাকৃতি। পাথর দিয়ে এই বৃত্ত তৈরি করা হত। তার উপর গম্বুজের মত চূড়া বা ছাদ থাকত। জীবিতকালে যে ধরনের গৃহে ক্রীটের অধিবাসীরা বাস করত, কবরগুলি ছিল সেই বাসগৃহের অনুরূপ।[২] ইউট্রাসকানদের কবর দেবার রীতির মধ্যেও অনুরূপ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবর যেমন বাসগৃহের অনুরূপ করা হয় তেমনই শবভস্মকে অনেক ক্ষেত্রে গৃহাকৃতি পাত্রে রাখার ব্যবস্থাও আছে। তবে মৃতের বাসস্থান হিসাবে কবর তৈরির যত নমুনা পাওয়া গেছে তার কোনটাই গাম্ভীর্য ও বিশালত্বে মিশরের পিরামিডের তুল্য নয়।

গহ্বরে যতখানি আয়তন নিয়ে মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা হয় সেই অনুপাতেই উপরে সৌধ তোলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কবর খোঁড়া হত বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতিতে। (তারা কি ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি এটা জানতে পেরেছিল ?)। কবরগুলি প্রায়শই বিশাল হত। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই ধরনের কবর লক্ষ্য করা যায়। এই গহ্বর চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া হত। মৃতদেহ এর মধ্যে রাখা হত। এই কবরক্ষেত্র ভর্তি করার জন্য চারপাশ থেকে মাটি কেটে পরিখার মত তৈরি করা হত। কখনও কখনও চারপাশ দুর্গের দেয়ালের মত পাথরের চাঁই দিয়ে ঘিরে দিত। যেখানে এত খরচা করে কবর তৈরি করা সম্ভব হত না সেখানে সাধারণ ব্যক্তির কবরের উপর স্তূপীকৃতভাবে পাথর ফেলে দেওয়া হত। যারা পাথরের স্তূপ তৈরি করতে পারত না তারা কবরের উপর মাটির ঢিবি তৈরি করে দিত। যেখানে কবর নির্মাণের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না সেখানেও দেখা যায় নানাভাবে কবরক্ষেত্র আচ্ছাদিত করে রাখার চেষ্টা চলত। মাটির ঢিবি তৈরি করা না গেলে গাছ-গাছালির ডালপালা দিয়ে কবরক্ষেত্র ঢেকে দেওয়া হত। মূল লক্ষ্য, যাতে কোন মাংসভোজী প্রাণী মৃতদেহ বের করে এনে খেতে না পারে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিবাসী কবর দেবার পর ক্ষেত্রটি এমনভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত যে কবরের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যাতে চোখে না পড়ে।[৩] আবার যেখানে কবরের উপর স্তূপ তৈরি করার রীতি ছিল সেখানে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে সেই কবরের উপর পিরামিডের মত বিশাল স্থাপত্যকীর্তি এবং সমাধিসৌধের মত মনোরম হর্ম্য গড়ে উঠেছে।

১ Spieth, 634

২ ARW. vii, [1204] 256) viii, 520.

৩ Int. Arch. xiii, suppl. 92. 97, Globus, xc, 305.

কবরে মৃতদেহ রাখার রীতি :—সভ্যতা যখন অনুন্নত ছিল তখন সাধারণত হাঁটু মুড়িয়ে তাতে মাথা ঠেকিয়ে বসিয়ে রাখার ভঙ্গিতে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হত। এর কারণ ছিল এই যে, জন্মের সময় মাতৃজঠরে সে যে ভঙ্গীতে ছিল মৃত্যুর সময়ও পৃথিবীমাতার গর্ভে ঠিক সেই ভঙ্গীতে তাকে রাখা। সঙ্গে অবশ্য প্রসাধন সামগ্রী বা আরামদায়ক জিনিস তেমন থাকত না। না থাকার কারণ, এ-সব তারা তখন তৈরি করতেই শেখেনি। কবরের এক কোণে মৃতদেহকে এইভাবেই বসিয়ে রাখা হত। নব্যপ্রস্তর যুগের কবর খুঁড়ে এই ধরনের বহু কংকাল পাওয়া গেছে। কখনও কখনও বসিয়ে রাখার ভঙ্গীতে বা চিৎ করে শুইয়ে রাখা অবস্থায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের কবর দেবার এই ভঙ্গী সেদিন পর্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এদের ক্ষেত্রে শুইয়ে রাখা ভঙ্গীতে কবর দেবার উদাহরণ খুব কম। ক্রীটদ্বীপের নোসুসোস-এ বসিয়ে বা শুইয়ে রাখা উভয় ভঙ্গীতে মৃতদেহ কবরস্থ কবার রীতি লক্ষ্য করা গেছে। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা যখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার আগে বর্বর অবস্থায় ছিল তখনও তারা শুইয়ে রাখা ভঙ্গীতে মৃতদেহকে কবর দিত। উত্তর আমেরিকার বিচিত্, আইভরিকোস্টের ব্রিগনান এবং ভারতের দক্ষিণাংশের ইয়ানাদি (Yanadi)-রাও এই ভঙ্গীতেই মৃতদেহকে কবরস্থ করত।[১]

মৃতদেহ কিভাবে কবরে রাখা হবে অর্থাৎ কোন দিকে মাথা এবং কোন দিকে পা থাকবে তা নিয়ে প্রথাভেদ আছে। একই জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এ নিয়ে ভিন্ন প্রথা অনুসরণ করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের অনেক সমাধিস্থানে দেখা যায় যে, একই কবরে ভিন্ন মৃতদেহকে বিভিন্ন দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। কেন যে এরকম করা হত ঐতিহাসিকদের চিন্তাতে এর কোন সূত্র আজও পাওয়া যায়নি। ভিক্টোরিয়ার অস্ট্রেলিয় বিম্মেরা জেলাতে এখনও আদিবাসীদের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস অভিজ্ঞানযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞানের নিজস্ব একটি দিকনির্ণয় চিহ্ন ছিল। এই অভিজ্ঞান চক্রের দিকনির্ণয় রেখা অনুযায়ী সেই অভিজ্ঞানধারী গোষ্ঠীর লোকদের কবর দেওয়া হত।[২] এধরনের কবর দেবার রীতির অন্য কোথাও বোধহয় তুলনা নেই। মূলত দিক নির্ণয় করা হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত লক্ষ্য করে।

সাউথ ওয়েল্‌স-এর নুগিউমবারা সূর্যোদয়ের দিকে মাথা রেখে মৃতদেহকে কবরস্থ করে।[৩] মধ্য আফ্রিকার অওয়েম্বা (Awemba), কালিফোর্নিয়ার মইদু এবং বিচিতরা পূর্ব শিয়রে মৃতদেহ রেখে কবর দেয়। অপর পক্ষে সেনেগাম্বিয়ার লিঙ্গুয়েৎ, ম্যানকাগানি ও ব্রিগনানরা খ্রীষ্টানদের মত ঠিক উল্টো শিয়রে মৃতদেহ কবরস্থ করে।

---

১ Dorsey, Whichta, 1904, P.B, Clozel and Villamur 467 Thurston, vii, 426.

২ Howit, 453.

৩ Mathews, 72.

[এই দুই ধারার পেছনে হয়তো এই বিশ্বাসই কাজ করে যে, পূর্বশিয়রে কবরস্থ করা হলে নবারুণের মত মৃত আবার জেগে উঠবে। এবং পশ্চিম দিকে শোয়ালে অস্তাচলগামী সূর্যের মত মৃত ব্যক্তি পরলোকে যাত্রা করবে।] সোলোমন দ্বীপের লোকেরা দেশের অভ্যন্তরভাগের দিকে মৃতের পা রেখে তাকে কবর দেয়।[১] দেয় হয়তো এই বিশ্বাসে যে, মরে গেলেও দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ থাকবে। কিংবা যেদিকে মাথা রাখবে সেদিকেই সে চলে যাবে। ভূত হয়ে ফিরে এসে উৎপাত করবে না।]। যারা এক সময় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল ছেড়ে প্রবাসী হয়েছে [যেমন আর্যরা।] তারা পূর্বপুরুষদের আদিবাসস্থানের কথা স্মরণ করে সেই দিকে মাথা রেখে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয় বা দাহ করে।[২] উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে যাবে। চীনের কুইচৌ (Kweichow) প্রদেশের মিয়াওরা সেদিন পর্যন্ত অনুরূপ চিন্তায় বিশ্বাসী ছিল। পূর্ব আফ্রিকার ওয়ানিয়ামওয়েজিদের মধ্যে রীতি আছে যে, তাদের মধ্যে কেউ বিদেশে মারা গেলে তার মায়ের গ্রাম যেদিকে সেই দিকে তাকে মাথা রেখে কবর দেওয়া হবে।[৩] অপর পক্ষে মুসলমানেরা সর্বত্রই মক্কার দিকে মাথা রেখে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়।

কফিন :— কফিন হল এক ধরনের শবাধার যার মধ্যে মৃতদেহকে রেখে কবর দেওয়া হয়। এই শবধারে মৃতদেহ রাখার একটি কারণ হল বাইরের প্রভাব থেকে মৃতদেহেকে মুক্ত রাখা। মাটি থেকে যদি শবকে রক্ষা করার কথা ভাবা হয়, তাহালে অনেক সময় কবরের মধ্যে কুলুঙ্গি রাখা হয় বা নিচের দিকে একটু ফাঁক রাখা হয় অথবা গাছের ডালপালা দিয়ে কফিন ঢেকে তারপরে মাটি ফেলা হয়। আফ্রিকাতে এই ব্যবস্থা খুবই প্রচলিত। এখন যে সভ্যতা এত উন্নতি করেছে তবুও অনেকে এই কফিনে মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা ত্যাগ করেনি। আগে কফিন তৈরি করা হত কাঠের গুঁড়ি কুঁদে। এখনও এ ব্যবস্থা নিয়ামনিয়ামদের অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে। অনেকে এই ধরনের কফিনে রঙ করে থাকে। যেমন—নাইজারের তীরে বসবাসকারী ইবুজো রা।[৪] এ প্রথা এস্কিমো ও উত্তর পশ্চিম আমেরিকার ইনডিয়ানদের মধ্যেও রয়ে গেছে। বোর্নিওর ডয়াকরাও একই ধরনের প্রথা অনুসরণ করে। তবে এই খোদাই করা কফিন মাটিতে কবর দেবার জন্য ব্যবহার করা হয় না। এখন এটা সেই আদি মধ্যযুগের এবং পরবর্তী রোমানদের পাথরের কারুকার্য করা মৃতাধার (Sarcophagi)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে মৃতাধার হিসেবে বড় বড় মাটির পাত্র তৈরি করার ব্যবস্থা ছিল। প্রাগৈতিহাসিক ক্রীটে মৃতদেহ রাখার জন্য মাটির সিন্দুক তৈরি

---

১ Codringotn, Melanesians, Oxford, 1801, P 254.
২ Dannert 3 ; Kind, 244, 248.
৩ Burton, Lake Regions of Central Africa, London, 1880, ii. 25.
৪ Frobenius, ii [1907] 102

করা হত। এর নাম লারনাজ Larnaz)।[১] জাপানে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত কারুকার্যময় কাঠ, পাথর বা মাটির বাক্সে। চীনে যখন কবর থেকে হাড় উঠিয়ে (বড়লোকদের ক্ষেত্রে) নতুন কবরে সমাধিস্থ করা হত তখন কফিন হিসেবে মাটির পাত্র ব্যবহার করা হত। ফিলিপিনে টাকবানুয়ারা মৃৎপাত্রে ভরে মৃতশিশুকে সমাধি দেয়। [মৃতপাত্রের এক নাম 'জার' অর্থাৎ জঠর—মাতৃগর্ভের প্রতীক। এর পেছনে হয়তো তেমন কোন প্রতীকী উদ্দেশ্য বর্তমান রয়েছে।] এই প্রথা প্যালেস্টাইনের প্রাগৈতিহাসিক কবরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেখানে মৃৎপাত্রে ভরে সমাহিত করা হয়েছে এমন বহু শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে।[২] ডিওডোরসের লেখা থেকে জানা যায় যে, বেলিয়ারিক দ্বীপের লোকেরা মৃতদেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে মৃৎপাত্রে ভরে তার উপর পাথর চাপা দিয়ে স্মরণ-স্তম্ভের মত তৈরী করত। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী এবং প্রাক্তন আদিবাসী, এমন ব্যক্তিদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই দেহের মাংস তুলে নিয়ে মৃৎপাত্রে হাড়গোড় ভরে কবর দিত।[৩] অনুরূপ প্রথা তিব্বতেও ছিল। তিব্বতে এ ব্যবস্থার কথা চৈনিক পর্যটকদের কাছ থেকে জানা যায়। প্রাক্তন আসামের কুকিরা মৃতদেহ পচে গেলে তা পরিষ্কার করে হাড়গোড় পাত্রে ভরে রাখত। যে কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে সেই পাত্র খুলে তারা দেখত। যেন হাড়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মৃত আত্মীয়ের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। তার ইচ্ছাতেই যেন পাত্র খোলা হচ্ছে। শবদাহ করে অগ্নিদগ্ধ হাড় কবর দেওয়ার প্রথা যারা মৃৎপাত্র তৈরি করতে শিখেছিল তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল। নৌকো করেও যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হত তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ব্রেজিলে সিউসী জাতি মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত ক্যানো (এক ধরনের ছোট নৌকো)-কে দুভাগে কেটে তাই দিয়ে শবাধার তৈরি করত। একটি অংশে মৃতদেহ রেখে অপর অংশ দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হত।[৪]

সাধারণত কফিনের জন্য হাল্কা ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হয়। গোল্ডকোস্টে শবাধার তৈরি করা হত নলখাগড়া বা গাছের বল্কল দিয়ে।[৫] ধনী বা নামকরা লোকদের জন্য অনেক জায়গাতেই একাধিক কফিনের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে আফ্রিকার বর্বরদের সঙ্গে ইউরোপের সভ্য ব্যক্তিদের কোন পার্থক্য নেই। সব সময়ই যে কফিন তৈরি করা হয় শবদেহকে রক্ষা করার জন্য তা নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত কোন ধরনের আধারের মধ্যে মৃতের প্রেতাত্মাকে আটকে রাখা যাতে আত্মীয়-স্বজনের সে কোনভাবে ক্ষতি করতে না পারে।

১ Archaeologia Iiv—397—400. Arch. Iv [1897] 474,
২ Frazer, Adonis 1907, P. 82.
৩ American Anthropology vi. New Series, [1904], 660.
৪ Globus, xc, 327.
৫ Journal of African Society, vii, [1928] 202.

পশ্চিম খণ্ডের এস্কিমোরা নেলসনকে জানিয়েছিল যে, বাক্সের ভেতর মৃতদেহ ভরা হয় তার আত্মাকে সেখানে আটকে রাখার জন্য। এই এস্কিমোরা বেরিং প্রণালীর ধারে বাক্সবন্দী মৃতদেহকে কবর দিত। এস্কিমোরা বিশ্বাস করত যে, খোলা অবস্থায় থাকলে মৃতের আত্মা বা ছায়া ঘুরে ফিরে বেড়ায়। সেইজন্য মৃতদেহকে তারা বাক্সবন্দী করে কবর দেয়। তাছাড়া কুকুরে যাতে শবদেহ ছিঁড়ে খেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেও এমন করা হত। মৃতদেহ কুকুরে ভক্ষণ করাকে এরা খুব অশুভ মনে করত।[১] ঐতিহাসিকদের ধারণা, কুকুরের চিন্তা পরবর্তীকালে এসেছিল। মূল চিন্তা এসেছিল প্রেতাত্মাকে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য। তবুও অনেকে মনে করেন যে, কফিন তৈরী করা হত মৃতদেহ যাতে কবরে শান্তিতে থাকতে পারে সেইজন্য। আত্মাকে বন্দী করে রাখার জন্যই যে কফিনের ব্যবস্থা নয় তার প্রমাণ সিউসি (Suisi)-দের কফিন। এই কফিনে তারা একটি ফুটো রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এই ফুটো দিয়ে আত্মা বাইরে যাওয়া আসা করতে পারে।

শবদাহের পূর্বে ক্রিয়ানুষ্ঠান: শবদাহ করার পূর্বে প্রত্যেকেই কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। এজন্য নির্দিষ্ট একটা সময়ও আছে। কারো ক্ষেত্রে শবদাহের পূর্বে মৃতদেহ কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। কারো ক্ষেত্রে কয়েক মাস। পশ্চিম আফ্রিকা ও সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে মৃতদেহ দাহ করার আগে কয়েক বছরের জন্য রেখে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যে তারা তৈরি হতে থাকে। অবশেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্দেশ্য স্থূলদেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এজন্য অনেকেই রাত্রিবেলাকেই উপযুক্ত সময় বলে চিন্তা করে।

রাত্রিতে যারা শবদাহ করে তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তর আমেরিকার হোপিং, সরবাকের (Sarawak) ডয়াক, প্রভৃতি।[২] দক্ষিণ আফ্রিকার মননসা (Mannasa) এবং নিম্ন নাইজারের নিগ্রোরা সন্ধ্যাবেলায় কবর দেয়। বাসুতোরা অন্ধকার নামলে তবে কবর খুঁড়তে আরম্ভ করে। তবে ঠিক ঊষালগ্ন ছাড়া শবদেহকে কবর দেয় না। এরা রাত্রির মধ্যেই দেহকে কবর দেয় এই কারণে যে, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে জেগে উঠে শবদেহকে দেখতে না পায়।[৩] রাত্রিতে কবর দেবার পেছনে বর্বরদের মধ্যে যে চিন্তা কাজ করে তা এই: দেহের ছায়াকে তারা আত্মা বলে মনে করে। কোন অপ-আত্মা এই ছায়াকে ধরতে পারে। সদ্য মৃতের আত্মাও এই ছায়ার উপর ভর করতে পারে। সেই জন্য রাত্রিবেলা তারা কবর দেয়। কারণ তখন কারো ছায়া পড়ে না। এরা সব চেয়ে ভয় করে

১ 18, RBEW. 312.
২ Ztchehr Ethn. xxxvii [1905] 634, Anthropos, i, 168.
৩ Martin 90. Journal of African Society, v, [1906] 357.
৪ Indian Census, iii, 290.

শিশুর প্রেতাত্মাকে। দক্ষিণ নিকোবর আইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সূর্যাস্তের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে থাকে। মধ্য রাত্রি থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে এদের পক্ষে শবদাহ বা কবর দেওয়া বাধ্যতামূলক।

মৃতদেহ স্পর্শকরণঃ শবদাহ বা কবর দেবার পূর্বে প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ না কেউ মৃতদেহ স্পর্শ করে আছে। এর কারণ, সাধারণত দুটো—(১) যাতে বাইরের কোন দুষ্ট আত্মা এসে মৃতদেহে প্রবেশ করতে না পারে। [এ বিশ্বাসের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান প্ল্যানচেট ব্যবস্থাতে। প্ল্যানচেটে যিনি মিডিয়াম হন তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। ফলে তার দেহে মৃতের আত্মা এসে ভর করে। মৃতদেহে আত্মা কমজোরি হলে অনেক সময় দুষ্ট আত্মারা তাতে প্রবেশ করে স্থূলদেহসুখ ভোগ করতে চায়। কিন্তু যদি কোন আত্মীয় বা ব্যক্তি সেই দেহকে স্পর্শ করে থাকে তাহলে জীবন্ত দেহের তড়িৎশক্তি বিদেহী আত্মারা সহজে ভেদ করতে পারে না। এই জন্যই আকাশচারী ভারতীয় যোগীরা ধ্যানে স্থূলদেহ ত্যাগ করে যাবার কালে শিষ্যদের মধ্যে কাউকে তাঁর দেহ স্পর্শ করে থাকতে বলে]।

(২) দ্বিতীয়ত মৃতের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা বশতও তারা মৃতদেহ চোখের অন্তরালে চলে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা স্পর্শ করে থাকে। এই সময় শোকে মুহ্যমানদের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। সেই জন্য দেখা যায় যে, মৃতদেহ স্পর্শে অশুচি হলেও অনেকেই শেষকৃত্যের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে দেহ স্পর্শ করে আছে।

মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে মাবুইয়াগ দ্বীপের অধিবাসী, টোরেস প্রণালীর লোক ও জামাইকার নিগ্রোদের মধ্যে সমান ব্যবস্থা চালু দেখা যায়। প্রতিবেশী মহাদেশগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। ইউরোপের লোকেরা মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার মধ্যবর্তী অংশের পার্বত্য লোকেরা অর্থাৎ ইগলু (Iglu)-রা মৃতের পদচুম্বন করে থাকে। এই চুম্বন করার অর্থ বোধহয় মৃতকে খুশী করা, যাতে তাদের ভয় দেখানো না হয়। অপর পক্ষে মণ্টেনিগ্রিনরা অন্ত্যেষ্টিযাত্রাকালে মৃতের দেহ চুম্বন করে।[১] বুলগাররা মৃতদেহের দক্ষিণ হস্ত চুম্বন করে বলে যে, 'আমাকে ক্ষমা কর।' যারা মৃত ব্যক্তি যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই মাসে জন্ম গ্রহণ করেছে—তারা সবাই মৃতের বুকের উপর বুক লাগিয়ে মাথায় তিনবার করে মাথা ঠেকায়।[২]

মৃতদেহ প্রদক্ষিণঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে আর একটি পদ্ধতি হল মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা। অ্যাপোলোনিয়াস রোডিয়াস (Apollonius Rhodius)-এর

১ JAI xxxix. 94, zvv, vi [1806] 408.

১ Strausz, Die Bulgaren, Leipz. [1898] 40C.

কবিতাতে দেখা যায় যে, অর্গোনটরা তাদের সহযোদ্ধা মোপসুস (Mopsus)-এর মৃতদেহ, শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে তিনবার প্রদক্ষিণ করেছিল। ভারতেও রীতি আছে চিতায় অগ্নিসংযোগ করার পর মৃতের পুত্র তা তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। চিতা বা কবরক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করার রীতি পৃথিবীর নানা দেশের অধিবাসীরাই অনুসরণ করে, যেমন, মধ্যাঞ্চলীয় এস্কিমো, রাশিয়ান ল্যাপ, বুরিয়াট, শান, ব্রিটিশ গায়নার আরাবক্‌স (Arawaks) প্রভৃতি। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড শায়ারে একজন যাজকের মৃতপত্নীর কবর অনুরূপভাবে প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল এমন সাক্ষ্যও পাওয়া যায়।[১] সোম প্রদেশের বুকেন (Beauquesne) নামক স্থানে (ফ্রান্স) কবরে কফিন রাখার পর শোকার্তরা তিনবার কবর প্রদক্ষিণ করে। এক একবার প্রদক্ষিণ করে আর পিছিয়ে আসে।[২] [এই প্রদক্ষিণ তিনবার কেন, তা ভাববার বিষয়। জগৎ তিনগুণে আবদ্ধ :—সত্ত্ব, রজ ও তমো। এই তিনগুণের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যই কি তিনবার প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা? তবে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চিন্তা হিন্দুদের। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এই তিন বার প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা কেন? সে কি তাহলে ভূলোক, অন্তরীক্ষ্য লোক ও দ্যুলোকের ধারণা থেকে? এই তিন লোকে মৃতকে স্থাপন করার জন্য? কিংবা হিন্দুদের সৎ+চিৎ+আনন্দ ও খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ব (Trinity) God, Christ and Holyghost থেকে? আদিবাসীদের অনেকের মধ্যেই ত্রিত্ব ভাব নেই। তাহলে তিনবার তারাও প্রদক্ষিণ করে কেন? একি তাহলে সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা, দিনের এই মূল তিনটি প্রহরকে চিন্তা করে? এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।]

প্রদক্ষিণ শুরু হয় সূর্যের গতিপথ ধরে, সেই জন্য সূর্যসৃষ্ট সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এই তিনবার পরিক্রমার কারণ হতে পারে। তবে যে তত্ত্বই কাজ করুক না কেন— বর্তমানে এধরনের প্রদক্ষিণ করা হয় মৃতের প্রেতাত্মাকে দূরে রাখার জন্য, সে যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে।

শববহন :—সাধারণত মৃতদেহকে গৃহের প্রধান দ্বার দিয়ে বের করা হয় না। অনুন্নত সংস্কৃতিতে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই প্রথাই চালু আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা থেকে এশিয়ার প্রান্ত ভাগ, পূর্ব ভারতীয় ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়মই প্রচলিত আছে। এসব ক্ষেত্রে গৃহে সাধারণত কোন জানালা থাকে না। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্য চালে চিমনি থাকে। মৃতদেহকে কেউ কেউ এই চিমনি দিয়ে বা চাল ফুটো করে বের করে কেউ বা দেয়াল কেটে বাইরে নিয়ে যায়, কিন্তু ঘরের মূল প্রবেশপথ দিয়ে মৃতদেহ বাইরে নেওয়া হয় না। কোরিয়াকরা তাঁবুর প্রান্তদেশ খুলে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বের করে। যদি কারো ঘরে জানালা থাকে তবে সেখানে জানালা দিয়েও মৃতদেহ বের করা

১ NQ, xi, 8th sevies, [1897] 458.
২ RTP, xv, 154.

হয়। যে স্থান দিয়ে মৃতদেহ বের করা হয় তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে মৃতের প্রেতাত্মা ঘরে আর ফিরে আসতে না পারে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে অপঘাতে মৃতব্যক্তির দেহকে প্রধান দুয়ার দিয়ে কখনই বের করা হয় না। নর্সম্যানরা ইরবাইগগিয়া (Eyrbyggia) কাহিনীর থোরোলফ (Thorolf)-এর মত মৃত্যুর পর আত্মা আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে ফেলে বলে বিশ্বাস করে। অবশ্য আত্মার এই ক্ষতিকর ক্রিয়ার চরিত্র নির্ভর করে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তার উপর। সেই হিসেবে তারা তার মৃতদেহকে ঘর থেকে বের করে। মহাদেশীয় ইউরোপেও এইভাবে অপঘাতে মৃতদের দেহ ঘর থেকে বের করা হয়। ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপ বিশ্বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।[১] এইচ. এফ ফিলবার্গ নামে একজন গবেষক জুটল্যাণ্ডে ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া ঘরের সন্ধান পেয়েছেন। ঘরটি খামারবাড়িতে অবস্থিত। একে মৃতের গৃহ বলা হয়।[২] ইউহি (Euhe) উপজাতিভুক্ত মাৎসে গোষ্ঠী। তাদের কোন পুরোহিত মারা গেলে তাকে ঘরের চাল ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে বের করে। ওয়াদজগগরা সন্তানহীনা কোন রমণী মারা গেলে দরজার উল্টো দিক ফাঁক করে সেখান দিয়ে তাকে বাইরে আনে।[৩] নিয়া-দের দ্বীপসমূহেও প্রসবকালে মৃত কোন রমণীর ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ঘর থেকে শব বের করা হয়। টোবা-রাটকরা শবদেহ বের করে ঘরের মেঝে (পাটাতন গোছের) ফাঁক করে সেখান দিয়ে মৃতদেহ নিচে ফেলে দিয়ে। নিচে অপেক্ষমান পুরুষেরা তাকে ভাল করে কষে বাঁধে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেলে তাকে দেয়াল কেটে ঘর থেকে বের করা হয়। এইসব মৃতের প্রেতাত্মা সাধারণত ভয়ানক বলে বিবেচিত হয়। এই ভয়ানকত্ব নির্ভর করে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তার উপর ও মৃত ব্যক্তির চরিত্রের উপর।

পূর্ব প্রাশিয়ার মানুষদের মধ্যে রীতি ছিল যে, যাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই এমন মাতাপিতার মধ্যে যিনি শেষে মারা যেতেন তাকে দেওয়াল ফুটো করে বের করা হত। এখানে পর পর যাদের শিশু মারা যায় সেই শিশুই আবার সেখানে জন্মায় বলে ধারণা। এক্ষেত্রে মাতার গর্ভে আবার যাতে সেই শিশু প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য এই রীতি অনুসরণ করা হত।

প্রেতাত্মার প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা :—প্রেতাত্মার ফিরে আসার পথ বন্ধ করার জন্য দরজার উল্টো দিক দিয়ে তাকে বের করে আনলেই যে ফল পাওয়া যাবে তা নয়। প্রেতাত্মা যাতে ফেরার পথ দেখতে না পায় সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে মৃতদেহের পায়ের দিকটা আগে ঘর থেকে বের করা হয়। ইউরোপের সভ্য জাতি থেকে টোরেস প্রণালীর মা-বুইয়াক নামক বর্বর জাতি সকলেই

১ NQ. iv 8th services, [1193] 189.
২ Folklore, xviii, [1907] 374.
৩ Globus, ixxxix, 26.

এই রীতি অনুসরণ করে থাকে।[১] না হলে তাকে এমন বিভ্রান্ত করে দিতে হবে যাতে সে প্রত্যাবর্তনের পথ ভুলে যায়। প্রেতাত্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাসুতো নামক বর্বরদের সঙ্গে থুমুপাশার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভারতীয়রাও কেউ মারা যাবার পর ঘরের দরজাই পাল্টে ফেলে। এই জন্য আটোঙ্গারা মৃতদেহকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। শ্যামদেশীয়রা এ জন্য শুধু মাত্র যে ঘরের দেওয়াল ফুটো করে তা নয়, তারা মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত তিনবার এই দেহ নিয়ে ঘরের চারদিকে ঘুরে তারপর বেরিয়ে যায়। যেন ঘূর্ণনে মৃত ব্যক্তির আত্মা বিভ্রান্ত হবে।[২] চামরা কফিন ধারক দণ্ডকে মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক ঘুরাতে থাকে। মৃতদেহ নিয়ে তারা আঁকা-বাঁকা ভঙ্গীতে এগিয়ে যায়, যাতে মৃতের আত্মা প্রত্যাবর্তনের পথ অনুমান করতে না পারে।[১] ইউরোপেও অনুরূপ রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। লিষ্ট্রিন নামক স্থানে মৃতদেহকে গীর্জার প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবার জন্য সব চাইতে দীর্ঘপথটি ধরা হয়। বোধ হয় একই কারণেই আয়ার্ল্যাণ্ড ও জার্মানীতে রীতি আছে যে, মৃতদেহকে তিনবার করে গীর্জার চারদিকে ঘোরানো হবে।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে ইউরোপের নানা স্থানেই নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যে চেয়ার বা বেঞ্চের উপর কফিন রাখা হয় সে চেয়ার বা বেঞ্চ ফেলে দেওয়া হয়। তিনবার মেঝে থেকে কফিন উঠানো হয়, তিনবার নামানো হয়। এটা করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, এতে মৃতের আত্মা বুঝতে পারবে যে, তাকে শেষ বিদায় জানানো হচ্ছে। মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার পরই একটি কুড়ুল মেঝেতে রেখে দেওয়া হয়। কিংবা দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিশেষ করে সুইডেন ও পূর্বপ্রাশিয়াতে (বর্তমান জার্মানী) এটা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

শবদেহ নিয়ে বের হবার পর যে জলে শব ধোয়ানো হয় সেই জল কোথাও পাত্রসহ কোথাও বা এমনি ফেলে দেওয়া হয়। পূর্ব প্রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর বহু স্থানে এই ব্যবস্থা চালু আছে। গ্রীসে শুধু যে এই জল ফেলে দেওয়া হয় তাই নয়, যে পাত্রে শব ধুইয়ে জল রাখা হয় সেই পাত্রও ভেঙে ফেলা হয়। ঘরের অন্যান্য পাত্রের জলও ফেলে দেওয়া হয়।[৩] এ ব্যবস্থা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এ ধরনের প্রথার পেছনে নানাবিধ কারণ কাজ করে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করাও হয়তো একটি উদ্দেশ্য। মৃতের আত্মা যাতে ফিরে আসতে না পারে সেজন্যও এমন করা হয়। জল ফেলে দেওয়ার অর্থ বোধহয়—এই বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মারা জল অতিক্রম করতে ভয় পায়। গ্রীসের লোকেরা মনে করত যে, জল ছিটিয়ে দিলে শবদাহের যন্ত্রণা কম হয়। এ ধরনের কোন চিন্তা সত্য-সত্যই গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসীদের মনে ছিল কিনা তা জানা যায় না। সম্ভবত খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের পর এদের মনে এ ধরনের চিন্তাধারা কাজ

---

১ Torres straits, Expedition, vol. v, 248.

২ International Archives, xiii, suppl. 92, Martin 91.

৩ Tyrlor, Paimitive Cult, ii, 23.

করেছে। ব্রিট্টানিতে প্লাউগুলেল গোষ্ঠীর লোকেরা সমুদ্রের এক ধরনের খাড়ি পার করে তাদের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিময়দানে নিয়ে যায়। সবটাই মাটির উপর দিয়ে নিয়ে যায় না। সমুদ্রের যে অংশ এখানে ভূমির ভিতর ঢুকে গেছে তাকে এরা বলে—প্যাসেজ ডি এনটার (Passage de enter)।[১] এই প্যাসেজ ডি এনটার অতিক্রম করেও মৃতদেহ নেওয়া হয়। একইভাবে হাইদারা কোন পুরোহিত মারা গেলে তাকে জল পার হয়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যায়। স্থলপথে নিয়ে যাবার উপায় থাকলেও তারা তা করে না। তারা মনে করে যে, সাধারণ মানুষের মৃতদেহের মত সমনদের মৃতদেহকে তেমন ভাবে ভয় করার কিছু নেই। তারা—তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিজেদের কাজে লাগাতে দ্বিধা করে না। তবে, পাছে সমন বা পুরোহিতের প্রেতাত্মা ক্রুদ্ধ হয় সেই কারণে মৃতদেহকে তারা মাদুরে মুড়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য কোন্ পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পথ যেন সে জানতে না পারে। জল পার করানোর উদ্দেশ্য প্রেতাত্মা যেন জল অতিক্রম করতে না পায়।[২] সুইডেনে মৃতদেহ ঘর থেকে বের করে নেবার পর বাড়ির চারদিকে লিনসিড ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেমন ভুত তাড়াবার জন্য সরষের দানা ব্যবহার করি। উদ্দেশ্য একই, প্রেতাত্মার প্রত্যাবর্তন বন্ধ করা।

অনেকে লিনসিড বা সরষের দানার মত বীজ ছড়িয়ে দেয়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সেই দানাগুলি গুণতে গুণতে রাত কাবার হয়ে যাবে। ভুত আর ঘরে ফেরার সুযোগ পাবে না। অনেকের মতে এই শস্যদানা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ভুতকে বিভ্রান্ত করা। সুইডেনের লোকেরা যে পথ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথে—'হে-সিড' নামে একধরনের দানাবীজ ছড়াতে ছড়াতে যায় (আমাদের দেশে যেমন খই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।) কবরের আশেপাশেও এই বীজ ছড়ানো হয়। এরা মনে করে, এমন করা হলে শয়তান মৃতের আত্মাকে ধরতে পারে না। খ্রীষ্টান হবার পরেও এদের মধ্যে এ ধরনের কুসংস্কার রয়ে গেছে।[৩]

স্বরকের আইবানদের মধ্যে আর এক অদ্ভুত রীতি কাজ করে। যে পথ দিয়ে তারা শব বহন করে নিয়ে যায়—সে পথের উপর তারা ছাই ছিটিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য পায়ের ছাপ ঢেকে দেওয়া যাতে করে প্রেতাত্মা কোন চিহ্ন দেখে আর ফিরে আসতে না পারে।[৪] ইউরোপের কোন কোন অংশেও এমন ধরনের রীতি লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের একটা ঘটনা এ ধরনের বিশ্বাসের একটি জীবন্ত নমুনা হয়ে আছে। কোন এক মহিলা হাসপাতালে ছিল। বাড়ির সকলে ধরে নেয় সে মারা গেছে। কিন্তু যখন সে ফিরে আসে ভয়ে লোকেরা পথের উপর ছাই ছিটিয়ে দিতে থাকে। মহিলাটির

১ RTP. xv. 631.
২ Jesup, Expetitions, vol. v, 53.
৩ Lloyd, 131, 139.
৪ Anthropos, 1, 169.

স্বামী তাকে প্রেতাত্মা মনে করে ঘরে নিতে অস্বীকার করে। কঙ্গোর নগ্নপদ অধিবাসীরা মৃতদেহ নিয়ে যাবার পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। কবরখানা পর্যন্ত কাঁটা ছড়ানো হয়। সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা—যে পথ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সে পথ দিয়ে ফিরে আসে না, পাছে মৃতের প্রেতাত্মা তাদের অনুসরণ করে।[১] করফুগোষ্ঠীর লোকেরাও অনুরূপ প্রথা মেনে চলে। অনেক বর্বর জাতি আছে যারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই প্রাচীর-এর মত বেড়া তৈরি করে। কোরিয়াক্, যারা মৃতদেহ দাহ করে তারা চিতার চারধারে টাট্কা গাছের ডালপালা ছড়িয়ে দেয়। যেন চিতার চারদিকে অরণ্য রয়েছে এই ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। যে পুরোহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকেন তাঁর চলার পথকেও আড়াল করে রাখার চেষ্টা হয়। যে রাস্তা দিয়ে তারা ফেরে সে রাস্তার মাঝে মাঝেই রেখা কেটে দেয়। সেই রেখা তারা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়। একটা রেখা পার হয় আর নিজেদের সারা দেহ ঝাঁকাতে থাকে। যেন কোন কিছু ভর করে থাকলে তা পড়ে যাবে। রেখাগুলোকে নদীর প্রতীক হিসেবে টানা হয়। চুক্চিদের রীতিনীতিও অনুরূপ। তারা মৃতদেহ পরিষ্কার করতে একটি জলপাত্র এবং কিছু দূর্বাঘাস ব্যবহার করে। কাজ হয়ে যাবার পর সমাধিস্থলে যাবার পথে কোনধারে পৃথক পৃথক ভাবে তা লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস জলপাত্র থেকে সমুদ্র হবে, ঘাস থেকে অরণ্য।[২] এইভাবে চুকচি ও কোরিয়াকদের পার্থিব রঙ্গমঞ্চের লোকেরা ধরাধাম থেকে বিদায় নেয়। গুণিনদের ক্ষেত্রে চলে যায় তাদের জাদু ক্ষমতা এবং পিশাচবিদ্যা। এই জাদুভূত বা পিশাচের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই চুক্চি ও কোরিয়াকরা উপরোক্ত সব ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। জামাইকার নিগ্রোদের বিশ্বাস যে, কোন মৃতদেহ যদি স্ব-ইচ্ছায় সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে সে দেহ হাল্কা থাকে, সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যদি সে দেহ যেতে না চায় তাহলে ভারি হয়। বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৩]

কার নিকোবর দ্বীপে অদ্ভুত এক অনুষ্ঠান করা হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে মৃতদেহ নিয়ে রীতিমত নাটক চলে। একদল মৃতদেহ কবরের দিকে নিয়ে যায়। আর একদল তা জোর করে গ্রামের দিকে টেনে রাখতে চায়। টানা হিঁচ্ড়েতে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। একবার এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শী কোন এক ব্যক্তি তা দেখে রীতিমত শিহরণ বোধ করেছিলেন। দু'দলের মধ্যে নকল যুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যেন মৃতদেহ গ্রামের মধ্যেই ফিরে আসবে। তা দেখে মহিলা ও শিশুরা রীতিমত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যারা কবর দিতে চায় তাদেরই জয় হয়। মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবরে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়। তারপর রীতি অনুযায়ী যে

১ Daily Chronology, 30th August. 1904.

২ Codrington, 254.

৩ Folklore, xv, 453.

সব অনুষ্ঠান করতে হয় তা করা হয়।[১] তবে অনুষ্ঠান হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তবেই।

শেষ বিদায়ের বাণীঃ—মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা যাতে গ্রামে ফিরে না আসে এ নিয়ে নানাধরনের কাজ তো করা হয়ই, তা ছাড়া আছে কিন্তু মন্ত্র বা বাক্য উচ্চারণ। এই বাক্য উচ্চারণ করা হয় মৃতের উদ্দেশে যাতে সে আর গ্রামে ফিরে না আসে। এজন্য কতকগুলি প্রতীকও ব্যবহার করা হয়।

সুমাত্রার বাটকদের মধ্যে রীতি আছে মৃতদেহ কবর দেবার আগে তারা তার আত্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। এই আত্মার নাম বেগু। বেগুকে পুরোহিতদের কার্য-কলাপ দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, সে আর বেঁচে নেই। সুতরাং জীবিতদের সঙ্গে তার আর বসবাস করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এরপর তারা নৃত্য শুরু করে। মৃতের আত্মার জন্য জেরাঙ্গো (Djerango) নামে একধরনের বিশেষ জিনিস তৈরি করে। একপাত্র জেরাঙ্গো নিয়ে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা হয়। মৃতের দেহের কোনো অংশ এই জেরাঙ্গো দিয়ে ঘষা হয়, তারপর তা মৃতের দেহের উপর জুড়ে দিয়ে বলা হয়ঃ—'তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা আর তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।[২]

চামদের মধ্যে রীতি আছে, শবদাহ করার সময় এক ব্যক্তি গৃহে থাকবে। শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে সে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে অনুনয় বিনয় করে বা হুকুম করার ভঙ্গিতে মৃতের আত্মাকে ঘরে ফিরে এসে আত্মীয়-স্বজনকে পীড়ন করতে বারণ করে।[৩] এ ব্যাপারে উত্তর টঙকিঙের মুয়াং বা মনরা ব্যাপক অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই রাত থেকেই আরম্ভ করা হয়। গুণিনরা এসে মন্ত্র পড়তে থাকে এবং জোরে জোরে বেল বাজাতে আরম্ভ করে—যাতে দুষ্ট আত্মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সে প্রেতাত্মাকে পরপারে গিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে বলে। যাত্রাপথে তাকে পরিচালিত করার জন্য সে একে একে মৃত পূর্বপুরুষদের নাম করতে থাকে এবং আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কোথায় কোথায় তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল। সে তখন এক ধরনের পরীক্ষা করে দেখে যে, তার কথা প্রেতাত্মা বুঝতে পেরেছে কি না। টাকার হেড বা টেল্ ধরে যেমন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ব্যাপারটা তেমনই। যদি এই পরীক্ষায় বোঝা যায় যে, মৃতের আত্মা বুঝতে পেরেছে, তবে অনুষ্ঠান শেষ হয়। যদি বোঝা যায় যে, সে বুঝতে পারে নি তা হলে যতক্ষণ না সেই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে যে, সে বুঝতে পেরেছে, ততক্ষণ তা চালানো হবে। তাতে যদি বহুবারও এই অনুষ্ঠান করতে হয় তাই করতে হবে। দ্বিতীয় রাতে মৃতের পূর্বপুরুষদের সম্মানে অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সঙ্গে গুণিনদের গুরুকেও সম্মান

১ JAI. xv, 453.
২ ARW. vii, 503.
৩ Cabatan, 48

জানানো হয়। প্রার্থনা বা অনুষ্ঠান করে প্রেতাত্মাকে ঊর্ধ্ব পর্যায়ের কোন শক্তি বা জিন-পরী জাতীয় কোন দেবতা বা দেবীর বাসস্থানের কথা বলে দেওয়া হয়—যার কাছে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে যাবার জন্য সে অনেক সাহায্য পাবে। নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা হয় তার নির্দেশ প্রেতাত্মা বুঝতে পেরেছে কিনা। তৃতীয় রাতে গুণিনদের আদি পুরুষের সম্মানে অনুষ্ঠান করে জানানো হয় যে, সে যেন প্রেতাত্মাকে কবরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং বুঝিয়ে দেয় কোন্ কবরে তাকে শয়ন করতে হবে। এই কবর সাধারণত দিনের বেলা খোঁড়া হয়। শবযাত্রা শুরু হবার আগে আর একবার গুণিন পরীক্ষা করে দেখেন যে, মৃতের আত্মা তাঁর নির্দেশ বুঝতে পেরেছে কি না। তারপর তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি কবরে দুটো বেদী থাকে। একটি মৃত্যের জন্য আর একটি পৃথিবীর আত্মার জন্য। কান্নার উচ্চ রোলের মধ্য দিয়ে মৃতদেহকে কবরে নামিয়ে বলা হয় উত্তরাধিকারী জীবিত ব্যক্তিদের সে যেন উৎপীড়ন না করে। পৃথিবীর আত্মার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়—তিনি যেন মৃতের আত্মাকে শান্তি দান করেন।[১]

পশ্চিম চীনের লোলোদের মধ্যে রীতি ছিল তারা মৃতের আত্মাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিত কোন পথে তাদের পরলোকে পাড়ি দিতে হবে। কবরে নিয়ে যাবার সময় পুরোহিতরা জো-মো নামক এক ধরনের মন্ত্র পড়ত যার অর্থ পথনির্দেশক অনুষ্ঠান। পুরোহিত নিজে মৃতদেহের সঙ্গে গৃহ থেকে একশ পদক্ষেপ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন। এই অনুষ্ঠানের বক্তব্য হল এই যে, জীবনে যেমন পিতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে নির্দেশ দেন, তেমনই মৃতকে একমাত্র পুরোহিতই নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোন্ পথে তার আত্মা যাত্রা করবে। প্রথমে গৃহ-প্রাঙ্গণ তারপর কবরের পথে নানা স্থানের উল্লেখ করা হত। এরপর যে সমস্ত শহর নদনদী ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করতে হবে তার নির্দেশ থাকত। শেষে উল্লেখ করা হত তালিয়াঙ পর্বতের—যেখানে লোলোদের আত্মারা বাস করে। শেষ পদক্ষেপের পর পুরোহিত বলতেন, এবার তিনি ফিরে যাবেন। এখন থেকে মৃতের আত্মাকে একাই চলতে হবে। লোলোদের বিশ্বাস ছিল যে, এর পর আত্মা যাবে হাডেসে (Hades)। সেখানে চিন্তা-বৃক্ষের ও কথা-বৃক্ষের নিচে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কান্নাকাটি করবে। এই অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পুরোহিত ফিরে যেতেন এবং মৃতদেহকে করবস্থ করা হত।[২] হুপাদের মধ্যে কাউকে কবর দিতে যাবার আগে বলা হত—যা ত্যাগ করে যাচ্ছ সেজন্য নিঃসঙ্গ বোধ কোরো না। যখন বেঁচে ছিলে সুসময় ছিল। তুমি যাদের ছেড়ে যাচ্ছ তাদের ভাল হোক। সরাঙ্গ দ্বীপে মোলাক্কাদের মধ্যে পুরোহিতেরা পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে প্রার্থনা জানান, যেন নতুন আত্মার প্রতি তাঁরা ভাল ব্যবহার করেন। তাকে যেন ভালভাবে গ্রহণ করা হয় এবং ঈশ্বরের কাছে

১ Lunet, 350.
২ JAI xxxiii, 108.

নিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়। তাঁরা যেন পৃথিবীর মাতার কাছে প্রার্থনা জানান যে, মৃতের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোষ্ঠী থেকে সমস্ত রোগ দূর হয়ে যাক।[১] এ-সব প্রার্থনা করা হত এই উদ্দেশ্যে যে, প্রেতাত্মা ফিরে এসে যেন পরিবারে অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি না করে।[২] গ্রীনল্যান্ডে যখন কোন মৃতদেহকে কবর দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েরা হাল্কা কাঠে আগুন ধরিয়ে এদিক ওদিক নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলতে থাকে ঃ—'এখানে আর কিছু পাবার নেই।' মধ্য আফ্রিকাতে অনুরূপভাবে আওয়েম্বারাও মৃতের উদ্দেশে বলে "তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি সকলে নজর রাখবে। পরলোকে সে যেন শান্ত হয়ে থাকে।[৩]

গৃহ থেকে দূরে মৃত্যু ঃ প্রত্যেক মানুষই আশা করে যে, মৃত্যুর সময় সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের মধ্যে থাকবে। মৃত্যু-সম্পর্কিত যে-সব অনুষ্ঠান-রীতি আছে তাতে স্বীয় বাসভূমিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাই বেশি করে বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি দূরে দেশে মারা যায় তাহলে অস্থায়ীভাবে তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হয়। বছরখানেক পরে কবর থেকে অস্থি তুলে এনে তার পারিবারিক সমাধিতে রাখা হত। যদি অস্থি আনা সম্ভব না হত তবে তা পুড়িয়ে ছাই নিয়ে আসতে হত।[৪] রোমান সৈন্যদের ক্ষেত্রে রীতি ছিল বাইরে কোথাও মারা গেলে তাদের একটি অস্থি অন্তত দেশে নিয়ে আসতে হবে। টোগোল্যান্ডের হো-দের মধ্যে নিয়ম ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যুদ্ধে মারা গেলে তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হত। পরে কবর খুঁড়ে হাড়, চুল, নখ ইত্যাদি কফিনে করে দেশে নিয়ে আসত। [তিব্বতে কোন ধর্মীয় নেতা মারা গেলে—তার শিষ্যেরাও এমন করত। আলবেনিয়ানদের মধ্যে যাযাবরবৃত্তি থাকার দরুন তারা একস্থান থেকে প্রায়ই আর একস্থানে চলে যায়। বিদেশে মারা গেলে তাদের হাড় সংগ্রহ করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সবটা পারা না গেলে অন্তত একটি অস্থি ও মাথার খুলি বা করোটি অবশ্যই দেশে আনা হয়। প্রাচীনকালে গ্রীসের স্পার্টায় নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রাজা যুদ্ধে মারা যান তাঁর প্রতিমূর্তি তৈরি করে কবর দেওয়া হবে।[৫] কোসেনজার চতুর্দিকে কয়েকটি গ্রামে নিয়ম ছিল যে, দূরবেশে কেউ মারা গেলে তার মূর্তি তৈরি করে বিছানায় শোয়ানো হবে এবং আত্মীয়-স্বজনেরা এই মূর্তিকে ঘিরে শোকের কান্নায় ভেঙে পড়বে। ব্রিট্টানির কোয়েসাম্টে কোন নাবিকের মৃত্যু হলে একটি ক্রুশ তৈরি করে গৃহে নিয়ে যাওয়া হত। এই ক্রুশ মৃত ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে

১ Riedel—141.

২ Goddard. 70.

৩ JAI, xxxvi, 157, Journal of African society, v, 436.

৪ Jesup, Expedition, iii, 270.

৫ Herod, vi, 58.

কাজ করত। সিন (Sein) দ্বীপে কেউ মারা গেলে তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে সমাধিস্থ করা হত—না হলে তার কোন প্রিয় দ্রব্যকে কবরে রাখা হত। এই প্রতীককে কেন্দ্র করেই যাজকেরা তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতেন, শবযাত্রাও হত।[১] উত্তর টঙকিঙের মান তিয়েনে, কোন লোক বিদেশে মারা গেলে গুণিনরা তার আত্মাকে অনুষ্ঠান করে ডেকে আনতেন। মান তিয়েন-এর লোকেরা বহু আত্মায় বিশ্বাসী। এই বহু আত্মার মধ্যে একটি আত্মা অন্তত গুণিনরা আনতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল। একটি পুতুলের মধ্যে গুণিনরা এই আত্মা ভরতেন। তারপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হত।[২] নিকট প্রাচ্যে মন্টেনিগ্রিনরা দূরদেশে কেউ মারা গেলে তার ডামি তৈরি বরে তাতে মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক পরিয়ে কান্নাকাটি এবং নানাধরনের পারলৌকিক অনুষ্ঠান করত। তবে যথার্থ অর্থে কোন কবর দেওয়া হত না।[৩] অপর পক্ষে বাসোগ (Basoga)-দের মধ্যে দেখা যায় কেউ দূরদেশে মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজন বাড়ি থেকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গাছের ডাল কেটে,গাছেরই বাকল দিয়ে তা জড়িয়ে রেখে ফিরে আসত। তারপর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যে-সব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয় তা সবই করত। এমনকি মৃতদেহকে কবর পর্যন্ত দিত।[৪]

যারা এ ধরনের অনুষ্ঠান করত তারা এতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত সন্দেহ নেই। ভাবত এইভাবে পারলৌকিক ক্রিয়া করাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা যে অবস্থা লাভ করত এক্ষেত্রেও তাই হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পরলোকে তার যথার্থ স্থান লাভ করবে।

কবরের আসবাবপত্র ও খাদ্যসামগ্রী : দৈহিক মৃত্যুতেই মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হয় মানুষ কোনদিনই একথাতে বিশ্বাস করত না। মৃত্যুর পর স্থূলদেহীর একটি সূক্ষ্ম সত্তা থেকে যায় এ বিশ্বাস তাদের ছিল। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান চর্চায় এ বিশ্বাসের উপর আঘাত পড়লেও বর্তমানে নতুন করে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। বিশেষ করে অধিমনোবিজ্ঞান চর্চার ফলে এ বিষয়ে চিন্তাধারা অনেকটাই প্রাচীনদের বিশ্বাসের কাছাকাছি ফিরে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকেই সমাধিক্ষেত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষ নানাভাবে যত্ন নিয়েছে। প্রেতাত্মার ভীতি এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি অনুরাগবশত এমন সব কবরও তৈরি হয়েছে যা বহু ব্যয়সাধ্য। যেমন মিশরের পিরামিড। বহু ব্যয়ে এই ধরনের সমাধিক্ষেত্র তৈরি করার কারণ এই যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে গৃহে যেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত মৃত্যুর পরও যেন কবরে থেকে তেমনই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে। সেই

১ RTP vi [1891] 156. xiv, 346.
২ Lunet, 258.
৩ JAI, xxxix, 92.
৪ Cunningham 118.

জন্য কবরক্ষেত্রে খাদ্য থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ প্রসাধনসামগ্রী দিয়ে দেওয়া হত। এমন কি, তার প্রিয় ব্যবহার্য জিনিস, দাসদাসী সব।

মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের তানেমবার ও তিমোরলট দ্বীপ দুটিতে দু'বছর বয়সের নিচে কোন শিশু মারা গেলে মা সমাধি দেবার আগে তার মুখে বুকের দুধ দিয়ে দেয়।[১] দিনভুম অরণ্যে কোন উরানি মারা গেলে তার কবরস্থানের কাছে একটি মোষ (স্ত্রী)-কে আনা হয়। তাকে কবরে ঢুকিয়ে দেবার আগে তিনবার তার মুখে মোষের দুধ দুইয়ে দেওয়া হয়।[২] অস্ট্রেলিয়ার বহু আদিবাসীর কবরে খাবার ও পানীয় দিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় অনেক দিন ধরে এই খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হয়।[৩] ভারতবর্ষে আসামের কোন কোন পার্বত্য জাতি এক বছর যাবৎ এই খাবার ও পানীয় সরবরাহ করে। পাপুয়া দ্বীপের অনেক গোষ্ঠী মৃতের কবরের পাশে টারোগাছ পুঁতে দেয়।[৪] আইরোকোয়ি (Iroquois) গোষ্ঠীর লোকে সাধারণত মৃতদেহ মুক্ত আকাশের নিচে ফেলে রাখে। মৃতের সঙ্গে তারা একবস্তা আটা, মাংস, চামচ প্রভৃতি দিয়ে দেয়। সাধারণত দূর দেশে যাত্রা করলে এক ব্যক্তি যতটুকু খাবার সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করে ঠিক ততটুকু খাবারই মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়।[৫] কালিফোর্নিয়ার অ্যাকোমাওয়িরা—মৃতের সঙ্গে শুখনো মাছ, গাছের শেকড়, লতাগুল্ম ইত্যাদি দিয়ে দিত। গায়ানার ডয়াকরা রুটি, ফল ও শুকনো মাছ দিত। আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সকল উপজাতিই অনুরূপ রীতি অনুসরণ করত।

পশ্চিম আফ্রিকার অগ্নি-গোষ্ঠী মৃতদেহের সঙ্গে দিয়ে দেয় রক্ত, খাদ্য ও পানীয়। নিগ্রোরা সাধারণত ব্রান্ডি, পোম্বে বা রাম জাতীয় মাদক পানীয়ও দিয়ে থাকে। নাইজারের নিম্ন অঞ্চলে মৃতের কবরে কয়েক পাত্র রাম ও তালসুরা ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে মৃতের আত্মা শক্তিমান হয়ে পরলোকে গিয়ে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিলতে পারে। শুধু যে নিগ্রোরাই এরকম করে তা নয়, বান্টু জাতের অধিকাংশই অনুরূপ রীতি অনুসরণ করে থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলের কাফির জাত ষাঁড় হত্যা করে তার অস্ত্র মৃতের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেয়। উত্তরাঞ্চলের বাগাণ্ডারা মৃতের কবরে খাবার নিয়ে আসে এবং কবরের উপর বিয়ার ঢেলে দেয়। এই রীতি যে শুধু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রচলিত আছে, তা নয়—সভ্য কোরিয়ররাও ভারতে ত্রিবাঙ্কুরের পার্বত্য উপজাতিদের মত (মান্নান) মৃতের মুখে কিছু ভাত দিয়ে দেয়।[৬] ইলিয়াদ পাঠ

১ Riedel, 306.
২ Thurston, vil, 255.
৩ Howitt pp. 448-455 etc.
৪ ZVRW, xix, 163.
৫ IRBEW, 140.
৬ JAIXXV, [1896] 347; Indian Census Report 1901, xxxvi P.349.

ক'রলে দেখা যায় ভেড়া ও ষাঁড়ের মৃতদেহ পেট্রোক্লাসের সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। গ্রীসের প্রাগৈতিহাসিক লোকেদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে ভোজসভা দেওয়া হত (অর্থাৎ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে) তার ভুক্তাবশেষ রয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বসবাসকারী গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীন এই ধারা অদ্যাবধি মুছে যায় নি। বুলগেরিয়াতে দেখা যায় কবর দেবার পরও তিনদিন মহিলারা কবরে গিয়ে ধূপ জ্বালে, সুগন্ধি ছড়ায় এবং কবরের উপর জল ও মাদক পানীয় ঢেলে দেয়। চল্লিশ দিনের দিন এক মহিলা পুরোহিতের সঙ্গে এক ধরনের পিষ্টক (কেক) নিয়ে সেই কবরে যায়। সঙ্গে নেয় এক বোতল মদ।

সবই কবরের উপর রাখা হয়। উদ্দেশ্য মৃতের চোখের উপর থেকে যেন মাটি সরে যায়। যাজক মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে কবরে ধুলো ছড়ায় এবং কবরের উপরের মাটি সমান করে দেয়। তারপর ছোট একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে জল ঢালে ও ও কিছু খাদ্য রেখে দেয়। তাছাড়া প্রতি বছর মৃতের স্মরণে মহিলারা সেখানে ধূপ-ধুনো দেয় এবং কবরের উপর মদ ও জল ঢালে। অনেক সময় ফলও রেখে আসে। যে-সব মহিলার স্বামীরা কফি খেতে ভালবাসতেন, তারা নিত্য সমাধিতে কফি ঢেলে দেয়। মন্টেনিগ্রোতে কবরে আপেল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও কবরের উপর ছোট চারাগাছ লাগিয়ে তাতে কয়েকটা কমলালেবু ও কয়েক টুকরো রুটি ঝুলিয়ে রাখে।[১] অন্যত্র বাৎসরিক স্মরণ দিবসে বিশেষ ধরনের রুটি (কেক) তৈরি করে কবরের উপরে তা ভেঙে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[২]

আমেলিনু (Amelineau) নামে এক মিশর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন যে, ফ্রান্সের শেটুডুন (Chateaudun)-এ তিনি এক বিধবা মহিলাকে দেখেছিলেন—যিনি এক বছরের উপর নিত্যদিন তার স্বামীর কবরের ওপর এক কাপ চকলেট রেখে আসতেন। ওয়েন্ড, কাওভ, উত্তর জার্মানী ও প্রাশিয়ার স্লাভেরা মৃতের হাতে একটি করে পাতিলেবু দিয়ে দেয়। ওয়েন্ডরা মৃত শিশুদের সঙ্গে দিয়ে দেয় ডিম ও আপেল। যারা সুরাসক্ত তাদের দিয় দেয়া হয়—পাইপ ও ব্রান্ডির বোতল। এরা মনে করে যে, এ-সব সঙ্গে না দিয়ে দিলে মৃতের আত্মা শান্তি পাবে না। ক্রোশিয়াতে কবরে ডিম, আপেল, রুটি প্রভৃতি দিয়ে দেওয়ার রীতি প্রায় সর্বত্রই আছে। তাছাড়া প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সাধুসন্তের জন্ম দিনেও সেখানে গিয়ে খাবার রেখে আসা হয়।[৩]

বুলগেরিয়ার যাজকেরা নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়ে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আসে। প্রাচীন কোসিস-এর ট্রোনিস নামক স্থানে একজন বীর সৃষ্টিকারী ব্যক্তির কবরে নিত্যদিন বলি দিয়ে পুজো দেওয়া হত। কবরের

১ JAI xxxix, 93.

২ Rodd, 126.

৩ Globus, lxxxv [1904] 39.

৪ Paus xiv, 7.

ভেতরে শায়িত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য সেখানে একটি স্থায়ী গর্তও খোঁড়া থাকত। এই গর্ত দিয়ে বলিপ্রদত্ত পশুর রক্ত ঢেলে দেওয়া হত। ভক্তেরা সেখানে বসে পশুর মাংস প্রসাদ হিসেবে নিতেন।[১] ফ্রেজার নামে এক পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন যে, প্রাচীন রোম ও গ্রীসের বহু কবরে এই ধরনের স্থায়ী গর্ত খোঁড়া ছিল—যে গর্ত ছিল কবরের ভেতর অবধি। সেখান দিয়ে নিয়মিত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হত। অনুরূপ নিদর্শন আফ্রিকার নানা দেশ, পেরু, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়।

কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে খাদ্য ও পানীয় পেঁছে দেবার এই ব্যবস্থার উপর আরও ভিন্ন কারণে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা হত।

মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গঃ—এক সময় বিশেষ করে রাজরাজড়াদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে তাঁরা মারা গেলে তাঁদের স্ত্রী, দাসদাসী, এমনকি তাঁদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হত্যা করে কবর দেওয়া হত। The death of Sardanapalus চিত্রে ইউজিন ডেলাক্রয় (Eugene Delacroix) এই প্রথাটিকে অমরত্ব দান করে গেছেন। প্রাচ্যের জনৈক রাজার মৃত্যু হচ্ছে। চিতার উপর তিনি শেষ বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে জীবিতকালে তাকে যেসব জীবন্ত প্রাণী আনন্দ দিত তাদের হত্যা করা হচ্ছে। যে সব জিনিস তাকে আনন্দ দিত তাও বিকৃত করা হচ্ছে এ-সব তাঁর সঙ্গে যাবে বলে।[২] এটা করা হত পরলোকে রাজাকে ইহলোকের মত মর্যাদা, সুখ ও আনন্দ দেবার জন্য। এরই একটি ক্ষীণধারা ছিল ভারতীয়দের সতীপ্রথার মধ্যে। এতে হিন্দু স্বামী মারা গেলে তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীবৃন্দকে স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় পোড়ানো হত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে রাষ্ট্রীয় আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তথাপি নেপাল এবং ভারতের কোথাও গোপনে গোপনে আজও এই প্রথা চলে আসছে। সম্প্রতি রাজস্থানে সতীদাহের ঘটনা ভারতবর্ষে বিপুল প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিয়েছে (১৯৮৭ খ্রীঃ)। সম্ভবত আর্যরা যখন বর্বরতার পর্যায়ে ছিল, তখন তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর ভারতে বহুদিন পরে আবার এই প্রথার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল, যেগুলিকে স্বার্থকেন্দ্রিক বলা যেতে পারে। ভারতে অনার্যদের মধ্যেও অনেক গোষ্ঠী সেদিন পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রথা অনুসরণ করত। এখানে কোন রাজা বা গোষ্ঠীপ্রধানের মৃত্যু হলে তাঁর দাস-দাসীদের হত্যা করে একই সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হত। কবর সাজানোর জন্য অনেক সময় শত্রুপক্ষের বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে তাদের মাথা কেটে আনত।[৩]

পৃথিবীর সর্বত্রই যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তা নয়। তবে আর্যদের মধ্যে এ প্রথা

১ The death of Sardanapalus, Delacroix, Land Marks of the World's Art', Modern World. pp. 13, 19.
২ Things, Indian, Lond, 1906 ; p. 446; Anthropologies, IV, 473.

প্রায় সার্বিক ছিল বলা যায়। সীজার এবং মেলা গলদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। গলরাও হিন্দুদের মত মৃতদেহ দাহ করত। মেলা (Mela) থেস্রিয়ানদের মধ্যেও এই প্রথা দেখেছিলেন। বর্তমান আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিল।[১] হোমারের ইলিয়াদে এর জীবন্ত প্রমাণ রয়েছে পেট্রোক্লাসের শবদাহের মধ্যে, যাতে বারজন বীর ট্রজানকে তার সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। ভল্গা তীরবাসী বুলগারদের মধ্যে আরব পর্যটক ইবুন ফাধিয়ান ৯২১-৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ একটি দৃশ্য দেখেছিলেন! এক তরুণ গোষ্ঠী-প্রধানকে সেখানে চিতায় পোড়ানো হচ্ছিল। পোড়াবার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকেও চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল।[২] এটা এই প্রমাণ করে যে, অবিবাহিত কোন অভিজাত ঘরের তরুণ সন্তান মারা গেলে তার সঙ্গে মৃত অবস্থাতেই কোন বালিকার বিবাহ দিয়ে তাকে কবরস্থ করা হত বা পোড়ানো হত।

অন্যত্রও এই নির্মম প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার ট্রান্সভালে বাভেন্ডাদের মধ্যে রীতি ছিল যে, কোন অবিবাহিত ছেলে মারা গেলে তার সঙ্গে একটি মেয়েকেও কবর দেওয়া হত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরলোকে মেয়েটি তার পত্নী হবে। এখন আর কোন মেয়েকে এজন্য হত্যা করা হয় না। গুণিনরা কিছু অনুষ্ঠান ক্রিয়া করেন, যাতে—বালিকাটিকে হত্যা না করেও উদ্দেশ্য সাধিত হয়।[৩] মধ্য আফ্রিকার বান্টু উপজাতিদের মধ্যে ওয়াদজগ্গ বা ওয়াচগদের মধ্যেও সহমরণ প্রথা ছিল। তবে বর্তমানে কিছু অনুষ্ঠান করে স্ত্রীরা এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। চিতাগ্নি জ্বালাবার আগেই এই অনুষ্ঠান করা হয়।[৪] ওরেগোনের টোলকোটিনরা—মৃতদেহকে পুড়িয়ে থাকে। তারা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদের চিতায় তুলে দেয়। তবে তাকে একটু আধটু পুড়ানো হলেও পুড়িয়ে একেবারে মেরে ফেলা হয় না।[৪]

স্ত্রীদের স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে দেখা গেলেও স্ত্রীর চিতায় স্বামীকে পোড়ানো হয়েছে, এমন নজির খুব কম পাওয়া যায়। তবে এমন রীতি যে ছিল না তা নয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন প্রবল ছিল তখন হয়তো স্বামীদেরও পুড়িয়ে মারা হত। এর একটি গল্প পাওয়া যায় 'আরব্য রজনী'তে যেখানে সিন্ধবাদ নাবিককে তার স্ত্রীর সঙ্গে কবরে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সম্ভবত প্রাচ্যে স্বামীদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। তারই একটি ক্ষীণধারার পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পে। নাটচিজ (Natchiz)-এর কোন রাজপরিবারের মহিলা মারা গেলে তার স্বামীকেও স্ত্রীর সঙ্গে সহমৃত্যু বরণ করতে হত। অশান্টিতে (Ashanti) রাজার অনুমতি নিয়ে তার

৩ O, Curry Manners and Customs, Dublin, 1873, i Coe xx.
১ RHR. III [1905] 325.
২ JAI, xxxv, 381.
৩ Globus, lxxxix, 198.
৪ IRBEW, 145.

ভগ্নীরা—দেখতে সুন্দর এমন যে কোন তরুণকে বিয়ে করতে পারত, তা সে যত নিচু বংশোদ্ভূতই হোক না কেন।[১] তবে এটা জানা ছিল যে, স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। একমাত্র ছেলের মৃত্যু হলেও তাকে আত্মহত্যা করতে হত। এই নিয়মের হাত এড়িয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। পালাবার চেষ্টা করলেও তাকে ধরে আনা হত।[২]

একসময় মৃতের সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পুড়িয়ে মারা বা কবরস্থ করার নীতি পরিত্যক্ত হলেও এর কিছু চিহ্ন বা নমুনা বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। জাপান, চীন ও কোরিয়াতে কয়েক শতাব্দী আগে মাত্র এই রীতির অবসান ঘটেছে। যে-সব দাসদাসীকে আগে প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে চিতায় বা কবরে পাঠানো হত, এখনও অনেক জায়গায় প্রতীকী ভাবে এই রীতি পালন করা হয়, যেমন দাসদাসীর পুতুল তৈরী করে কবরে রাখা হয়। লোকে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ধাতুদ্রব্য বা মাটি দিয়ে এই সব পুতুল তৈরি করে। এই প্রতীকরূপ দাসদাসীদের মিশরের কবরগুলিতে দেখা যায়। উত্তর টঙকিঙের হুয়াং হোয়া প্রদেশের মান কুয়াঙ ত্রাঙুরা কবরের পাশে ছোট একটি কুটির তৈরি করে এবং সেখানে পুরুষ বা মহিলার প্রতীক হিসেবে একটি পুতুল রেখে দেয়। [হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধের সময় একটি কাষ্ঠদণ্ডে মনুষ্য প্রতিকৃতি অংকন করে পুঁতে রাখা হয়। এর উদ্দেশ্যেও অনুরূপ কিছু একটা হতে পারে]। এই পুতুল মৃতের সহযোগী বা সহযোগিনী হিসেবে কাজ করবে বলে তাদের বিশ্বাস। সেইজন্য পুতুলটিকে সেখানে রেখে আসার সময় তার গায়ে টোকা মেরে তাকে বলে—'ওকে দেখো।'

সহমরণের যে গল্প বা প্রমাণ আমরা পাই এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সহমরণে দেওয়া হত জোর করে। অনেক সময় অনেকে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত। [মহাভারতে মাদ্রী স্বেচ্ছায় পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, সেকালে অন্তত পঞ্জাবে সহমরণ প্রথা ছিল।] স্বেচ্ছায় যারা সহমরণে যেত, তারা যেত অত্যন্ত শোকাহত হয়ে। তবে হিন্দু ও গলপ্রধানদের ক্ষেত্রে এই সহমরণ হত প্রথা অনুযায়ী। যারা সহমরণে যেত—তারা যেত কিছুটা কুসংস্কারে; কিছুটা এই জেনে যে, প্রথা ভাঙবার চেষ্টা করলে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে—কিংবা এই রীতি ভেঙে সমাজে থাকলে পরিবেশের এমন চাপ সৃষ্টি করা হবে যে, তার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই দুঃসহ হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্য সহমরণে যেতে তারা পরোক্ষভাবে বাধ্য হত।

মৃতের সম্পত্তিঃ—মনুষ্য সভ্যতার উন্মেষের প্রাক্কালে সম্ভবত এই রীতি ছিল যে, কোন লোক মারা গেলে তার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত—অথবা নষ্ট করে ফেলা হত। এখনও পৃথিবীর নানা স্থানে এ-ব্যবস্থা চালু আছে।

১ IRBEW, 187.
২ Ellis, Tshi-speaking people, Lond. 1887, 287.

এটা সম্ভবত মৃত্যুদর্শনজনিত ভীতি থেকেই করা হয়। অর্থাৎ মৃতের প্রিয় জিনিসপত্রের কাছে তার প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করবে এই ভীতি থেকে তার প্রিয় সম্পদ কেউ নিতে ভয় পেত। সেইজন্য তারা মৃতের সম্পদ তার সঙ্গে চিতায় বা কবরে দিয়ে দিত। পরে লোকে বুঝতে পারে যে, সম্পদ এভাবে নাশ হলে সম্পদের সাহায্যে যে অগ্রগতি সম্ভব তা হবে না। সেইজন্য সামান্য কিছু মৃতের সঙ্গে দিয়ে বাকীটুকু তারা রেখে দিতে আরম্ভ করে।

গৃহপালিত পশুঃ প্রাচীনকালে গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত। ভারতবর্ষে গোধন ছিল অর্থের প্রতীক। সুতরাং অনেকে মনে করত যে, এইসব পশু যা আহার্য হিসেবে এবং সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হয় তা মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়াই ভাল, কারণ পরলোকে এগুলো তার কাজে লাগবে। [ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধে যে বৃষোৎসর্গ করার রীতি আছে তা কি এই প্রাচীন সম্পদদান-প্রথারই একটি স্মৃতি মাত্র ?] হেরেরো জাতের মধ্যে এইজন্য রীতি আছে যে, কেউ মারা গেলে তার পোষা জন্তু-জানোয়ারদের মেরে ফেলা হয়, পাছে এদের লোভে প্রেতাত্মা ফিরে এসে পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি করে। এইজন্য কোন লোক মারা গেলে পরদিন তারা তার পোষা জন্তুগুলিকে মৃত আত্মার উদ্দেশে মেরে ফেলে। পশুগুলির শিঙ কবরের কাছে কোন গাছে ঝুলিয়ে রাখে।[১] দক্ষিণ আমেরিকার আবিপোনীরা (Abepones) মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সমস্ত অস্থাবর সম্পদ কবরস্থ করে দিত, কিংবা পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে পুড়িয়ে ফেলত। এদের ক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীপ্রধান বা বীরযোদ্ধা মারা গেলে তার সবচাইতে প্রিয় অশ্বগুলিকে ছুরি মেরে হত্যা করে কবরের কাছে বৃত্তাকার দণ্ড পুঁতে তাতে বেঁধে রাখা হত।[২] মণিপুরের তাঙগুলরা কেউ মারা গেলে একটি মোষকে মেরে ফেলে, যাতে মোষের আত্মা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার সঙ্গে পরলোকে যেতে পারে। কারণ, তাদের বিশ্বাস, স্বর্গের দুয়ার বন্ধ থাকে। এই মোষ শিঙের গুঁতোয় সেই দুয়ার খুলে দেয়।[৩] ভিন্ন দেশে মোষের বদলে কুকুর মারা হয়। লিল্লুয়েটরা সম্ভবত এই জন্য কোন শিকারী মারা গেলে তার কুকুরদেরও মেরে ফেলে। মৃতের কবরের চারধারে চারটি বাঁশ পুঁতে কুকুরগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তার যে সমস্ত গয়নাগাটি ও মূল্যবান সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া হয় সেগুলি রক্ষা করার জন্যই এমন করা হয়ে থাকে। কারণ বহু জিনিস মৃতের সঙ্গে কবরে দেওয়া হয় না।[৪] ইংল্যান্ডে প্রাগৈতিহাসিক এমন কবর পাওয়া গেছে যেখানে পশুর অস্থি রয়েছে। এসব যে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার তা নয়—কারণ, এখানে ভুক্তাবশেষ অনেক জিনিসও পাওয়া গেছে। পরবর্তী কালে

১ Dannert, 40
২ Internat Archives, xiii, suppl. 61.
৩ JAI, xxxi, 807.
৪ Jesup, Expeditions ii, 269.

কোন কেল্টিক জাতীয় ব্যক্তির কবরে অশ্বের কঙ্কাল ও রথের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।[১] জার্মানীর প্রাশিয়াতে নব্য প্রস্তরযুগের কোন কবরে যোদ্ধার দেহের পাশে অশ্বের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। রাশিয়াতে সাইথিয়ানদের এবং কুরগানে (প্রাগৈতিহাসিক মৃতের স্তূপ) অধিকাংশ কবরেই যুদ্ধাশ্বের কঙ্কাল দেখা গেছে। রাইন নদীর তীরে ফ্রাংকদের কবরেও অনুরূপ জিনিসের সন্ধান মিলেছে। ইউরোপের ম্যাগেয়ার ও পোলদের কবর থেকে সাইবেরীয়দের কবর পর্যন্ত বহু কবরেই অনুরূপ চিহ্নের অভাব নেই। পোলরা মৃতের সঙ্গে তার বাজপাখি ও কুকুরকেও কবর দিত।[২] এ-সব ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুদের যে খাদ্য হিসেবে কবর দেওয়া হত, তা নয়। বরং পরলোকে আত্মার সঙ্গী হিসেবে দেওয়া হত।

মৃতের জিনিসপত্র ঃ মৃতের জিনিসপত্র সম্পর্কে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যে নানাপ্রকার রীতিনীতি চলে আসছে তার বহুপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জামাইকার নিগ্রোরা যদি মনে করে যে, কেউ তুকতাকে মারা গেছে তবে তাকে সশস্ত্র অবস্থায় কবর দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে সে যেন এর প্রতিশোধ নিতে পারে।[৩] মণিপুরের কোন তাঙখুল যদি বাঘের হাতে মারা যায়, তাহলে তার কবরে একটি শিকারী কুকুর, ধারালো কাঁটা ও একটি শক্ত বর্শা দিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় এই কারণে যে, স্বর্গে যাবার পথে হঠাৎ যদি কোন বাঘের আত্মার সঙ্গে তার দেখা হয় সে যেন তাকে হত্যা করতে পারে।[৪] অরেগনের অ্যালসিয় ভারতীয়রা সবরকম জিনিস মৃতের সঙ্গে দিয়ে দিত। কারণ তারা মনে করত যে, ইচ্ছে করলেই মৃতদেহ রাতে প্রাণ ফিরে পেয়ে চলাফেরা করতে পারে। সেইজন্য তারা কবর এমন করে তৈরি করত যাতে তা থেকে বেরুবার পথ থাকে।[৫] টমসন ভারতীয়রা (রেড ইন্ডিয়ান) কবরে ওষুধের বাক্স ও রক্ষকশক্তির মূর্তিও রাখত।

ইউরোপেও মৃতের কবরে নানা ধরনের উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়। ফ্রান্সের কোন কোন জেলায় রীতি আছে মৃত ব্যক্তি যদি পড়তে জানে তবে তার দুই হাতের মাঝে একটি প্রার্থনাপুস্তক ধরিয়ে তাকে কবর দেওয়া হয়। যদি সে পড়তে না জানে তাহলে তার হাতে জপের মালা দিয়ে দেওয়া হয়। আঙুলের ডগায় এক ধরনের গাছের পবিত্র ডগাও ধরিয়ে দেয়। ফ্রান্স ও স্পেন উভয় দেশেই লোকেরা বিশ্বাস করে যে, এই গাছের ডগা প্রতি বসন্তে ফুল ঝরাবে, অবশ্য সে যদি স্বর্গে যাবার মত সুকর্ম করে থাকে তবেই। স্প্রী-উপত্যকা ও লুসাতিয়ার ওয়েন্ড, মাসুর এবং পমেরানিয়ার লোকেরা কফিনের মধ্যে একটি করে প্রার্থনাপুস্তক দিয়ে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মৃতের হাতে পাকানো দড়ি দিয়ে দেওয়া হত অথবা এই দড়ি তার

১ Greenwell, British Burrows, Oxford, 1977.
২ International Archives, i [1888] 53.
৩ Folk Lore, xv, 88.
৪ JAI xxxi, 306.
৫ American Anthropology, iii, N. S. [1901] 241.

কবরের উপর রাখা হত। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জীবিতকালে সে যেসব করণীয় কাজ করতে পারেনি তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই দাঁড় নিয়ে ব্যায়াম করবে। স্বর্গে যাবার সময় সে বোঝাতে পারবে যে, সে অনুতপ্ত এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্বিধা করেনি। এর পেছনে যে কারণই থাক না কেন, ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ফেররারার ধর্মসভায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সে এ রীতি এতটাই গভীর হয়ে বসেছিল যে, ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য সে দেশে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। এই সপ্তদশ শতাব্দীতেই একজন ফরাসী ডাক্তার ও পর্যটক রাশিয়ান ল্যাপদের মধ্যে দেখেছিলেন যে, তারা মৃতের হাতে টাকার থলি দিয়ে দেয়, যাতে টাকা নিয়ে সে স্বর্গে যেতে পারে। তার সঙ্গে একটি যাজকের সই করা অনুমোদনপত্রও থাকত। ছাড়পত্র লেখা হত সেন্ট পীটারকে উপলক্ষ্য করে। ভিন্ন ধরনের রীতিতে মৃতের মুখে ছোট মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার চরিত্র সম্পর্কে অনুমোদন পত্র লিখে দিত। মৃতকে পরলোকে সুখ দেবার জন্য ইউরোপে এক সময় এতটাই বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল যে, ব্যাপারটা ক্রমশ বিশ্রী ধরনের হয়ে উঠেছিল। প্রাশিয়ান ও লিথুয়ানিয়ানরা এমন করত যে, কবরে কফিন রাখার সময় কফিন খুলে মৃতের শিয়রে কিছু টাকা দিয়ে দিত।[১] দুই কাঁধে দিত কিছু মাটি, আর দিত মৃতের সম্পদের কিছু অংশ। মৃত যদি বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হতেন তার সঙ্গে একটি চাবুক দিয়ে দেওয়া হত।[২] ভইগৎল্যান্ডে (Voigtland) মৃতব্যক্তি যে সব জিনিস খুব পছন্দ করত তার কবরে সেই সব জিনিস দিয়ে দেওয়া হত, যেমন, ছাতা ও জুতো। [হিন্দুদের শ্রাদ্ধেও এসব দেওয়া হয়]। ওয়ার্টেমবার্গের প্রাচীন সমাধিতে দেখা যায় যে, মৃতের দুই ধারে জুতোর সাঁচ রাখা হয়েছে। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে,—এই কৃত্রিম পাদুকা বা অঙ্গ 'খেয়ার মাঝি'কে পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে হবে, কিংবা পারাপার করার সেতুর মুখে যে দারোয়ান বা প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে তাকে অথবা পাতালে যাবার পথে যে গেটকীপার রয়েছে তাকে দিতে হবে।[৩] এর পিছনে এ ধরনের চিন্তাও থাকতে পারে যে, পরলোকে যাত্রার দীর্ঘপথে যদি হঠাৎ কোন ঘটনায় পা ভেঙে যায় তা হলে এই কৃত্রিম পা বা পাদুকা তাদের সাহায্য করবে। [হিন্দুদের বৈতরণী পার হবার মুখে খেয়ার মাঝিকে কড়ি দেবার গল্পের সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে।]

কবরের মধ্যে মর্মান্তিক যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বোধহয় শিশুর অস্থিসহ কতকগুলি পুতুল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এধরনের কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। চুনাপাথরের একটি বালিকার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে রোমে। নাম ক্রেপেরিয়া ট্রাইফিনা। শিশুটি অ্যানটোনাইনের সময়ের। ইটালির ক্যাপিটল

১ ZVV. xi 453.
২ Tetzner, 85.
৩ ZVV, xi 457.

মিউজিয়ামে এই মমিকৃত শিশুটির প্রস্তরীভূত দেহ রয়ে গেছে। তার পাশে রয়েছে বাগদান-অঙ্গুরী ও তার খেলার পুতুল। মাসুররা শিশুর কবরে খেলার পুতুল আর গিল্টি করা আপেল রেখে দেয়। দেয় এই কারণে যে, স্বর্গের উদ্যানে যেন তারা খেলা করতে পারে। ওয়েন্ডরা মৃত শিশুদের সঙ্গে ডিম আর আপেল দেয়। বসনিয়ানরা মৃত শিশুদের সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও স্লেট দিয়ে দিত।[১]

পূর্বে মহিলাদের নিজেদের কোন সম্পদ থাকত না। সম্পদ বলতে বোঝাতো তাদের প্রসাধনসামগ্রী এবং গৃহকর্মের জিনিসপত্র। তবে পুরুষদের সঙ্গেও যেসব জিনিস কবরে দিয়ে দেওয়া হয় তার সবই যে তাদের, তা নয়। মৃতদেহকে কবরে রাখার সময় আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেও এতে দান করে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এরকম দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে যখন সঞ্চয়বৃত্তি দেখা দেয় তখনই কবরে দানের পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং মৃত্যুদূষণজনিত ভয় থাকা সত্ত্বেও মৃতের সব সম্পত্তিই তার সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র রাজরাজড়া বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরেই দানের পরিমাণ বেশী হয়। সেক্ষেত্রেও রাজা বা ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের একটি অংশই প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়। হলস্টাট ও শ্লেজবিগ-এ পরবর্তী ব্রোঞ্জযুগের ও প্রাথমিক লৌহযুগের কবরে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।[২] সাউথাদমটন দ্বীপে বৃদ্ধ এক এস্কিমোর কবরের নিচে নৌকোর মত জিনিস দেখা গেছে।[৩] মিশরের নানা কবরে শস্যভাণ্ডার, নৌকো, গৃহ ইত্যাদির নানা নমুনা পাওয়া গেছে। এ-সবই হয়তো পরলোকে আত্মার কাজে লাগবে এই বিশ্বাসে দেওয়া হত। গল-যোদ্ধারা তাদের ঘোড়া ও রথ সবই কবরস্থ করত। তবে পরবর্তী কেল্টিক যুগে কবরে রথের পরিবর্তে রথের চাকা দিয়ে দেওয়া হত।[৪] দূর প্রাচ্য থেকে আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত নানা কবরে দেখা যায় মৃতের মুখে টাকা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা তাদের দেওয়া হত পারের কড়ি হিসেবে বা পরলোকের দুয়ারে প্রহরারত দারোয়ানকে দেবার জন্য। কখনও কখনও দেখা যায়, কবরে জীর্ণ ও পুরাতন জিনিস দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন জিনিস না দিয়ে নামমাত্র কোন প্রতীক রাখা হয়েছে। নিউগিনির তামি দ্বীপের অধিবাসীদের কবরে উভয় ধরনের জিনিসপত্রই দেখা যায়। প্রাচীন কালে এখানকার মৃতদের সৎকার করা হত নৌকোয় ভাসিয়ে দিয়ে। যারা এখনও মৃতদেহ ভাসিয়ে দেবার প্রথা অনুসরণ করে তারা পুরানো জীর্ণ নৌকোয় এই দেহ ভাসিয়ে দেয়। নৌকোর পাটাতনে একজোড়া নারকেলের সঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্রও দেওয়া হয়। কিন্তু সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে দেবার আগে সেগুলি আবার তুলে নেয়। টাইরলের

১ ZVV. x [1900] 119.
২ ARW. v [1902] 5.
৩ Boas, Eskimo of Baffin Land. p. 61.
৪ Greenwell, 455, ff.

(ব্যাভেরিয়াতে) কোন কোন অঞ্চলে এমন রীতি হয়ে গেছে যে, কবরে মৃতদেহের সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকলে সে সুখী হতে পারে না। সুতরাং কবর দেবার আগে কোন মুদ্রা সেখানে দেওয়া হলে তা সরিয়ে নেওরা হয়। এটা করা হয় অপ্রয়োজনীয় সম্পদ নাশ বন্ধ করার জন্য।

কবরে যে সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়, তা সবই প্রায় ভাঙা বা অকেজো। এটা করা হয় চুরি বন্ধ করার জন্য। [তা ছাড়া ভাঙাটাকে বস্তুর মৃত্যুস্বরূপও ধরা হতে পারে।] মধ্য আফ্রিকাতে কবরে যে হাতির দাঁত ও ফলের বীচি দেওয়া হয় তা গুঁড়ো করে দেওয়া হয়, যাতে ডাইনীরা তা ব্যবহার করতে না পারে।[১] ঐতিহাসিকদের মতে এর পেছনে যে যথার্থ কারণ রয়েছে তা যথেষ্ট ভাববার বিষয়। প্রথমত দ্রব্যগুলি ভেঙে তাকে মৃততুল্য করা হয় যাতে বিষয়ের বা দ্রব্যের সূক্ষ্ম সত্তা জীবের সূক্ষ্ম সত্তার অনুগামী হতে পারে। [বস্তুরও সূক্ষ্ম সত্তা থাকার সম্ভাবনা প্রবল।] টোগো-ল্যান্ডের 'হো'-রা কবরে রান্নার ভাঙা বাসনপত্র দিয়ে দেয়। দেয় এই বিশ্বাসে যে, এগুলির সূক্ষ্ম সত্তা পরপারে মৃতকে রান্নাবান্না করে খেতে সাহায্য করবে। কালিফোর্নিয়ার 'হুপা'রা কবরে মৃতের সঙ্গে তার কাপড়-চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, নানা জিনিস, কড়ি, মৃতের সরঞ্জাম সব দিয়ে দেয়। কিন্তু এ-সবই দেয় ভেঙে, মুচড়ে, দুমড়ে। কবরে খাবার পাত্র, বাসনপত্র ও বড় বড় বাক্স দিয়ে দেওয়া হয়। তবে এগুলিকে পুড়িয়ে ও ফুটো করে দেওয়া হয়। একটি কাঠিও এর মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কবর থেকে যাতে চুরি না হয় সে-জন্যই এমন করা হয়। তবে তারা মনে করে যে, এ সব জিনিস মৃতের সঙ্গে পরলোকে যায়। ফলে এগুলিকে ভেঙে মৃতের সামিল করার চিন্তাও বোধহয় তাদের মধ্যে কাজ করে।[২] সেক্ষেত্রে চুরি বন্ধ করাটা মূল কারণ নয়।

লিঙ্কনসায়ার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, সেখানে এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর কবরের উপর একটি মগ ও জগ দিয়েছিলেন। তবে দেবার আগে সেগুলি ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, কবর দেবার সময় শোকে তিনি এত মুহ্যমান ছিলেন যে, কফিনের মধ্যে তা দিতে পারেন নি। তাই বাইরে রেখেছেন। কবরের উপর ওগুলিকে ভেঙে দিয়েছেন এই কারণে যে, তাদেরও প্রাণনাশ করে দিয়েছেন। তার স্বামী মগ ও জগগুলোকে খুব ভালবাসতেন। যাতে প্রেতাত্মা হয়ে এগুলো তাকে খুঁজতে না হয় সেজন্যই এগুলো দেওয়া হয়েছে।[৩] পরলোকে যাত্রার সময় মৃতদের আত্মার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে দিতে হয়—উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মত স্থানেও এ বিশ্বাস প্রবল ছিল। কোন কোন দূর পাড়াগাঁয়ে আজও হয়তো এ বিশ্বাস টিকে আছে।

১ Werner, Natives of British Centrul Africa, 159.
২ Goddard, 71.
৩ Folk Lore. ix [1881] 187.

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি: কবরের মধ্যে বা বাইরে মৃতের উদ্দেশে যা দেওয়া হয় তা যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্বারা শোধিত হয়, ততক্ষণ মৃতের সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে না। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা মৃতের উদ্দেশে সেগুলিকে দেওয়া হলে তখন সেগুলি আর জীবিতদের পক্ষে ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। সেইজন্য ইয়াকুতরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত সবকিছু ভেঙেচুরে কবরের উপর ফেলে দেয়। এর মধ্যে হয়তো বেলচা, স্লেজগাড়ি, লাঠি, সবই থাকে।[১] আপেচ (Apache)-রাও মৃতের বেলচা তার কবরের মধ্যে দিয়ে দেয়।[২] মেলানেশিয়ানরা আবার এ-সব জিনিস সমুদ্রে ফেলে দেয়। মধ্য আফ্রিকার ওয়ারুন্ডিরা ঘরের দরজা কবরের উপর ফেলে রাখে। যে ঝুড়ি দিয়ে কবরের মাটি তোলা হয় সে ঝুড়িও সেখানে রেখে আসে। বাগান্ডাদের মধ্যে যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয় তারা সবাই ভেজা ধরনের পাতায় হাত মুছে নেয়। পরে এই পাতা কবরের উপর ছুঁড়ে ফেলে। ইউরোপেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। ইউরোপে যে পবিত্র পাত্র থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় সেই পবিত্র পাত্র কবরের উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে ব্রিটানিতে ধূপদানি পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবর দেওয়া হত। মধ্য সাইলেশিয়াতে মৃতের দেহ প্রসাধনকালে যা কিছু ব্যবহার করা হয় তা কফিনে পুরে কবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। সুচসুতোটা পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা হত না। ব্রান্সউইকের কিছু কিছু অংশে কফিন রাখার আসন ও অন্যান্য জিনিস কয়েকদিন কবরে রাখার পর আবার তা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্ভবত মৃত্যু-দূষণ তখন শেষ হয়ে যায় বলেই তারা এগুলি ফিরিয়ে আনে। আর একটি কারণও হয়তো থাকতে পারে—মৃতকে মাটির অনেক নিচে নামিয়ে দেবার কাজ শেষ হলে অর্থাৎ যখন দেখা যায় তার প্রত্যাবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তখনই এগুলি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। প্রেতাত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস এদের মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, ঘর থেকে শব নিয়ে বেরুবার সময় তারা ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে আসতো—যাতে তারা (শবরা) অন্য কোন জিনিস না আনতে পারে। এই প্রথা এখনও বেশ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

রক্ত ও চুল: কোন কোন জায়গায় এমন শোকমিছিলও বেরয় যেখানে কেউ কেউ নিজের দেহকেই কেটেকুটে রক্তাক্ত করে তোলে। কখনও কখনও নিজেদের হাত-পা ভেঙেও ফেলে। এটা করা হয় এই বোঝানোর জন্য যে, তারা কেউ ডাইনী-বিদ্যা প্রয়োগ করে বা তুকতাক করে লোকটির মৃত্যুর কারণ হয় নি। প্রাচীন ইজরায়েলে আইন করে এমনতর শোকপ্রকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে এই ব্যবস্থা রীতিমত প্রচলিত ছিল। এধরনের শোক প্রকাশের কাহিনী অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা

১ RHR, xivi, 211.
২ American Anthropology, new series, vii [1905] 492.

থেকেও পাওয়া যায়। শোকার্তরা এই প্রথানুসারে মৃতের উপর নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে দিত। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, মৃতদেহকে মাটিতে নামাবার পর শোকার্তরা একে একে তার পাশে দাঁড়াবে বা হাঁটু গেড়ে বসবে। এ সময় একটি বুমেরাঙ এসে প্রত্যেকের মাথায় আঘাত করবে। এতে মৃতের উপর রক্ত ঝরে পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে এই রক্ত ঝরানো হত কবরে মাটি চাপা দেবার পর।[১] সুমাত্রার ওরাঙ সাকী (Orang Sakei)-দের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনেরা ছুরি দিয়ে নিজেদের কপাল কেটে মৃতের উপর রক্ত বর্ষণ করত। উত্তর আমেরিকার মোন্টানার দুজন ভারতীয়কে (রেড ইন্ডিয়ান) ১৮৯০ সালে হেলেনা নামক স্থানে নরহত্যার দায়ে মিসৌরি নদীর মুখে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দু'জন মহিলা এসে এ-জন্য শোকপ্রকাশ করে। এই দুজন মহিলার মধ্যে একজন এসে নিজের হাতের দুটো অঙুল কেটে মৃতের কবরে ছুঁড়ে দেয়। আর একজন নিজের মুখ গভীর করে কেটে রক্ত ফেলতে থাকে। উভয়েই তাদের রক্ত কবরের উপর ঢেলে দেয়।

অনুষ্ঠানটি মূলত ছিল মৃতের উপর রক্ত ঢেলে দেওয়া। যেখানে এটা করা হত না সেখানে ধীরে ধীরে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এই রক্ত সাধারণত দিত মৃতব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বা বিশেষভাবে যুক্ত ব্যক্তিরা। অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের মধ্যে নানা গোষ্ঠী এই রীতি অনুসরণ করত। অন্যান্য লোকের মধ্যেও এ প্রথা চালু ছিল। কেন যে এটা করা হত, তা রীতিমত ভাববার ব্যাপার। এটা যে শুধু মৃতকে খুশি করার জন্যই করা হত, তা বোধহয় নয়। তার চাইতেও বড় কোন কারণ এর মধ্যে ছিল। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল মৃতের সঙ্গে মিলন চিহ্নিত করা। এটাই কি তাহলে একমাত্র উদ্দেশ্য? মৃতের উত্তরপুরুষদের দুঃখ দেওয়াই যে লক্ষ্য তাও বলা যায় না। এর হয়তো আরও উদ্দেশ্য ছিল। এও হতে পারে, যে রক্ত দিয়ে মৃতের আত্মাকে পরলোকে বলশালী করার চেষ্টা হত [যেমন আমরা পৃথিবীমাতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে ভাবি যে, রক্ত পেয়ে পৃথিবী শক্তিশালী হবে। ফার্টিলিটি কাল্টে বলিদানের পেছনে এরকম ধারণাই প্রবল ছিল।]। শোক প্রদর্শনের চরম উদাহরণ হিসেবেও একে ধরা যেতে পারে।[2] তবে এর পেছনে একটি গুহ্য উদ্দেশ্যকে সকলে মূল কারণ হিসেবে ভেবে থাকে, যে উদ্দেশ্যের কথা অদ্যাবধি জানা সম্ভব হয়নি।

রক্ত দেওয়ার মত শোকপ্রকাশের আরও একটি ধারা আছে। তা হল মাথার চুল কেটে দেওয়া। কেউবা চুল ছিঁড়ে, কেউ বা কেটে মৃতের সঙ্গে তা কবরে দিয়ে দেয় বা কবরের উপর রাখে। মাথা ন্যাড়া করা বা চুল কাটার এই রীতি রক্তদানের রীতি অপেক্ষাও বেশি প্রচলিত। [হিন্দুরা অদ্যাবধি শ্রাদ্ধের সময় মাথার চুল ফেলে দেয়]। ইলিয়াদে দেখা যাচ্ছে পেট্রোক্লাসের শবদাহের সময় তার সহকর্মীরা মাথার চুল

১ JAI, xxiv [1895], 187, Curr, Australian Race, Melb. Lord. Folk Lore xiv [1903], 436.

২ Torres, Strange Expeditions, vi [1908] 154.

চেঁচে মৃতের উপর স্তূপীকৃত করেছিল। স্বয়ং এচিলি বা একিলি তাঁর স্বর্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ এতে কেটে দিয়েছিলেন, যে কেশ তাঁর পিতা স্থির করেছিলেন, তিনি ঘরে ফিরে এলে পবিত্র স্পারচিয়স নদীর জলে দেওয়া হবে। সিওক্সদের (Sioux) মধ্যে রীতি ছিল, তারা চুলের গুচ্ছ কেটে মৃতদেহের উপর ছুঁড়ে দিত। মৃতদেহের সঙ্গে বা তার মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে এই চুল বেঁধে দেওয়া হত। তারপর তা কফিনে ঢুকিয়ে দিত।[১] চাকোটা উপসাগরের কাছে প্রাচীন কবরখানায় মমিকৃত দেহের পাশে মানুষের কেশগুচ্ছ দেখা গেছে। চাকোটা হল দক্ষিণ পেরুতে। এখানে একটি শিশুর মৃতদেহের নিচে দীর্ঘ কেশগুচ্ছও পাওয়া গেছে। আরবে মহিলারা স্বামী, পিতা বা নিকট আত্মীয় মারা গেলে চুল কেটে ফেলত। এই চুল হয় তারা কবরের উপর ছড়িয়ে দিত নতুবা খুঁটি পুঁতে তাতে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখত।[২] ভারতে উত্তরপ্রদেশের রাজি-রা তাদের কোন আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে শিশু সহ অন্যেরা দাড়ি, গোঁপ, মাথা সব কামিয়ে ফেলে। এই চুল মৃতের কবরের উপর রাখা হয়।[৩] ককেশাসের চেচেনিজদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে—স্বামী মারা গেলে লাইন দিয়ে বিধবারা তাদের চুল কেটে কবরের উপর রাখত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কানও কেটে দেওয়া হত।[৪] আধুনিক ইউরোপের মন্টেনিগ্রিনদের মধ্যে অদ্যাবধি এই রীতি চালু রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পুরুষ মানুষেরাও মাথা কামিয়ে শুধুমাত্র একটি টিকি রাখত। [হিন্দুদের মধ্যে অদ্যাবধি এ নিয়ম চালু আছে।] পরবর্তী-কালে এই টিকিও কেটে কবরে দিয়ে দেওয়া হত।[৫] রক্তদানের মত মাথা কমিয়ে একই ধরনের চুল দেওয়া হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চুল পুড়িয়ে ফেলা হত। কলম্বিয়ার বিলকুলা ও মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা এমনিভাবে চুলের সংকার করে। কেউ কেউ নিজের চুলের সঙ্গে মৃতের চুল একত্র করে এক ধরনের পরিধেয় তৈরি করে কোমরে জড়িয়ে নেয়। শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর সময় এই বস্ত্র তারা পরিধান করে। এই চুল দিয়ে যে কি করা হয়—স্পষ্টভাবে তা জানা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেউরি হওয়া যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা নয়। চুল কাটা হয় যখন অশৌচ পালন শেষ হয় তখন। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধের সময়]। অনেকের ধারণা মৃতের সঙ্গে মিলনের একটা পথ হিসেবেই এই ধরনের ক্ষৌরকর্ম করা হয়। জীবিতেরা যেমন মৃতের জন্য মাথার চুল ফেলে দেয় তেমনই মৃতের চুলও রেখে দেওয়া হয়। [তিব্বতেও এমন করা হয়। ভারতে গৌতম বুদ্ধেরও নখ, চুল প্রভৃতি রেখে দেওয়া হয়েছিল।] শুধু চুল নয়, নখ ও বস্ত্রের কিছু অংশও রেখে দেওয়া হয় [তিব্বতে প্রচলিত আছে]। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্ট ক্রয় (St. Croix) দ্বীপে যারা কবরে

১ RBEW. 159.
২ Jaussen 94, Hartland 2p. ii, 220.
৩ Crooke, Te iv, 213.
৪ Anthropologies, iii, 735.
৫ JAI, xxxix, 99.

রাখার আগে মৃতদেহকে স্নান করায়, তারা তার এক গুচ্ছ চুল বা বস্ত্র রেখে দেয়। এটা করা হয় রক্ষাকবচ হিসেবে, যাতে মৃতের আত্মা তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে।[১] এক ধরনের মতবাদ আছে (theory of sympathetic magic) যাতে মনে করা হয় যে, মৃতের দেহের যে কোন অংশের সঙ্গে আত্মার নিবিড় সম্পর্ক আছে, কারণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আত্মার ব্যক্তিত্ব সমানভাবে কাজ করে। এই সম্পর্ক ব্যক্তির কুশপুত্তলি, পরিধেয় বস্ত্র, সম্পদ, এমনকি নামের মধ্যেও থেকে যায় [সেই কারণেই বোধহয় হিন্দু তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীরা নাম ও গোত্র পেলেই তা দিয়ে তাবিজ-কবচ তৈরি করে।] সুতরাং এদের যে-কোন একটিকে কিছু করা হলে ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে তা স্পর্শ করে। [এই কারণেই বোধহয় ভারতে বিশেষ বিশেষ দিনে চুল, নখ ইত্যাদি ফেলা বারণ। কারণ, কোন শত্রুর হাতে পড়লে তা নিয়ে সে তুকতাক করতে পারে।] তবে মৃতের দেহের কোন অংশ যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য রাখা হয় তা নয়। সে যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য রাখা হয়। [অবশ্য ধর্মগুরুদের দেহের কোন অংশ রাখা হয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যই।] কিন্তু জীবিতরা যে অংশ তাকে দেয় সেই অংশের সাহায্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে বলেই দেয়। এমনও কেউ মনে করেন যে, রক্ত বা চুল দিয়ে মৃতের আত্মাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ জীবিতের যে প্রাণশক্তি, মৃতের আত্মা তা লাভ করবে এই বিশ্বাসে তা করা হয়। বর্বরেরা এই দর্শনে বিশ্বাসী হলেও এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, পূর্বে মৃতের উদ্দেশে যে নরবলি দেওয়া হত, এ তারই একটি প্রতীকী অস্তিত্ব মাত্র। কিন্তু এর সপক্ষে কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। তবে যে ক্ষেত্রে রক্ত দেবার ব্যবস্থা বা অঙ্গের কোন অংশ কেটে দেবার রীতি প্রচলিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে একে নরবলিদানের একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান বলা চলে। [ভারতবর্ষে যেমন বর্তমানে মাতৃশক্তির কাছে বলি দেবার প্রতীক হিসেবে ঘট পুজার ব্যবস্থা আছে। এই মাতৃশক্তি উর্বরাশক্তির প্রতীক। ঘট বা জার হল মায়ের উদরের প্রতীক। পিতৃপরিচয়-হীন কোন সন্তান এই জন্য মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে বলে তাকে বলা হয় জারজ, অর্থাৎ জার (মাতৃগর্ভ) থেকে জাত। ঘটে সিঁদুরের প্রতীক হল বলিদানের রক্তের প্রতীক। ঘটশীর্ষে আম্রপল্লব হল শস্যের প্রতীক।] অনেকে এই চুল বা রক্তদানকে মৃত্যুদূষণ দূর করার একটি ব্যবস্থা হিসেবেও মনে করেন।

কোথাও কোথাও যেমন মৃতের জন্য শোকপ্রকাশ ও রক্তদানের ব্যবস্থা আছে, তেমনই ইউরোপে নিয়ম আছে, যেন চোখের জল মৃতের উপর না পড়ে। মৃতদেহ চলে যাবার পরও অতিরিক্ত কান্নাকাটি কবরস্থ মৃতের আত্মাকে অস্থির করে তোলে বলে বিশ্বাস। [এই জন্য হিন্দুদের মধ্যে মৃতের কথা স্মরণ করাও বারণ। কারণ স্মরণের তরঙ্গ মৃতের সূক্ষ্ম সত্তায় আঘাত করে তাকে চঞ্চল করে তোলে।] ইউরোপের

১ Hartland L. P ii, 319.

লোকগাঁথায় এমন অনেক কাহিনী আছে যাতে দেখা যায় শোকের আতিশয্য হেতু প্রেতাত্মা কবর থেকে উঠে এসে আত্মীয়দের তিরস্কার করছে, কারণ এতে তারা কবরে শান্তিতে থাকতে পারছে না। অনেকে শোকার্ত অশ্রুতে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রদত্ত বস্ত্র ভিজে উঠতে দেখেছেন। মৃতের উত্তরাধিকারী, যারা জীবিত আছেন তাঁদের কোন ব্যবহৃত দ্রব্যও কবরে দেওয়া বারণ, কারণ এতে যিনি সামগ্রীর অধিকারী তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। অনেকে জীবিতদের বস্ত্রাংশ কেটে নিয়ে এই জন্য তুকতাক করে।

অগ্নি: অনুন্নত সভ্যতায় দেখা যায় যে, কবরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা কবরে আগুন জ্বেলে দেয় এই বিশ্বাসে যে, প্রেতাত্মা নিজেকে উষ্ণ করে নিতে পারবে। মেরিবোরোর লোকেরা মনে করে যে, এই আগুন রাখা হয় দুষ্ট আত্মাদের সেখান থেকে দূরে রাখার জন্য। কখনও কখনও খারাপ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তুকতাকের জন্যও এই আগুন রাখা হয়।[১] কবরের উপর এই আগুন নানাজনে নানা সময়ের জন্য রাখে। এটা নির্ভর করে কোন্ গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কি রীতি আছে, বা কবরস্থ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগের গভীরতা কতটুকু তার উপর। কখনও কখনও একাধিক আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে। এই রীতি মেলানেশিয়ান দ্বীপের নানা অংশ এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।[২]

উত্তর আমেরিকাতে মেক্সিকোর তারাহুমারেরা গুহাতে মৃতদেহ কবর দেয়। কবর দেবার পর প্রথম রাতে সেখানে তারা আগুন জ্বেলে রাখে। সেই জন্য তাদের গুহা-কবরগুলি ধোঁয়াতে কালো হয়ে আছে। ফ্লোরিডার সেমিনোলরা কবরের প্রান্তদেশে আগুন জ্বালে। তিনদিন তারা আগুন জ্বেলে রাখে। রাত্রিবেলা আকাশে আলো ফেলে ঘোরানো হয়। এটা করা হয় এই কারণে যে, কোন পাখি যেন মৃতের কবরের কাছে আসতে না পারে।[৩] হুপা ও ক্যালিফোর্নিয়ার ইউরোকদের মধ্যে কবরে আগুন জ্বালাবার পদ্ধতি চালু আছে।[৪] ইউরোকরা মনে করে যে, পরলোকের ভয়ংকর পথযাত্রায় আলোর প্রয়োজন আছে। অ্যালগোনকিন্স (Algonquins)-দের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা চালু আছে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ক্লামামরা তিন দিন ধরে এই আলো জ্বেলে রাখে। তিন দিন ধরে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলে। তারা মনে করে যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হলে মৃতের আত্মাকে যে-কোন মুহূর্তে শয়তান (o-ma-a) এসে ধরে ফেলতে পারে। তাছাড়া এই তিনদিন তাদের আত্মীয়-স্বজন কবরের চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি করে বেড়ায়। এর উদ্দেশ্যও দুষ্ট আত্মাদের দূরে রাখা।[৫]

---

১ **Howitt, 470.**
২ **L. Anthrop, xii, 775, JAI, xxxiii 120, etc.**
৩ **5 RBEW, 521.**
৪ **American Ethnology iii [1877] 58.**
৫ **IRBEW, 107.**

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাগৈতিহাসিক নানা নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, এক সময় পৃথিবীর বিরাট এক অংশে কবরের উপর আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে যা রয়েছে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

কবরে আগুন জ্বালাবার উদ্দেশ্য হিসেবে নানা কারণ ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন, যেমন (১) প্রেতাত্মাকে উত্তাপ দান করা। (২) পরলোকে যাত্রাপথে তার যাত্রা সহজতর করা (কারণ সেখানে অন্ধকার থাকে) এবং (৩) দুষ্ট আত্মাদের দূরে রাখার জন্য কবরের উপর আলো জ্বালা। এই রীতি এখনও বেশ ব্যাপক। ইউরোপে যে Death Chamber-এ আলো জ্বালানো হয় তার উৎপত্তি এখান থেকেই। অনেক সময় এই উদ্দেশ্যেই মৃতের হাতে মোমবাতি দিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের ক্ষেত্রে যেমন আলোর ব্যবস্থা আছে তেমনই নবজাতকের ক্ষেত্রেও প্রদীপ জ্বালাবার রীতি বর্তমান। এর কারণ মা ও নবজাতককে তুকতাক ও দুষ্ট আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা করা। অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানেও এইভাবে প্রদীপ বা আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা আছে। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে দূরে রাখাও অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে একই উদ্দেশ্যে কাজ করা হয় তা নয়। অস্ট্রেলিয়াতে বরং উল্টো বিশ্বাস আছে। তারা মনে করে যে, আলো দেখলে ভুতে তাড়া করে। অপরপক্ষে ইউরোকরা মনে করে যে, ভয়াবহ পিছল সেতু পার হয়ে পরলোকে যাবার জন্য কবরে আলো দেবার প্রয়োজন আছে। আবার ভিন্নক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, আলো মৃতের আত্মাকে রক্ষা করে।

অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন উপজাতি মৃতের মস্তক দেহচ্যুত করে চিতার আগুনে ঝলসে নেয়; যখন মাথা পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে যায়—তখন একে টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়। তারপর সেই অংশগুলিকে চিতার নিভন্ত আগুনে ফেলে দেয়। এরকম করার উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তি যাতে মস্তিষ্কহীন হবার ফলে শবদাহকারীদের অনুসরণ করতে না পারে। কারণ, মাথা না থাকার জন্য কবন্ধকে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে হবে। [হিন্দুরাও শবদাহকালে মাথা ফাটিয়ে থাকে।] মাথা না থাকার জন্য কবরস্থ প্রেতাত্মা যখন এগুতে চায় তখন আগুনের ছেঁকা খেয়ে এমন থমকে যায় যে, সে আবার কবরে ফিরে যায়। সমাজে জীবিতদের মধ্যে আর ফিরে আসার সাহস পায় না।[১] গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের মধ্যে দেখেছি যে, মৃতদেহকে কবরের দিকে নিয়ে যাবার সময় তারা তার পেছনে ছেঁকা লাগায়। লাগায় এই বোঝাবার জন্য যে, তারা চিরবিদায় নিচ্ছে। দক্ষিণ নিকোবরের অধিবাসীরা মৃতদেহকে কবর দেবার আগে ঘরের সামনে আগুন জেবলে যায়। কবরে মাটি ফেলার আগে মশাল জেবলে চারিদিকে ঘুরিয়ে দুষ্ট আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আগুন জ্বালানো হয় প্রেতাত্মা ও জীবিতদের মধ্যে আড়াল তৈরী করার জন্য।[২] [হিন্দুরা যে সৎকার শেষে ফিরে এসে আগুন ছুঁয়ে ঘরে

১ JAI, xv [1885] 88
২ Indian Census Report 1901, iii, 209.

ঢোকে সেও কি এরই জন্য ?] টোগোল্যান্ডের ইউহি (Ewhe), যারা ঘরের ভেতরেই মৃতদেহকে কবর দেয়, শোক প্রকাশকালে অর্থাৎ অশৌচ পালনকালে সারা সময় তারা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এই আগুনে তীব্রগন্ধ এক ধরনের লতা পোড়ানো হয়—যাতে ভূতেরা দূরে থাকে।[১] ইউরোপের কোন কোন জায়গায় ঘর থেকে কবরে নিয়ে যাবার পথে যে খড়ের উপর মৃতদেহ শায়িত ছিল পথের ধারে সেই খড় পোড়ানো হয়। এর পেছনেও প্রাচীনদের সেই অগ্নি জ্বালাবার রীতিরই প্রাধান্য রয়েছে।

প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা :—প্রেতাত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ খুঁজে পাওয়া না যায়—সেখানে তাকে তৃপ্ত করার জন্য আত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কবর দেবার রীতিও বিদ্যমান রয়েছে। উত্তর টঙ্কিঙের কিছু কিছু উপজাতি আত্মা সংগ্রহ করে দেহ সমেত বা দেহ ছাড়াই তাদের করব দেয়।[২] স্যাভেজ দ্বীপের পলিনেশিয়ান ও মালয়েশিয়ানদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক সংকর জাতি, আইতু (aitu) নামে এক প্রেতাত্মাকে বড় ভয় পায়। তাই তারা মৃত্যুপথযাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে :—'যদি ছেড়েই যেতে হয়—চিরকালের মত ছেড়ে যাও।' সুতরাং কবরের উপর তারা বড় বড় পাথব ছুঁড়ে দিয়ে আইতুকে মাটির নিচে আটকে রাখার চেষ্টা করে। কবর দেবার আগে মৃতদেহের পাশে এক ধরনের গাছের সাদা বাকল বিছিয়ে দেয়। যে কীট প্রথমে এই বাকলে উঠে, তাকে সাবধানে কোন বস্ত্রে জড়িয়ে নেওয়া হয়। এই কীটটিকে মৃতদেহের সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়। একেই এরা মনে করে আত্মা (Moui)। এই কবর কংক্রিটে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় যাতে প্রেতাত্মা কবর থেকে আর উঠতে না পারে।[৩] নিকোবর দ্বীপের লোকেরাও মৃতদেহের নিচে একটি কাপড় ভাঁজ করে দেয়। তারা মনে করে এই কাপড়ের মধ্যে আত্মা থাকে।[৪]

টোগোল্যান্ডের কিছু ইউহি গোষ্ঠীর মধ্যে সাপে-কাটা ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে কবর দেবার পর নবম দিনে গুণিন—যেখানে সর্প দংশন হয়েছিল সেখানে যায়। যায় মৃতের আত্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সে মাত্র একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে যায়, যাতে মৃতের আত্মা ভয় না পায়। সে মন্ত্র পড়ে আত্মাকে মিষ্টি কথায় ডাকতে থাকে। একটু পরে গ্রামের কোন তরুণ ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে যোগ দেয় এবং প্রেতাত্মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। যেখানে দংশন হয়েছিল সেখান থেকে মাটি খুঁড়ে একটু মাটি হাঁড়িতে ভরে নেয়। সাদা কোন কাপড়ে তা বাঁধা হয়। সেই

---

১ Globus, lxxxi, [1902] 190.
২ Lunet, 163, 244, 274.
৩ Thomson, Savage Island, Lond, 1902, p. 52.
৪ International Archives, iv, [1893] 24

হাঁড়ি এমন লোকের মাথায় তুলে দেওয়া হয় যে পূর্বে সর্পদ্বারা দংশিত হয়েছিল, কিন্তু বেঁচে গেছে। বাজি ফাটাতে ফাটাতে বা বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এরপর তারা বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর লোকদের নিয়ে যেখানে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া হয়েছে সেখানে যায়। এরপর হাঁড়িটি উল্টো করে কবরে বসিয়ে সেখানে সেটাকে রেখে আসে। এই হাঁড়ির মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা থাকে বলে তারা বিশ্বাস করে।[১] নিম্ন নাইজারের ব্রাসম্যানরা কোন লোক দুরারোগ্য ক্ষততে মারা গেলে নিয়মিত কবরখানা থেকে তাকে দূরে কবর দেয়। এর পর তার আত্মাকে আহ্বান করে অনুষ্ঠান সহকারে একটি কাঠের পুতুলে তা স্থাপন করে। পরে নিয়মিত কবরস্থানে সেই কাঠের পুতুলকে কবর দেওয়া হয়।[২]

দেহবন্ধন ও বিকৃতকরণ ঃ—আত্মাকে কবর দেওয়া হয় এই কারণে যে, পাছে অপঘাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা, যারা জীবিত আছে, তাদেরও কোন ক্ষতি করে। এ ব্যাপারে এই কবর দেওয়াই যে শেষ কথা তা নয়। আরো কিছু করণীয় আছে। কবর দেবার মত করে মৃতদেহকে বাঁধা-ছাঁদা করাও অন্যতম একটি প্রতিকার। লিংকনসায়ারে একটি প্রথা চালু আছে। প্রথা এই যে, কফিনে মৃতদেহ রাখার আগে তার পা দু'টি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে সে আর ফিরে আসতে না পারে, বা অন্য কোন আত্মা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে ব্যবহার করতে না পারে।[৩] পা বেঁধে দেওয়া বা পায়ের আঙুলের ডগা বেঁধে দেবার রীতি ইউরোপের নানা জায়গাতেই আছে। শুধু যে বেঁধে দিয়েই এরা ক্ষান্ত হয় তা নয়—স্নায়ু, পেশী এবং মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। আফ্রিকার নানা জাতির মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বেশি করে নজরে পড়ে বাসুতো ও বেচুয়ানাতে। হারবার্ট নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা নানা জাতীয় অস্ত্র দিয়ে মৃতের দেহে এমন পেটাই করে যে হাড়গুলি ভেঙে যায়। অন্ত্র, কাঁধ এবং ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে পাথর ভরে দেওয়া হয়।[৪] অস্ট্রেলিয়ার কিছু উপজাতি কিভাবে মাথা পুড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে প্রেতাত্মাকে অন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে তা পূর্বেই দেখেছি। বাহিয়ার কিছু নিগ্রো মৃতের দীর্ঘ অস্থিগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার ঘাড় মটকে দেয়। কোন ব্যক্তি বজ্রাঘাতে মারা গেলে উত্তর আমেরিকার ওমাহারা যেখানে তার মৃত্যু হয় সেখানেই তাকে কবর দেয়। কবর দেয় মাথা উল্টো দিক করে। পা দুটো কেটে নেওয়া হয়।[৫] ইউরোপে আধুনিককাল পর্যন্ত হুবহু মিল না থাকলেও একই ভাবে বজ্রাহত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হত। এই সেদিন পর্যন্ত আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে তারা রাস্তার মোড়ে কবর দিত। কবর দেবার আগে তার দেহে একটা শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আর

১ Spieth, 290, of, 756, 760
২ Leonard, 168
৩ Gutch and Peacock, Lincoln Shir es Folk Lore, 1903, p. 240.
৪ Howitt—p. 474
৫ JAFL ii, [1889] 90

এক ধরনেও এদের কবরস্থ করা হত, যেমন, মাথা কেটে দু'পায়ের ফাঁকে বসিয়ে। বার্নস্লি (Barnsley)-র কাছে রয়স্টন (Royston) গীর্জায় পাথরের একটি কফিনে মধ্যযুগের এমন একটি নরকংকাল পাওয়া গেছে।[১] আলবেনিয়ার একটি কবরখানাতেও এমন বিকৃত নরকংকালের সন্ধান মিলেছে। কংকালটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর। মধ্যযুগের ইউরোপে সর্বত্রই অপঘাতে মৃতদের এইভাবে কবর দেবার রীতি ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোমেনিশকির লিথুয়ানিয়ানদের মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এরা অপঘাতে মৃতদের দেহ বিকৃত করে কবর দিত এই কারণে, যাতে তারা উঠে এসে মাঠে ঘাটে চলে ফিরে বেড়াতে না পারে। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মহত্যাকারীদের আত্মা জার্মানদের রূপ ধরে বা ছাগলের রূপে পথচারীকে বিভ্রান্ত করে। অনেক সময় যে দড়ি গলায় দিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে, বা যে অস্ত্র দিয়ে তারা আত্মহত্যা করেছে—সে সব নিয়েও তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এমন বিশ্বাস ছিল। শস্যক্ষেত্রে ঝড় তুলে বা তুষারপাত ঘটিয়ে তারা শস্যহানি করে। তাদের স্পর্শ মৃত্তিকাকে রোগাক্রান্ত করে। সেইজন্য তাদের অনুর্বর ভূমিতে সমাধি দেওয়া হত।[২]

ইউরোপে বাদুড়কে দুষ্ট আত্মার প্রতীক বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে নরম্যানদের মধ্যে যে দুষ্ট আত্মা লোকের অস্বস্তির কারণ হত তাকে বন্দী করে পুড়িয়ে ফেলার রীতি ছিল। কখনও কখনও কোন মৃতের আত্মাকে ক্ষতিকর মনে হলে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তাকে তুলে ভিন্ন জায়গায় সমাধিস্থ করা হত। কবরের চারপাশে দেওয়াল এত উঁচু করে দেওয়া হত, যাতে আত্মা বাইরে না আসতে পারে। একমাত্র উড়ন্ত মুরগিই এই দেওয়াল অতিক্রম করতে পারত।[৩] কবর ঘেরাও করা হত শুধুমাত্র যে মৃতকে রক্ষা করার জন্য তা নয়, জীবিতদের রক্ষা করার জন্যও এমন করা হত। চেরেমিস (Cheremiss)-রা কবরের চারদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া দিত। বেড়া দিত এই কারণে, যাতে প্রেতাত্মা তার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে এসে মাঠ দিয়ে হাঁটতে না পারে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক উপজাতি কবরের উপর বেশ করে মাটি চেপে দিত। অর্থাৎ মাটি পিটিয়ে দিত। অ্যাচাগোয়া (Achagoaś)-রা চুনসুরকি দিয়ে কবরের উপরিভাগ শক্ত করে এঁটে দিত। প্রতিদিন সকালে এসে তারা কবর পর্যবেক্ষণ করে দেখত। কোথাও কোন ফাটল দেখা দিলে তা আবার বুজিয়ে দিত—যাতে সেখান দিয়ে আত্মা বাইরে আসতে না পারে।[৪] কবরক্ষেত্র, বাক্স বা মাটির আধার, কফিন প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছিল মৃতকে কোন আধারে আটকে রাখার জন্য, যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে জীবিত ব্যক্তিদের তারা কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ সব তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য

১ Folk Lore, ii, 101
২ Am. Urquell, iii, [1892] 50-53
৩ Morris, Cave-dwellers 1962, p, 92
৪ International Archives, xiii, Suppl, 93, 96

ছিল এটাই। পরে এ ব্যবস্থা একটি প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মৃতের দেহের সমস্ত রন্ধ্রপথ বন্ধ করে দিত যাতে দেহের খাঁচা ছেড়ে সূক্ষ্ম আত্মা বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে।[১] এই ব্যবস্থা মালয়েব লোকেরাও অনুসরণ করত।[২] নিয়াসের অধিবাসীরা যে শুধু মৃতের হাতপায়ের আঙুল বেঁধে দিত তাই নয়, মুখও বেঁধে দিত। নাকের রন্ধ্রদ্বয়ও তারা সেঁটে দিত, যাতে আত্মা দেহ ছেড়ে বেরুতে না পারে।[৩] বুলগেরিয়াতে আরও নৃশংস আচরণ করত। মৃতের নাভিতে সূচ ফুটিয়ে দেওয়া হত। মোলাক্কার অ্যামবন ও ইউলিয়াস দ্বীপেও এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হত সন্তান প্রসবকালে কোন রমণীর মৃত্যু হলে। এ ক্ষেত্রে মৃতের হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে কাঁটা ও পিন ফুটিয়ে দেওয়া হত। পায়ের আঙুলেও অনুরূপভাবে কাঁটা ও পিন ফোটানো হত। হাঁটু, কাঁধ, বাহু কিছুই বাদ যেত না। তারা চিবুকের নিচে ও বগলের তলায় মুরগি বা হাঁসের ডিম দিয়ে দিত। মৃতের চুলের কিছু অংশ ছেঁটে নিয়ে কফিনের ঢাকনার গায়ে পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হত। এতটা সাবধানতা অবলম্বন করা হত এই উদ্দেশ্যে, যাতে মৃতেব আত্মা কফিন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না পারে। কারণ এরা কফিন থেকে বেরিয়ে এলে উড়ন্ত প্রাণীরূপে মানুষ ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ক্ষতি কবে। এত সাবধানতাব পরেও সে যদি বেরুতে পারে তবুও ডিমগুলোকে ফেলে দিতে পাববে না এরকম বিশ্বাস ছিল।[৪]

এভাবে যে নানাপ্রকারে মৃতদেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হত তার পেছনে বহু উদ্দেশ্য কাজ করত। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার পুরি (Puri)-রা মৃতের বুক চিরে দিত যাতে আত্মা বেরিয়ে যেতে পারে। কারণ, তারা মনে করত যে আত্মা বুকেব মধ্যে থাকে।[৫] দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়ের চাকো জাতির লেঙ্গুয়া গোষ্ঠী যদি মনে করত যে, তুকতাকের জন্য কারো মৃত্যু হয়েছে, তাহলে মন্ত্র পড়ে মৃতের অন্ত্র কেটে ফাঁক করে দিত এবং তার মধ্যে কিছু পাথর ও পোড়া হাড় ভরে দিত। এতে যে-গুণিন তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, তার মৃত্যু হবে এদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল।[৬] ন্যাগাল্যান্ডের কোন কোন গোষ্ঠী মৃতের মাথায় আঘাত করে। এ করার কারণ, তারা মনে করে যে, মাথায় আঘাত করলে পরলোকে তাকে যোদ্ধা হিসেবে সসম্মানে গ্রহণ করা হবে।[৭]

---

১ JAI viii, [1879] 393
২ Skeat, Malay Magic, 401
৩ Modigliani, Nias, 1980 p, 283
৪ Riedel, 81.
৫ International Archives, xiii, Suppl, 87.
৬ JAI xxxi, 296, cf Hartland L p ii, 109.
৭ JAI xxvi, 198' ARW,xii, p54.

সমাধিকার্য বা শবদাহ থেকে প্রত্যাবর্তন ঃ—শবদেহকে কবর দেবার পর শোকার্তরা গৃহে ফিরে আসে। নানা ধরনের প্রক্রিয়া করে তারা প্রেতাত্মাকে কবরের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করে। তবু ভয় যায় না। পাছে প্রেতাত্মা তাদের সঙ্গে গৃহে ফিরে আসে এই কারণে গৃহে ফিরেও তারা কতকগুলি ব্যবস্থা নেয়। কারণ, সবাই মনে করে যে, মৃতের আত্মা জীবিতদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে চায় না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শবের শেষকৃত্য করে লোকেরা ঘরে ফেরার চেষ্টা করে।

লুজোঁর বোনটোক ইগোরোটরা মৃতদেহ কফিনে ভরার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ে। বহু লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিযে এসে এই কাজকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে। কবরক্ষেত্রে অযথা কোন সময় নষ্ট করা হয় না। যত সম্ভব কম সময়ের মধ্যে সমাধি দেবার কাজ শেষ করার চেষ্টা চলে। এবং কবর সেরেই তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে এসেই তারা নদীতে স্নান করে নেয় অর্থাৎ যদি দেহে কিছু লেগে থাকে তা ধুয়ে নেবার চেষ্টা করে।[১] পাপুয়ার অধিবাসীরা বাড়তে কেউ মারা গেলে নিজেদের এতটাই অশুচি মনে করে যে, ভূত তাদের সঙ্গে রয়ে গেছে এই ভেবে তারা কবরের উপর একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে এবং সেখানে প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে বাস করে। যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তাহলে তাকে অস্নাত অবস্থায় সকলের দৃষ্টির আড়ালে এক কোণে রেখে দেওয়া হয়। ওজিবোয়ারা হাস্যকর কাণ্ড করে। তারা কবরের উপর কিছুক্ষণ লাফালাফি করে আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে গাছের আড়াল দিয়ে দৌড়তে থাকে। এমনভাবে দৌড়য় যেন কেউ তাদের তাড়া করেছে। এভাবে দৌড়নোর অর্থ মহিলার স্বামীর ভূতকে এড়িয়ে নিরাপদে ফিরে আসা।[২]

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করে, তাদের যাতে ভূতে তাড়া না করতে পারে সে জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, বাটক পুরোহিতেরা কবর দেওয়া শেষ হলে মাথার উপর প্রবল বেগে লাঠি ঘোরাতে থাকে। যাতে ভূতেরা জীবিতদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।[৩] দক্ষিণ নিকোবরে মৃতদেহকে কবর দিয়ে পরিবারের লোকেরা ঘরে ফিরে এসে ঘুমোয়। পরদিন ঘর শোধন করে আগাগোড়া ধোয়ামোছা করা হয়। শোকার্তরা এর পর স্নান করে পুরোহিতদের মন্ত্রপূত জল বা তেল কাঁধে ও মাথায় নেয়। একটি মশাল ধরিয়ে তা ঘোরানো হয় যাতে প্রেতাত্মা পালিয়ে যায়। [হিন্দুরা সৎকার সেরে এসে স্নান করে ঘরে ঢোকার আগে অগ্নিস্পর্শ করে ও শিলা বুকে পিঠে ছোঁয়ায়।][৪] উত্তর-পূর্ব রোডেশিয়াতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর লোকেরা কবরের উপর থুতু ফেলে ফিরে আসে। কেউ আর একবারও পেছনে ফিরে তাকায় না। ওরা বলে এটা করা হয়—হায়েনারা যাতে মৃতদেহের খবর না পায়।

১ A. E, Jenks, Bontoc Igorot, 1905, p, 78
২ Jones, Ojebway Indians, 1861. p. 99.
৩ ARM, vii, 504.
৪ Indian Census Report, 1901, iii. 209.

তবে এ ধরনের রীতির যথার্থ উৎস সেই প্রেতাত্মা-ভীতি।[১] জার্মানীর পূর্বপ্রাশিয়ার মাসুরদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, প্রথম যে শবাধার ধরে, প্রেতাত্মা তাকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে আসে। সুতরাং প্রথম শববহনকারী প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে— 'তোমার শোয়ার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করেছি তো? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে ভাল করে করে দেব।' এর পরই খুশি হয়ে প্রেতাত্মা ফিরে যায়। শোকার্ত মরড্‌ভিনরা কবরের কাছে এসে একটু আগেই দাঁড়িয়ে পড়ে। যারা কবর খুঁড়ে, তাদের মধ্য থেকে তখন একজন এসে কোদাল দিয়ে তাদের চারদিকে বৃত্ত এঁকে দেয়। দুবার এই বৃত্ত আঁকা হয়। যখন তারা ঘরে ফেরে তখন গৃহের প্রবীণতম ব্যক্তি তাদের পথের উপর একটুকরো কাঠ ও একটি বাঁকানো ছুরি ফেলে দেয়। এর উপর দিয়ে তারা হেঁটে ঘরে ফেরে। ছুরি দেওয়ার অর্থ প্রেতাত্মাকে ভয় দেখানো। কারণ, তারা মনে করে যে, প্রেতাত্মা পায়ের গোড়ায় গোড়ায় তাদের অনুসরণ করে।[২] বাবর দ্বীপপুঞ্জে কবরের চারপাশে চারটি খুঁটি পুঁতে তাতে আড়াআড়ি বাঁশ লাগানো হয়। এর উপর চাঁদোয়ার মত লাল সামিয়ানা টাঙায়। একটি দণ্ডে দড়ি বা ফিতে জাতীয় কিছু বেঁধে দেওয়া হয়। গাঁয়ের লোকেরা সেটা ধরে থাকে। ধরে থাকে শক্ত করে। সাত গুণতে গুণতে গৃহকর্তা তখন সেই ফিতে কেটে দুটুকরো করে দেন। মৃতের পরিবারের হাতে এই ফিতের যেটুকু থাকে তা কোন এক আত্মীয় মৃতের গৃহে নিয়ে আসে। এই কেটে দেওয়ার অর্থ হল—মৃতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করা। এবার থেকে পরলোকে তার যে-সব আত্মীয়-স্বজন রয়েছে সে তাদের মধ্যে থাকবে।[৩] আফ্রিকার নানা স্থানে মৃতের সৎকার উপলক্ষ্যে বন্দুক ফোটানো হয় ও ঢাক বাজানো হয়। এটা করা হয় প্রেতাত্মাকে ভয় দেখাবার জন্য। অন্যত্র, যেমন মেলানেশিয়াতে দৃঢ়সংকল্প নিতে ভূত তাড়ানো হয়।

প্রেতাত্মার স্বগৃহে অবস্থানের চেষ্টা :—মৃতের আত্মা সহজে পার্থিব সংসার ত্যাগ করতে চায় না বলেই প্রায় অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে। তারা ভাবে মৃত্যুস্থান বা মৃতদেহেই আত্মা থেকে যাবার চেষ্টা করে। হুরোন-ভূত শবমিছিলের পুরোভাগে হেঁটে যায়। যতক্ষণ না মৃতের আত্মার সদগতির জন্য ভোজের ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধ হয় ততদিন তারা সমাধিক্ষেত্র বা শ্মশানেই থাকে। রাতের বেলা তারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবিতদের ভুক্তাবশেষ কুড়িয়ে খায়। জামাইকার নিগ্রোরা মনে করে, প্রেতাত্মা শবমিছিলে কফিনের উপর বসে থাকে। কোরিয়দের মতে প্রেতাত্মা চেয়ারে বসে। কোনিক্‌সবার্গের লোকেরা মনে করে যে, কবর দেবার সময় কেউ যদি যারা কবর খুঁড়েছে তাদের বাহুর দিকে তাকায় তাহলে মৃতের প্রেতাত্মাকে দেখতে পায়।

---

১ Journal of African Society, v, 436.
২ Smirnov, i, 346.
৩ Riedel, 359.

পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রেতাত্মা কবর বা শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। কতদিন ঘুরে বেড়ায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে দিন কয়েক, কারো কারো মতে মাসাবধি বা বছর ধরে। কারো মতে অনির্দিষ্ট কাল। সমাধিক্ষেত্রকে মৃতদেহ বা আত্মার স্থায়ী বাসস্থান বলেও অনেকে মনে করে। তবে যারা প্রেতলোক বা পরলোকে বিশ্বাসী তারা মনে করে যে, কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান শেষে আত্মা পরলোকে যাত্রা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অনুষ্ঠান হচ্ছে ততক্ষণ মৃতের আত্মার জন্য খাদ্য পানীয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। মধ্য নাইজেরিয়ার লোকেরা মনে করে, আত্মা কবর থেকে বাইরে আসতে পারে, আবার কবরে ফিরতেও পারে। সেইজন্য কবরের মধ্যে একটি ফোকর বা গর্ত রাখে। যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তাদের মতে জীবাত্মা স্বগৃহে ফিরে আসতে পারে।

ইউরোপে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শিশুসন্তান রেখে মা মারা গেলে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের আত্মা ঘরে এসে শিশুকে স্তন্যপান করিয়ে থাকে। বুলগারিয়ানরা মনে করে যে, প্রেতাত্মা চল্লিশ দিন পর্যন্ত গৃহে থাকে। প্রথম ইস্টার ডে-তে ফিরে আসে এবং শিশুর খ্রীষ্টানকরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে। পাদাং উচ্চভূমির মিনাঙকাবু মালয়রা মৃতের বসার চেয়ার ও বিছানা একশ দিন পর্যন্ত পরিষ্কার করে রাখে। রাখে এই কারণে, পাছে প্রেতাত্মা অখুশি হয়। এই একশ দিনের মধ্যে প্রেতাত্মা বার বার বাড়িতে এসে হানা দেয়। ইয়াকুৎরা মনে করে যে, প্রেতাত্মা মৃতদেহের চারদিকে ঘুরঘুর করে এবং যে সব স্থানে যেতে সে ভালবাসত প্রায়ই সেই স্থানে যায়। কোন কাজ যদি সে অসমাপ্ত রেখে যায়, তাহলে সেই কাজ সে সমাপ্ত করার চেষ্টা করে। নিশীথ রাতে তারা গোরুর বাথানে যায় এবং লাঙল জোয়ালে হাত বুলায়। মহিলা ভূতেদের বাসনপত্র ধোবার, ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার, শস্যভাণ্ডার গুছানোর, এমনকি গুনগুন করে গান ও ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলার শব্দও শোনা যায়। পরিবারের অনেক লোকই তাদের দিব্যি ঘুরে বেড়াতে বা ক্ষেত খামারে পদচারণা করতে দেখে।[১]

অশৌচ শুদ্ধিকরণ: যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়, যারা এতে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেককেই শুদ্ধ হতে হয়। অনেকেই পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত এই শুদ্ধিকরণের জন্য অপেক্ষা করে। সুতরাং শবসমাধি বা দাহের পরেই সবসময় এটা করা হয় না। শুদ্ধিকরণের জন্য মূলত করা হয় দূষণমুক্তি ও স্নান। দূষণমুক্তি হয় আগুন জেলে বা ধোঁয়া দিয়ে। তবে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর ইউয়াহ্‌লায়ী (Euahlayi)-রা শুদ্ধিকরণ করে কবর দেবার পরেই। যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তাহলে গায়ে কাদা মেখে সারারাত সে আগুন জেলে সেই ধোঁয়ার পাশে শুয়ে থাকে। তিনদিন পরে তাকে এবং তার বোনেদের (সম্ভবত তারাও সহধর্মিণী) একটি খাঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগেই আগুন জ্বালানো থাকে। বিধবা মহিলাটি ধোঁয়াচ্ছন্ন খড়কুটো হাতে ধরে খাঁড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১ RHR. xivi, [1902] 224.

খাঁড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আগুন নেভায়। এটা হবার পর ধোঁয়া বেরুচ্ছে এমন একটি পানীয় দ্রব্য পান করে। জল থেকে উঠে আবার সে সেই ধোঁয়াপূর্ণ ঝোপের কাছে যায় এবং স্বামীকে ডাকতে থাকে। ধরে নেওয়া হয় স্বামী তার ডাক শুনতে পেয়ে জবাব দিয়েছে। এই কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত তাকে কথা বলতে দেওয়া হয় না। যে কথা সে বলতে পারে তা হল শোক-কান্নার কথা। ঘরে ফেরার পর আবার তাকে ধোঁয়ার মধ্যে শুদ্ধ হতে হয়। এই ধোঁয়া গ্রামের সকলকেই শুদ্ধ করে বলে বিশ্বাস। এর পর কয়েক মাস যাবৎ তাকে শোকের পোশাক পরে থাকতে হয়।[১]

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অর্থাৎ উপজাতিরা বিধবা মহিলাদের 'কথা বলতে দেয় তখনই যখন অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান শেষ হয়। গাছের কয়েকটি ডগা জড় করে তা পুড়িয়ে সেই পুড়ন্ত ডগা দিয়ে সে আগাগোড়া নিজেকে ঝাড়পোঁছ করে।[২] ইয়াকুৎদের কবর তৈরিকারকেরা নিজেদের শুদ্ধ করে কফিন থেকে আনা কয়েকটি কাঠের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে। তারপর তারা ঘরে ফেরে।[৩] বেচুয়ানার কোন বিপত্নীক ব্যক্তি যদি আবার বিয়ে করে তবে তাকে এবং তার নতুন স্ত্রীকে ধোঁয়ার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিতে হয়।[৪] বাঙ্গালাদের মধ্যে নিয়ম আছে, যারা মৃতদেহ স্পর্শ করবে তাদের অগ্নিবৃত্তের মধ্যে বসে নিজেদের শুদ্ধ করে নিতে হবে।[৫] মাবুগঞ্জাদের মধ্যে যারা শোকমিছিলে যায় তাদের গা রগড়ে ঔষধি জলে স্নান করে অশৌচমুক্ত হতে হয়।[৬] প্রাচীন হিব্রুদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করলে, কবর ছুঁলে, বা মৃতের শিবিরে গেলে সাতদিনের জন্য তাকে অশৌচ পালন করতে হত। এ সময় সে কোন সামাজিক কাজ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না। তিনদিনের এবং সাতদিনের মাথায় তার দেহে এক ধরনের জল ছিটিয়ে দেওয়া হত—'বিচ্ছেদক জল' অর্থাৎ যে জল গায়ে লাগলে অশৌচ থেকে সে মুক্ত হবে। এই জলের সঙ্গে এক ধরনের ভস্ম মেশানো হত, যে ভস্ম কেউ পাপ স্বীকার করে কোন অনুষ্ঠান করে থাকলে সেখানকার অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করা হত। এরা অশৌচকে এত বেশি মানত যে, এসময় যা কিছু সে স্পর্শ করত তাই অশুচি হয়ে যেত, এমনকি পবিত্র জল যে ছিটিয়ে দেবে, তাকে স্পর্শ করলে সেও অশুচি হত। সপ্তম দিনে শুদ্ধ হবার পরও অশুচি ব্যক্তি এবং পবিত্র জল-সিঞ্চক-ব্যক্তি উভয়কেই স্নান করে পোশাক-আসাক ধুয়ে নিতে হত। সন্ধ্যে হলে তবে তাদের শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হত।[৭] লুজোঁর বোনটক

১ K. Langlow Parkar, Euahlayi Tribe, pp. 86, 88, 93.
২ Spencer-Gillen[b] 554.
৩ RHR. xlvi, 211.
৪ JAI, xxxv, 307.
৫ JAI, xxxix, 114.
৬ Rattroy, Some FL. Stories and Songs in Chinyanja. 1907, p. 94.
৭ Nu 1910ff, 51.

ইগোরোটদের মধ্যে যারা মৃতের সৎকারে অংশ নিত, তারা সৎকার সেরেই দ্রুত নদীতে গিয়ে স্নান করে নিজেদের ধুয়ে নিত।[১] প্যারাগুয়ের চাকো ভারতীয়রা মৃতের সৎকার করে এসে গরম জল খেত এবং গরম জলে স্নান করত। মৃতের নিকট-আত্মীয়দের কিছুদিনের জন্য অশুচি মনে করে গ্রামের বাইরে রাখা হত। গ্রামে পুনরায় ঢোকার আগে আবার তাদের গরম জলে স্নান করে শোকপ্রকাশ করতে হত।[২] কলম্বিয়ার লিলুয়েৎরা মৃতের সৎকার করে এসেই ভোজের আয়োজন করত, অর্থাৎ শ্রাদ্ধভোজ। মৃতের পরিবারের লোকদের এরপর চারদিন উপবাসে থাকতে হত। এ সময় তাদের শোকও করতে হত। তাছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাও বাধ্যতামূলক ছিল। এর পর চুল ছেঁটে, তাতে রঙ করে, তেল মাখার পর শক্ত করে বাঁধা হত। পরে আনন্দের হাসি মুখে টেনে দ্বিতীয়বার তারা ভোজের আয়োজন করত। কোন যুবক বিপত্নীক হলে তাকে এক বছর বনবাসে কাটাতে হত। সেখানে সে মনোরম একটি ঘর তৈরি করে রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে ও গরম জলে স্নান করে তার মৃতা-স্ত্রীর অশুভ প্রভাব দূর করত। কোন যুবতী বিধবা হলে তাকে একবছর প্রত্যেক দিন ধৌতি অনুষ্ঠান করতে হত। এটা করতে হত নিজের আয়ুবৃদ্ধির জন্য এবং পরবর্তী স্বামীর কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করার জন্য। এদের ধারণা ছিল, এ না করা হলে পরবর্তী স্বামীও স্বল্পায়ু হবে।[৩] টমসন ভারতীয় (রেড ইনডিয়ান)-দের মধ্যে নিয়ম আছে, পুরুষ বা মহিলা যারই অপর পক্ষ মারা যাক না কেন, গোলাপ বনের মধ্য দিয়ে তাকে চারবার যেতে হবে। বিপত্নীক ব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় খাঁড়ির জলে স্নান করে নিজেকে জ্বলন্ত বৃক্ষপল্লব দিয়ে আগাগোড়া ঝাড়পোঁচ করতে হত। এ কাজ তাকে সারা বছর ধরেই চালাতে হত। যে ঘাস বা গাছের লতাপাতায় সে বসবে বা শোবে তাও শুকিয়ে যেত। [হিন্দুদের কুশাসনের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে ?]।[৪]

উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি কেন করা হয় তা কালিফোর্নিয়ার পিমাদের বিশ্বাসের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পিমারা মনে করে যে, প্রেতাত্মা বা ভুত হল অলৌকিক শক্তিধর। তারা ঘুমন্ত প্রাণীকে ছোঁবার চেষ্টা করে। এ ছোঁয়ার অর্থ হল প্রেতাত্মার সঙ্গে অন্ধকার জগতে চলে যাওয়া।[৫] সেই জন্য লিলুয়েৎ মহিলাদের স্বামীর ভুত থেকে মুক্ত হতে হয়। না হলে নিজের এবং পরবর্তী স্বামীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। মৃত্যু-দূষণ ধারণা বর্বরদের মধ্যে এত বেশি প্রবল যে, হুপাদের মধ্যে যারা মৃতদেহ স্পর্শ করে তাদের শ্রাদ্ধশান্তি ও শ্রাদ্ধকরণ না হওয়া পর্যন্ত মস্তক আবৃত করে চলতে হত। না হলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এই ছিল তাদের ধারণা।[৬] এ ধরনের বিশ্বাস

১ Jenks, 79.
২ Grubb, Among the Indians, p. 44.
৩ JAI xxxv, 137ff (following).
৪ Jesup, Expeditions, I, 335.
৫ 26 RBEW [1908] 194.
৬ Goddard, Hupa Texts, 1904, p. 254, n.

যে শুধু বর্বরদের মধ্যেই রয়েছে তা নয়। ঐতিহাসিক কালে ইউরোপের সর্বত্রই এমনতর বিশ্বাস কার্যকর ছিল। এখনও কোথাও কোথাও আছে।

প্রাচীন গ্রীসে শবদাহ-গৃহের সামনে পবিত্র জলের একটি কলসী রাখা হত। এই জল আনা হত ভিন্ন গৃহ থেকে। শবদাহ-গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে লোকেরা এই জল দিয়ে নিজেদের শুদ্ধ করে নিত।[১] এখনও ইউরোপে নিয়ম রয়েছে যে, যারা মৃতদেহ কবর দিতে যাবে, তাদের জন্য ঘরের দরজায় জল ও তোয়ালে রাখা হবে। সৎকার থেকে ফিরে এসে সেই জলে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, তবে তারা ঘরে ঢুকবে। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে অগ্নি স্পর্শ করে ঢুকতে হবে।]। ইস্ট্রিয়াতে জ্বলন্ত কাঠের উপর জল ঢেলে দেওয়া হয় [আমাদের চিতায় যেমন জল ঢালা হয়]।[২] ফ্রান্সে দুপুরুষ আগেও নিয়ম ছিল যে, শবের সৎকার করে এসে প্রথমেই লোকে কাছাকাছি কোন জলাশয়ে স্নান করতে যাবে। কোন কোন গ্রামে মৃত্যু-দূষণ ভীতি এত বেশি ছিল যে, পোশাক-আসাক শুকোতে দেওয়া হয়েছে এমন কোন পথ দিয়ে যদি মরদেহ নিয়ে যাওয়া হত তবে সঙ্গে সঙ্গে পোশাক খুলে আবার তারা ধুয়ে ফেলতে হত। টাইরলে নিয়ম আছে, শবযাত্রার আগে, পরিবারের সকলে একত্রিত হবে। গৃহকর্তা ধোঁয়া দিয়ে তাদের শুদ্ধ করে দেবেন। এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে বলে তারা মনে করে। কোন কোন জেলাতে এমন নিয়ম আছে যে, মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই পোশাক-আসাক সব ধুয়ে ফেলতে হয় [আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাত্রের জল ফেলে দেওয়া হয়। রান্না করা খাবারও নষ্ট করে ফেলা হয়]। তারা মনে করে, এ না করা হলে অল্প দিনের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় কেউ মারা যাবে।[৩]

শ্রাদ্ধ-ভোজ: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্যতম একটি অঙ্গ হল মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় ভোজের ব্যবস্থা করা। অনুন্নত সংস্কৃতিতে এটা বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহের সামনেই খাইয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় খাইয়ে দেওয়া হয় কিছুদিন পর। তার পর মাঝে মধ্যে এরকম চলেই। [হিন্দুদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে।] কোথাও কোথাও নিয়ম আছে, সৎকার সেরে ফিরে এলে খাওয়ানো হয়। কোথাও খাওয়ানো হয় দ্বিতীয়বার সমাধি দেবার সময়, [অর্থাৎ এক স্থান থেকে অস্থি বা কংকাল তুলে এনে নতুন স্থানে সমাহিত করার সময়। সেন্ট হেলেনা থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কবরস্থ দেহ সিয়েন নদীর তীরে এনে এমনি করেই দ্বিতীয়বার কবর দেওয়া হয়েছিল]। এক এক জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই ভোজসভা দেওয়া হয়।

---

১ Rohde, Psyche, i 219.

২ Globus xeii, [1907] 88.

৩ Von Zingerie, pp. 49, 50, vide, E.R.E. vol. IV, Edt, James Hastings, p. 434.

গিলাবার্ট দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত এক রীতি আছে। যখন মৃতদেহ ধৌতকরণের পর শোকের কান্না আরম্ভ হয়, তখন বাইবে মৃতদেহের কাছে নৃত্যগীত সহকারে ভোজ চলতে থাকে। যারই কান্নার পালা শেষ হয় সে-ই এসে এই ভোজের আসরে বসে পড়ে। সমাধি দেবার আগে তিন দিন ধরে এই ভোজ চলে।[১] কলম্বিয়ার কউকা উপত্যকাতে (Cauca valley) শুকনো মৃতদেহ কবর দেবার আগে দুমাস ঘরে রাখা হত।[২] অরুকানিয়ান (Arucanian)-দেব মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা চারদিক ঘিরে মাটিতে বসত। তারপর সামান্য সময় মৃতের জন্য কাঁদত। কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে এদের জন্য খাবার ও পানীয় নিয়ে আসত। উপস্থিত সকলেই সে খাবার খেত।[৩] আইনুদের ক্ষেত্রে মৃতদেহ ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হলে বড় এক পাত্রে করে খাবার বা বাজরার পিঠে ও জল এনে মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে রাখা হত। মৃতের উদ্দেশে এই সময় শেষ বাণী উচ্চারণ করে—আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাবার আগে খাবার গ্রহণ করতে বলা হত। বলা হত :—'এটা আমাদের বিদায় ভোজ। তোমার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।' কিছুক্ষণ মৃতদেহের পাশে সেই খাদ্য রেখে তারপর তা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দিত। বাজরার পিঠে ও পানীয় এনে উপস্থিত সকলকেই দেওয়া হত। প্রত্যেকেই খাবার আগে দু-তিন ফোঁটা মৃতের উদ্দেশে দান করে তার পর খেতে আরম্ভ করত। [হিন্দুরা যেমন অন্ন গ্রহণের পূর্বে পঞ্চ-আত্মাকে দিয়ে নেয়]। বাজরার রুটির কিছুটা খেয়ে বাকীটা বাড়ির ছাইয়ের গাদার মধ্যে পুঁতে দেওয়া হত। প্রত্যেকেই তাই করত। পুঁতে দেবার পর এই টুকরোগুলি আবার সংগ্রহ করা হত এবং বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে পারিবারিক কবরখানায় রাখত।[৪] প্রাশিয়ানরা (বর্তমান জার্মান) যখন বর্বর ছিল, পৌত্তলিক ছিল, তখন মৃতদেহকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেঞ্চে সটান করে শুইয়ে দিত। একজন নিকট আত্মীয় মৃতদেহের কাছে বসে থাকত। সে প্রচুর পরিমাণে বিয়ার খেয়ে চিৎকার করে কাঁদত।[৫] মাসুরদের মধ্যে এ ব্যাপারে যে অনুষ্ঠান হয় তা আরও ব্যাপক। কেউ মারা গেলে সারা গ্রামে জানিয়ে দেওয়া হয়। শবযাত্রায় প্রচুর লোক হয়। ঘরের এক দিকে একটি লম্বা টেবিল থাকে। এই টেবিলের মধ্যভাগে থাকে মৃতদেহ। চারদিকে বসে পুরুষ মানুষেরা। মহিলারা অন্য একটি টেবিলে ঘরের আর এক দিকে বসে। দুটো ক্লান্তিকর শোকসঙ্গীত গাইবার পর খাদ্য সরবরাহ করা হয়। পুরুষদের হাতে দেওয়া হয় মদের বোতল ও গ্লাস। একে একে সবাই পান করতে থাকে। মহিলাদের দেওয়া হয় মদভর্তি একটি পাত্র ও চামচে। প্রত্যেক মহিলা এক বা দু চামচে করে পানীয় নেয়। এক টুকরো করে সাদা কাপড় বা ঝুড়িতে চাক চাক ঘন দই দেওয়া হয়।

১ Int. Arch. ii [1889] 42.
২ Globus, xe 305.
৩ Int. Arch. xiii, suppl-105.
৪ Batchelor, Ainu and their Folk Lore, Lond, 1901, 7556.
৫ FL. xii, 300 ; Tetzner, 23.

মৃতদেহের পাশে বসে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা এক সময় অন্যান্য দেশের মত ইউরোপেও বহুল প্রচলিত ছিল।

মৃতের পাশে বসে যেমন খাদ্য গ্রহণ করা হয় মৃতদেহ সংকারের পরও তেমনই ভোজনের ব্যবস্থা আছে। শোকার্ত আইনুদের দেখা যায় যে, মৃতদেহ কবর দিয়ে ফিরে এসে উইলো গাছের কাঠ দিয়ে পবিত্র একটি চিহ্ন তৈরি করে। একে এরা বলে 'ইনাও'। এর পর তারা প্রার্থনা শেষে খাবার খায় এবং উম্মাদের মত মদ্য পান করে।[১] ওড়িশার ওড়িয়াদের মধ্যে মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় কয়েকদিন ধরে ভোজ চলে। ইউরোপের পৌত্তলিক নরম্যানরা তিন রাত ধরে আহারের ব্যবস্থা করত। মাসুর—যারা মৃতদেহকে কবরে নেবার সময় ভোজের ব্যবস্থা করে, শবের সংকারের পর ঘরে ফিরে আবার তারা খেতে বসে। এবার মহিলা ও পুরুষ সকলেই একই স্থানে বসে। মদ্য জাতীয় পানীয়ের সঙ্গে মধু মিশিয়ে তাদের পান করতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও এই পানীয় মধুর সঙ্গে মেশানোর আগে আগুনে পোড়ানো হয়ে থাকে। তারপর বিশেষ নাম ধরে ডাকা হয়। দুপুরবেলা মাছ, মাংস এবং মধু মেশানো এক ধরনের শস্যদানা দেওয়া হয়। সারা দিন পাড়া প্রতিবেশীরা শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়। এরই ফাঁকে ফাঁকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যার আগে কেউ শোকার্ত পরিবার ত্যাগ করে যায় না।[২] কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে মৃতদেহ বের করার আগে টেবিলক্লথ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে এই টেবিলক্লথের উপরই মৃতের কল্যাণার্থে ভোজের খাদ্য সরবরাহ করে। ইল্লে-এট-ভিলেইনে ভোজের টেবিলে ফলের রস, মদ্য জাতীয় পানীয়, কফি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় না। আস্তে আস্তে কথা বলা হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সবাই নীরবে বিদায় নেয়।

ওয়েজার নদীর নিম্ন অঞ্চলে জলাভূমির ফ্রিসিয়ানরা (Frisian) এক্ষেত্রে ঠিক উল্টো ব্যবহার করে। গীর্জায় প্রার্থনা সেরেই তারা দ্রুত মৃতের গৃহে চলে আসে। সেখানে গাদা গাদা পিঠে, অজস্র মদের বোতল, মাটির পাইপ. তামাক পাত্র, দেশলাই ও সিগারেট থাকে। মৃতের গৃহে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজ আরম্ভ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত বাড়িতে ছিল নীরবতা ও এক ধরনের ফিস্‌ফিস্‌ কথা। এবার ভোজসভা যেন বাধা হারিয়ে উম্মাদের আসরে পরিণত হয়। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর এমন ভরে যায় যে, তিন পা দূরেও কিছু দেখা যায় না। শোকের আসর যেন হাসি ঠাট্টায় উম্মাদের আসরে পরিণত হয়।[৩] ফলে ইউরোপের বহু অংশে এ ব্যাপারে আঞ্চলিক যে সমস্ত রীতিনীতি ছিল সেগুলো যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যায় সেজন্য আইন তৈরি করতে হয়েছিল। ব্যয়ের একটা সীমাও ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল।

---

১ Batchelor, 559.

২ Troppen², 104.

৩ Zvv ix, [1899] 55.

বহু জাতি আছে যাদের এই ভোজ দেওয়া হয় কবরেরই উপরে। ওজিবোয়া—যারা মাটির উপর তাদের মৃতদেহ রাখে, তারা তার উপর বাঁশ ও মাদুর দিয়ে একটি আচ্ছাদন তৈরি করে দেয়। যখন এই আচ্ছাদন তৈরি শেষ হয় তখন তারা মৃতের মাথার কাছে গোল হয়ে বসে মৃতের উদ্দেশে মাংস, সুপ, গরম জল ইত্যাদি দান করে। এই খাবারের সামান্য কিছু অংশ অগ্নিতে দেবার জন্য রেখে দিয়ে বাদবাকিটা তারা নিজেরা খেয়ে ফেলে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে—মৃতদেহ সমাহিত করার পরের দিন কবরের কাছে ভোজনের আয়োজন করা হয়। মৃতের সঙ্গে সম্পর্ক অনুযায়ী অনেকেই কিছু কিছু খাবার ও পানীয় স্পর্শ করে না। কিছুদিন তারা আনন্দ উৎসবও বন্ধ রাখে। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ভোজ হয় সমস্ত প্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়া শেষ হবার পর।[১] গিলিয়াকরা হিন্দুদের মত তাদের মৃতদেহ পোড়ায়। যখন শবদাহ শেষ হয়, তারা গোল হয়ে বসে কুকুরের মাংস খায়। কুকুরটিকে সেই শ্মশানেই পোড়ানো হয়। শ্মশানে কুকুর হত্যা করা হয় এই কারণে যে, সে যাতে মৃতের আত্মার সঙ্গে যেতে পারে। কুকুরের মাংসের সামান্য একটু তারা খায়, বাকিটা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। হয়তো চারিদিকে এইভাবে ছড়ানো হয় মৃতের উদ্দেশেই। এর কিছুদিন পর নতুন করে আবার ভোজের ব্যবস্থা হয়।[২] প্রাচীন রোমানরা ভোজের ব্যবস্থা করত মৃতদেহ সৎকারের নবম দিনে। সমাধিক্ষেত্রেই ভোজের ব্যবস্থা হত। ফ্রান্সের একটি প্রদেশ—'হাউ'তে এবং আল্‌পস-এর 'আর্জেনটিয়ারে' নামক স্থানে মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গ কবরের উপরই একটি টেবিলে খেতে বসত। ভোজ শেষ হলে একের পর এক মৃতের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করত। এই প্রথা যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল শুধু তাই নয়, নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই চলে আসছে। এ সময়কার কবরগুলি খুঁড়ে এ ধরনের ভোজের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখানে পশুদের হাড় ও আগুন জ্বালানোর প্রমাণও মিলেছে।

মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় যে ভোজ হয়, দেখা যাচ্ছে একটি ভোজেই তা শেষ হত না। প্রাচীন নর্স ও ইউরিয়ারা এ বিষয়ে গিলিয়াকদের মতই নামমাত্র ভোজ সেরে বাকি অংশ চারদিকে ছড়িয়ে দিত। মোলাক্কার কাইজার দ্বীপে আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতের গৃহে কুড়িদিন ধরে ভোজন করে। ভোজ শেষ করে কুকুরের মাংস দিয়ে। তালেমবার ও তিমোরলট দ্বীপবাসীরা দশ থেকে একশ দিন পর্যন্ত এই শ্রাদ্ধ-ভোজন করে থাকে।[৩] লেপার দ্বীপবাসীরা একদিন মাত্র এই শ্রাদ্ধের খাবার খায়।[৪] মালাগাছিরা বোধ হয় সকলকেই ছাড়িয়ে গেছে। এরাঁ এ ব্যাপারে বোধ হয় সবচাইতে বেশি ব্যয় করে। দিন রাত মদের ফোয়ারা ছোটে। (অবশ্য মৃতের পরিবারের অবস্থা অনুযায়ী) প্রত্যেকেই প্রায় মাতাল হয়ে যায়। খাবার যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভোজ চলে। কেউ

---

১ International Archives, vi, 25.

২ ARW, viii, 473.

৩ Riedel, 421, 306.

৪ Codrington, 287.

ভোজ ছেড়ে উঠে যাবার নামও করে না। অভিজাতদের ঘরে মাসাবধি এই ভোজনপর্ব চলে। কারো কারো ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে এই ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মালয়ের মুসলমানেরা সৎকারের দিন ভোজন করে। তাছাড়া, তৃতীয়, সপ্তম ও চতুর্দশ দিনেও ভোজন করা হয়।[১] প্রাচীন প্রাশিয়ানরা তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও চল্লিশতম দিনে এই ভোজন করাতো।[২] উত্তর টঙকিঙের চৈনিকরা মাসের প্রতি সপ্তাহে এই ভোজের আয়োজন করত।[৩] বুরিয়াৎ পুরোহিতদের মৃত্যু হলে শ্মশানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় দিনে যখন তার পোড়া হাড় সংগ্রহ করে ফার গাছের গুঁড়ি খোদাই করে তাতে রাখা হয় তখন আর একবার ভোজ দেওয়া হয়। এর পরই সাময়িক কালের জন্য অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে।[৪] এদের এই সহজ ভোজ-ব্যবস্থা ফিজি দ্বীপের অধিবাসীদের ভোজ ব্যবস্থার ঠিক উল্টো। তাদের ঘরে কেউ মারা গেলে কান্নাকাটিই চলে চার দিন ধরে। চতুর্থ দিনে একটি ভোজ দেওয়া হয়। কেউ কেউ দশম, ত্রিংশতম ও চল্লিশতম দিনেও ভোজের ব্যবস্থা করে। এই সময় মৃতের কবর সাজানো হয়। শততম দিনেও লোকজন ভোজন করানো হয়। পাটাগনিয়ানদের মধ্যে শোক চলে পনের দিন ধরে। এই সময় উচ্চরোলে কান্নাকাটি চলে এবং ঘোড়ার মাংস ও পানীয় সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক মাসেই এই কান্না ও ভোজের ব্যবস্থা থাকে। বছর শেষ হলে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান করে তবে এ ব্যাপারে ইতি টানা হয়।[৫]

শ্রাদ্ধ-ভোজের প্রয়োজনীয়তাঃ মৃত্যু-উপলক্ষে যে ভোজের আয়োজন করা হয় তা যে সমবেত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যই করা হয় তা নয়, কারণ অতিথিরাও এতে পাওনা জিনিস দিয়ে থাকে। শবমিছিলে যারা যোগ দান করে তাদের আনন্দদানের জন্যও যে এসব করা হয়, তাও নয়। এ যে শোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সে কথাও বলা যায় না। কিংবা পরিবারের জীবিত ব্যক্তিরা যে তাদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে থাকে তাও নয়। এর নিশ্চয়ই ভিন্নতর একটা অর্থ আছে। এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয় মৃতের আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কারণ, যারা এ ধরনের উৎসব করে থাকে তারা বিশ্বাস করে যে, এইসব ভোজসভায় মৃতের সূক্ষ্ম সত্তা নিজেও অংশ নেয়। জার্মানীর প্রাশিয়াতে যখন এ ধরনের ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তখন একটি আসন খালি রাখা হয়। ধরা হয় তাতে মৃতের আত্মা জীবিতদের সঙ্গে ভোজে বসবে। সেই জন্য শূন্য আসনের পাত্রেও রীতিমত খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হত। প্রাচীন প্রাশিয়ানরা খাদ্য ও পানীয় মৃতের উদ্দেশে টেবিলের নিচে ছুঁড়ে দিত।[৬] কলাম্বিয়ার

১ Skeat, Malay magic, 407.
২ Toppen[২] iiin.
৩ Lunet, 89.
৪ JAI, xxiv, 135.
৫ International Archives, xiii, Suppl, 163.
৬ Toppen 2 iiin.

থিল্‌ংকেটেরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে আন্তর্বিবাহ চলে। যদি কোন পুরুষ মারা যায় তাহলে তার মৃতদেহ স্ত্রীর গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বের করে। মৃত ব্যক্তির পরিবার ও গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভোজন করায়। খাদ্য সরবরাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করে খাবারের একটু অংশ আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ধরা হয়, আগুনে যে অংশ ছুঁড়ে দেওয়া হল তা মৃত ব্যক্তি ভক্ষণ করবে।[১] নাম ঘোষণা করা হয় এই কারণে যে, বিশ্বাস, এতে মৃতের আত্মা খাদ্য গ্রহণ করতে সেখানে আসবে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, ভোজসভা আনন্দসভা নয়, আপ্যায়ন সমাবেশও নয়। মৃতের আত্মার জন্যই এই ভোজের ব্যবস্থা।

এই ধরনের ভোজসভায় মেলানেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই যখন মৃতের নাম ধরে ডাকা হয়, তখন প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি নিজের হাতে খাবার নিয়ে স্পষ্টভাবে বলে :—'এই খাবাব তোমার জন্য।' তারপর সেই খাবার সে আলাদা করে রাখে [হিন্দুরা যেমন পিণ্ড দেয়, তেমন]।[২] তাহলে ভোজকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ উৎসব হয় তা নিজেদের জন্য নয়। মৃতকে আনন্দ দেবার জন্যই। কারণ ধরেই নেওয়া হয় যে, ভোজসভায় সেও উপস্থিত। মৃতকে সঙ্গে নিয়েই যে ভোজ, তার জন্যে যে ভোজ, এর প্রমাণ অনুন্নত সংস্কৃতির কিছু লোকের ব্যবহারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন, জাম্বেসি অঞ্চলের চিনিয়াই চিনিউনগুয়েরা কবরে যে ভোজের আয়োজন করে তাতে যে পশু হত্যা করা হয় তার রক্ত ও কিছু পানীয় (সুরাজাতীয়) মৃতের উদ্দেশে কবরে ঢেলে দেয়। মৃতদেহের কাছে যাতে এসব যেতে পারে এ-জন্য কবরে একটি গর্ত থাকে।[৩] মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু দ্বীপের অধিবাসীরা মনে করে যে, মৃতের আত্মা নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্য তারা মৃত্যুর পর পঞ্চম দিনে কাঠের একটি পুতুল তৈরি করে মন্ত্রবলে মৃতের আত্মাকে তার মধ্যে টেনে আনে। তাকে ভাত, শুয়রের মাংস, মুরগির মাংস এইসব খেতে দেওয়া হয়। শেষে কিছু আঠালো খাবার দিয়ে পুতুলের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় :— 'খাও, পান কর, আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখ, যেন কারো কোন ক্ষতি না হয়।' মৃতের আত্মাবদ্ধ এই পুতুলের খাওয়া শেষ হলে সমবেত লোকেরা তখন খেতে আরম্ভ করে। এই খাওয়া-দাওয়া চলে সারারাত ধরে।[৪] বেচ্ছারা সদ্য মৃতের উদ্দেশে যে খাবার দেয় পরে তা নিজেরাই খেয়ে নেয়। মোলাক্কা অধিবাসীদের সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, মৃতকে যে খাবার দেওয়া হয়, সমবেত লোকেরা সেই একই খাবার গ্রহণ করে কি না, যেমন বেচ্ছারা করে। সম্ভবত একই খাবার তারা খায়। এবং তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতেই হবে যে, ভোজন-উৎসব

১ 26, RBEW, 431, of. 462.
২ Condrington-271, 282, 284,
৩ JAI, xxiii, 421.
৪ Riedel, 395

মৃতের জন্যই, জীবিতদের জন্য নয়। চেরেমিসরা চল্লিশতম দিনে শ্মশানে গিয়ে মৃতব্যক্তির আত্মাকে তাদের সঙ্গে ভোজ খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। কোন কোন জায়গায় অদ্ভুত এক নিয়ম আছে। একজন ভোজনবিলাসী নিজেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বশূন্য করে মৃতের সব চাইতে ভাল পোশাক পরে। তাকে তখন বিশেষ সম্মানের আসনে বসানো হয়। তিনিই যেন কর্তা এমন ভাব করা হয়। মৃতের বিধবা পত্নী তাকে স্বামী বলে সম্বোধন করে। ছেলেমেয়েরা 'বাবা' বলে ডাকে। সারারাত ধরে সেই ব্যক্তি সমবেত সকলের সঙ্গে খায়দায়, নাচগান করে। নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে সে পরলোকের কাহিনী শোনায়। সেখানে কেমন সুখে আছে তা বর্ণনা করে। প্রাক্তনপুরুষ—যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কথা বলে। সে তার জন্য শোক করতে বারণ করে। বরং প্রতি বছর মৃত্যুদিবসে তার স্মরণে ভোজসভাব আয়োজন করতে বলে।[১] [আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানে আত্মা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে স্থূল দেহের মৃত্যুর পর জীবাত্মার অনুরূপ আনন্দের কথাই বলা হয়েছে। আত্মা নাকি নিজেকে হাল্কা, মুক্ত ও আনন্দময় বলে ভাবে। অবশ্য যোগীদের যোগদর্শনে এমন অভিজ্ঞতার স্তরভেদ উল্লেখ আছে। সব আত্মাই এই মুক্তির আনন্দ পায় না। এ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।]

ভারতবর্ষে ছোটনাগপুরের কোলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মৃতের গৃহে তারা ভোজের আয়োজন করে। এই ভোজে প্রতিবেশী মংগ্রেল গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই মংগ্রেলদের সঙ্গে অন্য কোন অবস্থায় তারা একত্র ভোজন করে না। ভোজসভায় যে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে সে যদি খাদ্য গ্রহণ না করে তবে পরিবারের অপর কেউ খেতে পারবে না। [আমাদের অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মত?]। সে খাবার খেয়ে চলে যাবার পর গৃহকে মৃত্যু দূষণমুক্ত বলে ভাবা হয়। এরপর মৃত ব্যক্তির আত্মা কখনও তাদের ক্ষতি করবে না কোলরা এই বিশ্বাস করে। কোলদের অনুরূপ প্রথা উত্তর আমেরিকার কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে।

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়, তার যে একটা ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে তা প্রমাণ হয় বিশেষ ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করা দেখে। প্রাচীন রোমানরা মৃতের ভোজসভায় এক ধরনের শস্যের বীজ দিত যাকে বলা হয় পাল্‌স (pulse)। এখনও ইউরোপের নানা জায়গায় শ্রাদ্ধের ভোজসভায় পাল্‌স সরবরাহ করা হয়। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এক্ষেত্রে কেক ও বিস্কুট দেয়। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে আনুষ্ঠানিক ভোজ দেওয়া হয়—তাতে খাদ্যগুলি এমন জিনিস দিয়ে তৈরি হয়—যাতে মনে করা যেতে পারে যে, এ হল মৃতের মাংস দিয়ে তৈরি। [কেক ও মদ, রক্ত ও মাংসের মতন]। একদা মানুষ যখন নরখাদক ছিল, তারা মৃতের মাংস ভক্ষণ করত। সেই প্রথারই একটি ক্ষীণ ধারা বোধহয় এই ব্যবস্থার মধ্যে টিকে

১ Smirnov, i, 143

আছে। ভারতবর্ষেই এ ব্যাপারে অদ্ভুত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন— Albe Dubois। ঘটনাটি তাঞ্জোরের এক রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত। ১৮০১ খ্রীঃ তিনি মারা যান। চিতার আগুনে তাঁর হাড়ের কিছু অংশ দগ্ধ হলেও পুড়ে যায়নি। ফলে সেই হাড় তুলে এনে গুঁড়ো করা হয়। তারপর ব্রাহ্মণদের জন্য রান্না করা চালের সঙ্গে তা সেদ্ধ করে বারজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়। এ সাক্ষ্য সেই মৃত রাজার দুই মহিষীই দিয়ে গেছেন। এটা করার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, সে হাড় সম্পূর্ণ না পোড়ার জন্য যে পাপ হয়েছিল—বারজন ব্রাহ্মণের পেটে সেই হাড় চলে যাওয়াতে তাঁরাই সেই পাপের ভাগী হয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের ওয়েল্‌স-এও অনুরূপ প্রথা ছিল—যাকে বলা হত Sin-eating. Sin-eating-এ মৃতদেহ যখন ঘরের বাইরে এনে কফিন-দণ্ডের উপর রাখা হত তখন একটি লোককে ডাকা হত। একটি কেক মৃতদেহের হাতে দেওয়া হত। আর দেওয়া হত কাঠের একটি পাত্র, যাতে ভর্তি থাকত বিয়ার জাতীয় পানীয়। এর সঙ্গে একটি টাকাও থাকত। এটা পাবার পর সে মৃতকে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করত। এর পর মৃতদেহ নিয়ে শবযাত্রা বেরুতো।

ব্যাভেরিয়ান পার্বত্য এলাকায় অনুরূপ ঘটনারই ভিন্নতর ব্যাখ্যা আছে। তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃতদেহ বাইরে এনে কফিন-দণ্ডের উপর রাখা হত। ইতিমধ্যে ঘরদোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হত। গৃহকর্ত্রী মৃতের উদ্দেশে বিশেষ ধরনের কেক তৈরি করতেন। আটা বা ময়দা ছেনে প্রথম সে তা মৃতব্যক্তির দেহের উপর রাখত। তারপর ভাজত। এই কেকের মধ্যে মৃতব্যক্তির সকল সুযোগ সুবিধা ও গুণাবলী প্রবেশ করেছে তারা এ রকম চিন্তা করত। এই কেক এরপর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়া হত। এরা বিশ্বাস করত যে, মৃতের প্রাণশক্তি ও সকল দক্ষতা এইভাবে উত্তরপুরুষদের মধ্যে বর্তাবে। [একই উদ্দেশ্যে বোধহয় প্রাচীনতম কালে নরখাদকেরা মৃতের মাংস ভক্ষণ করত।] টঙ্কিঙ-এর ম্যানকক-এ এই ধরনেরই একটা অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। এরা খাবার আরম্ভ হবার আগে পুরোহিত পরিবারের সকল ব্যক্তি ও আত্মীয়-স্বজনকে এক টুকরো মাংস শুঁকতে দিত। যখন ভোজসভা বসত তখন প্রত্যেককেই এই মাংসের সামান্য টুকরো দেওয়া হত। পুরোহিতকে দেওয়া হত শুয়রের পা।[১] ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অষ্টাদশ শতকের একটি পাণ্ডুলিপিতে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ডেলাগুয়া উপসাগর অঞ্চলের উপজাতিদের মৃত্যু সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। মৃতের ক্ষমতা অনুযায়ী লোকেরা তার উদ্দেশে একটি পশু বলি দিত (হত্যা করত)। গোলাকার একটি কবর খুঁড়ে তারা মৃতদেহকে সেখানে সটানভাবে শুইয়ে রাখত। পশুটির পেট চেরা হলে নাড়িভুঁড়ি বের করে মৃতের মুখের উপর তা রাখা হত। এরপর মৃতদেহের চারদিকে নাচ শুরু করত। নাচ শেষ হলে সেই নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে হৈ-হুল্লোড় করে সবাই খেত। এটা

১. Lunet, 245

হয়ে যাবার পরই মৃতের দেহ নরম থাকতে থাকতেই তাকে দুমড়ে গোলা পাকানো হত। বলি দেওয়া পশুটির তলপেটের কিছু অংশ মৃতের গায়ে লেপটে দেওয়া হত বা কবরে ঢেলে দেওয়া হত। তারপর কবরের মুখ বন্ধ করে দিত। এর পরই অদ্ভুত নৃত্য সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হত।

বাগাণ্ডাদের ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত খাদ্যের বিশেষ অর্থ রয়েছে। এখানে মহিলা মারা গেলে কেউ মুরগি খেতে পারত না। এর কারণ তাদের একটি পুরাণ কাহিনী। কাহিনী এই যে, স্বর্গ থেকে মৃত্যুকে এক মহিলাই ডেকে এনেছিল। পিতার নির্দেশ অমান্য করেও মাঝপথ থেকে তার পোষা মুরগির জন্য ফেলে আসা খাবার আনতে গিয়ে মৃত্যুরূপ ভাইয়ের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। সে তখন তার এবং তার প্রেমিক স্বামীর সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। সেই থেকে মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়ে। সুতরাং বাগাণ্ডাদের ক্ষেত্রে মহিলার মৃত্যু হলে ভোজসভায় মুরগি খাওয়া বারণ। কিন্তু যদি কোন পুরুষমানুষ মারা যায় তবে ভোজের জন্য মুরগির মাংস রান্না করা হয়। অতিথিদের এই মাংস সরবরাহ করবার আগে মৃত ব্যক্তির বিধবা মহিলারা তা চেখে দেখে।[১] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মূল ভোজসভায় যারা অংশ নিতে পারে না কোথাও কোথাও এক-একটি উপজাতি সেজন্য এই খাবার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সার্দিনিয়াতে মৃত্যুর পর সাতদিন বা নয়দিনের মাথায় সুগন্ধি কেক তৈরি করে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে গরম গরম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য যারা শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল শুধু তাদেরই কাছে এই কেক পাঠানো হয়। যথার্থ অর্থে শ্রাদ্ধের খাওয়া যাকে বলে তা সীমিত থাকে নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেই। গেইনসুবোরোতে যারা খাদ্যের বদলে পয়সা চায় তাদের পয়সাই দেওয়া হয়। বুলগেরিয়াতে গ্রামের লোকেরা মৃতের উদ্দেশে ফল নিয়ে আসে। শব-সমাধির সময় সেই ফল বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ওড়িয়াদের মধ্যে কোন কোন ধনীলোকের মৃত্যু হলে শবযাত্রার সময় পথে যেতে যেতে খই ও তামার পয়সা ছড়ানো হয়। মাবুইয়াগদের মধ্যে নিয়ম আছে, মৃতদেহ যে খাটে থাকে তার কাছে স্তূপীকৃত খাদ্য রাখা হয়। এই খাদ্যই পরে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছুদিন পরে যখন করোটি খুলে নেওয়া হয় এবং পরিষ্কার করে আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয় তখন শোকার্তদের নতুন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা সাহায্য করেছিল তাদেরও খাদ্য পরিবেশন করে এরা ; উভয় ক্ষেত্রেই খাওয়া-দাওয়া হয় বাড়িতেই।

গরীবদের যে এসময় পয়সা দেওয়া হয় সেটা দেওয়া হয় খাদ্যের পরিবর্তে। ভারতবর্ষেও এই রীতি চালু আছে। দরিদ্ররা খুশি হলে আত্মা পরলোকে শান্তি পাবে এ বিশ্বাসও এর পেছনে কাজ করে। এর পেছনে যে পুরোহিত শ্রেণীর হাত আছে তাতে সন্দেহ নেই। পুরোহিতদের এই উপলক্ষে বেশ ভালরকম দানধ্যান করা হয়।

১ JAI, xxxii, 48.

শ্রাদ্ধে ভোজের ব্যবস্থা হল মৃতকে শেষ বিদায় জানানো। শ্রাদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মৃতের আত্মা পরিবারবর্গের সঙ্গেই থাকে বলে পৃথিবীর প্রায় সবাই বিশ্বাস করে। [বস্তুবাদী, যারা আত্মায় বিশ্বাস করে না তাদের কথা অবশ্য বাদ।] মৃতের আত্মা সহজে সংসার ত্যাগ করতে চায় না বলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাদের সংসার ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

প্রাশিয়ার কোনিগসবার্গে শ্রাদ্ধের আসরে যে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে মৃতের জন্য একটি আসন রাখা হয়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর ঘরের সব জানালা দরজা খুলে দেয়। অর্থাৎ, প্রেতাত্মাকে বলা হয়, এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। প্রাচীনকালে এ ধরনের ভোজের পর প্রাশিয়ানরা বলত—"খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, এবার চলে যাও।" ব্রেজিলের কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে নিয়ম আছে—ভোজের সময় যদি মৃতব্যক্তি পুরুষ হয়, তবে তার বিধবা স্ত্রী অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে ভোজসভায় এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপস্থিত সকলকেই তাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়। মৃতের জন্য সকলকে শেষবারের জন্য পান করতে বলে। এটা হলে তবেই মৃতের আত্মা পরলোকে যাত্রা করতে পারে। যতক্ষণ বন্ধুবান্ধবেরা উপস্থিত থাকে ততক্ষণ মৃতের আত্মাও স্থান ত্যাগ করতে চায় না।[১] মেক্সিকোর 'তারাহিউমারেরা' কোন পুরুষ মারা গেলে তার জন্য তিনবার ভোজের ব্যবস্থা করে, কিন্তু মহিলা মারা গেলে এই ভোজের ব্যবস্থা করে চারবার। মৃত্যুর পনের দিনের মধ্যে এই ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। পরের ভোজগুলো বেশি খরচ করে করা হয়। এক একটা ভোজ চলে ২৪ ঘণ্টা ধরে। এ সময় সকল শোকার্তই মৃতের আত্মার সঙ্গে কথা বলে। তাকে (প্রেতাত্মাকে) যা দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে চলে যেতে বলে—যাতে জীবিতদের কোন ক্ষতি না হয়। ছয় মাস পরে দ্বিতীয় ভোজ দেওয়া হয়। এরপরে দেওয়া হয় জাঁকজমক করে তৃতীয় ভোজ অর্থাৎ সবচাইতে বড় ভোজ। ফণীমনসার গাছকে এরা পবিত্র বলে মনে করে। এর নাম এদের ভাষায় কিকুলি। তাদের মতে ভূত তাড়ানোর পক্ষে এই কিকুলি খুব শক্তিশালী। তাই এই কিকুলি দিয়ে প্রেতাত্মাকে পৃথিবীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হয়—যাতে সেখানে সে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ফণীমনসার ডাল জলে ডুবিয়ে সবার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে কিকুলি হাতে নাচ ও গান বিরাট এক ভূমিকা নেয়। আরও ভিন্ন ধরনের নাচও হয়। এই সময় এক ধরনের দেশীয় মদ পান করা হয়। এর নাম তেসভিনো (Tesvino)। মৃতের আত্মার সঙ্গে জীবিতেরাও এই পানীয় পান করে। তৃতীয় ভোজসভায় বড় একটি মাটির পাত্রে জল রেখে পুরোহিত তাকে মন্ত্রপূত করে। তারপর পাত্রসহ সেই জল আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়। পাত্রটি মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মৃৎপাত্রের টুকরোগুলির উপর লোকেরা নাচতে শুরু করে। এই অনুষ্ঠান শেষ হয় তরুণদের মধ্যে দৌড়

১ International Archives, xiii, Suppl. 112

প্রতিযোগিতা দিয়ে। লোকেদের হাতে থাকে গোল পাত্র। তারা যখন দৌড়য় চারদিকে ছাই ছিটিয়ে দেয়—উদ্দেশ্য মৃতের পথ ঢেকে দেওয়া। এরা ফিরে আসে আনন্দ করতে করতে। ফিরে এসেই মাথার টুপি ও কাঁধের কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ করতে থাকে। আনন্দ করে এই কারণে যে, মৃতের প্রেতাত্মাকে অবশেষে তারা দূর করতে পেরেছে।[১]

সাধারণত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখে মনে হয় যে, মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্যই এমন করা হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় যে, মূলত এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় জীবিতদের কল্যাণের জন্যই বেশি করে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এই অনুষ্ঠানের রীতি পর্যালোচনা করলে এ-কথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

হাঙ্গেরীর বুলগারিয়ানদের মধ্যে শব-সমাধির আগে উপস্থিত সকলকে খাবার সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেককে এক টুকরো রুটি, একটি পলতে ও কাপড় দেওয়া হয়। পলতেটি জ্বালানো হয় ঘরে। তারপর নিভিয়ে দেওয়া হয়। এরপর চলে রুটি খাওয়া। এদের ধারণা, এটা করা হলেই আত্মা মুক্ত হয়ে যায়। যে ঘরে মৃতের আত্মাকে জাগরিত করা হয় তার পাশের ঘরে আর একবার তারা ভোজ দেয়। এই ভোজ দেওয়া হয় যারা জীবিত থাকে তাদের কল্যাণে, এবং যে মারা গেছে সে যাতে অনন্ত ঘুমে ঢুলে পড়তে পারে সেই জন্য।[২] লুজোঁর ইগোরোটরা মৃতদের ফিরে না আসার জন্য নির্দেশ দেয়, কারণ মৃতের আত্মা ফিরে এলে জীবিতেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে তাকে বিদায় জানানো হলেও অন্যান্য দুষ্টাত্মা থেকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে রাখে। জীবাত্মাদের এরা বলে আনিতো (Anito)। তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি অপর কারো দুষ্ট আত্মা জীবিতদের ক্ষতি করে তাহলে সে আর ঘরে ফিরে এসে মাঝে মাঝেই ভোজের আসরে বসতে পারবে না। তাকে শেষ বিদায় জানানো হলেও মাঝে মাঝেই তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভোজে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখা হয়। ইগোরোটরা বেশ ভোজনবিলাসী। কারো মৃত্যু হলেও ভোজনের ক্ষেত্রে এজন্য কোন হেরফের হয় না। বরং মৃত ব্যক্তির নামে মাঝে মাঝেই ভোজন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৩]

ইয়াকুতেরা বিশ্বাস করে যে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যে ঘোড়া বা গরু বলি দেওয়া হয় তাদের পিঠে চেপে মৃতের আত্মা পরলোকে যায়। [হিন্দুরা যেমন বৃষোৎসর্গ করে মনে করে যে, এই ষাঁড়ের লেজ ধরে তারা বৈতরণী পার হবে]। বারোঁৎসেরাও প্রায় অনুরূপ ধারণাই পোষণ করে। তারা মনে করে যে, মৃতের ভোজ উপলক্ষে কোন ভৃত্য বা ষাঁড় মারা হলে পরলোকে পূর্বপুরুষেরা তাকে সাদরে গ্রহণ করবে। অরোরার মেলানেশিয়ানরা বিশ্বাস করে যে, মৃতের আত্মার জন্য যদি অনেকগুলি শূয়র মারা

১ Lumholtz, Unknown Mexico. i, 384 ff.
২ Globus xc, 140
৩ Jenks—79.

না হয়, তাহলে মৃতের আত্মা জড়ানো লতাপাতায় ঝুলে থাকে। এরকম ঝুলে থাকা খুবই বেদনাদায়ক। মৃতের উদ্দেশে শুয়র মারা না হলে তার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই কারণে কেউ মারা গেলেই তারা শুয়র মেরে থাকে। তারা মৃতের উদ্দেশে যে ভোজের আয়োজন করে তাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রাক্তন আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে ভোজন করতে আসে বলে মনে করে।[১]

অ্যাঙ্গোলার লোকেরা মনে করে যে, পরলোকে আত্মা কিভাবে থাকবে তা নির্ভর করে তার জন্য কত খাদ্য ও শোক (Tambi) করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এই জন্য তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এক সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। এ-সময় কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হাসি-ঠাট্টা ভোজ সবই হয়।[২]

সাইলেশিয়ানদের মধ্যে একটি বেদনাদায়ক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আছে। কোন অবিবাহিত যুবক বিশেষ করে বাগ্‌দত্ত হলে তার জন্য অনুষ্ঠানকালে সবুজ ডালপালা দিয়ে ঘর সাজানো হয়। এখানে যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তা ঠিক যেন বিবাহের ভোজন অনুষ্ঠান। এতে শুধু শোকার্ত নয়, অন্যান্যদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়।[৩] কখনও কখনও সরাসরি অধ্যাত্ম ভাব বা নিরাসক্ত ভাবও দেখানো হয়। তবে এক্ষেত্রেও যা করা হয় তার পেছনে কাজ করে মূলত উপরোক্ত চিন্তাগুলি। বুলগেরিয়াতে শবসমাধির আগে যে খাওয়ানো হয় তাতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এক ফোঁটা করে মদ মাটিতে ফেলে দেয় এবং মৃতের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'এর পাপ ক্ষমা কর।' কবর দেবার পর যাজক ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে দেন—তারপর টেবিলে বসে মৃতকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেন। ভোজের সময় অতিথিরা যখন চারদিক ঘিরে খেতে বসে, তখন যাজকেরা বলে—ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন। সমবেত কণ্ঠে সমস্ত অতিথিরাও ঐ একই কথা বলে। লেবাননের খ্রীষ্টানদের মধ্যে কেউ মারা গেলে পোলাও জাতীয় ভাত রান্না করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে যাজকদের এই অন্ন দেওয়া হয়। এই খাদ্য গ্রহণ করতে করতে অতিথিরা বলে, যার জন্য খাচ্ছি ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন। শোকগৃহে আহারের সময়ও একই রীতি অনুসরণ করা হয়।

অন্ত্যেষ্টি-উৎসব ও নৃত্য : দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক অংশেই আদিবাসীদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে এক ধরনের নাচ ও কোন কিছুর অনুকরণে অভিনয়রূপ উৎসব হয়। কোথাও কোথাও বা যুদ্ধের অনুকরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য কি, এটা আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ কারো কাছেই তেমন করে স্পষ্ট নয়।

তাদের অনুমান, এটা করা হয় প্রেতাত্মাকে তাড়াবার জন্য বা তাকে আনন্দ দেবার জন্য। তবে আধুনিক কালে এই প্রথা প্রায় উঠেই গেছে। যারা এই নৃত্য বা

১ Codrington 282.

২ Journal of the African Folk Lore, ix, 16.

৩ Zvv, iii, 152.

অভিনয় করত তারাও এর মূল কারণ কি তা বলতে পারছে না। ফলে এটা একটা হেঁয়ালী হয়ে আছে।

সুদানের বোঙ্গোদের মধ্যে দেখা যায়, কবরের উপর পাথরের স্তূপ তৈরি করা হয়েছে। তার উপর বেশ কিছু বাঁশ জাতীয় দণ্ডও পুঁতে দিয়েছে। এর উপর কতকগুলি চিহ্নও খোদাই করা থাকে। কেন যে এমন করা হয়, বর্তমানে অতীত ঐতিহ্যের রেশ টেনে যাঁরা এটা করে থাকে তাঁরাও এর অর্থ জানে না। প্রথা আছে তাই করে যায়।[১] কবর খোঁড়ার সময় গ্রামের সকল লোকেই অংশ নেয়। কবর তৈরি করার পর পাথরের স্তুপের উপর যখন দণ্ডগুলি পোঁতা হয়, তখন একে একে সবাই দণ্ডগুলি লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। তীরগুলি যেখানে লাগে সেখানেই তাদের রেখে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতে যানাদি বলে একটি জাত আছে। তারা কেউ মারা গেলে ষোল দিনের দিন বা তারও পরে এক ধরনের অনুষ্ঠান করে। এর নাম—পেড্ডাডিনাযু। এক মুঠো কাদা নিয়ে তার একদিক একটু ছুঁচলো করা হয়। এরা একে মৃতের আত্মা বলে মনে করে। একটি বেদীর উপর এই কাদামাটির জিনিসটি বসিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র এর সামনে খাবার দেয়। তার পর প্রদীপ ও ধুনো জ্বালে। এর পর সবসুদ্ধ একটি পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মৃত ব্যক্তির একটি মাটির প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাকে উত্তরমুখি করে বসানো হয়। তার মূর্তিটিকে শিকাই নামে এক ধরনের ফলের রসে সিক্ত করা হয়। এর উপর দেওয়া হয় কিছু গুঁড়ো লাল রঙ। কীলকাকৃতি সেই মাটির ঢেলাটি মূর্তিটির মাথায় বসানো হয়। এরা চারটি ভাতের ডেলা মূর্তিটির হাত ও পায়ের কাছে রেখে দেয়। আর রাখা হয় পান ও পয়সা। মৃতের পুত্র এই মূর্তিটিকে প্রণাম করে। পুত্রপৌত্রেরা তারপর মূর্তিটি ও পুকুরের মাঝ বরাবর পেছনে হাত পেতে লাইন দিয়ে বসে পড়ে। এর পর ধীরে ধীরে মূর্তিটিকে জলের কাছে এনে ফেলে দেওয়া হয়। জলে মূর্তিটি গলে যায়।[২]

বোঙ্গো-যানাদিদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় উভয়েরই লক্ষ্য প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়া।

সিউক্স (Sioux) বলে একটি জাত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে খেজুরের বিচি নিয়ে ভূতের খেলা খেলে। এতে ধরে নেওয়া হয় মৃতের প্রেতাত্মাও একজন অংশীদার। তার প্রভাবকে ছোট ছোট কতগুলি জিনিসের স্তুপে ভাগ করা হয়। একজন লোককে ভূত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই নানা জিনিসের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত ভূত-পুরুষটি বাকি সকলের সঙ্গে খেলা করে। মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, পুরুষরাই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মহিলা হলে মহিলাই ভূত সাজে।[৩] এই খেলার সঙ্গে

১ FL. ix, 8.

২ Heart of Africa, London, 1874, i. 304.

৩ Thurston vii, 428.

হাঙ্গেরির বুলগেরিয়ানদের সামান্য মিল আছে। এরা এখন আর মৃতদেহ নিয়ে ততটা নিশিযাপন করে না। তাস খেলেও রাত কাটায় না। এই রাত্রি জাগরণ ও খেলা খেলে আগে বোঝবার চেষ্টা হত যে, মৃতের ভাগ্যে কি ঘটেছে বা জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তার মনোভাব কিরূপ।[১] আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণেও মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে এক ধরনের কানামাছি খেলা ও অন্যান্য নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ছিল। তিন চারটি তরুণ মুখে কালি মেখে লাঠি নিয়ে খেলত। মৃতের চারপাশে এই উৎসব হত। তা দেখেই মনে হয়, শুধুমাত্র বিষণ্ন মনকে একটু চাঙ্গা করে তোলার জন্যই যে এমন করা হত তা নয়। মনে হয় মুখোশধারী বা মুখে রঙ করিয়ে লোকেরা অতীন্দ্রিয় কোন শক্তির ভূত বা শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।[২] বর্বরেরা এক্ষেত্রে মুখোশ, ভূত বা শয়তানের প্রতিমূর্তিই ধারণ করে। এ ধরনের নর্তককে বর্বরেরা মনে করত, নৃত্যকালে সত্যি সত্যিই সে ভূত বা অতীন্দ্রিয় অন্য কোন শক্তিতে পরিণত হয়। মৃত্যু-নৃত্যে এ ধরনের কৃত্রিম একটা মুখোশ সর্বত্রই লোকে পরত।

টোরেস প্রণালীর পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা মৃত ব্যক্তির অনুকরণে ভূতের নৃত্য করে। এটা করা হয় আত্মীয়-স্বজনদের বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, প্রেতাত্মা জীবিত আছে—এবং অভিনয়কারীর প্রেতাত্মারূপের মধ্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে এসেছে। স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও সে যে বেঁচে আছে এ জেনে আত্মীয়-স্বজনেরা আনন্দ পায়। এই জন্য এই উৎসবে ক্লাউনজাতীয় এক ব্যক্তি অপরের নৃত্যের এমন অভিনয় করে, যাতে হাসির উদ্রেক হয়। এর উদ্দেশ্যেও হল আনন্দ বর্ধন করা। তবে সব বর্বরদের মধ্যেই এই নৃত্য যে আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই করা হয় তা নয়। বাটকদের মধ্যে একমাত্র গুরুই এই নৃত্য করেন। এই গুরু হলেন মহিলা। তার নৃত্যের উদ্দেশ্য হল মৃতের প্রেতাত্মার হাত থেকে জীবিতদের রক্ষা করা। মৃতদেহ কবর দেবার আগে এবং পরে দুবারই সে নাচে। মৃতদেহ কবর দেবার পর সে লাঠি নিয়ে পাহারা দেয়। পাহারা দেয় ভূত তাড়াবার জন্য নয় জীবিতদের দূরে রাখার জন্য, যাতে তাদের মধ্যে কেউ কবরে বা পরলোকে অর্থাৎ মৃতের জগতে না যায়।[৩]

আবিসিনিয়ার বেনিয়ামেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের আদিবাসী জীবনের অনেক কিছুই সঙ্গে রেখে দিয়েছে। এই জন্য এখানে মহিলারা সমাজে আজও বেশি সম্মান পায়, তাছাড়া তাদের পবিত্র বলেও ধরা হয়। মৃতের চারদিকে শুধুমাত্র তাদেরই নৃত্য করতে দেওয়া হয়। মৃতের যদি কোন বোন থাকে তবে সে পুরুষের পোশাক পরে তলোয়ারের লড়াই দেখায়। হাতে ঢালও থাকে। মৃতের উদ্দেশে প্রশংসাসূচক গান শোনানো হয়।[৪] মহিলারা এক ধরনের অভিনয় করে মৃতের আত্মাকে তুষ্ট করার

---

১ IRBEW, 1975
২ Globus xc 140
৩ Croker Researches 170.
৪ ARW vii, 503

জন্য, যাতে সে খুশি হয়ে জীবিতদের কোন ক্ষতি না করে। ডামারাসরা কবরের উপর আগে পেছনে ছোটাছুটি করে নৃত্য করে। এর উদ্দেশ্যও ভুত তাড়ানো।

নাইজার অঞ্চলের ইবুজোদের মধ্যে কোন গোষ্ঠীপ্রধান মারা গেলে 'কোয়াওটা' নামে এক ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়। এর অর্থ ধনুক বাঁকানো। যুবকেরা লেংটি ও বাঁদরের চামড়ার টুপি পরে শহরে দ্রুত চক্কর দেয়। এই চক্কর দেবার সময় ঢাল তরোয়াল বর্শা ইত্যাদি নিয়ে যেন যুদ্ধযাত্রায় বেরুচ্ছে এমন অভিনয় করে। এই সময় তারা ভয়াবহভাবে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে। সারি বেঁধে এগুবার সময় তারা মাথার উপর এক ধরনের বাঁকা তরোয়াল ঘুরিয়ে থাকে। তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি লেগে রীতিমত ঝঙ্কার ওঠে। এই ঠোকাঠুকির শব্দ দূর থেকেও শোনা যায়। মাঝে মাঝেই তারা ঢালের উপর তরোয়াল ঠুকে ডাইনে বাঁয়ে লাফাতে থাকে। উদ্দেশ্য হল, তাদের সামনে যে দুষ্ট প্রেতাত্মা রয়েছে তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।[১]

ভিন্ন ধরনের নৃত্যও আছে যেখানে ভাঁড়ামিটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। প্যারাগুয়ের চাকোদের মধ্যে কোন মহিলার সন্তান মারা গেলে ঘরের চারদিকে বৃত্তাকারে আগুন ধরিয়ে সেখানে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় সেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। যুবকেরা ফড়িং জাতীয় পতঙ্গের পোশাক পরে এবং চারদিকে এমনভাবে ছোটাছুটি করে যে, হাসির উদ্রেক হয়।[২] কেন এরকম করা হয় যারা তা করে তারাও তা বলতে পারে না। অনেক অশ্লীল লিঙ্গ-নৃত্য পর্যন্ত করা হয়। ঊনবিংশ শতকের নবম দশকে একজন লোঙ্গো রাজার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এ ধরনের নৃত্যের ইতিহাস পাওয়া গেছে। যারা এ ধরনের নৃত্য করত তারা পাখির পালকের পোশাক ও অগ্রভোঁতা দীর্ঘচঞ্চু এক ধরনের পাখির মুখোশ পরত। নানা অনুষ্ঠানে যাপ (Yap) দ্বীপে অনুরূপ নৃত্য হয়ে থাকে।[৩] আরু দ্বীপে এই নৃত্য হত শোক শেষ হলে। এই নৃত্য দ্বারা তারা বোঝাবার চেষ্টা করত যে এবার সে বিয়ে করতে পারে। শুধু তাই নয় বিয়ে করার জন্য তাকে উৎসাহও দিত।[৪]

বাউবো পুরাণ-কাহিনীতে আছে যে, ডেমেটার যখন কোরেকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান তখন এই ধরনের নৃত্য করা হয়েছিল। সম্ভবত আফ্রিকায় বা অনেক বর্বরদের মধ্যে অদ্যাবধি এ-ধরনের যে নৃত্য দেখা যায়, সেটি প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। গ্রীকরা এ-ধরনের নৃত্য করত, মৃত্যু, দুরাত্মা এবং শোক বিতাড়নের জন্য। এ-ধরনের নৃত্য এক ধরনের রক্ষাকবচের কাজ করত বলেও তাদের বিশ্বাস। নবজন্মের প্রতীকও ছিল এই নৃত্য। এ নৃত্য যে সুখের স্মৃতি নিয়ে আসত, বা দুঃখ-চিন্তার অবসান

---

১. Munzinger, 327

২. Anthropologies, ii, 105

৩. Grubb-45

৪. Globus Ixxx, 1904, 316.

ঘটাতো বলেই করা হত, তা নয়। আসলে এর পেছনে ছিল এক ধরনের জাদুক্রিয়া, যার দ্বারা মৃত্যু ও দুষ্টশক্তিকে জয় করা যায় বলে বিশ্বাস। পরে অবশ্য ক্লাউন জাতীয় নৃত্যে আনন্দ দিয়ে দুঃখ দূর করার প্রয়াসও করা হত। মৃত্যুকে দূরে রাখাও এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের মধ্যে অশ্লীল লিঙ্গনৃত্যের পরিবর্তে পরে শুধু এই কমিক জাতীয় নৃত্যই হত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাও চলে যায়। এখন এর একটা ক্ষীণধারা মাত্র বর্তমান আছে।

মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ : মৃত্যু কিভাবে অশৌচ তৈরি করে দেখা গেছে। জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের উপর মৃত্যু কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। অনুন্নত সংস্কৃতিতে দেখা যায়, কোন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজন সমবেত হচ্ছে। তবে মৃত্যুর অশৌচ মূলত স্পর্শ করত আত্মীয়-স্বজনদের, বিশেষ করে বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীককে। অশৌচ কতদিন হবে তা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা আছে। কয়েকদিন থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারো কারো ক্ষেত্রে এই শোকপ্রকাশ চলে থাকে।

নিউগিনির কাছে টোর্স্টদ্বীপে সমগ্র বসতি অঞ্চলই অশৌচের আওতায় পড়ে। এই সময় এরা একটি বিশেষ কুঞ্জে নীরবে বৃত্তাকারে ঘোরাফেরা করে। মঙ্গাঞ্জাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের খুব সংযমের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অউরোরা দ্বীপে কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে তার পত্নী ও পিতা-মাতা একশ দিনের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। মহিলাদের উপর বিধিনিষেধ অত্যন্ত কঠোর। তারা একেবারেই ঘরের বাইরে যেতে পারে না। কাউকে এই সময় তাদের মুখ দেখানো বারণ। তাদের ঘরের মধ্যে মাদুর মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়। এই মাদুরের প্রান্তদেশ মাটি ছুঁয়ে থাকে। তবে এই সময়ও সকাল সন্ধ্যায় মাদুর মুড়ি দিয়ে কবরে গিয়ে তাঁদের কাঁদতে হয়। শোকার্তরা বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে পারে না, যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাছমাংস বারণ। এমন অনেকে আছে যাদের ক্ষেত্রে শস্য জাতীয় জিনিস বারণ। বনের ফলমূল খেয়ে তাদের কাটাতে হয়। এই সময় গলায় এক ধরনের পাকানো সুতো পরতে হয় (হিন্দুদের গুরুদশার সুতোর মত)।

নিকোবর দ্বীপে দেখা যায় শোক আরম্ভ হয় কবরের কাছে ভোজনের সময় থেকে। দু ধরনের শোক পালন করতে হয়—কম ও বেশি। কম অশৌচে আত্মীয়-স্বজনেরা তিন মাস পর্যন্ত আনন্দ উৎসব বন্ধ করে থাকে। মৃতের গৃহে গেলে বিশেষ কিছু খাবার তারা খেতে পারে না। বড় ধরনের শোক শুধু পরিবারের লোকদেরই পালন করতে হয়। এই সময় তারা বিশেষ বিশেষ কিছু খাদ্য, ধূমপান, পান খাওয়া, সব বাদ দেয়। আত্মীয়দের একটু দীর্ঘদিন এই শোক পালন করতে হয়। প্রাচীনকালে হুরোনরা এইভাবে দু-ধরনের অশৌচ পালন করত। শোক পালনের সব চাইতে বেশি সময় ছিল দশ দিন (ভারতের ব্রাহ্মণদের এগার দিনের মত)। এই সময় শোকার্তরা

মাটিতে মাদুর পেতে শুতো (এরই ধারা টেনে আজও হিন্দুরা কুশের আসন ব্যবহার করে থাকে)। কথাও কম বলত। শোবার সময় চুল মাটির দিকে রাখতে হত। ঘরের বাইরে শুধু রাত্রিবেলাই যেতে পারত। শীতের দিন হলেও নিজেরা কোন উত্তাপের সাহায্য নিতে পারত না। গরম খাবার খাওয়াও বারণ ছিল। শোকের চিহ্নস্বরূপ মাথার পেছন থেকে একগুচ্ছ চুল কেটে ফেলত। এরপর কম শোকের পালা চলত। এই শোক চলত এক বছর ধরে। এই সময় লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা গেলেও কাউকে প্রণাম করা বা কারো প্রণাম নেওয়া চলত না। মেয়েরা এসব করতেই পারত না। তবে ছেলে-মেয়েদের বাইরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি দিত। এক বছরের মধ্যে বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী কেউ বিবাহও করতে পারত না।[১]

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বীভৎস ও ভয়াবহ অশৌচ পালনের ইতিহাসও আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আরাওয়াকরা কোন পুরুষমানুষ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীর নিকট-আত্মীয়েরা তার মাথার চুল ছোট করে কেটে দিত। বিধবাটি তার কাপড় খুলে ফেলত। কয়েকমাস পরে পান-উৎসব হত। এতে গ্রামের প্রত্যেক লোকই অংশ গ্রহণ করত। এক ধরনের লতার বেত দিয়ে তারা একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে চাবুক কষতো, চাবুক কষতো এমন করে যে, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। অনেকে এ সময় মারাও যেত।[২] চাররুয়াদের মধ্যে নিয়ম ছিল, কোন পুরুষ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ও বিবাহিতা কন্যারা তাদের আঙুলের একটি গিট কেটে ফেলত। বিবাহিতা ভগ্নীরাও এই কাজ করত। এ ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অংশ নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করত। দু মাস তারা নিজেদের ঘরে একা একা কাটাতো। এ সময় তারা উপোস থাকত ও কান্নাকাটি করত। তবে কোন স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে সেজন্য কান্নাকাটি করতে হত না। শিশুসন্তান মারা গেলে পিতাও সেজন্য কিছু করত না। কিন্তু পিতা-মাতা মারা গেলে বয়স্ক সন্তানেরা দুদিন যাবৎ নিজেদের ঘরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকত। এ দুদিন প্রায় না খেয়েই থাকত তারা। এরপর শরীরে প্রচণ্ড রকম ক্ষতচিহ্ন করে তারা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো। এখানে পূর্বেই একটি গর্ত খুঁড়ে রাখা হত। সেই গর্তের কাছে বুক রেখে শুয়ে শুয়ে তারা বিশ্রাম নিত। এই গর্তের উপর তারা নিজেদের হাতে কুঁড়েঘর তৈরী করে তাতে দুদিন নির্জলা উপবাসে কাটাতো। তৃতীয় দিন বন্ধুবান্ধবেরা খাবার এনে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে একটিও কথা না বলে চলে যেত। এভাবে দশ-বার দিন কাটার পর তারা গ্রামে ফিরে আসতে পারত।[৩]

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে শোক বা অশৌচ পালন মূলত মহিলাদেরই

১ Riedel, 268.
২ 5 R B E W, iii.
৩ Int, Auch. xiii, 77, 71.

করতে হত। গায়ানাতে অশৌচ পালনের জন্য পুরুষ মহিলা সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে বাস করত। মহিলারা দিনের বেলা সম্পূর্ণ আড়ালে থাকত। খুব ভোরে ও সন্ধ্যাবেলায় কবরে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করত। মুবোয়াস ও কায়কুরুদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, পরিবারের কোন ব্যক্তি মারা গেলে ক্রীতদাস ও মহিলারা চার মাস কথা বলতে পারত না। মুবোয়াসরা এ-সময় শুধু নিরামিষ খেতে পেত। ভৃত্যেরা প্রায় অনাহারেই থাকত।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারামুঙ্গা মহিলারা অশৌচের সময় একে অপরের সঙ্গে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করত। এরা একে অপরের মাথার চামড়া কেটে দিত। ঘটনাটা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই বেশি করে ঘটত। কেউ কেউ নিজেদের মাথা জাম-গাছের লাঠি দিয়ে আঘাত করে নিজেরাই ফাটিয়ে দিত। সদ্য বিধবা মহিলা গরম লোহা দিয়ে নিজেদের দেহের নানা স্থান ক্ষতবিক্ষত করত। মৃতের বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন, শাশুড়ী সবাইকে নীরবতা পালন করে চলতে হত। এক বা দু-বছর পরে শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত তারা এই নিয়মের বাইরে যেতে পারত না।

টোগোল্যান্ডের অধিবাসীরা ছমাস অশৌচ পালন করত। কারণ তারা মনে করত যে, পরলোকে মৃতদের মধ্যে গিয়ে পড়তে জীবাত্মার ছ'মাস সময় লাগে। মৃতকে ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হত। প্রায় ছ সপ্তাহ তার বিধবা পত্নীকে সেই ঘরেই আত্মগোপন করে থাকতে হত। শুধু বেরোতে পারত স্নানাদি কার্যের সময়। বেরুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বেরুতে হত। এ-সময় তাদের চলতে হত মাথা নিচু করে। বাহু দিয়ে বুক ঢেকে রাখতে হত। এটা করা হত এই কারণে, মৃতের প্রেতাত্মা যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। তার কাছে সব চাইতে ভয়াবহ ছিল মৃত ব্যক্তি। মৃতের পেতাত্মাকে তাড়াবার জন্য তাকে এক ধরনের গদা হাতে রাখতে হত। এটা করত প্রেতাত্মা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলে। কারণ, এরকম সম্পর্কের অর্থই ছিল মৃত্যু। নিরাপত্তার জন্য সে ঘুমোতোও গদার উপর। কেউ ডাকলে সে সাড়া দিত না। আমিষ জাতীয় খাদ্য ছিল নিষিদ্ধ। যে খাদ্য ও পানীয় তাকে দেওয়া হত তার সঙ্গে ছাই মিশিয়ে তবে সে খেত। কারণ, তা না হলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কাঠকয়লার আগুনে এক ধরনের ভেষজ ধূপ ও শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে ভূতপ্রেতের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করত। এতে যে গন্ধ বেরুতো ভূতেরা তা সহ্য করতে পারে না বলে বিশ্বাস রয়েছে। কোন মহিলা মারা গেলে তার স্বামীকেও অনুরূপ শোক পালন করতে হত, তবে তার সময় ছিল অত্যন্ত কম—সাত দিন অথবা আট দিন। আগুই নামক স্থানে নিয়ম ছিল মৃতের বিধবা পত্নীকে ছয় মাসের আগে তার অশৌচ গৃহ থেকে বের করা হত না। এর পরেও নানা ধরনের শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করে তবে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনের ধারার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারত।[১]

১ Int. Arch. xiii, Suppl. 70.

ইউহিদের মধ্যে পরিবারের প্রাচীনতম ব্যক্তিকে পাঁচ থেকে সাত মাস পর্যন্ত অশৌচ পালন করতে হয়। অবশ্য কারো ক্ষেত্রে এই অশৌচ এক থেকে তিন মাস পালন করলেও চলে। তবে সর্বসাকুল্যে এই অশৌচ এক বছরের বেশি যায় না। তথাপি কোন স্ত্রী বা স্বামী যদি মনে করে যে আরো অশৌচ পালন করবে, তবে আর এক বছর পর্যন্ত সে তা পালন করতে পারে। বিধবাদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের বিধি অত্যন্ত কঠোর। যে মাদুরে কবর দেওয়া অবধি তার স্বামী শায়িত ছিল সেই মাদুরে তাকে শয়ন করতে হত। তাকে থাকতে হত ঘরের অন্ধকার কোণে। কোন আসনের পরিবর্তে পাথরের উপর তাকে বসতে হত। যে কাপড়ে মৃতকে কবর দেওয়া হত, তাকে সেই ধরনের কাপড় পরতে হত। দুপুর বা সন্ধ্যায় অন্য কোন কাপড় সে পরতে পারত না। এ-সময় কারো সঙ্গে কথা বলা বা গ্রামের প্রধান সড়ক দিয়ে হাঁটা তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অধিকাংশ সময়ই তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে হত। বাইরে যাবার সময় বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরতে হত তাকে। কোন কিছু বিক্রি করতে হলে দাম-দস্তুর করা চলত না। এসময়ের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য কোন জিনিস তার হাতে থাকলে অশৌচ শেষ হলেও তার কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতো না। অশৌচের রীতিনীতি যথার্থ পালিত না হলে বিধবারা পাগল হয়ে যাবে এটাই ছিল বিশ্বাস।

ইউরোপে অদ্যাবধি মৃত্যু হলে অশৌচ পালনের রীতি আছে। প্রাচীন রোমানরা মনে করত[১] যে, মৃতদেহ স্পর্শ করলে দেহ অশুদ্ধ হয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও ঘরবাড়ি সবই অশুচি হয়ে যায়। এজন্য শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

অদ্যাবধি দক্ষিণ ইটালীতে মৃত্যু অশৌচের কারণ হলেও এমন অশুচি নয় যে, বন্ধুবান্ধবেরা সমবেদনা জানাতে মৃতের গৃহে যেতে পারবে না। মৃতের পরিবারের লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা জানায় মাটিতে বসে। কয়েকদিন পরিবারে আগুন জ্বালানো চলে না। বন্ধুবান্ধবেরা এই সময় খাবার সরবরাহ করে। তবে মৃতের গৃহে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। পুরুষেরা এক মাস ক্ষৌরকর্ম করে না। মাল্টাতে মৃতের গৃহে তিন দিন আলো জ্বলে না। এ সময় বন্ধুবান্ধবেরা খাবার পাঠায়। মাটিতে জোড়াসনে বসে শোকার্তরা আহার্য গ্রহণ করে। সাধারণ আসবাবপত্রও ব্যবহার করা চলে না। মেয়েদের চল্লিশ দিন অশৌচ পালন করতে হয়। তবে সাতদিন পরে ক্ষৌরকর্ম সেরে পুরুষেরা বাইরে যেতে পারে।

প্রাচীন এথেন্সে নিয়ম ছিল যে, মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও শ্মশানযাত্রী সবাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অশুচি হয়ে যায়। অশৌচের সময় বাইরের কোন লোক মৃতের গৃহে প্রবেশ করতে পারত না, স্ত্রীলোকরা তো একেবারেই নয়।[১]

বর্তমান গ্রীসে এ ধরনের অশৌচ পালন না করা হলেও এর একটা ক্ষীণ ধারা প্রবহমান রয়েছে। যেমন মৃত্যুর পর ঘরদোর তিনদিন ধোয়ামোছা হয় না। যে ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া হয় তা তাড়িঘাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। ক্ষৌরকর্মও বন্ধ থাকে।

১ Globus lxxii[22], lxxx-190.

এসময় অতিথি আপ্যায়নে মিষ্টি দেওয়া হয় না। মইনাতে পরিবারের কেউ মারা গেলে সদস্যেরা নিজের নখ দিয়ে মুখে আঁচড় কাটে। মহিলারা মাথার একগুচ্ছ চুল কেটে কবরে ছুঁড়ে দেয়। উত্তর গ্রীসে মহিলারা সাদা পোশাক পরে। মাথায় কোন টুপি পরে না। কেশবিন্যাসও বাদ দেয়। বুলগেরিয়াতে কবর থেকে ফিরে এসে এবং শব সংক্রান্ত খাবার তৈরি হবার পূর্বে কফিন তৈরি করার জন্য যে সব কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটা করা হয় পরিবারে কোন রোগের বীজাণু থাকলে তা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। একে বলা যায় এক ধরনের দূষণ-মুক্তি অনুষ্ঠান। চল্লিশ দিন লোকে ক্ষৌরকর্ম করে না। মহিলারা এ-সময় চুলে তেল মাখে না বা হোরো নৃত্যে একবছর অংশ নেয় না। সমাধি দেবার পূর্বে এবং পরের দিন পরিবারে কোন কাজ হয় না। হয় না এই কারণে যে, তারা মনে করে এতে হাতে ঘা হয়ে যাবে।

জার্মানীতে নিয়ম আছে, কবর দেবার আগে ঘর থেকে বাইরে কিছু যাবে না। অর্থাৎ কাউকে কিছু দেওয়া হবে না। শুধু অত্যন্ত জরুরী কাজই করা হবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বেশ কয়দিন ঘরে কোন ধোয়ামোছা হয় না। রবিবার শোকবস্ত্র পরিবর্তন করা যায় না। ইয়র্কশায়ারের নর্থ রাইডিং-এ মৃত্যুর মুহূর্তে ঘরে কোন আগুন জ্বলতে থাকলে তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তিকে ঘরের বাইরে না নেওয়া পর্যন্ত গৃহে আর আগুন জ্বালানো হয় না। স্কটল্যান্ডে কিন্তু উল্টো ঘটনা ঘটে। সেখানে এইসময় ঘরে আগুন বা আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়।

অশৌচের পোশাক: পৃথিবীর সর্বত্রই অশৌচের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবস্থা আছে। প্রথমত এটা করা হয় লোকেরা যে অশৌচের মধ্যে রয়েছে এটা বোঝানোর জন্য। ফলে সাধারণত যে ধরনের পোশাক পরা হয় অশৌচের সময় ঠিক তার উল্টো পোশাক পরা হয়ে থাকে। যারা বড় বড় চুল রাখে তারা এসময় চুল কেটে ফেলে। অথবা সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে যায়। যারা প্রসাধন করত তারা প্রসাধন বাদ দেয়। যারা চুলে বেণী পাকাত তারা বেণী খুলে ফেলে এবং কেশবিন্যাস বন্ধ রাখে। যারা পোশাক পরত তারা হয় নগ্ন হয়ে চলে, নয়তো পুরানো বা মোটা পোশাক পরে। এ সময় অলংকার পরা হয় না, বা ঢেকে রাখা হয়। যারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে ভালবাসে তারা এ সময় কেউ বা কালো, কেউ বা সাদা পোশাক পরে। শব-মিছিলে যাবার সময় আইনুরা তাদের কোট পরে উল্টো করে।[১] বাঙ্গালাতে শোক প্রকাশ করার জন্য পুরুষেরা অনেক সময় মহিলাদের পোশাক পরে।[২] আবার যারা মাথায় টুপি বা উষ্ণীষ পরে তারা মাথা খালি রাখে। মহিলারা ঘোমটার আড়ালে তাদের ঢেকে রাখে এবং প্রায়শই বাড়িতেই থাকে। সম্ভবত এর দ্বারা অশৌচের সংক্রামতাকেই বোঝানোর চেষ্টা চলে। তবে অশৌচের পোশাক পরা হয় মূলত মৃত

১ Seebohm, Greek Tribal Society, Lond. 185, p. 79.

২ Batchelor, 106.

ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যেই। এই শোক প্রকাশ করা হয় নিন্দা এড়ানোর জন্য, বা মৃতের আত্মার ক্রোধ এড়ানোর জন্য। তবে যথার্থই কেন এমন করা হয় কেউ তা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে নানা ধরনের শোকপ্রকাশ বা অশৌচ প্রকাশের রীতি দেখে মনে হয় আত্মরক্ষার তাগিদও অশৌচ পালনের পেছনে কাজ করে। এইজন্য দেখা যায় যে, চাররুয়ারা অশৌচ পালনের সময় হাতে একটি লাঠি রাখে। ইউহি বিধবারা কাছে রাখে গদা। কেউ বা রাখে আগুন, আলো, সুগন্ধি, দুর্গন্ধ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে অশৌচ পালনের নামে প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধই যেন ঘোষণা করা হয়। তবে এ ব্যাপারে মানুষের চিন্তা এত বিচিত্র ধরনের যে, অনুমান করা কষ্ট, কেন এই ছদ্মবেশ।

অশৌচ পালনের সময়সীমা ঃ মৃত্যু যে শুধু একটি পরিবারের কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে আঘাতস্বরূপ তা নয়, বন্ধু-বান্ধব এবং সকলের কাছেই আঘাতস্বরূপ। একটি ব্যক্তির মৃত্যুতে যে শূন্যতা তৈরী হয় তা পূরণ করতে বেশ সময় লাগে। অনেকে স্থূল দেহের মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে করে না। তার আত্মা তখনও তাদের মধ্যে বাস করছে এরকম বিশ্বাস করে। অবশ্য তার কার্যকলাপের ধারা বোঝা অসাধ্য। প্রথম প্রথম লোকে ভয় পায়। তারা ভাবে. সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য মৃতের আত্মারা রীতিমত ক্ষুব্ধ। ফলে যে-কোন সময় ক্ষতি করতে পারে। যারা জীবিত থাকে তাদের প্রথম চেষ্টা হয তাকে খুশি করা এবং ধীবে ধীরে তার যে যথার্থ স্থান অর্থাৎ মৃতের জগৎ সেখানে যেতে সাহায্য করা। এবং সেখানে যাতে সহজে সে যেতে পারে এবং ভালভাবে গৃহীত হয় সেই ব্যবস্থা করা। সেই প্রেতলোকে বা পরলোকে তার পূর্বপুরুষেরা বাস করছে এরকম বিশ্বাস প্রায় সবারই আছে। তবে সেই প্রেতলোক বা পরলোকে মুহূর্তের মধ্যে যাওয়া যায় না। অথচ সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত সে শান্তিও পায় না। ফলে যে-কোন মুহূর্তে জীবিত উত্তরাধিকারীদের সে দেখা দিতে পারে। তখন সে বেশির ভাগ সময়ই আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘুরঘুর করে। সুতরাং পরিবার ও সমাজের উপর মৃত্যু-দূষণভীতি থেকেই যায়। কতদিন সে এই ঘুরঘুর করবে তা নির্ভর করে, কতদিন সে আত্মীয়দের সঙ্গে ছিল তার উপর অথবা মৃত্যুর পর পরলোকে যাবার জন্যে যতটা সময়ের দরকার তার কতটুকু অতিক্রান্ত হয়েছে তার উপর। সুতরাং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা পরিবারের ক্ষেত্রে অশৌচ প্রালনের সময় এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন তথ্য পেশ করা কষ্টকর। কারণ পৃথিবীর সকল জাতির হিসাবই তো আর পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে এব্যাপারে একটা অনুমান করা যেতে পারে মাত্র ঃ—বাবর দ্বীপপুঞ্জে শোক পালনের সময় ১৫ দিন। প্যারাগুয়ের লেঙ্গুয়াদের মধ্যে নিয়ম আছে, কেউ মারা গেলেই মাথা ন্যাড়া করে ফেলে। চুল আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে তবেই তাদের অশৌচ পালনের সময় শেষ। আমেরিকার মুসকুয়াকিদের ক্ষেত্রে পালনের সময় ত্রিশ দিন।

ত্রিশ দিন শেষ হলে তারা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিয়ে নতুন পোশাক পরে। তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত ভোজ শেষ হয়। এই ভোজসভায় এমন একজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যাকে বলা যায় ভুতের বাহক (আমাদের দেশের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ)। তার মধ্য দিয়ে প্রেতাত্মাকে ডাকা হয়। সূর্যাস্তকালে কিছুসংখ্যক তরুণকে নিয়ে সে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায়। এরা বিশ্বাস করে যে, এই ব্যক্তি প্রেতাত্মাকে সুখকর শিকারক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। (সম্ভবত একাজ করা হয় সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় বলে। অর্থাৎ পশ্চিমে সূর্যের মৃত্যু হয় এই বিশ্বাস থেকে পশ্চিম দিককেই তারা মৃত্যুলোক বলে কল্পনা করে থাকে)। লোকটি ফিরে এলে যে ব্যক্তি মারা গেছে সেই নামে তাকে ডাকা হয়।[১] নিউ হেব্রাইডেস-এ অশৌচ পালন করা হয় একশ দিন ধরে। আইভরি-কোস্টের বাউলেদের অগ্নি সম্প্রদায় মনে করে যে, অশৌচ পালন করতে হয় এক বছর। তবে প্রায়শই ছয় মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত এই সময় কমিয়ে আনা হয়। তবে বিধবাদের ক্ষেত্রে কোন রেহাই নেই। তাদের পূর্ণ এক বছর অশৌচ পালন করতে হয়। পারলৌকিক ক্রিয়া এই সময়ের মধ্যে চলতে থাকলেও মৃতের কবর দেওয়া দু-এক বছর পিছিয়ে যেতে পারে।[১] কোরিয়াতে কে কতদিন শোক পালন করবে তা নির্ভর করবে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক কার কতটা নিকট ছিল তার উপর। পিতা, মাতা, স্বামী, ধর্মপিতা, প্রথম সন্তান এদের জন্য অশৌচ পালনের সময় সাতাশ মাস। তবে সাধারণ নিয়ম মত তিন বছর এই অশৌচ পালন করতে হয়। তবে আত্মীয়দের মধ্যে উনিশ বছরের কম যাদের বয়স তাদের জন্য এই সময় তিন মাস মাত্র। ইউহিরা মৃতের জন্য আট মাস অশৌচ পালন করে। অশৌচ শেষ হলে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উদ্বৃত্ত অংশ ফেলে দেওয়া হয়। এর পরই শোক পালন শেষ হয় এই কথা বলে 'মৃতকে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।' অর্থাৎ যারা আগে মারা গেছে সেই তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডয়াকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনেরা তিন অথবা সাত দিনের জন্য অশৌচ পালন করে। লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা ও খাবার-দাবারের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। সমগ্র পরিবারটিই অর্থাৎ গৃহই অশৌচের পর্যায়ে পড়ে। অশৌচ শেষে মুরগি মেরে ঘরে ঢোকার দরজায় রক্ত দেওয়া হয়। এর পরই অশৌচ কেটে গেল বলে ধরা হয়। আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে অশৌচের সময় সাত দিন হলেও নিকটজন যেমন, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশি। এরা অশৌচ থেকে মুক্তি পায় না। এই সময় আত্মা মৃতের জগতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। অশৌচ পালনের সময় এরা বিশেষ ধরনের শোকের পোশাক পরে। এসময় এদের মধ্যে বিপত্নীক বা বিধবা কেউ আর বিবাহ করতে পারে না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিওয়া (অশৌচ থেকে মুক্তি) করার ব্যবস্থা হয়।[২]

১ JAI. xxxix 453.
২ International Archives, ii, 182.

ওয়াররামুঙ্গারা যতদিন না দেহ পচে গলে হাড়গুলি বেরিয়ে পড়ে ততদিন শোক পালন করে। এসব হতে এদের প্রায় দুবছর পেরিয়ে যায়। এরপর হাড়গুলো 'অস্থায়ী অবস্থান' অর্থাৎ গাছ থেকে নামিয়ে উই বা পিঁপড়ের ঢিবি তোলা মাটিতে কবর দেওয়া হয়। তবে একটি হাড় গাছেই রেখে দেওয়া হয়। আরও একটি জিনিস রেখে দেওয়া হয়, তা হল হাতের কব্জি থেকে হাড়ের একটি টুকরো। এই হাড়ের টুকরোটি শিবিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তখন বুক চাপড়ে কান্নার রোল ওঠে। কিছু অনুষ্ঠান করার পর সেই হাড়টিকে গুঁড়ো করে মাটিতে পুঁতে উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়। এটা হবার পর জীবাত্মা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞান-শক্তির জগতে চলে যায়। এবং সেখানে থেকে পুনর্জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এর পরই অশৌচ পালন শেষ হয়।[১] দিয়েরিরা মনে করে যে, যখন কারো পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে না তখন মৃতের জীবাত্মা কবরে ঘুরে বেড়ায়। মৃতের পদচিহ্ন চোখে না পড়লে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই সময় মুখে সে যে লাল গৈরিক বা হলুদ মৃত্তিকা লেপন করে থাকে তা ধুয়ে ফেলে। এরপরে নতুন করে চর্বি ও রাঙামাটি দিয়ে এক ধরনের যৌগিক প্রসাধন তৈরি হয়। তখনই এরা আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারে।[২]

শোক প্রদর্শন না করা: দেখা যাচ্ছে অশৌচ পালনের মূল দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের উপরই বেশি পড়ে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, পুরুষদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এই পরিশ্রমের দায়িত্ব পড়ে। তবে কোন রকমেই অশৌচ হয় না এমন উদাহরণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যেমন হিন্দু সন্ন্যাসীরা এ-সব কিছু মানেন না। প্রাচীন গ্রীসের কেওস-এর লোকেরা কেউ মারা গেলে শোক-পোশাক পরত না।[৩] মোলাক্কার অনেক অধিবাসীও এমন করে থাকে।[৪] বাইরে যেখানে শোকের চিহ্ন থাকে না সেখানে কোন অশৌচ আছে বলে ধরা হয় না। সুদানের কিতা জিলাতে মৃতের জন্য কোন প্রকার শোক প্রকাশ হয় না। পুরুষ, মহিলা, কেউই শোক প্রকাশ করে না। যদি কোন স্ত্রী মারা যায় তাহলে কবর দেবার আগেই তার বোনকে বিপত্নীকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। বিপত্নীক ব্যক্তি আট দিনের মধ্যেই বিবাহ করে। কেউ কেউ বা এক মাস বা দুমাস অপেক্ষা করে। তবে বিবাহ না করলেও কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে উপপত্নী রেখে নেয়। যদি কোন পুরুষ মারা যায়, তার বিধবা স্ত্রী যখন খুশি বিয়ে করতে পারে। অবশ্য গর্ভবতী থাকলে নয়। এমত অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়।[৫]

১ Spencer—Gillen 530 ff.
২ Globus—xc vii, 1910, 57.
৩ Rohde—Psyche, i 257 n
৪ Reidel, 935
৫ Steinmetz, 156

গোলকোস্টের সেগুয়েলাতে কবর দেওয়া এবং নৃত্য একই দিনে হয়। এখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত সব কাজ শেষ হয়ে যায়। শোক বলতে যা বোঝায় এখানে তা প্রায় অনুপস্থিত।[১] উত্তর টঙকিঙের মেওদের মধ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া মাত্র তিন দিন চলে। এ সময় শোকের একমাত্র চিহ্ন এই যে, চুল খুলে রাখা হয়। চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া অন্য কোন শোকের চিহ্ন নেই। অশৌচও পালন করা হয় না। দু-একদিন কবরের উপর কিছু খাবার রাখা হয়। তার পরই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ আর কোন চিন্তা করে না।[২] তাত্ত্বিক বিচারে এর অপরিসীম মূল্য আছে। যে কারণে হিন্দুদের ক্ষেত্রে মৃতের কথা স্মরণ করা বারণ।

গৃহ ও গ্রাম শুদ্ধিকরণ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় যেন প্রেতাত্মা আর গৃহে ফিরে আসতে না পারে। সৎকার হয়ে যাবার পরও মৃতের আত্মা গৃহে থাকে অনেকেরই এরকম বিশ্বাস আছে। সুতরাং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অনুষ্ঠানাদি হয়ে যাবার পরও যেখানে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সেই স্থান শুদ্ধ করার প্রশ্ন দেখা দেয়। ভূত তাড়িয়ে এই শুদ্ধিকরণ করা হয়। শেষ শ্রাদ্ধের পরও এইজন্য তারাহিউমারেরা ভূত তাড়িয়ে থাকে। পুরুষ মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনবার ভোজ দিলেই চলে। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে চারবার ভোজ দিতে হয়, কারণ মহিলারা শ্লথগতি। তাদের যেতে বিলম্ব হয়।[৩] ভূত তাড়াবার জন্য বহু ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে চিৎকার করা হয়। প্রায়শই ভূতেরা ক্ষতিকর হলেও সহজেই তাদের প্রতারণা করা যায় বলে অনেকে মনে করে। তাছাড়া এদের বিশ্বাস এই যে, ভূতেদের স্নায়ু খুব দুর্বল হয়। একই প্রথায় শুধু মৃতের প্রেতাত্মা নয় অন্যান্য দুষ্ট আত্মাদেরও তাড়ানো যায়। ভূতদের মধ্যে সবাই সহজে বোকা বনে যেতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই কবর দেবার সময় বন্দুক ফোটানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্যই হল ভূত তাড়ানো। দক্ষিণ আমেরিকার মাকুসিরা যে ঘরে কেউ মারা যায় সেই ঘরের দরজাতেই বন্ধুক ছুঁড়ে শব্দ করে। দুষ্ট আত্মা এবং প্রেতাত্মা সকলকে তাড়াবার জন্যই এমন করা হয়।[৪] ভূত তাড়ানোর জন্য নানা কিছু করা হয়, যেমন ঢাক পিটানো, তুর্য নিনাদ করা, চিৎকার করা ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা ভূত তাড়ানোর জন্য কাঁসর পিটতো।[৫] টাইরলে (ইউরোপ) ভূত তাড়ানোর জন্য লোকে মৃত ব্যক্তির চাবির গুচ্ছ সংগ্রহ করে ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ করে। এতে নাকি ভূত গৃহের চৌহদ্দির বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর গৃহের সীমানার মধ্যে সে আর ভয়ে ভয়ে পা বাড়াতে পারে না।[৬] মৃত্যু উপলক্ষ্যে নানা ধরনের যে নৃত্যের ব্যবস্থা আছে তাও করা হয় এই ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যেই।

১ Clozel and Villamur 337
২ Lunet 318
৩ Lumholtz i, 387
৪ Int. Arch. xiii, Suppl. 88
৫ Rohdehl, Psyche, ii, 77
৬ Zingerle 57

ইউরোপের বহুস্থানে বিশেষ করে স্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়িতে কেউ মারা গেলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া-মোছা হয়। ডয়াকদের মধ্যে শেষ শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পর পুরোহিত গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী করা একটি ঝাড়ু রক্ত ও চাল ধোয়া জলে ধুইয়ে নেয়, তারপর যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদিতে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে সকলকে দূষণমুক্ত করে। তারপর পুরোহিতটি সকলকে নিয়ে নদীর দিকে যায়। তারা যাত্রা শুরু করলে কিছু ব্যক্তি বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে পিটতে থাকে। পুরোহিতটি দুর্ভাগ্যের কারণ অশুভ শক্তিগুলিকে নদীগামী লোকদের পিঠে চাপতে বলে। যেন সত্যি সত্যি কেউ তাদের পিঠে ভারি বোঝা হয়ে চেপেছে এই ভান করে লোকগুলো টলতে থাকে। নদীতে এসে ভেলার উপর তারা এই বোঝা নামিয়ে দেয়। এইভাবে দুর্ভাগ্যকে দূর করে ভেলাটিকে সমুদ্রের দিকে ভাসিয়ে দেয়। সেখানে নাকি কালো একটি জাহাজে গুটি রোগের রাজা বাস করে।[১] কলম্বিয়ার টমসন ভারতীয়দের মধ্যে কেউ শীতের সময়ে মারা গেলে তামাক ও পাইন জাতীয় গাছের পাতা ভেজানো জলে ঘর ধুইয়ে দেয়। প্রত্যেক সকালে ঘরের মেঝেতে ফারগাছের ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া নানা জায়গায় তামাক ও পাইন পাতাও বিছিয়ে রাখা হয়। তবে ঘরে যদি একাধিক মৃত্যু হয় এবং গ্রীষ্মের সময়ে কেউ মারা যায় তা হলে সে ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়।[২] প্রাচীনকালে গ্রীকেরা ঘরকে দূষণমুক্ত করার জন্য এক ধরনের বিষাক্ত উদ্ভিদ মেশানো জলে ঘরবাড়ি ও ছাগলভেড়াগুলিকে ধুইয়ে নিত।[৩] অপঘাতে মৃত্যু হলে দূষণমুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হত। ইউহিরা মনে করে যে, কেউ আত্মহত্যা করলে সারা গাঁ দূষিত হয়ে যায়। ফলে মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের বিশেষ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এ ধরনের মৃত্যু হলে অনাবৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে।[৪]

গৃহত্যাগ ও সম্পদ নাশ করাঃ পরিবার বা গোষ্ঠীতে কারো মৃত্যু হলে যারা স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে বাস করে এবং একটু উন্নত সভ্যতার লোক তারাই ঘরবাড়ি শুদ্ধ করে। তবে যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা এসব ক্ষেত্রে তাদের সাময়িক আবাসস্থলকে নষ্ট করে দেয়। এবং সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। কোথাও কোথাও মৃতদেহকে ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়। কোথাও বা এমনিই ফেলে রাখে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তাদের কেউ মারা গেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। নতুন জায়গায় গিয়ে তারা শিবির গড়ে। বান্টুদের মধ্যে সাধারণ কোন মানুষ মারা গেলে তার ঘরটি ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু গোষ্ঠীপ্রধান মারা গেলে সমস্ত অঞ্চলই ত্যাগ করে চলে যায় তারা। অনেকে হয়তো বা পরে ফিরে আসে। কেউ কেউ আবার সব

১ Int. Arch. ii, 201
২ Jesup. Exped i, 331
৩ Rhode, ii, 73
৪ *Spieth, 274, 276*

পুড়িয়ে ফেলে। ঘর ছেড়ে দেবার কারণ এই নয় যে, মৃতের প্রেতাত্মা সব সময় সেখানে বাস করে। নুগোনিরা তাই মনে করে। তবে কখনও ফিরে আসতে পারে এই ভয়েই ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়।[১] এই ধরনের চিন্তা নিগ্রোদের মধ্যে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। তা ছাড়া আন্দামানের আদিবাসী, কারেন, ইয়াকুত্‌, কামুৎচাডাল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা অধিবাসী, মেলানেশিয়ান, মধ্যাঞ্চলের এস্কিমো এদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তা রয়েছে।

আইনুদের মধ্যে প্রবীণতমা কোন মহিলা মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘর ভেঙে ফেলা হয় বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তারা মনে করে, বুড়ীদের আত্মা দুষ্ট ভূত হয়ে ফিরে আসবে। এর ফলে তাদের ক্ষতি হবে। সুতরাং কোন বুড়ী মরণাপন্ন হলে তাকে একটি ছোট ঘরে রাখা হয়। সে মারা গেলে সেই ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়।[২] প্রাচীনকালে জাপানীরা তাদের শাসক মারা গেলে রাজধানীটাই নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করে নিত।[৩] নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও এমনভাবে ঘরবাড়ি নষ্ট করার রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। মৃতদেহকে কবরে পাঠানোর জন্য গাড়িতে ওঠানোর পরেই চেরেমিসরা মৃতকে উদ্দেশ করে প্রার্থনা জানায় যে, সঙ্গে করে যেন ঘরটিকেও সে নিয়ে না যায়। সে যেন তার নিজের ঘর উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যায়।[৪] রোমানদের মধ্যে এখনও এই প্রাচীন প্রথার ক্ষীণ একটি ধারা টিকে আছে। যদি সম্ভব হয় সপ্তাহখানেকের জন্য তবে তারা বাড়ি ছেড়ে বাইরে গিয়ে কোথাও থাকে।[৫]

সভ্যতার উন্মেষকালে মৃতের অস্থাবর সম্পত্তি তার সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হত অথবা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা হত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা ভাবে এর ক্ষীণ ধারা আজও প্রবহমান। মৃতের সঙ্গে তার সম্পদ দিয়ে দেওয়া হত শুধু এই কারণে নয় যে, সমস্ত কিছু নিয়ে সে পরলোকে যাবে। আর একটি উদ্দেশ্যও এর পেছনে কাজ করত। সে উদ্দেশ্য এই যে, সে যেন ফিরে এসে তার জীবিত উত্তরাধিকারীদের বিরক্ত না করে। প্রথম দিকে মৃত্যুদূষণ থেকে মুক্ত হবার জন্যই যে এটা করা হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা মনে করত যে, মৃতের স্পর্শ তার সমস্ত সম্পদেও লেগে আছে। মেলানেশিয়ান দ্বীপের বোগেনভিলেতে মনে করা হয় যে, মৃতের সমস্ত কাজের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ রয়ে গেছে।[৬] এ ধরনের চিন্তাধারা অন্যত্রও ছিল। ফলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থান ও মেলানেশিয়াতে দেখা যায় যে, মৃতের

১ Elmslie—Among the Wild Ngoni, Edinborough and Lond. 1899, p. 71
২ Batchelor, 130
৩ Aslon, Shinto, 1905, p, 252
৪ Smirnov, i, 137
৫ Hare and Baddlelay, Walks in Rome, 1909 p 433
৬ *ZVRW* xxiii, 1910, 351

শস্যক্ষেত্রের সমস্ত শস্যও তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। পোশাক-আসাক তো পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছেই। এ ক্ষেত্রে ডাইনীবিদ্যা বা তুকতাকের ভয়ও ছিল।

ইউরোপে ভোটিয়াকরা জঙ্গলে অথবা হ্রদে মৃতের পোশাক-আসাক সব ফেলে দিত।[১] ওয়ারচেস্টশায়ারে এই বিশ্বাস চালু রয়েছে যে, মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশি দিন পরা যায় না। অর্থাৎ যে পরবে তার মৃত্যু হবে। লিংকনশায়ারের অধিবাসীরা মনে করে যে, মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ বাইরে ফেলে দেওয়া হলেও মৃতের দেহ পচে গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাও নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সের ভিল্লে-এট-ভিলেঁ প্রদেশে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মৃতের ব্যবহৃত সব জিনিসই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। যত যত্নই করা হোক না কেন—তার পোশাক-আসাকে পোকা ধরে যাবে। [এ ধরনের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ লেখকের ঁমাতা। পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর মাতার মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাঁর ব্যবহৃত শাড়ি বিনা যত্নেও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।] তার গরু ভেড়াও আকস্মিক দুর্ঘটনা বা রোগে মারা যাবে। অবশ্য চর্মকারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হলে তা হবে না। হেব্রাইড্স থেকে ককেশাস পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তি যে-শয্যায় প্রাণ হারায় সেই শয্যা পুড়িয়ে ফেলা হয় বা দূরে ফেলে দেওয়া হয়। আধুনিক সভ্যতা এ ধরনের চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না বলে এবং আত্মীয়-স্বজনদের লোভের জন্য এ-সব প্রথা এখন আর তেমন করে টিকে নেই।

উত্তর আমেরিকার হারেস্কিনদের মধ্যে নিয়ম আছে, মৃতের পোশাক-আসাকের কিছু অংশ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছুটা মৃতদেহের সঙ্গে কবরে দেওয়া হয়। বাকীটা হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়, জলে ফেলে দেওয়া হয়, নয়তো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়।[২] সেরাঙের কোন কোন গ্রামে মৃত কর্তৃক কর্ষিত জমির ফসলের কিছু অংশ নষ্ট করে ফেলা হয়। কিছু অংশ অচ্ছুৎ বলে গণ্য হয়। তবে এসব দোষ কেটে যায় যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিরাট একটি বেল, সারঙ এবং দশটি ডিশ দিয়ে তা কিনে নেয়। পরে অবশ্য লোকটি এগুলি মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের ফিরিয়ে দেয়।[৩] মোলাক্কানদের মধ্যে অনেকেই মৃত ব্যক্তির বাগানের কিছু গাছ তার নামে উৎসর্গ করে কেটে ফেলে। বাকিগুলি জীবিত উত্তরাধিকারীদের জন্য থাকে। অনুরূপ প্রথা তামি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। তবে ক্যানো জাতীয় নৌকো এদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে এই নৌকো তারা নষ্ট করে না। নৌকো থেকে কয়েক টুকরো কাঠ ও গলুই তুলে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয় মাত্র।

মাল্টাতে ঘোড়ার খুব মূল্য। তাই মৃত ব্যক্তির ঘোড়াকে মেরে না ফেলে তার লেজের ডগা থেকে কিছু চুল কেটে নেওয়া হয়। তাছাড়া আর একটি অদ্ভুত রীতিও

১ RTP, xiii, 1895, 332
২ Petitot, 272
৩ Riedel, 142, 143

আছে, যেমন, ভাড়াটে লোকেরা ঘরের আসবাবপত্রের নানা জিনিস কিছুটা ওলটপালট করে, কিছুটা ভেঙে এই সব একটি ফুটন্ত কড়াইতে ফেলে দেয়। এখানে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই দিয়ে এক ধরনের তরল পদার্থ তৈরি করে ঘরের দরজা জানালায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়।[১]

কিরঘিজদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার ঘোড়ার জিন পাল্টে তবে অন্য কেউ তাতে চড়ে। এই জিনের উপর মৃতের প্রেতাত্মা বসে থাকে বলে তাদের বিশ্বাস।[২] সিউক্সরা 'ভূতের জুয়া' নামে এক ধরনের খেলায় মৃতের সম্পত্তি বাজি ধরে। তারা মনে করে এতে মৃতের প্রেতাত্মাও অংশ গ্রহণ করে।[৩] তা ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যারা অংশ নেয় অনেক সময় তাদের মধ্যেও এ-সব বণ্টন করে দেওয়া হয়। এতে যদি পরিবারের লোকেরা নিঃস্ব হয়ে যায় তবু তারা এটা করে থাকে। মৃতের দু-একটি ঘোড়াকেও মেরে ফেলে কবর দেওয়া হয়। নিকোবর দ্বীপের লোকেরা মৃতের কোন জিনিস ব্যবহার করার আগে গুণিন দিয়ে তা শুদ্ধ করে নেয়।

অনেক লোক মৃতের সম্পদ ব্যবহার করতে বেশ সময় নেয়। কারণ তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা পরলোকে গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার সম্পদ বা সম্পত্তিতে হাত দেওয়া উচিত নয়। অশৌচ পালন শেষ হলেই তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা পরলোকে গিয়ে পৌঁছেছে।

নিউ জর্জিয়াতে শেষ পারলৌকিক ক্রিয়া হয় একশ দিন পরে। এই সময় মৃতের হাড়গোড় কবর দেওয়া হয়। এই হাড় কবর দেবার আগে মৃতের সম্পদে হাত দেওয়া যায় না।[৪] অশৌচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাস্টুদের মধ্যে কেউই মৃতের সম্পদে হাত দেয় না। সুমাত্রার পেডাঙ্গ উচ্চভূমির মিনাঙ্গকাবু মালয়ীদের মধ্যে রীতি আছে, স্বামী স্ত্রীর গৃহে তার সঙ্গে থাকতে যায়। সেই জন্য স্বামী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ধনসম্পদ বিলি করে দেওয়া হয় যাতে স্বামীর আত্মা তার পারিবারিক গ্রামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার গৃহে একশ দিনের জন্য থাকতে পারে। একশ দিনের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে পড়ে না বলে তাদের বিশ্বাস। ফলে এই কয়দিনের জন্য সে স্ত্রীর সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এদের বিশ্বাস শততম দিনে স্ত্রীর আত্মা যখন পরলোকে গিয়ে পৌঁছায় তখন তার সম্পত্তি বিলি করে দেওয়া যেতে পারে। কলম্বিয়ার ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদের কিছুটা কবরে, কিছুটা আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকে এবং কিছুটা নষ্ট করে ফেলা হলেও তার ধনুকবাণ ও চামড়ার মুজো কেউ নিতে পারে না। এতে শাস্তি পাবার সম্ভাবনা। পরিবারের রক্ষাকর্তা-শক্তি সহায়ক না হলে কেউ তার পাইপে ধূমপানও করতে পারে না। কাপড়-চোপড় যা নেওয়া

১ Busuttil, 130, 120
২ ZVV, xii, 1902, 16
৩ RBEW, 195
৪ JAI xxvi, 403

হয়, হয় তা ধোয়া হয়, নয়তো বেশ কিছু সময় নদীর স্রোতে রেখে দেওয়া হয়। তারপর কয়েক দিন ভাল করে শুকোবার পর তবে তা গ্রহণ করে। তার শিকারের ফাঁদকে জনপদ থেকে বহুদূরে কোন এক গাছে অনেক দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয়, তারপর ব্যবহার করে।[১] ইউরোপের স্প্রী উপত্যকার সার্বদের মধ্যে চার সপ্তাহ অশৌচ পালন করা হয়। শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। মৃতের খুব নিকটজনেরা এক বছরের জন্য শোক পালন করে।[২]

নাম সম্পর্কে ছুৎবাই : অনেক লোক মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে না। অনেকের কাছে নাম উচ্চারণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। অনেকে আবার এ নাম উচ্চারণ করে না মৃত ব্যক্তিকে ভুলে যাবার জন্য। দক্ষিণ আমেরিকায় আদিবাসীদের মধ্যে আরাওয়াক, সালিভা এবং আরও অনেকে এরকম করে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে লোকে ভুলে যেতে চায় ভীতি থেকে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের অনেকেই পিতৃপুরুষদের ভুলে যাবার চেষ্টা করে। তাদের আত্মা দুষ্ট আত্মাতে পরিণত হয় বলে তারা মনে করে। ফলে মৃতদের নাম তারা কখনও মুখেও আনে না। গোয়াই কুরু (Guay Curu) ও লেঙ্গুয়ারা (Lengua) মৃতের নাম তো উচ্চারণ করেই না, বরং তাকে ধোঁকা দেবার জন্য নিজেদের নামই অনেক সময় পাল্টে রাখে যাতে মৃতের আত্মা ফিরে এসে আর তাদের চিনতে না পারে। মৃতের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি-বিধানের রীতি আছে। গুয়াজিরোদের মধ্যে যদি পারিবারিক গৃহে বসে কেউ মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে—তবে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়। তা না হলেও কড়া জরিমানা তো হয়ই।[৩] নিউগিনির ইয়াবিমেরা মৃতের নাম উচ্চারণ এড়িয়ে যায় এই কারণে, পাছে তার আত্মা অরণ্যে ফল খাবার সময় বিঘ্নিত হয়ে তাদের উপর রেগে যায়।[৪] লিলুয়েটদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, তারা এক বছর বা তারো বেশি সময় মৃতের নাম উচ্চারণ করবে না। তারা মনে করে যে, নাচের সঙ্গে প্রেতাত্মার একটা রহস্যময় সম্পর্ক আছে। মৃতের নাম উচ্চারণ করা মানেই তার আত্মাকে বিঘ্নিত করা। ফলে সে পৃথিবীতে নেমে আসে। মৃত ব্যক্তির আত্মা বা যে ব্যক্তি তার নাম নেয় তাদের উভয়েরই পক্ষে তা ক্ষতিকর। কারণ ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলে তার উপর ভুতের প্রভাব পড়তে পারে। তবে বেশ কিছু সময় চলে যাবার পর এ নাম উচ্চারণ করলে ভয়ের কিছু নেই।[৫] এই যে অশৌচের ধারণা মৃত্যুতত্ত্বের সঙ্গে এর একটা বড় রকমের যোগ রয়ে গেছে। মাদাগাস্কারের নোস্‌সিবি ও মেয়েট্টে দ্বীপের কোন রাজার মৃত্যু হলে তিনি পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। মনে করা হত তিনি

১ Jesup. Exped. i, 331
২ Tetzner 325
৩ Int. Arch, xiii, Suppl, 99
৪ ZVRW, xiv, 336
৫ JAI, xxxv, 138

দেবতাদের পাশে আসন লাভ করেছেন। তথাপি তাঁর নাম উচ্চারণ করতে কেউ সাহস পেত না।[১]

বান্টু উপজাতির মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার রীতি প্রচলিত আছে। তথাপি এরাও মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে না। ফলে জীবিতদের ক্ষেত্রেও নামের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে। নতুন নতুন নাম সৃষ্টি হয়। শুধু বান্টু নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও মৃতের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিনিষেধ আছে। তবে বিস্তৃত অঞ্চলে এই প্রথা থাকলেও সর্বত্রই এ জিনিস নেই। বরং প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে ঠিক এর উল্টো প্রথা চালু ছিল। মিশরীয়রা প্রেতাত্মারূপেও বেঁচে থাকতে চাইত। প্রেতাত্মারূপে বেঁচে থাকতে চাইতো এই কারণে, যাতে উত্তর পুরুষেরা তাদের স্মরণ করে। সেই জন্যই প্রথম সাম্মেটিকাসের আমলের একজন উচ্চ রাজকর্মচারীর মূর্তি, যা বার্লিন জাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে, তাতে এই কথা লেখা রয়েছে, "এই মন্দিরের দেবতারা তোমাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন যদি তোমরা আমার নাম উচ্চারণ কর। যার নাম উচ্চারণ করা হয়, সে বেঁচে থাকে। যদি কেউ দেখে যে তোমরা আমার নাম উচ্চারণ করছ, তবে অপরেও নাম উচ্চারণ করবে।"[২] অনেকে নাম ও ব্যক্তির সঙ্গে একটি রহস্যময় সম্পর্কের সন্ধান পায়। নাম হল ব্যক্তির অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং, ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নামও বেঁচে থাকে। নামই হল রূপ হিন্দুদের এই তত্ত্ব যেন এখানে ক্রিয়াশীল।

দ্বিতীয় সমাধি: অনেকে দুবার করে সমাধি দেয়। একবার দেয় স্থূল দেহের সমাধি, আর একবার হাড়গোড়ের সমাধি। স্থূল দেহ তুলে তার হাড়গোড়কে দ্বিতীয়বার সমাধি না দিলে পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হয় না। অনেকে, যারা মৃতদেহ কবর না দিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে ফেলে রাখে তারা এক সময় মৃতের হাড়গোড় কুড়িয়ে গোষ্ঠীর কবরস্থানে এনে জমা রাখে বা কবর দেয়। এটা না করা পর্যন্ত মৃতের আত্মা শান্তি পায় না বলে তাদের ধারণা। ফলে অশৌচও তাদের শেষ হয় না।

স্থূলদেহের পচন: পরলোকে যাত্রা প্রাচীন সভ্যতার ধারণামতে ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। দেহের পচন সম্পূর্ণ না হলে আত্মা পরলোকের দিকে পাড়ি দিতে পারত না। এর সঙ্গে স্থূলদেহ ও জীবাত্মার চিন্তা জড়িত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীনেরা মনে করত যে স্থূলদেহের বাইরেও জীবের স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে। অনুন্নত সভ্যতায় আত্মার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনা ছিল না।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে ওনকাটজেরিদের মধ্যে এই বিশ্বাস চালু আছে যে, কবরে হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে হাড় পড়ে থাকে তাই হল ভূত। এদের ভাষায় 'কুচি'। মাংস যা গলে যায়, তাই হল আত্মা—মুঙ্গারা। স্বর্গে গিয়ে বজ্র-বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে এরা বুঝিয়ে দেয় যে, তারা বেঁচে আছে।[৩] এই কারণেই

১ Steinmetz, 383
২ RHR lix, 1909, 185.
৩ Globus, xcvii, 56.

পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রাচীনেরা হাড়কে বলত অটিসকেন অর্থাৎ আত্মা। এরা মনে করত যে, মানুষের দুটি আত্মা আছে। দুটোই বিভাজ্য ও বস্তু দিয়ে গঠিত। তবে উভয় আত্মাই যথেষ্ট বিবেকসম্পন্ন। মৃত্যুর সময় একটি আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু অপরটি শ্মশান বা কবরে থেকে যায় যতক্ষণ না পারলৌকিক ক্রিয়া হয়। [আত্মার এই দ্বৈত অস্তিত্ব যে আজগুবি কল্পনা তা ভাবার কারণ নেই। কারণ যারা যোগী, তাঁরা জানেন যে, দেহে চেতনা থাকতেও বহু দূর দেশে তারা ভ্রমণ করতে পারেন। একে তরঙ্গতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও স্থূল দেহ যখন তৃতীয় নয়নে নিজেকেই নিজের সামনে দেখতে পায়, তখন দ্বৈত সত্তায় অবিশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে না।] পারলৌকিক ক্রিয়া হয়ে গেলে ছোট্ট ঘুঘু বা কবুতরের আকারে একটি আত্মা ভিন্ন জগতে চলে যায়। আর একটি আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়। এই আত্মা দেহকে লক্ষ্য রাখে এবং দ্বিতীয়বার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকে। এইজন্য এরা হাড়কে অটিসকেন বা আত্মা বলে উল্লেখ করে থাকে।[১]

সেলেবির টোরাটজারা বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ দেহে পচনক্রিয়া থাকে ততক্ষণ আত্মা পরলোকে যেতে পারে না। যতক্ষণ দেহে পচনক্রিয়া থাকে ততক্ষণই সে মানব থেকে যায়। [এই কারণেই কি হিন্দুরা তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে ফেলে?] পরলোকের বাসিন্দারা তাকে সেখানে গ্রহণ করে না। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের লোকেরাও তাই ভাবত যে, দেহে মাংস লেগে থাকা পর্যন্ত আত্মা সেখানে থেকে যায়। মাদাগাস্কারের বেটসিলিওরা যে পারলৌকিক ক্রিয়া করে তার উদ্দেশ্যই হল দেহের পচনক্রিয়া ও পুনর্জন্ম ত্বরান্বিত করা। আত্মা এদের মতে সাপের আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় [যে বীর্য থেকে নবজন্ম হয় এর বীজ সর্পাকৃতি। এটা লক্ষ্য করেই কি এরা এমনতর ধারণা করেছিল?] এই সাপকে এরা বলে ফ্যানানি। এই ফ্যানানি পচনশীল দেহ থেকে বেরিয়ে আসে।

আরু দ্বীপপুঞ্জে মৃতের সমস্ত সম্পদ কবরখানায় এনে জড় করা হয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে সেখানে নিত্য খাবার এনে দিতে হয়। এটা চলে যতক্ষণ না হাড়ের উপর থেকে মাংস গলে পড়ে যায়, এবং হাড়কে পারিবারিক কবরে এনে দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ করা হয়। তার আগে ভোজ দেওয়া হয়। তাছাড়া পারলৌকিক ক্রিয়া হয় যা দ্বারা মৃতের স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অনুমতি পায়।[২] এদের প্রায় সবার মধ্যেই এই বিশ্বাস রয়েছে যে, দেহের মাংস ঝরে না পড়া পর্যন্ত আত্মা আশেপাশেই থাকে—পরলোকে মৃতের জগতে যেতে পারে না। নিজের সম্পদের সঙ্গে আত্মা লেগে থাকে। সুতরাং নিত্য তার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়। এই কারণে অদ্যাবধি কবর দেবার সময় গ্রীক চার্চ থেকে বলা হয়—'দেহ তাড়াতাড়ি তার নিজস্ব উপাদানে মিলিয়ে যাক।' [ভারতীয়দের মতে পঞ্চভূতই হল এই উপাদান।] তিন বছর পরে

১ RBEW, 114.
২ Riedel, pp. 267, 268.

কবর খুঁড়ে দেখা যায় যে, হাড় থেকে মাংস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে এরা ভাবে যে আত্মা পরলোকে চলে গেছে। সুতরাং হাড় তুলে দ্বিতীয়বার এরা তাকে পারিবারিক কবরখানায় এনে সমাধিস্থ করে। যদি তখনও দেখা যায় যে হাড়ে মাংস লেগে রয়েছে তবে মনে করা হয় মৃত ব্যক্তি কোন পাপ করেছিল। সেইজন্যই এই অবস্থা। এতে লোকেরা ক্রুদ্ধ বোধ করে। বলে ঃ 'মাটি তোমার দেহ খাবে না।' পশ্চিম জগতের গীর্জার সঙ্গে এখানে গ্রীক গীর্জাগুলির বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। এমন কি চীন ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য জাতের মানুষের সঙ্গেও। তারা মনে করে, হাড় থেকে মাংস যদি সম্পূর্ণ ঝরে না পড়ে তবে তা মৃত ব্যক্তির সাধুতার লক্ষণ। কুসংস্কারের ক্ষেত্রে এ ধরনের বহু মতবাদ আছে।

এই ধরনের বিশ্বাস থেকে অনেকে দেহ থেকে মাংস যাতে খসে পড়ে সেই জন্য নানা কৃত্রিম পথ বেছে নেয়—যাতে করে আত্মা তাড়াতাড়ি তার নিজস্ব ভূমিতে চলে যেতে পারে। তাছাড়া এতে জীবিত আত্মীয়-স্বজনেরও মঙ্গল হয় বলে তারা মনে করে। সোলোমান দ্বীপে গোষ্ঠীপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 'শক' (শক্তি) বলা হয়। এরা মৃত্যুর পরে শক্তিমান ভূত হয়ে থাকে। মাল্টা দ্বীপের 'সা' নামক স্থানে সাধারণ লোক সাধারণ কবরভূমিতে সমাধিস্থ হয়। হাড় থেকে তাদের মাংস স্বাভাবিক-ভাবেই ঝরে যায়। তবে এরা বিশ্বাস করে যে, মৃতদেহে যতক্ষণ দুর্গন্ধ থাকে ততক্ষণ শক্তিমান ভূতও দুর্বল হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন স্থানে অদ্যাবধি পচনক্রিয়া দ্রুত করার জন্য কবরের উপর জল ঢালা হয়। সমুদ্রে মৃতদেহ ভাসানো, উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেলে রাখা, বা শবদাহ করার প্রথা বোধহয় এই কারণেই হয়েছে, কারণ এতে হাড় থেকে মাংস দ্রুত সরে যায়। [হিন্দুদের শবদাহের পেছনে সত্যি সত্যি এই ধারণা বর্তমান রয়েছে। একটোপ্লাজমরূপী জীবাত্মা—যতক্ষণ স্থূলদেহ থাকে ততক্ষণ তার কাছে ঘোরাফেরা করে। তবে জীবন্মুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ভয়ের কারণ থাকে না; কারণ তারা পার্থিব জগতের প্রতি মোহমুক্ত। এই কারণে সাধু-সন্ন্যাসীদের দাহ না করে কবর দেওয়া হয়।] দেহের কোন অংশ বর্তমান থাকলেই আত্মা তার কাছে ঘুরঘুর করে। সেইজন্য কাপালিকরা এই প্রেতাত্মাশক্তিকে নিজেদের কবলিত করার জন্য মড়ার মাথা বা কঙ্কাল তাদের ক্রিয়াক্ষেত্রে রেখে দেয়। অনেকে, যারা এই সূক্ষ্ম সত্তাকে মনা (Mana) নামে আখ্যা দেয়, তারাও মড়ার মাথা, হাড়, ছাল, চুল ইত্যাদি নিজেদের কাছে রেখে দেয় তার ভৌতিক শক্তিকে কাজে লাগাবে বলে।[১]

মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া যে শুধু এইভাবেই ত্বরান্বিত করা হয় তাই নয়। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু উপজাতি দিন পনের পরেই এই জন্য কবর থেকে মৃতদেহ তুলে ফেলে হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেয়। অনুষ্ঠান সহকারে এই কাজ করার পর তারা দেহের কঙ্কালকে দ্বিতীয় বার কবর দেয়। চোকতাওদের মধ্যে এই কারণে এক

১ Codrington 260 ff.

ধরনের বৃদ্ধ মানুষ আছে যারা আঙুলে বড় বড় নখ রাখে। এই নখ দিয়ে তারা মৃতদেহের হাড় থেকে মাংস তুলে নেয়। এগুলি নিয়ে তারা অস্ত্রের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলে এবং কঙ্কালকে তুলে এনে পারিবারিক বা গোষ্ঠীভুক্ত হাড়ের কবরখানায় এনে রেখে দেয়।[১] টিমোর দ্বীপের দক্ষিণ টেটোয়েন-এ রাজার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হাড় থেকে মাংস তুলে নেওয়া হয়। দেহের অন্যান্য নরম অংশও হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত যখন কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না, তখন শোকের কান্না শুরু হয়। কারণ, এরা মনে করে যে, হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হলে তবেই যথার্থ মৃত্যু হয়। মর্যাদা অনুযায়ী অনুষ্ঠান সহকারে কঙ্কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাংসপিণ্ড একটি গর্তে ফেলে দেওয়া হয়।[২]

যেখানে স্বাভাবিকভাবে দেহকে পচতে দেওয়া হয় সেখানে আবহাওয়া অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় দেহের পচন বিভিন্ন সময়ে শেষ হয়। মণিপুরের কুকিরা এক মাসের মধ্যে দেহের পচনক্রিয়া শেষ হয় বলে মনে করে। তারপর মাদুরে মুড়িয়ে দেহকে কবর দেয়। ব্যাঙ্কস দ্বীপে এই পচনক্রিয়ার সময় ধরা হয় একশত দিন। কোন কোন উপজাতি এক বছরের কম সময়ের মধ্যে মৃতদের কবর থেকে উঠিয়ে নতুন করে কবর দেয়। টঙকিঙের চৈনিকরা তিন বছর পর কবর খুঁড়ে কফিন থেকে কঙ্কাল বের করে নতুন করে কবরস্থ করে। এর উপর ছোট একটি সৌধও নির্মিত হয়। আগে চীনেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। বুলগেরিয়ায় পিতামাতা তাদের কোন সন্তান মারা গেলে তিন থেকে ন বছর পরে কবর খুঁড়ে হাড় বের করে মদে ধুয়ে গীর্জার প্রাঙ্গণে এক বছরের জন্য কবর দেয়। পরে আবার তা তুলে নিয়ে নতুন করে কবর দেওয়া হয়। মধ্য যুগে সারা ইউরোপে এই ধরনের রীতি ছিল। কবর থেকে মৃতের হাড় বের করে এক সময় সেগুলিকে হাড় রাখার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে রাখা হত। একে বলা হত—Charnel-housc-গীর্জার প্রাঙ্গণে স্থানাভাব হেতুই এমন করা হত বলে বলা হয়। তবে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ নিয়ম প্রাচীনকালের বিশ্বাসেরই একটি ক্ষীণধারা মাত্র।

মৃতের ভোজ : সর্বত্রই এক এক জাতি এক এক সময়ে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করে ভোজের আয়োজন করে। ব্রেজিলের বোরোরা—তাড়াতাড়ি কবর থেকে কঙ্কাল উঠিয়ে দ্বিতীয় বার কবর দিলেও কখনও একা কাউকে কবর দেয় না। দু'জনের হাড় বের করে একত্রে কবর দেওয়া হয়। বোধ হয় পরলোকে তাদের একা চলতে না হয় এই বিশ্বাসে এমন করা হয়। হুরোনরা মৃতের উপলক্ষ্যে শেষ ভোজ দেবার প্রতি বারবছর পর তার কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে আনে। প্রথমে হাড়গুলো পরিষ্কার করে। যদি তখনও কোথাও কোন মাংস লেগে থাকে, তবে তা চেঁচে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর কঙ্কালকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করে বস্তা, কম্বল, বা

১ RBEW 168, 169
২ Kruijt—830

দামী চামড়ায় এই কঙ্কালকে জড়িয়ে নেয়। তার আগে বেশ করে শোক প্রকাশ করে। কঙ্কালের হাড়গুলো একত্র করে তার সামনে ভোজ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যেষ্টি নৃত্যও চলে। পরদিন বড় একটি গর্তের কাছে এগুলি নিয়ে গিয়ে নানা অনুষ্ঠান ও দানধ্যানের পর পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়।[১] এ ধরনের অনুষ্ঠানরীতি পৃথিবীর অন্য জাতের মধ্যেও রয়েছে। প্রাক্তন অসমের খাসিয়ারা মৃতদেহ পুড়িয়ে চিতাভস্ম ছোট একটি পাথরের স্তূপের নিচে রেখে দেয়। সেখান থেকে পরে পারিবারিক ভস্মাধারক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তা জমা রাখে। পরে নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ বিসম্বাদ থাকলে তা মিটিয়ে নিয়ে গোষ্ঠী-ভস্মাধার ক্ষেত্রে তা জাঁকজমকসহকারে জমা রাখা হয়। এখানে বড় একটি পাথরের ঘর থাকে। গোষ্ঠীর সকল মৃত ব্যক্তির হাড়ই সেখানে রাখা হয়।[২] ভারতের অন্যত্রও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। আর আছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এই যুগ্ম কবরক্ষেত্র জীবিতদেরও ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের পরিণতি : দেহের শেষ মৃত্যু সর্বত্র সমান নয়। অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু উপজাতি কিছুদিন মৃতদেহ বা দেহের হাড় নিজেদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াবার পর শেষপর্যন্ত একটি গাছের ডালে এনে তা ঝুলিয়ে রাখে।[৩] ক্যারোলিনার চোকতাওদেরও গোষ্ঠী-অস্থিগৃহ আছে, যেখানে সবশেষে মৃত ব্যক্তিদের হাড় এনে জমা করে রাখা হয়। লুইসিয়ানা ও ভার্জিয়ানার আদিবাসীদের অস্থিগৃহের ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল। এ-সব জায়গায় মৃত গোষ্ঠীপ্রধান বা পরিবার-প্রধানদের লক্ষ্য করে রীতিমত উৎসব হত।[৪] দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার সোফালার স্থানীয় অধিবাসীরা দেহ থেকে মাংস খসে পড়লে তাদের মৃত ব্যক্তিদের হাড় এনে বিশেষ একটি স্থানে রেখে দেয়। প্রত্যেক মৃতের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন সেখানে তারা মৃতদের আত্মার জন্য বেশ শ্রদ্ধাভরে খাবার-দাবার রেখে প্রার্থনা জানায়। তারপর প্রসাদের মত সেই খাবার নিজেরা খায়। ক্যারিবিয়ানরা পরিচ্ছন্ন হাড় ঘরের চালের বাঁশে ঝুলিয়ে রাখে।[৫] ব্যাংকস দ্বীপপুঞ্জে প্রিয় কোন পুত্র মারা গেলে তার হাড় ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাখা হয়। কিছু হাড় পিতামাতা ঘরে ঝুলিয়ে রাখে।[৬] আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীরা মৃতের হাড় তোলা উপলক্ষ্যে রোদন করে থাকে। মৃতের হাড় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। নিকটতম আত্মীয় রাখে করোটি ও নিম্ন চোয়াল। কয়েক মাস তারা এগুলি নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখে। কখনও কখনও ঘরের খুঁটিতেও বেঁধে রাখা হয়।

---

১ **RBEW 112.**
২ **Gurdon 140.**
৩ **Howi H, 467, 470, 471.**
৪ **RBEW, 124.**
৫ **Boyle, Archaeological Roport, 1903, 142.**
৬ **Codrington, 267.**

দ্বিতীয় কবরের উদ্দেশ্য ঃ দ্বিতীয় বার কবর দেবার মূল উদ্দেশ্য হল পার্থিব জগৎ থেকে জীবের আত্মাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং পরলোকে পরিবারভুক্ত অন্যান্য মৃতদের আত্মার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। তবে এজন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় সে জন্য যে দেহের কিছু অংশ অবশ্য প্রয়োজনীয় তা নয়।

তিমোরলট ও তানেম্বার দ্বীপপুঞ্জে যুদ্ধে নিহত কোন যোদ্ধার কবরস্থ হবার দশ দিন পরে গ্রামের লোকেরা সমুদ্রের ধারে এসে সমবেত হয়। পুরুষেরা আসে সশস্ত্র হয়ে, মহিলারা অনুষ্ঠান সামগ্রী নিয়ে। একজন বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে মৃতের আত্মাকে নাম ধরে ডাকতে থাকে। মাটিতে পাতাশুদ্ধ একটি বাঁশ পোঁতা হয়। বাঁশের মাথায় বেঁধে দেওয়া হয় কোমরবন্ধ। এই বাঁশকে মনে করা হয় সিঁড়ি যা দিয়ে মৃতের আত্মা তার অভীষ্ট স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে পারে। সারনিটু নামে এক ধরনের পুরোহিত বীরের উদ্দেশে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে। লোকেরা তাকে হাততালি দিয়ে অনুমোদন করে। বাঁশ নড়াচড়া করলে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আত্মা সিঁড়ির চূড়োয় উঠে গেছে। তখুনি বাঁশটিকে দু'টুকরো করে চেরা হয়। কোমরবন্ধটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয় যাতে আত্মা আর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে জীবিতদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। চাল ও ডিম ভর্তি একটি রেকাবি, যেটাকে অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটাকেও ভেঙে দেওয়া হয়। এতে সন্তুষ্ট হয়ে মৃতের আত্মা ছোট খুসনিতু দ্বীপে চলে যায়। এই দ্বীপটি হল সীলুর উপকূলের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এই দ্বীপটিকে আত্মার বাসস্থান হিসেবে মনে করে। মৃতের হাড়-এর দ্বিতীয় কবর পরে কোন এক সময়ে দেওয়া হয়।[১]

ককেসাস অঞ্চলে চেচেনিসরা এক ধরনের স্মৃতিশয্যা-ভোজ দিয়ে থাকে। মৃতদেহ কবরস্থ করার কিছু পরেই এই ভোজ দেওয়া হয়। একে স্মৃতিশয্যা-ভোজ বলা হয় এই কারণে যে, চেচেনিসরা মনে করে যে, আত্মা পরলোকে চলে গেলেও যতক্ষণ না এই ভোজ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে শয্যাতেই শুয়ে থাকে। সুতরাং মৃতের আত্মাকে ঊর্ধ্বগামী করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা এই ভোজের আয়োজন করে। এই সময় নৃত্যগীত, ঘোড়দৌড়, বন্দুক ছোড়া, পান আহার সবই চলে। চারটি ঘোড়দৌড়ে যে ঘোড়া প্রথম হয় সদ্য মৃতের নামে তার উদ্দেশে ভোজের আয়োজন হয়। অন্য তিনটি ঘোড়ার ক্ষেত্রে মৃতের তিনজন পূর্বপুরুষের নামে ভোজ দেওয়া হয়ে থাকে। মৃতের নামে পবিত্রকৃত এই ঘোড়াগুলি যে জীবিত মালিকের মালিকত্বের বাইরে চলে যায় তা নয়। তবে এগুলিকে ব্যবহার করার সময় যাদের নামে তাদের উৎসর্গ করা হয়েছিল অর্থাৎ সেই মৃত পুরুষদের অনুমতি নেওয়া হয়। তবে শেষ ভোজ দু'বছরের আগে দেওয়া হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে এই ভোজের আয়োজন করে তার বিধবা স্ত্রী। তখন সে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই

১ Riedel 307.

বিবাহ হয় মৃতের কোন ভাই বা আত্মীয়ের সঙ্গে।[১] স্মৃতিশয্যা-ভোজে আমোদ ফুর্তি করা হয় পরলোকে মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্যই।

করোটির ব্যবস্থা : মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার করোটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কখনও কখনও কোন জাতি মৃতের করোটি গলায় পরে থাকে, বিশেষ করে স্বামী মারা গেলে মহিলারা। করোটি ধারণ করা হয় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এবং এক ধরনের রক্ষাকবচের মত। আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীরা মৃতের হাড়কে টুকরো করে গয়না করে পরে। বিধবা বা বিপত্নীক ব্যক্তি ঘাড়ের উপর করোটি ধারণ করে। তবে সব সময় যে এটা করা হয় তা নয়। এতে ব্যথাবেদনা ও রোগ দূর হয় বলেও বিশ্বাস।[২] করোটির রক্ষাকবচ একটি ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যখন কোন ঘর বা বেদীতে এই করোটি দেখা যায় তখনই মনে করা যায় যে এখানে কোন ধর্মীয় ব্যাপার আছে।

টোররেস প্রণালীর লোকগাঁথা থেকে জানা যায় যে, সেখানকার লোকেরা পিতামাতার করোটিতে এক ধরনের গন্ধপাতা ঘষে দেয়। অন্যান্য করোটিতেও এই পাতা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারা এই করোটির কাছে তাদের বীরত্বব্যঞ্জক কাজের কথা বর্ণনা করে শোনায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। স্বপ্নে নাকি এই করোটি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়। করোটির নির্দেশ অনুযায়ী তারা সাফল্য অর্জন করে থাকে।[৩] সোলোম দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা মনে করে যে করোটি অপরিসীম শক্তিধর। করোটির সাহায্যে ভূতদের সাহায্য পাওয়া যায়।

[ভারতের কাপালিকরাও এই বিশ্বাসে উদ্বোধিত হয়ে তাদের কাছে করোটি রাখে। এই করোটিকে বলা হয় ভৈরব]। সান্তাক্রুজে এই করোটি একটি সিন্দুকে রাখা হয়। নিত্য একে খাবার দেওয়া হয়। কারণ, এরা মনে করে যে, করোটি হল মৃত ব্যক্তিরই সমান।[৪] পশ্চিম আফ্রিকার ফ্যান-জাতি পরিবারের প্রধানদের মুণ্ড সিন্দুকে রেখে দেয়। যুদ্ধযাত্রা, জুয়া খেলা প্রভৃতির আগে তারা এই করোটির সঙ্গে পরামর্শ করে।

করোটি তা নিজেদের গোষ্ঠীরই হোক বা শত্রুপক্ষের কারোই হোক এর একটা বিরাট মূল্য আছে এ-কথা মনে করেই অনেক আদিম জাতি মুণ্ড শিকারে বেরুতো। [ভারতের নাগাদের মধ্যে এক সময় এই প্রথা চালু ছিল]।[৫] মনুষ্যমুণ্ড যে শুধু বিজয়ের প্রতীক তা নয়। এটা বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয়, কারণ, নরকরোটি সমগ্র সমাজ বা পরিবারের পক্ষে কল্যাণ ডেকে আনে ঃ এরা মনে করে, যে আগে ছিল শত্রু

১ Athropos, (ii) 736
২ Indian Census Report, 1901, iii, 65
৩ Torses Straits Report, v, 41 ff, 47, ct, 250, 251, 257 etc.
৪ Codrington, 262, 264.
৫ প্রফুল্ল রায়, পূর্বপার্বতী পৃ. ৪৯,

তার মুণ্ড ঘরে থাকলে সেও হয় মিত্র, রক্ষাকর্তা।[১] শুভ দিনে এই সব করোটিকে রীতিমত স্তোকবাক্য দিয়ে পুজো করা হয়। করোটির অধিকর্তা তার সমগ্র উন্নতি ও নিরোগ স্বাস্থ্যের জন্য এই করোটিকেই ধন্যবাদ জানায়।

মৃতের প্রতিমূর্তি : অনেকেই পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ করে মৃতের প্রতিমূর্তি তৈরি করে তা স্থাপন করে। হিন্দুকুশ পর্বতের কাফিররা কোন বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছর পর কোন রকমে তার একটি কাঠের প্রতিমূর্তি তৈরি করে। এই উপলক্ষ্যে ভোজেরও আয়োজন করা হয়।[২] কলম্বিয়ার টমসন ভারতীয়রা কবরের উপর একটি পাথরের মূর্তি স্থাপন করে। তারা যতটা সম্ভব মৃত ব্যক্তির অনুরূপভাবে এই প্রতিমূর্তিটি তৈরি করার চেষ্টা করে। [হিন্দুদের ক্ষেত্রেও কাষ্ঠদণ্ডে এই প্রতিমূর্তি খোদাই করে গৃহ-চত্বরের কোথাও তা পুঁতে রাখা হয়]। এই মূর্তিগুলি স্মৃতির প্রতীক হিসেবেও কাজ করে। অনেকের কাছে এর আরও ব্যাপক অর্থ আছে। যেমন, অস্টিয়াকদের মধ্যে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি যদি মারা যায়, তবে তাঁর প্রতিমূর্তি তৈরি করে মৃতদের তাঁবুতে রাখা হয়। মূর্তিটিকে জীবিত ব্যক্তির মতই সম্মান দেখানো হয়। খাবার সময় তারা মূর্তিটিকে খাবারের ঘরে নিয়ে আসে। সন্ধ্যায় বেশ পরিবর্তন করে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং সকালে আবার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিয়ে মৃতের বেদীতে স্থাপন করে রাখে। তিন চার বছর মূর্তিটিকে এইভাবে সম্মান দেখাবার পর কবরে সমাধিস্থ করা হয়।[৩] ওজিবুয়াদের কোন সদ্য বিধবা কয়েকটি কাপড় শক্ত করে বেঁধে একটা শিশুর মত গলায় ঝুলিয়ে রাখে। একে নিয়েই সে শোয়। এক বছর সে স্বামীর স্মৃতি হিসাবে এমন করে। অবশেষে রীতিমাফিক শোকপ্রকাশ করে একদিন সে এটা ফেলে দেয় এবং নতুন করে বিবাহ করে।[৪] কালিফোর্নিয়ার মইদুরা মাঝে মাঝেই মৃতের উদ্দেশে দেওয়া জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলে। প্রথম বছর মৃতের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাতে খড় ভরে দেওয়া হয়। এবং মৃতের উদ্দেশে যে সব দান করা হয় এই মূর্তিসহ তা সব পুড়িয়ে ফেলা হয়।[৫] কয়েকটি তুর্কী উপজাতি কবরের মধ্যে মৃতের প্রতিমূর্তি দেখে দেয়। তবে মৃতের সঙ্গে এই প্রতিমূর্তির কতটা মিল আছে সেটা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু সে জন্য কিছু এসে যায় না। কারণ, এগুলিকে প্রতীক হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও এই প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয় মৃতের শক্তিকে ধরে রাখার জন্য। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যেন্দেই-এর বান্টুরা গৃহকর্তা মারা গেলে তার মৃতের দাড়ি ও চুল কামিয়ে ফেলে। তার মাথার চুল, হাতের আঙুল ও পায়ের নখ প্রভৃতি মাটির প্রতি-মূর্তিতে লাগানো হয়। এরপর প্রতিমূর্তিটি মুজিমুতে (Mzimu) পরিণত হয়।

১ Furness, op cit, 65
২ Robertson—p. 645
৩ Abacromby, Finns, Lond 1898 i 169
৪ Jones, Ojeb Indians, p. 101
৫ Bull Am. Mus. Nat, Hlst, xvii [1902] 36.

অর্থাৎ মৃতের প্রতিমূর্তি হিসেবে পূজো-আর্চার বিষয়ে পরিণত হয়।[১] মোলাকাব লেতি, মোয়া ও লাকোর দ্বীপে লোকেরা পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য কাঠ খোদাই করে বিশেষ রকম কয়েকটি মূর্তি তৈরি করে। মৃতদেহকে কবর দেবার পাঁচদিন পর একটি মূর্তিকে বের করে এনে মৃতের আত্মাকে এতে প্রবেশ করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়। তাকে মূর্তিতে ঢোকানো হয় খাবারের লোভ দেখিয়ে। এই মূর্তিতে মৃতের আত্মা সাময়িককালের জন্য বাস করে। একে খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করার জন্য রীতিমত অনুনয় বিনয় করা হয়। অনুনয় বিনয় করা হয় এই কারণে যে, যেন কোন রোগ-শোক তাদের স্পর্শ না করে। এরপর পারিবারিক ভোজের আয়োজন করা হয়।[২] উত্তর টঙকিঙের লোলোরা একরকমের ঘাস ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি মূর্তি তৈরি করে। এটাকে দেয়াল বা ছাদে বেঁধে দেওয়া হয়। এই মূর্তি পূর্বপুরুষদের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করে।[৩] এ-সবই এক ধরনের মৃত্যুতত্ত্ব হিসেবে আদিবাসীদের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই মূর্তি পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যেও পড়ে।

১ **JAI, xxv, 236**
২ **Riedel, 395**
৩ **Lunet 331**

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও প্রাচীন ব্যাবিলন

সেমেটিক জাতের অন্যান্যদের মত প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরাও বিশ্বাস করত যে, পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবন অপেক্ষা অনেক ভাল। ব্যাবিলনীয়দের পূর্বে মেসোপোটেমিয়াতে যে সুমেরীয়রা রাজত্ব করত, তারাও অনুরূপভাবে মৃত্যু সম্পর্কে এই প্রাচীন ধারণাতে বিশ্বাস করত। তবে সুমেরীয়দের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের সমাধি দেবার প্রথা, মৃতের উদ্দেশে বলিদান, মৃতের আত্মার জন্য আহারের ব্যবস্থা, এ-সব সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। আত্মাকে বলত তারা জিদ (Zid) অর্থাৎ দমকা হাওয়া। ব্যাবিলনীয়েরা একে বলত নাপিসতু (Napistu) অর্থাৎ শ্বাস। ভারতীয় ভাষাতে যাকে বলে প্রাণবায়ু। মৃত্যুকে এরা যে ভাবে বর্ণনা করেছে, তা থেকে এদের মৃত্যুভীতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুমেরীয় শব্দে একে বলে দিগ (Dig) অর্থাৎ কেড়ে নেওয়া। ব্যাবলনীয়েরা কারো মৃত্যু হলে বলত—ঈশ্বর তাকে নিয়ে গেছেন—'ইলু-শু-ইকতের-শু'। কেউ কেউ মৃত্যুকে ভাগ্যের বিধান বলে মনে করত। তাই বলত ভাগ্য তাকে নিয়ে গেছে—শিমতু-উম্বিল-শু। অসুরবনিপল যখন তরকুর মৃত্যু বর্ণনা করেছেন তখন দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, 'তার ভাগ্যের রাত্রি নেমে এসেছে।' মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তার আয়ু মৃত্যু লোকের দেবতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এইজন্য মেসোপোটেমিয়ার একজন কবি লিখেছেন—

'আমরা কি শাশ্বত গৃহ তৈরি করেছি ?
এর উপর নিজেদের নাম লিখে রেখেছি ?
ভাইয়েরা যে উত্তরাধিকার ভাগ করে নেয়—তা কি চিরদিনের ?
নদীর প্লাবন কি অনন্তকাল ধরে চলবে ?
যারা ঘুমোয়, যারা মরে যায়, তারা কোথায় শয়ন করে ?
মৃত্যুতে কারোই পার্থিব আকৃতি থাকে না।
যখন মৃত্যুদূত ও প্রহরীরা এসে তাকে নিয়ে যায়—
অনুন্নাকি, মহান দেবতারা একত্রিত হয়।
ভাগ্যলিপি-লেখক মম্মিত প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন।
মৃত্যু এবং জীবন তাদেরই ব্যবস্থাতে হয়।
তবে মৃত্যু কবে হবে সে কথা তারা কাউকে জানান না।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, জন্মকালেই দেবতা মম্মিত মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি শিশুজন্মের অধীশ্বরী বাও দেবীর সমকক্ষ। মৃত্যুর পর এঁদেরই কাছে

দ্বিতীয়বার তাদের পরীক্ষা দিতে হয়। আর পরীক্ষা দিতে হয় অরল্লুর বিচারকদের কাছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরা মনে করত যে, স্হূলদেহের মৃত্যুর পর আত্মা থেকে যায় অরল্লুতে। এই অরল্লু হল শূন্যভূমি। এখানে ভয়াবহভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। এখানে যেমন রয়েছে ধূলো তেমনই হাদেস (Hades)-এর ছায়া। দেহ থাকা পর্যন্ত দেহের প্রতি মৃত ব্যক্তিদের সমান আকর্ষণ থাকে। সুতরাং এই দেহ হয় পোড়ানো নয়তো সমাধি দেওয়া হত। আত্মীয়-স্বজনেরা এখানে তাদের খাবার সরবরাহ করত। যে সব জিনিস এই পৃথিবীতে লোকটির প্রিয় ছিল সবই তাকে দেওয়া হত। এখানে শবদাহ এবং সমাধি দেবার ব্যবস্থা সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। যদি শব দাহ হত, তবে মৃতপাত্রে ভস্ম ভরে তাতে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি দেওয়া হত, যাতে আত্মা তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে নিপ্পুরে এমন অনেক ভস্মাধার-মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। লগস (বর্তমান সুরঘুল ও এল হিব্বা)-এর কাছে দুটি বড় বড় শ্মশানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে সরু মাটির পাত্রে একটি ইঁটের আসনে মৃতাধার থাকত। মৃতদেহকে এর মধ্যে এক ধরনের জ্বালানি দিয়ে জড়িয়ে রাখা হত। এর উপর পাতলা মাটির প্রলেপ দিত। মাটির পাত্রের উপর কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে আগুন ধরানো হত। শবদাহ শেষ হলে মাটির পাত্রে ছোট একটি ফুটো করা হত। ইতিমধ্যে মাটির পাত্রটি পুড়ে শক্ত হয়ে যেত। শবদেহ কতদূর পুড়েছে পরীক্ষা করে দেখার পর যদি দেখা যেত যে, ভেতরের শব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তবে সেই ছাই মাটির পাত্রে পুড়ে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করত। যদি শবদাহ তেমন না হত, তবে মাটির পাত্র বা খাঁচাকে কবর হিসেবে ধরে নিয়ে সিটুতে (মৃতস্থানে) রেখে দেওয়া হত। অভিজাত বংশ ও ধনী লোকেরা ভস্মাধার রাখার জন্য এক ধরনের ইঁটবাঁধানো ভল্ট তৈরি করতেন। সেখানে পারিবারিক ভস্মাধারগুলিকে রাখা হত। সিঁড়ির দুধারে থাকত টালি বসানো নিষ্কাশন রেখা যেখান দিয়ে উপরের জল নিচের জলের সীমা পর্যন্ত নেমে যেত।

প্রাচীন সুমের, আক্কাড ও লগসের দক্ষিণাঞ্চলে শবদাহই ছিল প্রচলিত রীতি। অন্যত্র আবার ছিল কবর দেবার ব্যবস্থা। যেখানে সরাসরি স্হূলদেহ কবর দেওয়া হত (3200 B.C.) সেখানে তার আর কোন চিহ্নই নেই। মৃতদেহ সংরক্ষণ ছিল অনেকটা মানসিক ব্যাপার, অবশ্যকর্তব্য নয়। তবুও এ ব্যাপারে সুমেরীয় ও সেমাইটরা যথেষ্ট যত্ন নিত। উর নামক স্থানে ইঁটের গর্ভগৃহে অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই সব কঙ্কালের পাশে রয়েছে খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি। প্রসাধন সামগ্রীও আছে।

সহজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে মৃতদেহকে একটি মাদুরে মুড়ে ইঁটে-বাঁধানো মঞ্চে রাখা হত। মৃতের উপর বসিয়ে দেওয়া হত পোড়ামাটির ঢাকনা। ঢাকনা খুব বড় হত, যাতে মৃতদেহ এবং সেই সঙ্গে খাদ্য-পানীয়াদি সব জিনিস স্থান পেতে পারে। অনেক

গোলাকার সমাধি বা দাহক্ষেত্র পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় এখানে মৃতের হাঁটু বুকে ভাঁজ করে তবে সমাধি দেওয়া বা পোড়ানো হত। এই ভাঁজ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার মধ্যে প্রাচীনতম কালের মানুষের প্রথাই কাজ করত বলে মনে হয়, তা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক। কারণ প্রচলিত কোন পদ্ধতিকে অতিক্রম করতে মানুষের যুগযুগান্ত চলে যায়। অনেক সময় কবর দেবার জন্য মাটির বা চীনা মাটির কফিন তৈরি হত। কফিনের আকৃতি হত ক্যাপসুল ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে খুব বড় ধরনের হাঁড়ি জাতীয় জিনিসে ভাঁজ করে মৃতদেহকে ঢোকানো হত। সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত খাদ্য-পানীয়াদি। পরবর্তীকালে বাথটব ধরনের কফিন তৈরি হত। এতে ভাঁজ করা মৃতদেহকে কফিনের এক দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হত। পা ছড়িয়ে দেওয়া হত অপর দিকের দেয়ালের দিকে। এর ফলে ফ্লাস্ক ধরনের কফিন তৈরি হত। অসুর অঞ্চলে খননের ফলে পাথর দিয়ে তৈরি করা বহু ভল্ট টাইপের ঘর পাওয়া গেছে যা ছিল পারিবারিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা বা পুরোহিতদের এখানে কবর দেওয়া হত। প্রত্যেকটি ভল্টেই দরজা থাকতো পশ্চিম দিকে। দরজার মুখে পাথর চাপানো থাকত। সহজেই এই পাথর সরিয়ে কবরে ঢোকা যেত। ভল্টের পূর্বপ্রান্তে থাকত প্রদীপ বসানের জন্য কুলুঙ্গি। আসিরীয়রা এই ভল্টগুলিকে পারিবারিক কবর বা ভস্মাধার রাখার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ভস্মাধার-ক্ষেত্রগুলি ছিল কীলকাকৃতি। এগুলি পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি করা হত।

ব্যাবিলনে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শবদাহ করা হত। হয়তো, স্বাস্থ্যের কারণেই এটা করা হত। প্রাচীনতম যে সমাধিক্ষেত্র এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে তা মন্দিরপ্রাঙ্গণে। কিন্তু সুমের-এর বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় এ কবরক্ষেত্র ছিল অতি ছোট। কারণ জনসংখ্যা ছিল সুমের, ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার লোকদের নিয়ে। শুধু কবর দেবার প্রথাই বেশি ছিল, ফলে শহরের কোন অংশ এজন্য সংরক্ষিত থাকত।

সুমেরীয়রা পরলোকগত আত্মাকে বলত গিডিম (Gidim) অর্থাৎ অন্ধকারের সৃষ্টি গিগ-ডিম (gig-dim)। গিডিমের প্রথম অক্ষর অনুচ্চারিত থাকায় উচ্চারণ হত ইডিম বলে। ইডিম-এর উচ্চারণ কখনও হত এডিম। সেমিটিক ভাষায় এডিম্মু। প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে, মৃতের আত্মাকে দেবতা বলে ভাবা হত। তবে মহান কোন দেবতা নয়, ক্ষুদ্র দেবতা। এই দেব-আত্মা মানুষের জীবনে ভাল মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে পারত বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। পূর্বপুরুষদের পূজার ধারা থেকেই আত্মার এই দেবত্ব সম্পর্কে কল্পনা এসেছিল কিনা তা স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। তবে এটা স্পষ্ট, ব্যাবিলনীয়েরা ভাবত যে, শয়তান, রোগের শক্তি, দুর্ভাগ্য ইত্যাদি হল এক ধরনের দুষ্ট ভূত যা নরক থেকে উঠে এসে লোককে হয়রান করে।

ভূত হত তারাই যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ত্রুটি থাকত। সুতরাং এদের পাতালে ফেরত পাঠানোর জন্য নানা ধরনের মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠান করতে হত। তা সত্ত্বেও

ব্যাবিলনীয়েরা বিশ্বাস করত যে, অধিকাংশ আত্মাই প্রেতলোকের নিরানন্দ ছায়া ছায়া জগতে ঘুরে বেড়ায় [এ চিন্তা যে সত্য লেখক প্রত্যক্ষ যোগবলে তা লক্ষ্য করেছেন। পূর্বে যোগ ও পরলোক প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে]।

মৃত্যুর পরেও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক থাকে ব্যাবিলনীয়েরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করত। [এ ধারণা কতদূর সত্য তা ভাববার বিষয়। ঠাকুরপুকুর কলেজের পাশে (ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার বালিকা-বিদ্যালয়) একটি মহিলা শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অলকা দাশগুপ্তের কাছে এ ব্যাপারে লেখক অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনেছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর সূক্ষ্মদেহী স্বামী নানা সমস্যার সময় ছায়া ছায়া মূর্তি ধরে তাঁর কাছে এসে তাঁকে নানা ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতেন। পাঠক ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে জানার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।]। দেখা যায় যে, মৃত্যুর পরেও ব্যাবিলনবাসীরা মৃতের জন্য খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করত। সম্ভবত প্রাচীন বিশ্বাসের আঁচল ধরেই এ ধারণা তাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল যে, জীবাত্মা সত্যিই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। [মানুষের যেমন সূক্ষ্মদেহ আছে তেমনই খাদ্যেরও সূক্ষ্ম অংশ রয়েছে। ফলে সূক্ষ্ম দেহীর পক্ষে খাদ্যের সূক্ষ্ম অংশগ্রহণ করা অসম্ভব কিছু নয়।] পরবর্তীকালে ব্যাবিলনীয়রা যথার্থ খাদ্যের পরিবর্তে শ্মশান বা কবরে প্রতীকী খাদ্য, পানীয় ও পোশাক দান করত। পরে এই প্রতীকের মাধ্যমে পরলোকগত আত্মাব সঙ্গে এই সম্পর্ককে তারা অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করত। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র যে দেবত্বপ্রাপ্ত আত্মার সঙ্গেই যোগাযোগ হত, তা নয়, দৈবী জগতের সঙ্গেও যোগ সম্ভব হত। ব্যাবিলনের প্রত্যেক পরিবারেই প্রতি মাসে পরলোকগত আত্মার জন্য খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি দেওয়া হত। [কট্টর হিন্দুদের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি এই নীতি চালু আছে।]। এই সময় মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতিও সামনে রাখা হত। ব্যাবিলনের রাজকীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতির কাছে নিয়মিত খাদ্য-পানীয়াদি সরবরাহ করা হচ্ছে। আগাদে বা আক্কাডের রাজা সারগণের রেকর্ডে দেখা যায় যে, প্রাচীন সুমেরীয় রাজা এস্টেমেনার প্রতিকৃতির সামনে একটি করে মেষ বলি দেওয়া হত। খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ অব্দে গুডিয়া নামে এক রাজাকে দেখা যায় যে, নিজের প্রতিকৃতির জন্য আবেদন করছেন, যাতে মৃত্যুর পর তাঁর সামনে পারলৌকিক ক্রিয়াদি হতে পারে। রাজকীয় মহাফেজখানার কাগজপত্রে আরও দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের জন্য যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের জন্য এ ধরনের পারলৌকিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে রাজা ও পুরোহিতদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা ছিলই। পরে দেখা যায় সকল পরলোকগত আত্মার জন্যই নানা মন্দিরে প্রার্থনাদি করা হচ্ছে [হিন্দুরা অদ্যাবধি তর্পণের সময় যা করে থাকে]। যে স্থানে এই কাজ করা হত, তাকে বলা হত ব্যাবিলনীয় ভাষাতে 'কিয়ানাগ'—অর্থাৎ 'যেখানে পানীয় দেওয়া হয়'। [তর্পণে অঞ্জলিপূর্ণ জল

দানের মত]। পরবর্তীকালে বলিজাতীয় প্রথা বন্ধ হয়ে এই পানীয় দানের মধ্যেই জীবাত্মাকে খাবার দেওয়া শেষ করা হত। তবে এই কিয়ানাগ-এর সময় অনেককেই বা বা সমাজের সকলকেই খাওয়ানো হত। একটি উৎকীর্ণ লিপিতে বলা আছে যে. কিয়ানাগ খাওয়া হত।

পরলোকগত পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে সুমেরীয়দের আর একটি শব্দ ছিল—কিসিগ (Kisig)। সেমাইটরাও এই শব্দ ব্যবহার করত। 'কিসিগ' শব্দের অর্থ 'রুটি ভাঙা' অর্থাৎ সামাজিক সমাবেশে ভাগ করে রুটি খাওয়া। এই সামাজিক ভোজকে বলা হত 'কিসবা কসাপু'। বছরের চতুর্থ মাস সম্পর্কে অতি প্রাচীনকালে 'সিগ-বা' (sig-ba) এই শব্দ ব্যবহার করা হত। পরে বলা হত কিসিগ নিনাজু (Kisig Ninazu) বা প্রেতলোকের দেবতা নিনাজুর উদ্দেশ্য রুটি ভাঙা (breaking of bread)। এর পরের মাস ছিল নিনাজ-ভোজের মাস। নিপ্পুরের পঞ্জিকাতে এই মাসের বিশেষ উল্লেখ ছিল—আমাদের পঞ্জিকাতে যেমন ৺দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা প্রভৃতি মাসের উল্লেখ থাকে। এই দুই মাস ছিল বর্তমান কালের ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস। এই সময় দিনের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম হওয়াতে মাস দুটিকে অন্ধকারের মাস বলা হত। ধারণা, এই সময় পাতালের দেবতারা উঠে এসে সূর্যকে দুর্বল করে দিত। শস্যদেবতা নিচে নেমে এসে সম্মান পেতেন। [ভারতে এই সময়ই দক্ষিণায়নের কাল—যা অশুভ। দেবতারা এই সময় নিদ্রিত থাকে বলে বিশ্বাস। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস অবধি সময় দেবতাদের কাছে একরাত্রি মাত্র। ঊর্ধ্বদেশের (space) বা ভিন্ন গ্রহের ঘূর্ণনের বেগের উপর আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের এই হেরফের হয়। Theory of Relativity-তে এই চিন্তা সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে]। রুটি ভাঙার মাসের কথা অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের কথা প্রথম সেমিটিক বংশীয় রাজা অম্মিদিতন (Ammiditana)-এর একটি পত্র থেকে জানা যায়। এখানে অম্মিদিতন মারডুক দেবের পুত্র সুম্ম ইলি (Summa Ili)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, 'লেনেনিগ মাসের কিসিগুগের জন্য মাখন ও দুধ দেওয়া উঠে গেছে। যখনই তুমি এই বার্তা পাঠ করবে—তক্ষুনি আশা করি তোমার দূত ব্যাবিলনে এসে ৩০টি গোরু ও ৬০ 'ক' (Ka) মাখন নিয়ে যাবে। যতক্ষণ কিসিগুগ (Kissigga) শেষ না হয় তিনি যেন আমাদের দুগ্ধদান করা থেকে বিরত না হন।' রুটি ভাঙার সামাজিক সমাবেশের কথা অর্থাৎ একত্রে ভোজনের কথার এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আত্মার কল্যাণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সেমাইটরাও এই রীতি গ্রহণ করেছিল। এসুকি হারানে (বর্তমান ইরাকে) হররন (Harran) নামে চন্দ্র দেবতার মন্দিরে এক পুরোহিতের আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। তাতে তৃতীয় কলমে পরলোকগত আত্মার কল্যাণে মাসিক বলিদানের কথা উল্লিখিত আছে। এই মাসিক অনুষ্ঠানের জন্য পোশাক পরার পর তিনি বলছেন—চর্বিওয়ালা ভেড়ার মাংস, রুটি, খেজুরের মদ, সাইপ্রেস এবং বাগানের ফল মৃতের আত্মাদের উদ্দেশ্যে ভাঙছি। তাঁদের সামনে

পছন্দমত সুগন্ধি রাখছি।' এই পুরোহিত রুটি ভাঙছেন তার পরলোকগত পূর্ব-পুরুষদের জন্য। সুগন্ধিদণ্ড দ্বারা এখানে পরলোকগতদের প্রতিকৃতিকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। সামাজিক ভোজ ও পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সুগন্ধিই হল তাদের প্রাপ্য। দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণকালে পরলোকগত দিব্য আত্মাদের জন্য আসন পাতা হত, যাতে তাঁরা সেখানে বসতে পারেন এবং ভোজে অংশ নিতে পারেন। রাজা অসুরবনিপল রাজকীয় পূর্বপুরুষদের জন্য এই ভোজের ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এমন একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন 'পূর্বগামী রাজাদের জন্য আমি আবার রুটিভাঙা ও পানীয় দেবার প্রথা প্রবর্তন করছি।'[১] রাজা নিজেই এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তাঁর একটি বক্তব্য থেকেই একথা জানা যায়। উক্তিটি এই : 'রাজা হিসেবে নয়, প্রধান পুরোহিত হিসেবে এই রুটি ভাঙছি।' মৃতের উদ্দেশে জলদান প্রথা থেকে 'জলদানকারী' (pourer of water) শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই জল দান করতেন মৃতের কোন নিকটতম আত্মীয় [আমাদের বিশিধ শ্রাদ্ধের মত]। জলদান একটি বড় কল্যাণকর ঘটনা। এইজন্য সেমাইটরা সব চাইতে বড় যে অভিশাপ দেয়, তা এই : 'ঈশ্বর তাকে উত্তরাধিকারী ও জলদানকারী থেকে বঞ্চিত করুক।'

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরা বিশ্বাস করত যে, আত্মার শান্তি ও অমরত্ব নির্ভর করে মাসিক পারলৌকিক ক্রিয়ার উপর। নিকট আত্মীয়েরা এটা করলে তবেই আত্মা শান্তি ও অমরত্ব লাভ করে। পুত্র সন্তান উত্তরাধিকারী থাকলে তবেই প্রাক্তন পুরুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। [এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সে সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদেরও এই ধারণা আছে।] এইজন্য রাজারা দেবতাদের কাছে প্রার্থনার সময় পুত্র কামনা করতেন। রুটি ভাঙার জন্য প্রত্যেকটি পরিবার পুরোহিতদের রীতিমত দান করত। অনেকে এজন্য স্বতন্ত্র মন্দিরও তৈরি করত। এই মন্দিরকে বলা হত ই-কিসিগ্গ (e-kisigga) অথবা 'বিট কসপ কিস্পি (bit kasap kispi)। সর্ব আত্মার কল্যাণ কামনায় রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থেরও সংস্থান রাখত।

তবে ব্যাবিলনে মৃতের জন্য কি ধরনের শোকপ্রকাশ করা হত, সে বিষয়ে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হয়তো বা শোকপ্রকাশ করার জন্য ভাড়াটে ব্যক্তি থাকত। প্রাচীন সুমেরীয় একটি উৎকীর্ণ লিপিতে এ ধরনের শোককারীর জন্য অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করার উল্লেখ আছে। অসুরবনিপলের সময়ের একটি পত্রে রাজার মৃত্যু-কান্নার উল্লেখ আছে। এ সময় পারিষদবর্গ শোকের পোশাক পরতেন। হাতে সোনার আংটিও পরতে হত। মাহিনা করা গায়কেরা শোকগীত গান করত।[২] কোন রাজকর্মচারীর কবর দেওয়া হলে রাজাকে এইভাবে বলা হত : 'আমরা যে সমাধি তৈরী করেছি তাতে তিনি এবং তাঁর পরিবারের মহিলারা শান্তিতে আছেন। [সম্ভবত মৃতের

১ King, chronicles ii, [London 1907] 79, 5
২ Harper, Lettere, Chicngo, 1900, p. 473

সঙ্গে যাবার জন্য এদের হত্যা করা হত।] প্রার্থনা শেষ হয়েছে। তারা সমাধিস্থলে রোদন পর্বও শেষ করেছেন। মৃতকে দেবার জন্য যা পোড়ানো দরকার, পোড়ানো হয়েছে। যেভাবে তৈলসিক্ত করা দরকার তাও বাদ যায় নি। গৃহে বিচ্ছেদানুষ্ঠান এবং ধৌতি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। গৃহও শুদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য যে-সব অনুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও শোকগীত প্রয়োজন কিছুই বাদ যায় নি। তারা সব শেষ করেছেন।'[১]

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, গিলগামেশ তাঁর মৃত সহকর্মী ইয়াবনির জন্য ছয় দিন ছয় রাত শোকপ্রকাশ করেছিলেন। ব্যাবিলনের শেষ রাজা নবোনিডাস-এর মা মারা গেলে সমগ্র রাজপরিবার ও সৈন্যরা শোকের পোশাক পরে তিনদিন কান্নাকাটি করেছিলেন। পরের মাসের সব কটি রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছিল।

ব্যাবিলনে মৃতদেহে মলম মাখার কথা তেমন জানা যায় না। তবে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্যাবিলনীয়েরা মৃতদেহে মধু মাখাতেন। একটি গ্রন্থে সেডার (পাইন জাতীয় বৃক্ষ, লেবাননে যথেষ্ট আছে) তেল মাখাবারও উল্লেখ রয়েছে। এ-সব উল্লেখ থাকলেও মনে হয় ব্যাবিলনে সমাধি দেবার সময় দেহে কোন মলম মাখানো হত না। পরবর্তীকালে হয়তো মিশরের প্রভাবে এই মলম মখানো হত।

রুশ ঐতিহাসিকদের মতে, পরলোক সম্পর্কে ব্যাবিলনীয়দের ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না। তারা মনে করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা মাটির নিচে চলে যায় এবং আশাহীন বিমর্ষ জীবন যাপন করে। মৃত্যুর পর আত্মার পুরস্কার বা শাস্তি সম্পর্কে তাদের তেমন কোন তত্ত্ব ছিল না। মৃত্যুর পর আত্মা বিভিন্ন প্রকার ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তারা এমনও ভাবত না। তারা বরং পরলোক অপেক্ষা ইহলোক নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতেন। মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা সম্পর্কে তারা তেমন সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেননি।[২]

১ Harper, 437
২ History of Religion, Sergei Tokarev, p. 206.

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধদের মৃত্যু, জন্ম ও পরলোকের ধারণা

ভারতীয় দর্শনের পথ ধরেই বৌদ্ধ দর্শনের উদ্ভব। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাইরে নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ফলে সেই সেই দেশের চিন্তাধারা এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে নানা দেশে এর নানা রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। নইলে মূল বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ভারতীয় দর্শনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

জন্ম, মৃত্যু ও আত্মার অবস্থান বৌদ্ধদের মতে কর্মফলের উপর নির্ভরশীল [এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের চিন্তা যে কতদূর সত্য যোগদর্শন যাদের হয়েছে, তাঁরাই তা জানেন। তবে এই কর্মফলবাদ হিন্দুদেরও। ভগবদ্গীতায় কর্মফলবাদ স্পষ্টভাবে উল্লেখিত।]। মৃত্যু হবার পর মানুষ কে কোথায় অবস্থান করবে, তা নির্ভর করে তার কর্মের উপর। মৃত্যুর পর কর্মফলের সংস্কার (বেগ) সূক্ষ্মসত্তায় ভর করে পাঁচটি স্কন্ধ বা স্থূলদেহের উপাদান তৈরি করে। এত দ্রুত ঘটনাটি ঘটে যায় যে, সূক্ষ্ম সত্তা তার প্রাক্তন ব্যক্তিত্ব হারাবার আগেই নতুন করে ছটি বিভিন্ন স্তরের এক এক স্তরে জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ কর্মফল অনুযায়ী কেউ হয় দেবতা, কেউ মানুষ, অসুর, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা ও প্রেত। প্রেতলোকে সবচেয়ে কম শাস্তির সময় হল পাঁচশ বছর। তবে সেখান থেকেও কেউ ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারে। [উপক্রমণিকা অংশে 'যোগ ও পরলোক' অংশ দ্রষ্টব্য।] আবার ঊর্ধ্বলোক থেকেও কেউ মর্ত্যে বা নরকে নামতে পারেন। যারা অপকর্ম করে যমদূতেরা তাদের প্রেতলোকের অধীশ্বর যমের কাছে নিয়ে যায়। [এই ধারণা সত্য নয়। যোগীরা যোগদর্শনে তা জানতে পেরেছেন।] যমের নির্দেশে প্রেতলোকে তাদের বাস করতে হয়।[১] উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধধর্মেই এই ধারণা বেশি প্রবল। এখানে ধারণা যে, দশটি বিচারকের দরবারে মৃত্যুর পর বিচার হয়। যম বা যেনলো হল এই বিচারকদের মধ্যে একজন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন এবং কতদিন কে কি ভোগ করবে সময় বেঁধে দেন। মৃত্যুর পর পাপাত্মাদের পরনে থাকে কালো পোশাক, আর ধার্মিকের অঙ্গে উজ্জ্বল সাদা পোশাক। [মুসলিম মৃত্যুতত্ত্বের সঙ্গে এর মিল আছে।] ধর্মাত্মার গুণ কতটুকু তা পরিমাপ করার জন্য দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পুণ্যাত্মার পুণ্যের পরিমাণ বিচার করা হয়। পাল্লার ওজনে থাকে পাপ। [এখানে যেন প্রাচীন মিশরীয় পুণ্যাপুণ্য বিচারের জন্য মানদণ্ডে মাপার একটি ছায়া পড়েছে।]। যদি পাপের ভার পুণ্য অপেক্ষা বেশি হয় তবে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি পেতে হয়। যদি পুণ্যের পরিমাণ বেশি হয়, তবে পুরস্কার মেলে। পাপপুণ্য বিচারের

১ Monier Williams, Buddhism 1889, p. 114, f.

এই দৃশ্য নানা বিহারগাত্র ও পুস্তকে অংকিত আছে। মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তিও আছে। বিচারকক্ষ পার্থিব বিচারকক্ষেরই মত। মৃত্যুর পর একটি সেতু পার হতে হয়—এ বিশ্বাসও বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে। যারা সৎ তারা সহজেই এই সেতু পার হতে পারে, যারা পাপী তারা পড়ে গিয়ে কষ্ট পায়। [আদিবাসীদের বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে মিল আছে। যে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।] বিচারক-নির্দিষ্ট সময় পার হলেই আত্মার পুনর্জন্ম হয়। পুনর্জন্মের এই ধারণা চীনের তাওবাদীদের মধ্যেও আছে।[১]

বৌদ্ধরা জগৎসৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে কল্পতে বিশ্বাস করে। কল্প একটি অতি দীর্ঘ সময়। প্রতি কল্পে বর্তমান বিশ্ব ধ্বংস হয় প্লাবন, অগ্নুৎপাত বা ঝড়ে। কিন্তু বিশ্ব ধ্বংস হলেও জীব ধ্বংস হয় না। অধিকাংশই আরও উচ্চ জগতে জন্ম নেয়, যার নাকি ধ্বংস নেই [এই উচ্চ জগৎ কি পরমাত্মা যাতে জীব কর্ম অনুযায়ী সূক্ষ্ম দেহে বিরাজ করে? কিম্বা ভিন্ন গ্রহ যোগে যা দর্শন হয়? কিন্তু ওরকম ধারণা করা হলেও সে ধারণা ভুল। কারণ বিজ্ঞান বা উচ্চ দর্শন কোনটাই এ কথা স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের **Big Bang** তত্ত্ব, তন্ত্রের সৃষ্টিরহস্য বা সংস্কার প্রভৃতি এক্ষেত্রে বিচার্য। লেখকের সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানের তৃতীয় খণ্ডও এ বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারে বা **Woodrofle** সাহেবের **'The Serpent Power'** গ্রন্থ।]। যারা কর্মফল অনুযায়ী নরকে বাস করে তারা ভিন্ন জগতে নরকবাসী হয় অর্থাৎ সেখানে কর্মফল অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। তবে জগৎ ধ্বংসের সময় এখনও বহুদূর।

বৌদ্ধদের এই প্রলয়সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে পার্থিব জগতে তাদের মৃত্যুতত্ত্বও জড়িত রয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে তার নিশ্চিত উত্তর স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই দিয়েছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়—'সবারই কি মৃত্যু হবে?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'হে ভিক্ষু, মানুষের আয়ু অল্প। আমাদের সৎকর্ম করা উচিত। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে না এটা হতে পারে না [ভগবদ্গীতাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে, যেমন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।']। জীবনের শেষ মৃত্যুতেই হবে। মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। মৃত্যুর সঙ্গে রয়েছে দৈহিক ও নৈতিক দুঃখ বেদনা। আরও রয়েছে—শোক, তাপ, দুঃখ বেদনা, হতাশা ইত্যাদি। মৃত্যু হল নবজীবনের উন্মেষস্বরূপ, কারণ মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার জন্মাতে হয়। মৃত্যু আর দণ্ড বা শাস্তি এই জন্য বৌদ্ধদের কাছে সমার্থবোধক। এই জন্যই হিন্দুরা মৃত্যুকে এড়াবার উদ্দেশ্যে (জন্ম ও মৃত্যু), অমরত্ব লাভের জন্য ধর্মীয় জীবন-যাপন করে—ব্রহ্মচর্য পালন করে। তারা মনে করে, এমন করা হলে সূর্যেরও উর্ধ্বে যাওয়া যায়। [অনন্তজ্যোতির জগতে?]

---

১ **Edkins, Chinese Buddhism, 188, Passim ; Asiatic Journal xxxi, [1840] 209 f. Religion of China, 1880. p. 119 f. etc.**

মৃত্যু যেমন ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি মানুষের মনে সংবেগ অর্থাৎ ভোগ বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণাও সৃষ্টি করে। শ্মশান বৌদ্ধদের মনে অদ্ভুত এক বৈরাগ্য আনে। দেহের অনিত্যতার স্বরূপ বুঝতে পেরে তারা নিত্যের সন্ধানে আগ্রহী হয়।

মৃত্যু নিশ্চিত এ কথা জেনেও বৌদ্ধরা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য চেষ্টা করে। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা যে উপায় চিন্তা করেছে এক কথায় তা হল সমস্ত প্রকার বাসনার হাত থেকে অব্যাহতি, যেটা হিন্দু সংস্কৃতিরও মূল কথা। যিনি কামনা-বাসনা মুক্ত হয়েছেন তিনি অর্হতরূপে পরিচিত। অর্হত শব্দের অর্থ পবিত্র সন্ন্যাসী যিনি সত্য জ্ঞান লাভ করেছেন।[১] মৃত্যুকে তিনি তখন আর ভয় করেন না। নির্বিকার চিত্তে মৃত্যুকে মেনে নেন। বাসনা মুক্ত হলে তিনি জানতে পারেন যে, জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তের হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু হল স্থূল দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া, যথার্থ বৌদ্ধের ক্ষেত্রে মৃত্যু হল নির্বাণ—সমুচ্ছেদ।[২]

বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু যদি ঘৃণার বিষয় দেবতাদের কাছেও তাই, যদিও কিছু কিছু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দেবতারা সম্পূর্ণ রূপে সুখী।[৩] তবে দেবতাদের মৃত্যুর মধ্যে মানুষ যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা নেই। তথাপি তাদের জীবন যেমন মানুষের চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক, তেমনি সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও বেশি বেদনার কারণ। তাঁদের মৃত্যুযন্ত্রণা নেই বটে, তবে রূপান্তরের যন্ত্রণা আছে।[৪] এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারণাও একই ধরনের।[৫]

বৌদ্ধদের মৃত্যুবর্ণনা :—বৌদ্ধরা নিরীশ্বরবাদী হলেও নাস্তিকদের অপেক্ষা মৃত্যুর ব্যাপারে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধি আকাশে হারিয়ে যায়। অন্যান্য উপাদান, যেমন, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অনুরূপ বস্তুতেই মিশে যায়। পাখি যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে বেড়ায়—আত্মার রূপান্তর সম্পর্কে বস্তুগ্রাহ্য এই ভারতীয় ধারণাকেও তারা সমর্থন করে না। বৌদ্ধরা মনে করে যে, মৃত্যু একটি জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু হল জন্মকালে নানা উপাদান দিয়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তা ভেঙে যাওয়া।

১ History of Religion, Sergei Tokarev, p. 306.
২ Majjhima, ii, 223, Anguttara ii, 173, Therigetha 196, 703, 705, Dhammapada, 39
৩ Anguttara v 291
৪ H. C. Warren, Buddhism, Cambridge, Mass, 8196, p 181
৫ Vishnupurana vi, 5

এই ভেঙে যাওয়া বা গলে যাবার কারণ, কর্মফল আস্বাদন করা। ভৌত ও মানসিক সত্তা কোনটাই স্থায়ী নয়। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিনিয়তই স্থূল দেহের মৃত্যু হচ্ছে। চিন্তারও পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন উপাদান দিয়ে যে একটি দেহ তৈরি হয়েছিল মৃত্যুতে সেই "এক" অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশ হয়। তার উপাদানগুলি অনুরূপ উপাদানে মিশে যায়।

ভৌত উপাদান দিয়ে তৈরি যে দেহ, বৌদ্ধরা তাকে বলেছে স্কন্ধ। এই স্কন্ধের স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু বুদ্ধি বা বিজ্ঞান একটু ভিন্ন ধরনের। এই জন্য দেহ ও বুদ্ধিকে তারা শহর ও শহর-পরিচালকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অভিধর্মে বলা হয়েছে, অস্তিত্বের উৎস থেকে প্রথম চিন্তার উদয়। এই চিন্তা থেকে যে নব-প্রজন্মের বীজ তৈরি হয় তা থেকে নতুন চিন্তা বা বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে। অস্তিত্বের পরিচালক হল এই বুদ্ধি। একে বলা হয় ভবাঙ্গ অথবা ভবাঙ্গ-সঙ্গতি। এই চিন্তাই ঐক্যবদ্ধভাবে অপ্রতিহত বিকাশের পথে এক মানসিক প্রবাহ সৃষ্টি করে, যেমন নদীর প্রবাহ। এই আত্মাই সমস্ত চিন্তার উৎস। মৃত্যুকালে চিন্তারূপেই এটা থেকে যায়। ভৌত উপাদান ভৌত উপাদানের মধ্যে মিশে যায়। জীবনের একটি সত্তা, ভবাঙ্গ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভিত্তিতে নতুন নতুন সত্তার উদয় হয়। মৃত্যুকালে যে চিন্তাপ্রবাহ একটি সত্তার মধ্যে থাকে পরজন্মে সেই চিন্তাপ্রবাহ অনুযায়ীই নতুন সত্তা রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং মৃত্যুকালে ভবাঙ্গের মৃত্যু, অর্থাৎ স্থূল দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু চিন্তাপ্রবাহ থেকেই যায়। সেই জন্য মৃত্যুতে যা হয়, তা হল— চ্যুতি-চিত্ত —অর্থাৎ স্থূল দেহ থেকে চিন্তার বিচ্যুতি। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই জন্য মৃত্যু সম্পর্কে এই ধরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তখন 'মৃতব্যক্তি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে তার চিন্তাপ্রবাহ আত্মার কাছে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাপ্রবাহ শুরু হয়। এবং চিন্তাপ্রবাহ নতুন ভবাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর খেলা অর্থাৎ বুদ্ধিআশ্রয়ী আত্মা ও ভবাঙ্গে আত্মার নব প্রজন্ম চলতে থাকে।'

ভিন্নভাবে বলতে গেলে—মৃত্যু মানে ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু। এই ইন্দ্রিয়কে বলা যায় জীবিতেন্দ্রিয়। এই জীবিতেন্দ্রিয় নির্ভর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মসত্তার উপর। সূক্ষ্মসত্তাই জীবিতেন্দ্রিয়ের আশ্রয়, যেমন পদ্মের আশ্রয় জল। বেদান্ত একে বলে মুখ্যপ্রাণ বা বায়ু। সুতরাং মৃত্যু মানে জীবিতেন্দ্রিয় থেকে আত্মার বিচ্যুতি। কেউ কেউ আবার জীবিতেন্দ্রিয় ও আত্মার মধ্যে অন্তরাভব নামে আর একটি সত্তার কথা ভেবেছেন। এর মধ্যে জন্মান্তরের ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির ভূমিকাই মুখ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণশক্তি ও সংস্কার একই স্তরে রয়েছে, আত্মাকে জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তে ঘুরতে হবে।

জীবন থাকে দেহে। দেহ বেঁচে থাকে ইন্দ্রিয়ে। আত্মা এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সুতরাং দেহ যখন ইন্দ্রিয়বোধ থেকে চ্যুত হয় তখনই তা মৃত বলে ঘোষিত হয়। ইন্দ্রিয়বোধ বলতে বোঝায় জীবিতেন্দ্রিয় বা কায়েন্দ্রিয়, অর্থাৎ

কায়া বা দেহের ইন্দ্রিয়। বিজ্ঞান বা বুদ্ধি নির্ভর করে কায়েন্দ্রিয়ের উপর। এই বুদ্ধি মৃত্যুকালে দেহের এমন এমন অংশে বিরাজ করে যা থেকে কর্মফল অনুসারে তার নতুন জন্ম হবে। যেমন, নিকৃষ্ট স্তরে যার জন্ম হবে তার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান থাকবে পায়ে। যে মানুষ হয়ে জন্মাবে তার বুদ্ধি থাকবে নাভিতে। যে দেবত্ব লাভ করবে তার বুদ্ধিসত্তা থাকবে হৃদয়ে [হিন্দু তন্ত্র মতে পা হল রসাতল] নাভি তেজের ক্ষেত্র, হৃদয় বায়ুর ক্ষেত্র। সংস্কারের ভার ও লঘুতা অনুপাতে সূক্ষ্ম দেহ এই সব স্তরের একটি স্তরে স্থূলদেহের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অবস্থান করে]।

অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধশাস্ত্রে জীবিত বা জীবিতেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে 'আয়ু' (প্রাণ), উসমণ (তেজ) প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এইভাবে প্রশ্নোত্তরে এর আলোচনা করা হয়েছে, যেমন,

—পঞ্চেন্দ্রিয় কিসের উপর নির্ভর করে ?

—আয়ু বা প্রাণ।

—জীবন কিসের উপর নির্ভরশীল ?

—তেজ বা তাপ।

—তেজ কিসের উপর নির্ভর করে ?

—তাপ।

এই জন্যই বোদ্ধরা মৃত্যুকে বলেছে তাপের অভাব। প্রাচীন বৌদ্ধতত্ত্বে বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকে আয়ুর উপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বুদ্ধের শেষজীবন সম্পর্কে প্রাচীন বৌদ্ধভাষ্যে বলা হয়েছে, গৌতম বুদ্ধ আয়ু সংখ্যা অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ তার বাকী জীবনকে (পরবর্তী জীবন) অতিক্রম করে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছিলেন)। সংস্কৃতে লেখা দিব্যাবদান ও মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই আশীর্বাদধন্য পুরুষ (গৌতমবুদ্ধ) এমন নিবিড় মনঃসংযোগে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রাণ ও গুণ সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ ক'রে (অর্থাৎ প্রাণাতীত ও গুণাতীত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, যাকে বলা যায় নির্বাণ—জীবিতসংস্কারণ অধিষ্ঠায়।) তিনি প্রাণগুণ (আয়ু-সংস্কারাণ) জয় করেছিলেন। 'সংস্কারাণ' দ্বারা চিন্তাসমষ্টিসমূহ বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। সৌত্রান্তিকদের মতে আয়ু বলতে বোঝায় 'প্রাণ', যার অর্থ বহু সংস্কারের (চিন্তাবেগের) একত্র সমাবেশ। এই সংস্কার (বহু চিন্তাবেগ)-এর পরে আর কিছু নেই। মজ্ঝিম মতে আয়ুসংস্কার হল—আয়ু, তাপ, ঘনসংবন্ধ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। মৃত্যুকালে এগুলিই নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্থূল সত্তাতে এগুলি নাশ হলেও প্রাণ-সত্তাতে থেকে যায়। গভীর সমাধি হলেও সহজে এগুলি নাশ হতে চায় না।

দেহের মূল শক্তি হল প্রাণ (শ্বাস-প্রশ্বাস)। এই প্রাণের চরিত্র নির্ভর করে দেহ ও মনের উপর। সমাধিকালে দেহ ও মনের ক্রিয়া যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন প্রাণও স্তব্ধ হয়, অর্থাৎ কুম্ভক হয়। বৌদ্ধরা মনে করে যে, প্রাণিন অর্থাৎ প্রাণের

অধিকারী যদি ভবিষ্যতের জন্যও প্রাণকে স্তব্ধ করতে পারে তবেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ 'সংস্কার', যার জন্য বার বার এই জন্ম, প্রাণের কার্যকলাপকে চিরতরে বন্ধ করা গেলেই তার অবসান ঘটে। অর্থাৎ জীবিতকালেই কুম্ভক দ্বারা মনের ক্রিয়াকে নাশ করতে পারলে সংস্কারের যুগ যুগ সঞ্চিত চিন্তাপ্রবাহের নাশ হয়। সত্তার যথার্থ মৃত্যু একমাত্র তখনই সম্ভব, অর্থাৎ শূন্যতম সত্তায় স্থিতি সম্ভব। একেই বলা যায় নির্বাণ।

বৌদ্ধমতে আয়ুর পরিসর : বৌদ্ধরা প্রশ্ন তুলেছেন—অস্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? অনন্ত কেন ছোট ছোট নানা খণ্ডে ধারাবাহিকতা রেখেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন? কর্ম স্বভাবতই নানা ধরনের। একই ব্যক্তি নানা ধরনের কাজ করে থাকেন। অবশ্য কট্টর বৌদ্ধরা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কর্মের কেউ মালিক আছে বলেও তারা ভাবে না। নানা ধরনের কাজ একই চৈতন্য-প্রবাহের মধ্যেই প্রাপ্য। এই চৈতন্য-প্রবাহের মধ্যেই সত্তা কোথাও রয়েছে দেবতা হয়ে, কোথাও মানুষ, কোথাও নিকৃষ্ট জীবরূপে। এই সত্তা বিশেষ বিশেষ আত্মভাবে বিশেষ বিশেষ কর্মফল লাভ করে থাকে। এই কর্মফলজাত সংস্কার পরবর্তীকালে অর্থাৎ পরজন্মেও কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। মৃত্যু হল সত্তার একটি বিশেষ অবস্থায় কর্মফলভোগ শেষ ও নব জন্মের দিকে অগ্রগতি।

জীবনপ্রবাহের এক একটি অধ্যায়ে আয়ুর পরিসর কর্মফল দ্বারা সীমিত। দেবতা, মানুষ, ইতর জীব সবার ক্ষেত্রেই ঘটনা একই ধরনের। দেবতারা ভাল কর্মের ফলভোগ শেষ হলেই দেবত্ব হারাবে অর্থাৎ তাদের দিব্যসত্তার মৃত্যু ঘটবে।

তবে অনেক সময় কর্মফল শেষ হবার আগেই জীবন শেষ হয়। বৌদ্ধদের মতে এমন হয় (বিশেষ করে শুভ আত্মা এবং দেবতাদের ক্ষেত্রে) এই কারণে যে, পুণ্যফল থাকা সত্ত্বেও দুষ্ট শক্তি এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তুলনায় পুণ্য শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে। সেইজন্য সম্পূর্ণ পুণ্য ফল ভোগ করার আগেই কারো মৃত্যু হতে পারে। পুণ্যের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ক্লেদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পাপের বীজ থেকে যায়। এক সময় তা মহীরুহের মত বড় হয়ে উঠে পুণ্যকে আড়াল করে ফেলে। অনেক সময় প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়াতেও পুণ্য কর্মফল থাকা সত্ত্বেও অনেকের মৃত্যু হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যে অবস্থার মধ্য থেকে তার মৃত্যু হয় পুনরায় সেই অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যেই সে জন্ম নেয়। আবার পুণ্যবান ব্যক্তিও যদি অকস্মাৎ এমন কাজ করে যার ফলভোগ দ্রুত হওয়া দরকার সে ক্ষেত্রেও তার মৃত্যু হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণশক্তি ক্ষয় হবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

জীবনের স্বাভাবিক পরিসর অতিক্রম করে যার মৃত্যু হয় তাকে বৌদ্ধরা বলে—কালমরণ। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে মৃত্যু। মৃত্যু হয় বায়ু পিত্ত কফের যথার্থ কাজ না হওয়াতে। কোনটার আধিক্য বা দৌর্বল্য, অথবা সমবেতভাবে তাদের স্বাভাবিক কাজ না করাই মৃত্যুর কারণ। চার ধরনের রোগ আছে:—এই রোগগুলির

প্রত্যেকটির জন্য যদি একশটি হয় অকাল মৃত্যু তবে একটি হয় কালমরণ। সর্বসাকুল্যে চারশ চার ধরনের রোগ আছে যার দ্বারা মানুষের মৃত্যু হয়। অকাল মৃত্যুর সমকক্ষ আর এক ধরনের মৃত্যু আছে যাকে বলে 'অন্তরা মৃত্যু' অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে-কোন সময়ে মৃত্যু। সমস্ত লোকেরই এধরনের মৃত্যু হয় শুধুমাত্র উত্তরকুরুদের ক্ষেত্র ছাড়া। সাধক ব্যক্তি, যাঁরা সাধনা দ্বারা নির্বাণত্বপ্রাপ্ত হন, তারা আয়ুরেখা থাকা সত্ত্বেও সময়ের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। অনেকে একে বলেন 'অন্তরাভব'। সাধনার দ্বারা প্রাক্তন কর্মফলও এই সব সাধুব্যক্তি এড়িয়ে যেতে পারেন। এতে যেমন সময়ের পূর্বেই মৃত্যু হতে পারে আবার মৃত্যুসময় অতিক্রম করে বেঁচেও থাকা চলে, গৌতমবুদ্ধ যা করেছিলেন। তিনি নিজের পরমায়ু তিন মাস বৃদ্ধি করেছিলেন মানুষের উদ্ধারের জন্য।[১] এই তিন মাস অধিক পরমায়ু বুদ্ধ মৃত্যুমারকে জয় করে অর্জন করেছিলেন। 'মার' অর্থ শয়তান। এই শয়তানই মৃত্যুর কারণ। 'মহাপরিনির্বাণে' মৃত্যুর রাজ্য জীবনের রাজ্যে পরিণত হয়, যাকে বলে 'মহাব্যুৎপত্তি।' বোধিসত্ত্বরা এই পর্যায়ে প্রায় অনন্ত জীবনের অধিকারী।

শেষচিন্তা ও মৃত্যু: হিন্দুরা মনে করে মরার সময় মনে যে চিন্তার উদয় হয়—পরবর্তী জীবনে সেই চিন্তাই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে।[২] যারা ভক্তিবাদী তারা এই চিন্তাকে বেশি প্রশ্রয় দেন। বৈষ্ণবেরা ভাবেন মৃত্যুকালে কৃষ্ণচিন্তা হলে কৃষ্ণের কাছেই যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মতে কর্মফল বিচারের পর ঈশ্বরের মানুষকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্জন্ম দেন। বৌদ্ধরাও হিন্দুদের এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুকালের চিন্তাকেই পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মৃত্যুকালের চিন্তাই সূক্ষ্ম সত্তার সঙ্গে যায়। সেই চিন্তা নিয়েই সূক্ষ্মসত্তা আবার জন্ম গ্রহণ করে। ফলে যদি কেউ ভাল চিন্তা নিয়ে জন্মায়, তবে তার ভাল জন্ম অর্থাৎ ভাল ঘরে জন্ম হয়। যদি খারাপ চিন্তা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তবে সেই খারাপ পরিবেশেই জন্ম নেয়। সূক্ষ্ম জগৎ ও স্থূল জগৎ সর্বক্ষেত্রের জন্য এই ভাবেই হয়ে থাকে। কেউ যদি মৃত্যুকালে শূন্য চিন্তা করে অর্থাৎ চিন্তাহীন অবস্থায় মরে তবে সে শূন্যতা, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে। মৃত্যুকালের শেষ চিন্তা যদি পরজন্মের ভাগ্য নির্ধারক হয় তবে তার প্রাক্তন কর্মফল জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তার প্রভাব ইহজন্মের অন্যান্য কর্মের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

১ এর বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। যোগে দেহের প্রাণশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী দ্রুতগতি হয়ে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি এসে যায়। এতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। গতির উপর যে আয়ু বৃদ্ধি হয় তার প্রমাণ দিয়েছে বর্তমান Particle Physics. এতে দেখা যাচ্ছে দেশ (Space) জাত Particle গুলির কোনটার ঘূর্ণন থাকে ½, ⅓, ⅓ অংশ ইত্যাদি। কিন্তু Particle-এর গতি যদি হয় আলোর গতির ৮০% তবে ঘূর্ণনের সময় হয় ১·৭ আলোর গতির ৯০% হলে এর ঘূর্ণন হয় ৭ বার।

২ ভগবদ্গীতা, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ পাঁচ ও পরপর।

হতে পারে। যদি পূর্বজন্মের কর্মফল-এর প্রভাব বেশি থাকে তবেই পরজন্মের চরিত্র নির্ধারণে সে প্রভাব ফেলতে পারবে।

মৃত্যুর সময় মানসিক ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার থাকে না। ফলে যে কামনা-বাসনা জীবনে বেশি তাই এসে চিন্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং অভিধর্মসঙ্ঘে জীবনকে সেই ভাবেই পরিচালিত করতে বলা হয়েছে যাতে মনের উপর বাসনার ছায়া মৃত্যুকালে বেশি করে পড়তে না পারে। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'করুণা'-চিন্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তা তেমন গ্রহণীয় নয়। বৌদ্ধরা মনে করে যে, শেষ চিন্তাকে মৃত্যুর মুহূর্তে এসে তার জন্মের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। মৃত্যুকালে শুভ চিন্তা মনে খুব কমই উদয় হয়। সুতারং এর ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বর্গবাস হলেও সেই পুণ্যফল নষ্ট হয়ে নরকে পতন হতে পারে। মৃত্যুকালে কি ধরনের চিন্তা মনে আসবে তা পূর্বাহ্নেই স্থির করা সম্ভব নয়; তবুও চেষ্টা করলে মনে ভাল চিন্তা আনা যেতে পারে।

মিলিন্দপঞ্হোতে এই ধরনের আলোচনা পাওয়া যায় যে, রাজা মিলিন্দ অর্থাৎ মিনান্দার প্রশ্ন করছেন, বৌদ্ধরা বলে যে, সারা জীবন দুষ্কর্ম করেও কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে বুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারে তবে দেবতা হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে! তারা আরও বলে যে, একটি মৃত্যুর পর শুদ্ধ হয়ে কোন লোক পুনর্জন্ম নিতে পারে। চিন্তার ক্ষেত্রে এখানে কি কোন বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে না? এর উত্তরে নাগার্জুন বলেছিলেন, ছোট্ট একটুকরো পাথরও কি নৌকো ছাড়া ভাসমান হতে পারে? পাথর ভর্তি একশত গাড়িও কি নৌকোর উপর ভাসমান হতে পারে না? ভাল কাজই হল নৌকো-স্বরূপ।

মহামোগ্গল্লান এক হতভাগ্যকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দেখেন। তাকে দয়ার্দ্র হৃদয় সুলসা কয়েকটি রুটি দেন। মহামোগ্গল্লান মনে করেন যে, এই পুণ্যকর্মহীন লোকটি নরকে যাবে। কিন্তু সে যদি আমাকে এই রুটিগুলি দেয়, তবে স্বর্গে দেবতাদের রাজ্যে জন্মাবে। এই ভেবে তিনি লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ান। লোকটি তখন ভাবছিল, এই রুটি খেয়ে কি হবে? আমি যদি এগুলি দিয়ে দিই তাহলে পরলোকে যাত্রার সময় আমার পাথেয় হবে। কিন্তু যেহেতু সুলসা সম্পর্কেও তার মনে একটা মমতা জেগেছিল, কারণ রুটিগুলি সে-ই তাকে দিয়েছিল, সেই কারণে তার এই চিন্তা তাকে অনেকটাই কলুষযুক্ত করে। তবে সন্ন্যাসীকে দান করার পুণ্যে, অপর পক্ষে সুলসার জন্য মমতা প্রকাশ করার পাপে তাকে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মাতে হয়। এই বৃক্ষদেবতা দেবতাদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের।

ভিন্ন গল্পে দেখা যাচ্ছে—চিত্ত নামে ভয়ানক অসুস্থ এক বাগানের মালিককে অরণ্য, বৃক্ষ ও গুল্মাদির দেবতারা বলছেন, 'স্থির মস্তিষ্কে তোমার প্রার্থনা জানাও। প্রার্থনা জানাও যে, 'পরজন্মে আমি যেন রাজচক্রবর্তীন হয়ে জন্মাতে পারি।'

কলঙ্কিত কোন মানুষও যদি নিজের পাপ স্বীকার করে নিয়ে প্রার্থনা ও চেষ্টা দ্বারা তা মুছে ফেলতে চেষ্টা করে, সে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যচিত্ত হবে। অপর পক্ষে পাপমুক্ত কোন মানুষ যদি নিজের পুণ্যকর্মের জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করে তাহলে সে বন্ধনে জড়িয়ে যাবে। বন্ধন নিয়ে সে জন্মাবে। ঘৃণা, ভুল, ভ্রান্তি ইত্যাদি তার চিন্তাকে কলুষিত করে দেবে।

বৌদ্ধরা প্রথম থেকেই মৃত্যুর জন্য তৈরি হবার কথা ভাবত। সম্রাট অশোক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু-চিন্তার জন্য তিনদিন সময় দিতেন। মহাবগ্‌গে দেখা যায়, সন্ন্যাসীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, বর্ষাকালেও যেন তারা সাধারণ মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার পাশে থাকেন। বিশুদ্ধি মাগ্‌গতে মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠান কবার বিধান আছে। বন্ধুদের তখন বলতে হয়, 'আমরা তোমার জন্য বুদ্ধের পুজা করছি, বুদ্ধে নিজেকে নিযুক্ত কর।' শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তারা এদের পাঠ করে শোনাতো। পুজার জন্য যে সব উপচার ব্যবহার করা হত সেগুলি তাকে স্পর্শ করতে বলা হত। এরা ভাবত, এ-সব স্পর্শ, শ্রবণ ও আঘ্রাণ করলে পঞ্চেন্দ্রিয় পুজার প্রভাবে প্রভাবিত হবে এবং তার শেষ চিন্তাকে অনুরূপভাবে উদ্বোধিত করবে।

বৌদ্ধদের গল্পে দেখা যায়—একজন জেলে মৃত্যুকালে কোন ভিক্ষুর নির্দেশে বুদ্ধের পঞ্চশীল আবৃত্তি করে স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় এই পঞ্চশীল আবৃত্তি করার জন্য স্বর্গে উচ্চতর দেবতাদের পাশে স্থান পেয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্রে জাদুশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রও রয়েছে। যেমন 'ওঁ মণিপদ্মে হুম'[১] ত্যুকালে এই মন্ত্র উচ্চারণের বিরাট প্রভাব আছে বলে তারা মনে করে। অপর পক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় কেউ যদি বুদ্ধ ভৈষজ্যগুরুর নাম শোনে তাহলে আট জন বোধিসত্ত্ব তার মৃত্যুর সময় কাছে দাঁড়ায় বলে ভাবে। এবং তাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে দেয়। তাঁর সামনে স্বয়ং অমিতাভ বুদ্ধ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে দাঁড়ান। স্বয়ং ভগবানকে সামনে দেখে সে শান্ত চিত্তে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে জন্ম নেয়।

১ ওঁ—মণি (লিঙ্গ) পদ্ম (যোনি) অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ শূন্যতা (পুরুষ) সহ বিন্দু অর্থাৎ প্রকৃতি। সুতরাং এর মূল অর্থ বিন্দুকে নমস্কার করি।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু-চিন্তা : চীন

মৃত্যু সম্পর্কে চীনের প্রাচীন অধিবাসীদের অদ্ভুত ধারণা ছিল। আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হবার আগে সেই ধারণার ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। চৈনিকরা অকাল মৃত্যু ও পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান করে থাকে। অকাল মৃত্যুর জন্য তারা দায়ী করে অশুভ শক্তিকে। অকাল মৃত্যু সম্পর্কে তাদের কথা এই ধরনের—'প্রাণশক্তির বহির্নির্গমন বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা।' স্বাভাবিক পরিণত বয়সের মৃত্যুকে তারা বলে—আবরণ খসে পড়া।

চীনের তাওবাদে মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা সব সময়ই পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে সংযুক্ত এমন নয়। তাওবাদীরা মনে করতেন যে, প্রত্যেকটি লোকের দুটি আত্মা আছে—যেমন, 'কি' অথবা জীবন এবং 'লিঙ্' বা আত্মা। 'কি' হল দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। 'লিঙ্' দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। স্থূল দেহের মৃত্যুর পর 'লিঙ্' কারো কারো ক্ষেত্রে শয়তানে পরিণত হয়। এটা নির্ভর করে মৃতের চরিত্র কি ধরনের ছিল তার উপর। 'লিঙ' যেখানে দেবতাতে পরিণত হয় সেখানে লোকেরা তখন তাকে পুজো করে। পূর্বপুরুষদের আত্মাদের উদ্দেশে আনা খাদ্যদ্রব্যের মত তাদেরও খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

চীনারা সরাসরি অপ্রীতিকর শব্দ 'মৃত্যু' কথাটিকে ব্যবহার করে না—'মৃত্যু হল' এই কথার পরিবর্তে বলে 'চলে গেলেন', 'স্বর্গে গেলেন', 'আর নেই' ইত্যাদি। যদি কোন ভাবভঙ্গী বা চিত্রলিপিতে মৃত্যুকে বোঝাতো তাহলে দেখাতো এমন ধরনের ছবি : 'হাত শক্তভাবে জুড়ে দেওয়া এবং পেছন দিকে সামান্য হেলে যাওয়া মাথা।'

চীনের বিভিন্ন প্রান্তে মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার ও মৃতের সংকার সম্পর্কে এত বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে যে, এ সম্পর্কে সমগ্র চীনের কোন স্পষ্ট চিত্র উদ্ধার করা কষ্টকর। তবে যতটুকু জানা যায় তাতে তাদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু ও অবিবাহিত মৃতদের সম্পর্কে তথ্যও খুব কম। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, অনুষ্ঠানের কোন বাড়াবাড়ি নেই (ভারতেও নেই)। অনেক ক্ষেত্রে নবজাতক শিশুদের মৃতদেহ কোন কিছুতে জড়িয়ে মুক্ত আকাশের নিচেই ফেলে দেওয়া হয়, আবার কোথাওবা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কোন স্থানে তাদের রাখা হয়।

খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালেই এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সাধারণত মৃতদেহের সংকার হত কবর দিয়ে। [কবর দেওয়া হত এই কারণে যে, চীনারা মৃতদেহকে যথাসম্ভব যেমন আছে তেমনই রেখে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল। শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে শবদাহ হত।

কোন কোন সময়ে বিদেশের প্রভাবে শবদাহ প্রথা বেশি চলত]। শবদেহ কবর দেবার জন্য চৈনিকরা মাটি খোঁড়া তেমন পছন্দ করত না। পাথরের কোন কফিনে তা মাটির উপরই রেখে দিত। এর উপর মাটি ফেলে স্তূপের মত তৈরি করত। উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর সেখানে এসে মৃতের উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাওয়া। প্রথম দিকে কফিনের মধ্যে মৃতের পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে এমন নানা জিনিস দিয়ে দেওয়া হত। রাজাদের ক্ষেত্রে তাঁদের কফিন যে কোথায় রাখা হত তা খুঁজে বের করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণ তাঁদের কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত—যাতে ভেসে যেতে না পারে।

চীনে কখনও কখনও মৃতব্যক্তির কবরে দাসদাসী বা নিকট আত্মীয়দেরও হত্যা করে দেওয়া হত। খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সামন্তপ্রভু মুহু-এর কবরে ১৭৭ জন ব্যক্তিকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী (৫৫১-৪৭৮)-তে কনফুসিয়সের সময় এ ধরনের ঘটনার কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৪৪-১৬৬১) সম্রাট শুন-চের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমানে কাগজ দিয়ে দাস-দাসীর প্রতিমূর্তি তৈরী করে কবরে দেওয়া হয়। প্রাচীন ব্যবস্থার একটি ক্ষীণ প্রতীকী ধারা এর মধ্য দিয়ে আজও বেঁচে আছে।

চৈনিকদের ক্ষেত্রে এই মৃতদেহ কবর দেবার রীতি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য প্রচুর মনোযোগ ও অর্থ ব্যয় করা হয়। সমাধি যাতে অতি সুন্দরভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এদের মনোযোগের ত্রুটি নেই।

কবরদান প্রসঙ্গে কনফুসিয়সের নির্দেশ : কনফুসিয়স মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন নি। তাঁর একটি কথার মধ্যেই বোধহয় সবকিছুর নির্দেশ রয়ে গেছে। কথাটি এই—যা কিছু কর, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কর। পারিবারিক অবস্থা, শ্রেণীবিন্যাস এবং ঐতিহ্য অনুসারে এক একজন কবর দেবে। বণিক নিশ্চয়ই রাজকর্মচারীর ধারা অনুমান করবে না, বা সামান্য প্রজা রাজার ব্যবস্থা। তবে শোকপ্রকাশের জন্য সবার পক্ষে তিনি একই নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, যার অর্থ : শোকপ্রকাশ রীতিমাফিক না হয়ে আন্তরিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কনফুসিয়স যা-ই বলুন না কেন—ঐতিহ্যের ধারা পুত্রকন্যার শোকের ধারার সঙ্গে মিশে গেছে, আর এর সঙ্গে মিলেছে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি। পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ-সবও অনুষ্ঠান সমূহের মূল প্রেরণা হয়ে আছে।

মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি ব্যবহার : যখন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সকল উপায়ই ব্যর্থ হয় তখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেবদেবীর বেদীতে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী করা হয়। মরার আগে এখানে নিয়ে আসাকে কম্যুনিস্টপূর্ব চীনের লোকেরা অবশ্যকর্তব্য বলে ভাবত। মৃত্যুপথযাত্রীকে যে-সব দেব-দেবীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হত, তার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক মন্দির, নগরমন্দির ও মৃত্যু-দেবতার বা পরলোক-দেবতার মন্দির। এই সময় তার মাথা ন্যাড়া করে শরীর ধুইয়ে দেওয়া হত। হাত পায়ের নখ কাটা হত। অন্তর্বাসও পরিবর্তন করা হত। মৃত্যুর আগে তাকে শুইয়ে না রেখে বসিয়ে দেবার

চেষ্টা চলত। কারণ এতে প্রাণ দেহের ঊর্ধ্ব অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে চৈনিকদের বিশ্বাস ছিল। প্রাণ যদি নিম্নাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয় তাহলে পুনর্জন্মে সে নিচু শ্রেণীর এমন কি পশু প্রজন্ম প্রাপ্ত হতে পারে। ঊর্ধ্ব অঙ্গ দিয়ে নির্গত হলে উন্নত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে তাদের এই বিশ্বাস ছিল। নতুন মুদ্রা ও মন্ত্রপূত কিছু জিনিস পোড়ানো হত। সেটাই কাগজ বা অন্য কিছুতে মুড়ে মৃত্যুপথযাত্রীর হাতে দেওয়া হত। এটা দেওয়া হত পরলোকে যাবার পথের খরচ হিসেবে, যাকে আমাদের ভাষায় বলে 'পারের কড়ি', সেই হিসেবে। কখনও কোন বৌদ্ধ মন্দিরে ব্যবহৃত প্রদীপ মৃতের হাতে গুঁজে দেওয়া হত। কারণ চৈনিকরা মনে করত যে—পরলোকে অন্ধকার পথের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। খরচে কুলালে মূল্যবান কাঠের চেয়ার ও কাগজ দিয়ে তৈরি দু'জন বাহকও তার সঙ্গে দেওয়া হত।

চৈনিকরা সকালবেলার মৃত্যুকে শুভ বলে বিবেচনা করত। এতে তার উত্তরাধিকারীরা অন্তত তিনটি খাবার খেতে সুযোগ পেত। সন্ধ্যাবেলা মারা গেলে অশুভ বিবেচনা করা হত এই কারণে যে, এরপর কোন খাবার অবশিষ্ট থাকত না। চীনাদের নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে তার আত্মীয়-স্বজন ও পুত্রপরিজন উপস্থিত থাকবে। তারা তাকে ঘুমোতে না দিয়ে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। এই সময় যার কন্যা আছে তারা যদি চিৎকার করে কাঁদত তাকেও চৈনিকরা শুভ মনে করত। চৈনিকদের বিশ্বাস ছিল যে, এই চিৎকারে স্বর্গের দুয়ার খুলে যায়। সুতরাং যাদের কন্যা না থাকত তাদের দুর্ভাগ্য বলে ভাবা হত।

শোকার্তদের প্রথম কর্তব্য : কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সন্তানদের সারিবদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করায় নির্দেশ দিতেন। গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের বেদীতে তাদের প্রদীপ ধরাতে বলতেন। চৈনিকরা ভাবত, মৃত্যু হলে পরলোকের দূত তার আত্মাকে নিতে আসে। তবে নিয়ে যাবার আগে গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের অনুমোদন দরকার।

মৃত্যুর বার্তাবহ : পরলোকের অধিপতির দুজন দূত আছে—জীবন উ-চাঙ এবং মৃত্যু উ-চাঙ। উ-চাঙ অর্থ অনিশ্চিত। অর্থাৎ মৃত্যুদূত কখন আসবে তা কেউ জানে না। জীবন উ-চাঙ কোন দৈত্য নয়, উ-চাঙ নিযুক্ত মানুষের আত্মা, যে পাখি উ-চঙকে মৃতের গৃহ চিনিয়ে নিয়ে আসে। উ-চাঙ দিনের আলোতে দেখতে পায় না, সেই কারণে তাকে পথ দেখিয়ে আনার জন্য মানুষের আত্মার প্রয়োজন হয়। কারো কারো মতে উ-চাঙের এই দ্বৈত সত্তা যথার্থই কোন পৃথক প্রতিনিধি নয়, দুটি আত্মা—রজ ও তমোগুণের আত্মা এবং সত্ত্বগুণের আত্মা অর্থাৎ মন ও আত্মা। চৈনিকরা এই দুটি অবস্থাকে বলে 'পো' ও 'হুন'।

প্রথমটি হল কালো আত্মা বা দৈত্য বিশেষ। আর একটি শুভ্র আত্মা। এদেরই ভুল করে মৃত্যুরাজের দুই বার্তাবহ বা দূত হিসেবে অজ্ঞ লোকেরা কল্পনা করেছে। আসলে এরা আত্মারই দুই অবস্থা বিশেষ—যারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে যায়। আত্মার

'হুন' অবস্থা উর্ধ্বলোকে উঠে মিলিয়ে যায়। 'পো' নিম্ন পৃথিবীতে নেমে এসে রূপ ধরে থাকে [হিন্দুদের মণিপুর চক্র বা আকাশের তিন স্তর অবধি বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী সূক্ষ্ম দেহ হল 'পো', অনাহত থেকে সপ্ততল অবধি অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্ততল অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে ভাসমান সূক্ষ্ম দেহ হল 'হুন']।

মৃত্যুর পর শুদ্ধিকরণ : স্থূলদেহ থেকে প্রাণ চলে গেলে চৈনিকরা যে মাদুরে মৃত ব্যক্তি শায়িত থাকে সেই মাদুর উপরে তুলে ধরে ঝেঁকে দেয়। এতে তাদের ধারণা যে, যে রোগ থেকে তার মৃত্যু হয়েছে পুনর্জন্মে সেই রোগ তাকে আক্রমণ করবে না। সাধারণত মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্রই মুখ্য শোকপ্রকাশক। সে এই সময় একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করে। পরে সে বস্ত্রটিকে মৃতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার এক হাতে থাকে একটি বালতি ও অপর হাতে ধূপের কাঠি। পারলৌকিক অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে সে-ই হেঁটে যায়। হেঁটে যায় জলের ধারে। [সন্তান শিশু হলে তাকে কোলে নিয়ে যাওয়া হয়]। তার মাথার উপর সব সময় ছাতা ধরা থাকে—উদ্দেশ্য স্বর্গের দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করে রাখা। শবযাত্রার পুরোভাগে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে সৎকার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তি স্বরূপই ধরা হয়। কখনও কখনও বাজি ফাটিয়ে এবং গান বাজনা করেও মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হত [যেমন, আমাদের দেশে সংকীর্তন সহকারে মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।] সৎকার-ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাগজের নোট পোড়ানো হত। একটি মুদ্রার মধ্যিখানে পেরেক ঢুকিয়ে চৈনিকরা সেটাকে জলে ফেলে দিত। এতে জলকে কেনা যায় বলে চৈনিকরা মনে করত। বালতি করে এই জল তখন ঘরে আনা হত। এই জল বাড়িতে এনে ফুটিয়ে তাই দিয়ে মৃতদেহের বুক ঘষে দেওয়া হত। যেন স্নান করানো হচ্ছে। মৃতের কন্যা ও জামাতা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিত। এই সময় তাদের কাঁদতে হত। এর পর তারা মৃতের মাথায় ঝুঁটি বেঁধে দিত। মিঙ রাজাদের যেমন ঝুঁটি বাঁধা হত ঠিক সেই ধরনের ঝুঁটি। জনপ্রিয় একটি প্রবাদবাক্যই বোধহয় এর উৎস, যে, 'জীবিতরাই আত্মসমর্পণ করে [মাঞ্চুদের কাছে] মৃতেরা নয়।' ধৌতিকরণ শেষ হলে মৃতকে একটি চেয়ারে বসানো হত। যে মাদুর ও খড়ের উপর তার মৃত্যু হয়েছে সেই মাদুর ও খড় তখন বড় রাস্তায় গিয়ে পোড়ানো হত। চৈনিকরা মৃতের পদযুগলকে কখনও মাটি স্পর্শ করতে দিত না। সুতীবস্ত্রে পা মুড়িয়ে মৃতের জামাতা তা কোলে নিয়ে থাকত। এরপর মৃতের সামনে টেবিল পেতে দিয়ে তার উপর দুপাত্র খাবার দেওয়া হত—ভাত ও নিরামিষ তরকারি। এর ফলে পরবর্তী জীবনে মৃত দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে বলে চৈনিকদের ধারণা ছিল।

মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা :—মৃতের পুত্রেরা এরপর মাথার বেণী খুলে এর উপর চৈনিকরা যে সাদা বস্ত্র পরে সেই শ্বেতবস্ত্রখণ্ডে মাথা ঢেকে ও খড়ের জুতো পরে শস্য দেবতার মন্দিরে যেত। জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্দিরে গিয়ে প্রথমে ধরাতো একটি মোম। তারপর সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে শ্রদ্ধা জানাবার পর কাগজের নোট পোড়াতো। এই

টাকা কৃষিদেবতাকে দেওয়া হচ্ছে বলে তারা মনে করত। এই কৃষি-দেবতাকেই ইহলোকে মৃত্যুদেবতার প্রতিনিধি হিসেবে মৃতের আত্মাকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠানো হয় চৈনিকদের এরকম বিশ্বাস ছিল। এজন্য পারিশ্রমিক দিতে হয় মনে করেই টাকা পোড়ানো হত। এই সমগ্র অনুষ্ঠানকেই বলা হত 'পু-টাঙ' অথবা 'হলে ছড়ানো'। এটা বোধ হয় করা হত ইয়ামেনে রাজকর্মচারীদের অর্থ ছড়িয়ে খুশি করার পদ্ধতি থেকে। লোকে রাজকর্মচারীদের খুশি করত সুবিচার পাবার জন্য। সুতরাং সুবিচার পাবার জন্য পরলোকের কর্মচারীদেরও খুশি করা দরকার, চৈনিকদের এক সময় এই বিশ্বাস ছিল।

মৃতদেহ অপসারণ ঃ বাইরের অনুষ্ঠান ক্রিয়া সেরে এসে সকলে মৃতদেহকে বাড়ির মধ্যে গৃহে নিয়ে আসার তোড়-জোড় করত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান এই ঘরেই হত। এই ঘর ছিল পূর্বপুরুষদের বেদীতে। এর পর মৃতদেহকে উল্টে দেওয়া হত, মাতৃগর্ভে শিশু যেমন থাকে তেমন করে। ঘরের কুলুঙ্গিতে মৃত ব্যক্তির জন্য খাবার রাখা হত। সঙ্গে দেওয়া হত মোমবাতি ও মদ। এরপর মৃতদেহকে বহন করে বাইরে নিয়ে এসে ঘরের সামনেই কবর দেওয়া হত। আজও এ রীতি চলে। পরিবারের সকলে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে দড়ির মাদুরের উপর বসে—এবং একে একে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। এরপর অতি সাবধানে মৃতদেহকে চেয়ারে বসানো হয়। চারজন জোয়ান ব্যক্তি চেয়ারটিকে সমাধিক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র, মামা ও জামাতা পা ধরে থাকে। কবরক্ষেত্রে না যাওয়া পর্যন্ত দেহ কোথাও নামানো চলে না। কারণ, সেক্ষেত্রে চৈনিকরা ভয়ানক বিপর্যয় দেখা দেবে এরকম মনে করে। মৃতের মাথার উপর ছাতা ধরে রাখা হয় স্বর্গের আলো থেকে তাকে আড়াল করার জন্য। এরপর অকুস্থানে কিছু তন্ডুল বা ভাত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিটানো হয়, ভুত বা অপদেবতা তাড়ানোর জন্য। এরপর বিছানায় শুইয়ে মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মুখের উপর দেওয়া হয় একটা পুরু শ্বেতবস্ত্র। পা দুটো কাছাকাছি আনা হয়। পা ফাঁক হয়ে থাকলে মৃতের রাত্রি-সহচরের অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু হয় বলে চীনরা বিশ্বাস করত।

সমাজে মৃত্যু ঘোষণা ঃ এই সমাধিকার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দূতকে তাওবাদী পুরোহিতের মন্দিরে পাঠিয়ে তার রোগ, মৃত্যুর সময়, এবং কত বছর বয়সে তার মৃত্যু হল তা জানানো হত। পুরোহিত একটি হলুদ কাগজে এই সব বিবরণ লিখে দিতেন। এর পর তিনি কবে নাগাদ মৃত ব্যক্তি আবার জন্ম নিতে পারেন, কাদের ঘরে, কিভাবে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীও করে দিতেন। এই লেখা মৃতের পরিবারের লোকেরা কবরগৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। ঝুলিয়ে দিতেন এই কারণে যে, মৃতের নবজন্মের জন্য যেন সকলে তৈরি থাকতে পারে। বড় এক টুকরো কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হত, যাতে দরজা অতিক্রম করে যারা যাবে তারা মৃতদেহ দেখতে না পায়। একটি চীনামাটির পাত্রে প্রদীপ বসিয়ে তাতে তেল ঢেলে সলতেতে আগুন ধরিয়ে

দেওয়া হত। এই প্রদীপ দিনরাত্তির ধরে জ্বলত। প্রদীপ দেওয়া হত এই কারণে যে, মৃতের আত্মা যেন পথ চলাকালে সব কিছু দেখতে পায়।

প্রবীণ বয়সে মৃত ব্যক্তির সৎকার: যদি কোন ব্যক্তির সত্তর বছর বা ততোধিক বয়সে মৃত্যু হত তবে মৃতের পায়ের কাছে লাল রঙের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হত। এই লাল কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হত এই বোঝাতে যে, এই মৃতের সম্পর্কে শোক প্রকাশের কোন কারণ নেই। সুতরাং যারা তাকে দেখতে আসতো তারা কোন শোক প্রকাশের ভঙ্গী করত না। বরং পরিণত বয়সে মৃত্যুর জন্য সন্তোষ প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে মদ্যপানাদি চলত। কেউ দুঃখ প্রকাশেব ভান করলে তাকে বরং বিদ্রূপ করা হত। যথার্থভাবে মৃতদেহ কফিনে ঢোকাবার আগে লাল রঙের মোমবাতি ধরানো হত। যখন জীবন ফিরে পাবার আর কোন আশাই থাকতো না, এবং মৃতদেহ কফিনে ঢোকানো হত, তখন সাদা মোমবাতি জ্বালানো হত। এক ধরনের হলুদ তুলোতে তৈরি বালিশের উপর মৃতের হাত পা রাখা হত। যে-সব জায়গায় তুলোর জিনিস উৎপাদন করা যেত সেখানে তুলোর দণ্ড পর্যন্ত এই বালিশে দিয়ে দেওয়া হত।

আত্মীয়বর্গকে মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন: কারো মৃত্যু হলে চীনে দ্রুত আত্মীয়-স্বজনদের জানিয়ে দেওয়া হত, যাতে মৃতের পরিবারে যারা কোন কিছু পাঠাতে চায় তারা যেন তা তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারে। উপহার দ্রব্যের মধ্যে প্রধানত থাকত লেপ—প্রায় তিন ফুট লম্বা ও এক ফুটের সামান্য বেশী চওড়া। এগুলোকে কফিনে দেবার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হত। গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের লেপগুলোকে আগে কফিনে দেওয়া হত।

মৃতের পরিবারে আগমন: মৃতের পরিবারে কেউ এলে দারোয়ান এ-সময় তিনবার ঢাক পিটিয়ে তা জানিয়ে দিত। তার সঙ্গে ফুঁকতো সিঙ্গা। অনেক সময় গাদা বন্দুক ফোটানো হত। এরপরই বাজনা বেজে উঠতো। এতে শোকার্তরা বুঝতে পারতো যে, তাদের সহানুভূতি জানানোর জন্য অতিথি আসছে।

কফিন: চৈনিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কফিন তৈরি করা হত। কোথাও কোথাও কফিনের আকৃতি হত গাছের গুঁড়ির মত। উত্তর দিকে থাকত ঢাকনা। কারণ সেদিকে থাকত মৃতের মুখ। কফিন কি ধরনের এবং কত মূল্যের হবে তা নির্ভর করত পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির উপর। বড়লোকেরা নিজেদের কফিন পূর্বাহ্নেই কিনে রেখে দিতেন। কেউ বা কাঠ কিনে তাকে যথার্থরূপে শুকিয়ে ছুতোর দিয়ে কফিন তৈরি করাতেন। যারা তা পারত না তারা কফিন দোকান থেকে কিনতো, বা দাতব্য সংস্থা থেকে নিয়ে আসত। কফিনের শেষে থাকত পদ্মচিহ্ন। এই পদ্মচিহ্ন আঁকা হত এই আশায় যে, মৃতের আত্মা গৌতম বুদ্ধের মত পদ্মের উপর দাঁড়াতে পারবে। কফিনে নানা অনুষ্ঠান করে তবে সযত্নে মৃতদেহ রক্ষা করা হত।

শবযাত্রা: কফিন তৈরি হলেই অর্থাৎ মৃতদেহ কফিনে শায়িত হলেই শোকার্তরা আবার তাদের বেণী বন্ধন করত এবং ঘাসের চটির পরিবর্তে মোটা সাধারণ চটি পর়

দিতে পারত। এবার তাদের আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হত। মৃতের সঙ্গেও খাদ্য দেওয়া হত। এর পরই সকলে হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত এবং প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি মৃতের গুণকীর্তন করত। পরে দুই বাণ্ডিল কাগজের নোট পোড়ানো হত, একটি মৃতের জন্য অপরটি তার রক্ষকের জন্য।

শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত শোকার্ত পরিবার মৃতের কাছে রীতিমত খাবার সরবরাহ করত। কবরের প্রবেশপথে এজন্য টেবিল-চেয়ার রাখার ব্যবস্থাও ছিল। অবশ্য এক ধরনের সাদা পর্দা দিয়ে তা আড়াল করে রাখা হত। শ্রাদ্ধাদি হয়ে যাবার পর এই খাবার দেওয়া বন্ধ হত।

পথপ্রদর্শক পরী : কবরের উপর যে টেবিল বসানো হত তার দুধারে থাকতো কাগজের তৈরি পাহাড়। পরলোকে যাত্রার জন্য প্রিয় আত্মীয়-স্বজন যে সব অর্থ দিয়েছেন তার বিরাট পরিণাম বোঝাবার জন্যই এই পাহাড় তৈরি করা হত। এর পেছনে থাকতো দীর্ঘাকৃতি এক তরুণ ও সবুজ বর্ণের কুমারী। এরা মৃতের আত্মাকে পরী-সেতু পার করে দেবার জন্য পাশে থাকত। মৃতব্যক্তির ছবিও চেয়ারের পেছনে টাঙানো হত। ছবির দুপাশে থাকতো কাগজে মোড়ানো শোকবার্তা। সামনে থাকত সাদা মোম। চেয়ারের উপরে থাকত বিগত পুরুষদের পঞ্জি খোদাই করা পাথর। উল্টো করে বসানো এক গামলার উপর থাকতো এই চেয়ার। চেয়ারের উপর রেশমের ফিতে দিয়ে লাল রেশমী কাপড় বেঁধে দেওয়া হত।

বাঁধন কেটে দেওয়া : শেষকৃত্যের আগের দিন বৌদ্ধ ও তাওবাদী পুরোহিতদের ডেকে এনে মৃতকে ধোয়ানো হত পাপমুক্ত করার জন্য। বিকেলবেলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেওয়া হত এক পাত্র চাল ও সাতগাছা সুতোর পৈতে। এতে গাঁথা থাকত চব্বিশটি তামার মুদ্রা। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মৃতের আত্মার মুক্তির জন্য শাস্ত্রপাঠকালে মৃতের টেবিলে এগুলি রাখা হত। এই মন্ত্র পাঠকালেই তারা সুতোয় বাঁধা পয়সাগুলো একটা একটা করে খুলে নিয়ে নিজেদের ঢিলে আলখাল্লায় রাখতো। এই সুতো খোলা অর্থ এক ধরনের গেরো খোলা, যেগুলো মৃত ব্যক্তির পক্ষে পরকালে নানা অসুবিধার কারণ হতে পারে।

ছায়া জগৎ দিয়ে পরলোকে যাত্রা : কবরের উপর যে টেবিল বসানো হত একজন তাওবাদী পুরোহিত তার পাশে হাতে একটি বেল নিয়ে দাঁড়াতেন। এই বেল বাজাতে বাজাতে তিনি শাস্ত্র আউড়ে বলতেন 'সবই মিথ্যা।' এরপর তিনি পরলোকে যাত্রার নানা স্তর বর্ণনা করতেন। পরলোকে যাত্রা ছিল সাত সপ্তাহের। এই সাত সপ্তাহ মৃতের আত্মাকে নরকের মধ্য দিয়ে চলতে হত। এই নরকের বর্ণনা কৃত্তিবাস বর্ণিত রামায়ণের বর্ণনার মত বিরাট। এই নরক যন্ত্রণা এড়ানোর জন্য অনুশোচনা করতে বলা হয়েছে এবং সর্বশক্তিমান বুদ্ধের নাম করতে বলা হয়েছে। এই দীর্ঘ নরক বর্ণনা শেষ হলে টেবিলের সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার করে দেওয়া হত। সেখানে চতুষ্কোণ একটি রেখা আঁকা হত যার চতুর্দিকে থাকত নকশা। চতুষ্কোণের চারদিকে বারটি তেলের

প্রদীপ রাখা হত। বারটি প্রদীপ রাখা হত এই বিশ্বাসে যে, মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশের দুয়ার এই প্রদীপগুলি আলোকিত করে রাখবে।

চৈনিকদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের লঘুতাও থাকত। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটি টেবিলের চারধারে কয়েকজন বৌদ্ধ ও ছয়জন তাওবাদী পুরোহিত নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে তারা হাসি তামাশার গানও করতেন। আর গাইতেন বারটি চাঁদের ফুলের গান।' এই ফুলগুলির এক একটি বার মাসে ফুটত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বহু গানও এতে গাওয়া হত।

পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রীতি উৎসর্গ ঃ সান্ধ্যভোজের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের অনুষ্ঠান হত যার নাম 'ফ্যাঙ ইয়াং-কো'। এই সময় মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে বসানো টেবিল ও চেয়ার সরিয়ে ফেলা হত। এর বদলে ভিন্ন একটি চেয়ার দেওয়া হত যাতে বসতেন পুরোহিত। সামনে দুটো টেবিলে বড় বড় দুটো মোমবাতি ও ২৪টি নিরামিষ খাদ্যের পাত্র রাখা হত। এই পাত্রগুলি রাখা হত নানা দেবতার তৃপ্তিবিধানের জন্য। ঘরের প্রান্তে আরও চারটি টেবিল রাখা হত। দুই প্রান্তে দুটি করে চারটি। এগুলো রাখা হত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে কিছু উৎসর্গ করার জন্য। একটি নিচু টেবিলে রাখা হত সদ্য মৃতের জন্য খাদ্য। প্রেতাত্মাদের জন্য নির্মিত টেবিলে পূর্বপুরুষদের কাহিনী বিবৃত করে যে ফলক রাখা হত সেটা তখনও থাকত। এর চতুর্দিকে হাল্কা শোকের পোশাক পরে বসত আত্মীয়-স্বজনেরা। পুরোহিতের শাস্ত্রগ্রন্থ পড়া শেষ হলে বাড়ির বাইরে কাগজের বস্ত্র এবং টাকা পোড়ানো হত।

এসব হয়ে যাবার পর ঘরদোর নতুন করে সাজিয়ে পূর্বপুরুষদের উপলক্ষ্যে উৎসর্গের ব্যবস্থা থাকত। এবার ডাকা হত গায়ক ও বাদকদের। প্রচুর পরিমাণে মাংসের ব্যবস্থা করা হত [আমাদের মৎস্যমুখির মত]। সারা ঘর ফুটে উঠতো আলোকসজ্জায়। এর পর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেন প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি। তিনি উত্তরাধিকারদণ্ডে ভর করে আসতেন। সঙ্গে থাকত সাহায্যকারীরা। পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতিফলকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি মাথা নিচু করে সম্মান জানাতেন। তারপর তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে খেতে দিতেন মাংস। তিনি যখন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে সম্মান জানাতেন তখন উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন তার পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ব-পুরুষদের গুণকীর্তন করে লেখা একটি দীর্ঘ স্তুতিবাক্য পড়ে শোনাতেন। পড়তেন অবশ্য শোকার্ত কণ্ঠে। মাটিতে মুখ রেখে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সন্তান তখন কাঁদতেন। এর পর তাঁকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকেও তিনবার এই প্রথার পুনরাবৃত্তি করতেন। আত্মীয়-স্বজনেরাও তখন হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। এসব শেষ হলে অর্থাৎ মৃতের উদ্দেশে দানকার্য সমাপ্ত হলে সাময়িককালের জন্য যে সব অনুষ্ঠান-ব্যবস্থা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হত। তারপরই চলত শেষকৃত্য বা শ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।

শবযাত্রা ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে শবযাত্রা হত মৃত্যুর পর পঞ্চম সপ্তাহে। সময় সকাল চরেটে থেকে পাঁচটা। কেউ কেউ শবযাত্রা করত মৃত্যুর একশ দিন পরে। অনেক ক্ষেত্রে আরও পরে শবযাত্রা হত। দরিদ্রদের ক্ষেত্রে কফিন ঘরেই থাকত বা সাময়িক-কালের জন্য মৃতের উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহে থাকত।

কফিন নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকে জেগে থাকত। শবযাত্রা আরম্ভ হলে সবার আগে যেত কাগজের এক বিরাট মূর্তি, যাকে বলা হত পথ পরিষ্কারক। এর পরে আসত দুটি বড় বড় পতাকাবাহী বাঁশ এবং চারটি তরুণের মাথাওয়ালা কাগজের মানুষ। এই মূর্তিগুলির মাথা লাইন বেঁধে চলার সময় ওঠা নামা করত। জামাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র রেকাবীতে করে নিয়ে যেত ভাত ও পূর্বপুরুষদের প্রশংসাসূচক ফলক। ধনীরা এই স্তুতিফলক নিত সেডান কাঠের চেয়ারে করে। এই চেয়ার অবশ্য ধরে নিয়ে যেত জামাতা বা ভাইপোরা। এই স্তুতিফলক যারা বহন করে নিয়ে যেত তারা পরত সাদা পোশাক। তাদের দুই পাশে যেত আত্মীয়-স্বজনেরা। এর পরে আসত কফিন। এরপর কফিনবাহকেরা। বড়লোকদের ক্ষেত্রে বহু লোকে এই কফিন বহন করত। কফিন বাহকেরা পরত লাল বা নকশা করা পোশাক। এরা মাথায় পরত এক ধরনের খড়ের টুপি, যাকে বলত বিরেট্রা, অর্থাৎ যাতে সাপের ফণা তোলার মত মাথার ঢাকনি থাকত। এই পোশাক পরা প্রথম লোকটি মাথা নিচু করে হাঁটতো। তাকে অনুসরণ করত পুরুষ ও মহিলাসহ আত্মীয়-স্বজন। পুত্রবধূও অনুরূপ ফণা জাতীয় টুপি পরত। টুপি যা দিয়ে তৈরি হত, তাই দিয়ে তৈরি করা হত পোশাক। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তির মত তার হাতেও থাকত এক ধরনের দণ্ড। কখনও কখনও সেডান চেয়ারেও তাকে বসিয়ে দেওয়া হত। তখন ভারি টুপি থাকত চেয়ারের উপর। যেতে যেতে উচ্চরোলে চিৎকার করে সে কাঁদত। ঘরের বাইরে পা বাড়ানো মাত্র কফিন ও শোকার্তদের উপর চাল বা ভাত ছিটিয়ে দেওয়া হত। কফিনের উপর বসানো থাকতো পাখা ও একটি পা-তোলা সারস-এর মূর্তি। এই সারস পাখি মৃতের আত্মাকে পশ্চিম গগনের স্বর্গে নিয়ে যাবে এই ধরনের বিশ্বাস ছিল। [পশ্চিম দিক কল্পনা করার কারণ বোধ হয় এই যে, সূর্য সেদিকেই অস্ত যায়। সূর্যের অস্ত মানে সূর্যের মৃত্যু। তাই পশ্চিম দিককে অনেকেই মৃত্যুলোক হিসেবে কল্পনা করত]।

কফিন নিয়ে যখন কবরখানায় যেত সবাই তখন সাময়িক একটি স্থানে কফিনটি রেখে দিত। পরে কোন সূক্ষ্ম নির্দেশ পেলে তাকে যথার্থস্থানে সমাস্থি করা হত। সমাধি দেওয়া হলে কবরের উপর মৃতের আত্মার জন্য রাখা হত খাবার এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কবরাশ্রিত আত্মাদেরও ভোজে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো পরিবারের লোকেরা। এর পর শোকার্তদের টুপি ও কোমরবন্ধ পুড়িয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে পোড়ানো হত কাগজের নোট। বাঁশের দণ্ড ও লাঠিগুলিকে কবরের উপর রেখে দেওয়া হত। এর পরে সমবেত সকলেই একযোগে কান্না শুরু করে দিত। পাথর দিয়ে তৈরি করা কবরে ঢোকার পথ এর পর বন্ধ করে দেওয়া হত। কবরের

উপর পাথরের ফলক বসিয়ে তার উপরে মৃতের সমস্ত বৃত্তান্ত ও তার পুনর্জন্মের দিনক্ষণ অথবা ফকিন তোলার দিনক্ষণ লিখে রাখা হত। এর পর শোকার্তরা হাত ধরাধরি করে এক ধরনের আনন্দের ভঙ্গীতে কবর প্রদক্ষিণ করত। এই নৃত্যের পুনরাবৃত্তি হত আবার তিন দিন পরে।

কফিন সমাধিস্থ করার পরে যে ভাবে শোকার্তরা শেষকৃত্যে এসেছিল সেইভাবেই আবার ফিরে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত পিতৃপুরুষদের স্মৃতিফলক। ফিরত কাঁদতে কাঁদতে এবং আগুন জ্বালিয়ে। গৃহে ফিরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার আগে পূত অগ্নি জ্বালানো হত। তারপর একে একে সেই অগ্নি ডিঙিয়ে সবাই ঘরে ঢুকতো। [শ্মশান থেকে ফিরে এসে অগ্নি স্পর্শ করে ঘরে ঢোকার রীতি আমাদের মধ্যেও বর্তমান রয়েছে।] কোথাও কোথাও সমাধিস্থান প্রত্যাগত ব্যক্তিদের দেহে তাওবাদী পুরোহিতেরা পবিত্র জল ছিটিয়ে দিত। এরপর মৃতের পুত্র হাল্কা নীল রঙের পোশাক পরে হাঁটু গেড়ে বসে তৈরী করত খাবার এবং আরো কিছু কাগজের নোট পোড়াতো। পরে পূর্ব পুরুষদের বেদীতে গিয়ে প্রত্যেকটি বেদীর সামনে প্রদীপ ধরিয়ে সদ্য মৃতের স্মৃতিফলক নতুন একটি বেদীতে রেখে দিত। এর পরই বসত মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য ভোজসভা [অর্থাৎ আমাদের শ্রাদ্ধের ভোজের মত]। তৃতীয় দিনে সদ্য সমাহিতের কবরে গিয়ে নতুন করে খাবার রেখে আসতো চৈনিকরা। এরপর যারা সেখানে যেত তারা হাত ধরাধরি করে তিনবার একই দিকে এবং পরের তিনবার বিপরীত দিকে সমাধিক্ষেত্রকে ঘিরে নৃত্য করত। চৈনিকরা মনে করত যে, এমন করা হলে মৃতের আত্মা তার যথাস্থান লাভ করতে পারে।

মৃত্যুর সাতদিন পরে কয়েকজন তাওবাদী পুরোহিতকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হত মৃতের জন্য স্বর্গের পথ খুলে দিতে। সেদিন তিন প্রহর ধরে অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা ধরনের অনুষ্ঠান হত। সন্ধ্যায় আবার বসত সভা। সভার মাঝখানে থাকত টেবিল চেয়ার। চেয়ারে বসানো হত মৃতের প্রতিকৃতি। টেবিলের উপর রাখা হত দু'কাপ চা, হাল্কা ধরনের দু'প্লেট খাবার, ধূপদানি ও প্রদীপ। পুত্রবধূ এ সময় সেখানে এসে একপ্রস্থ কান্নাকাটি করার পর প্রেতাত্মাদের আহারে আমন্ত্রণ জানাতো এবং সেই সঙ্গে আবার পোড়াতো কাগজের টাকা। [কাগজের টাকা পোড়ানো হত কি এই কারণে যে চৈনিকরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং মনে করত যে, কাগজের নোট পোড়ানো হলে তার আত্মাও মৃতের সূক্ষ্ম দেহ বা আত্মার সহগামী হয়ে তাকে পরলোকের পথে পাথেয় হিসেবে সাহায্য করবে ?]। সকালবেলার আহারে দেওয়া হত নানা ধরনের খাদ্য। সেই সঙ্গে ধরানো হত মোম বা প্রদীপ। দ্বিপ্রাহরিক আহারে আরও নানাবিধ খাদ্য থাকত। সাত সপ্তাহের প্রতি সপ্তাহেই একবার এমন করে আয়োজন করা হত। ব্যতিক্রম ছিল পঞ্চম সপ্তাহে। এ সময় পুনরায় মৃতগৃহে অথবা কবরে খাবার পরিবেশন করা হত। পঞ্চম সপ্তাহে তাওবাদী পুরোহিতেরা আত্মার জন্য খুলে দিত নরকের দুয়ার। এজন্য

চীনারা কাগজের এক শহরই তৈরি করে ফেলত। এতে মানুষ, ঘোড়া ইত্যাদি নানা জিনিস রাখা হত—অবশ্য সবই কাগজের। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাওবাদী পুরোহিত তরবারি হাতে এই কাগজের শহর ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেতেন। এবং এই নরক-শহরে যত আত্মা বন্দী আছে তাদের মুক্তি দিতেন। এরপর আকাশের নিচে জ্বালানো হত বিরাট করে পূত অগ্নি। তিন-চারজন পুরোহিত এই আগুনের পাশে দাঁড়াতেন হাতে বাঁশ নিয়ে। বাঁশের ডগায় থাকত নানা ধরনের আতসবাজি।

ষষ্ঠ সপ্তাহে চীনে মেয়েরা মৃতের আত্মার উদ্দেশে ভোজের আয়োজন করত। যা আমাদের দেশের মেয়েরা করে মা-বাবার মৃত্যুর তিন দিন পরে। এই সময় মেয়েরা স্মৃতি হিসেবে মৃতের (মা অথবা বাবা) বস্ত্রের একটা ভাগ পেত। সপ্তম সপ্তাহ শেষ হলে—মুখ্য শোকার্ত (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র) মাথা কামতো। তবে কফিন সমাধিস্থ হতে দেরী হলে তখনও সে মাথা কামাতে পারতো না। এক বছর পর আবার শোকার্তরা সমবেত হত মৃতের কবরে। সেদিনও চতুর্দিকে উঠতো কান্নার রোল। চান্দ্রমাসের নবম চন্দ্রোদয়ের সময়ও কেউ কেউ কবর পরিদর্শনে যেত। শীতকালে সূর্য যখন দূরে সরে যেত তখন পুনরায় কবরে গিয়ে কাগজের নকল গরম পোশাক পুড়িয়ে অনুষ্ঠান করা হত। [চীনারা মৃত্যু উপলক্ষ্যে সাত সপ্তাহের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কি প্রকৃত পক্ষে জগতের সাতটি উল্লেখযোগ্য স্তরকে বোঝাবার চেষ্টা করত?—যাকে সপ্তলোক বা সপ্তভূমি বলা হয়ে থাকে আমাদের শাস্ত্রে? সপ্তভূমির এক এক স্তরে আত্মা এক এক ভাবে অবস্থান করে।[১]]

মৃতের আত্মার গৃহে প্রত্যাবর্তন ঃ চৈনিকরা মৃতদেহকে কবর দেবার সময়ই কবে সে আবার ফিরে আসবে পাথরের ফলকে তা খোদাই করে কবরের উপর রেখে দিত। যে রাতে তার ফিরে আসার কথা সেই রাতে মৃত্যুগৃহে একটি টেবিলের উপর তার জন্য নানা ধরনের খাবার সামগ্রী রেখে দিত। রান্নাঘরে এই দিন উনানের নিচে ও চারপাশে রেখে দেওয়া হত চুন। মৃতের প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ে তাও-পুরোহিতদের সঙ্গে করে আত্মীয়-স্বজনেরা আবার আসত গৃহে। রান্নাঘর পরীক্ষা করে দেখত চুনের উপর কোন পায়ের ছাপ পড়েছে কি না। এ সময় এক হাতে একটি সাদা মুরগি ও অপর হাতে ওজনের কোন জিনিস ধরে তারা একটি ঝুড়ির কাছে যেত। ওজন দিয়ে ঝুড়ির ঢাকনাতে আঘাত করতেই মুরগিটি চেঁচিয়ে উঠতো। তখন মুরগিটিকে নিরাপদে বের করে এনে আবার পোড়ানো হত কাগজের নোট। মুরগির সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করার অর্থ ছিল প্রেতাত্মার রক্ষীদের সরিয়ে দেওয়া। সাদা মুরগি হল প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের মত, যেমন অনেকের কাছে আগুন হল ভুতের ওষুধ। এই শ্বেত মুরগি মানুষের আত্মাকে উর্ধ্বগামী আত্মার কাছে নিয়ে যেতে পারে বলেও চৈনিকরা বিশ্বাস করত।

---

১ দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা, নিগূঢ়ানন্দ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন মিশরের মৃত্যু-চিন্তা ও পারলৌকিক অনুষ্ঠান

প্রাচীন মিশরের লোকেরা মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কি ধরনের চিন্তা পোষণ করত তার কোন সাক্ষ্য বর্তমানে নেই। তবে মৃত্যুর পর আত্মার যে বিচার হয়—এরকম বিশ্বাস আটাশতম রাজবংশের সময় থেকেই তাদের মধ্যে এসেছিল। হয়তো অসিরিজ সম্পর্কিত গল্প কিংবা 'রা'-সম্পর্কিত চিন্তা থেকে তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। এ সম্পর্কে 'প্রবেশপথ গ্রন্থ' (Book of the Gates) থেকে জানা যায়। এই গ্রন্থে লেখা আছে যে, অসিরিজের কক্ষে মৃত্যুর পর লোকের আত্মার বিচার হয়। মৃত্যুর পর ছয়টি রাজ্য অতিক্রম করে অসিরিজের গৃহে যেতে হয়। এই ছয়টি স্তর দিয়ে সূর্য রাত্রিবেলা পরিভ্রমণ করে। কিন্তু 'মৃতের গ্রন্থে' লেখা (Book of the Dead) আছে যে, বিচার হত আগেই, অসিরিজের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার পরীক্ষা হিসেবে। অসিরিজের এই স্বর্গরাজ্যকে বলা হত 'আলুর প্রান্তর' (The fields of Aalu)। এই ধরনের গল্প আছে ; কেউ মারা গেলে অনুবিস (Anubis) বিচারক অসিরিজের কাছে তাঁকে নিয়ে আসত।* অসিরিজের সঙ্গে থাকত থোথ (Thoth) নামে এক হিসেব রক্ষক (আমাদের চিত্রগুপ্তের মত) যিনি পৃথিবীতে মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করতেন স্বর্গে প্রবেশের আগে দাঁড়িপাল্লায় মৃত ব্যক্তির হৃদয় ওজন করে। এই দাঁড়িপাল্লায় পুণ্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করত একটি পালক—সততা অথবা 'মাৎ' (Maat)-এর প্রতীক। মাৎ ছিলেন সত্যের দেবী। একটি কলমে থোথ এই হিসেব লিখতেন। তাঁর চতুর্দিকে চল্লিশজন বিচারক বসে থাকতেন। এঁদের সামনে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তার স্বীকারোক্তি করতে হত। এই স্বীকারোক্তির পর তার হৃৎপিণ্ড মাপা হত। যদি তাতে সে উত্রে যেত তবে অসিরিজ তাকে পুরস্কৃত করতেন। যদি স্বীকারোক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হত, তাহলে তার হৃৎপিণ্ড (অর্থাৎ প্রাণ) অম্মিৎ (Ammit) নামে এক দৈত্য খেয়ে ফেলত। এই অম্মিৎ ছিল মৃতখাদক। অসিরিজের শত্রুদের সঙ্গে মিলে সে প্রলয় ভাগ করে নিত। এরাই অসিরিজকে টুকরো টুকরো করে কেটে গর্তে বা আগুনের হ্রদে ফেলে দিয়েছিল। কি করে যে এদের প্রভাব মন্ত্রের জোরে অতিক্রম করা যেতে পারে এ-কথা কেউ নিশ্চিতভাবে জানত না। পাপাত্মার এই বিচারের কথা 'প্রবেশপথ' গ্রন্থে

---

* অসিরিজ ছিলেন প্রাচীন মিশরের এক রাজা। তিনি অত্যন্ত সুশাসক ছিলেন। দেবী আইসিস তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু অসিরিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিংসাবশত তাঁকে হত্যা করে মিশরের নানাস্থানে তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়। দেবী আইসিস পুনরায় সব অঙ্গগুলি (লিঙ্গ বাদে) একত্রিত করেন। পরে আইসিস ও অন্যান্য দেবতাদের সাহায্যে তিনি পরলোকের অধীশ্বর হন।

উল্লেখিত আছে। এই গ্রন্থে আত্মার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আত্মা অমর নয়। এক সময় তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল। 'রা'-(অর্থাৎ সূর্য-দেবতা)-র অনুগামীদের কিভাবে বিচার করা হত তাও জানা যায় না। তবে 'প্রবেশপথ' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, 'রা'-এর শত্রুদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। 'রা'-এর শত্রুদের সবাই ছিল শয়তান। 'রা'-পূজারীরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা সূর্যের নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করত—যে সূর্যের নৌকো নিত্যদিন আকাশ পাড়ি দিয়ে বেড়ায়। সূর্যাস্ত-দিগন্তের নিচে মৃত্যুলোক আছে বলে তারা বিশ্বাস করত। সূর্য অস্ত গেলে এই মৃত্যুলোক আলোকিত হত। মৃত্যুর অন্ধকার লোক দুয়াৎ (Duat) সম্পর্কে তাদের ধারণা তেমন স্পষ্ট ছিল না। পরবর্তীকালে এই মৃত্যু-লোকের অধীশ্বর হন অসিরিজ।[১]

মৃত্যুর পর আত্মার বিচার হয়—এই ধারণা থেকেই মিশরীয়রা মৃত সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল। ফলে মিশরে মৃতদেহ কবর দেবার জন্য যত সব নিয়ম-কানুন চালু হয়েছিল পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও তেমনভাবে তা চালু ছিল না। এ-জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্থূলদেহ রক্ষা করা থেকে কবরের উপর পিরামিড জাতীয় সৌধ নির্মাণ করে প্রাচীন মিশরীয়রা এমন আশ্চর্য ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করে গেছে যা অদ্যাবধি সভ্য পৃথিবীর মানুষকেও চমকিত করে। মিশরের মমি জগৎ বিখ্যাত। মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশই এই মমিকরণে তাদের সাহায্য করেছিল। কারণ, সহজে এখানে কোন দেহে পচন ধরত না। শুধু দেহ নয় পরিবেশের গুণে মৃতদেহের সঙ্গে যে সব দ্রব্যাদি দিয়ে দেওয়া হত, এমন কি খাদ্য পর্যন্ত—তার অনেক কিছুই অদ্যাবধি অবিকৃত রয়েছে। পরিবেশের এই সহায়তার জন্যই আজ আমরা প্রাচীন মিশরের এমন বহু জিনিস খুঁজে পাই যা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব হত না। এই পরিবেশেই এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের বহু অনিত্য বস্তুকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার কলাকৌশল শিখিয়েছিল। এইজন্য মিশরে যে-ভাবে প্রাচীন জিনিসপত্র রক্ষিত আছে গ্রীস ও রোমের মত প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা নেই। গ্রীস ও রোমের নামকরা কোন ব্যক্তির যথার্থ দেহ বা মূর্তিদর্শন আজ আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে—সেকালে মৃত রামেসিস বা অন্য কোন রাজার মৃতদেহ দেখে তাঁর সম্পর্কে একটা অনুমান করে নিতে চায়, তাহলে আজও তা পারে। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মিশরে দেহরক্ষার জন্য যে চিন্তার উদয় হয়েছিল তা থেকেই সেখানে কবর দেবার রীতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। এই দেহরক্ষা করার পদ্ধতি থেকেই পরবর্তীকালে সেখানে মৃতের পুনরভ্যুত্থানের কল্পনা জন্মলাভ করেছিল। মিশরীয়রা মনে করত, —একটি মানবসত্তার বিভিন্ন শক্তি বা গুণ তার মমির সঙ্গে যুক্ত থাকে—যেমন, ইখু (ikhu) বুদ্ধি, যা ব্যক্তির মৃত্যুর পর দিব্যজগতে চলে যায়, 'ব' (ba) পাখির মত আত্মা যা কবরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, খইবিৎ (khaibit) ছায়া, এবং 'ক'

১ History of Religion—Sergei ToKarev, P. 187-88.

(ka) দেহের দ্বিতীয় সত্তা, যা জন্মলগ্নে দেহের সঙ্গেই এসেছিল এবং মৃত্যুর পরও তার দেহের সঙ্গে কবরে বাস করে - এ সবই যুক্ত থাকে তার মমির সঙ্গে। এই মমিকে মিশরীয়রা বলত সহু (Sahu)। এই মমির পুনরুত্থান হবে বলেই এরা মনে করত। তবে এ পৃথিবীতে না স্বর্গে, তা নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারো মতে মমি মাটির নিচে থাকলেও যথার্থ ব্যক্তিত্ব থাকে স্বর্গে। আবার ভিন্নমতে সহু যথার্থ মমি নয়। এ হল এক ধরনের সূক্ষ্ম দেহ—যা ক্ষয়িষ্ণু দেহে অর্থাৎ খৎ-এ (khat) জন্ম নিয়েছিল। গমের চারা যেমন দানা থেকে ফুটে বেরয় তেমনই সে বেরিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু দেহ থেকে। সুতরাং মৃত অসিরিজ নতুন জীবিত অসিরিজের জন্ম দিয়েছে। এইজন্য অসিরিজ তত্ত্বকে (Osiris Cult) উর্বরাশক্তি তত্ত্ব (Fertility Cult)-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়। এই সহু বা সূক্ষ্মসত্তার মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে।

মিশরীয়দের এই বিশ্বাসই নানা প্রতীকে নানা পিরামিডের মধ্যে অদ্যাবধি বর্তমান। এই মমিই হল অসিরিজের দেহ যা মাটির কফিন-স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা মাটি দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে বীজ পুঁতে কবর দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের মৃতাধারে সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেছে গমের দানা যা কবরের অন্ধকারে অঙ্কুরিত হয়েও আবার শুকিয়ে গেছে। সহু বা মমিকে মৃতদেহের দুটি অবস্থা থেকে কল্পনা করা হয়েছে। এক চিন্তাতে মৃতদেহ মৃত দেহই, মৃত মাছের শরীরের চেয়ে পৃথক নয়। মানুষের খৎ (স্থূলদেহ) মাছের খৎ-এর মতই। এটা বোঝানোর জন্যই মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রলেখাতে মৃতমাছের মূর্তি দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে সহুকে বলা হয়েছে ভয়াবহ ও আশ্চর্য জিনিস যা রাজকীয় একাকিত্বে কবরের মধ্যে নীরবে জাদুক্ষমতা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই জাদুশক্তি দ্বারা সহু তার জীবিতকালের সমগ্র শক্তিকে যে-কোন সময়ে আবার দেহের মধ্যে ডেকে আনতে পারে। সুতরাং সহুকে মনে করা হয় মানুষের মমি যা কফিনদণ্ডে বা বাক্সে শুয়ে আছে। সহুর সঙ্গে পরবর্তীকালে দুটি ধারণা এই জন্য যুক্ত হয়েছে যে, সহু হল সূক্ষ্ম সত্তা, যার উৎপত্তি হয়েছে খৎ থেকে। খৎ হল দেহের কলঙ্কিত নাম। প্রাচীনতম ধর্মে যখন যথার্থ স্থূলদেহের কথা বলা হত, তখন একে বলা হত সহু। সুতরাং প্রার্থনা করা হত, যাতে স্থূলদেহে 'ব' বা আত্মা প্রবেশ করে উত্তরপুরুষদের দেওয়া খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারে। এ থেকেই যথার্থ স্থূলদেহ বা সহুর পুনরভ্যুত্থানের চিন্তা গজিয়ে উঠেছে। প্রথমে দেহকে মমি করা হত এই চিন্তা থেকে যে মৃতদেহ তাদের মধ্যেই থাকবে। মিশরে যখন লোকেরা সাধারণ কবর খুঁড়লেই দেখতে পেত যে, স্থূলদেহও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না, তখনই কৃত্রিম উপায়ে তাকে আরও অক্ষত করে রাখার চিন্তা তাদের মধ্যে আসে। মমি তৈরি করার রীতি মিশরের প্রাচীনতম মানুষের মধ্যে ছিল না। এ ভাবনা আসে নব্য প্রস্তর যুগ শেষ হবার আগে। এ সময়কার এমন সব পাথরের ছুরি পাওয়া গেছে যা দিয়ে মৃতদেহের অন্ত্র

বের করে নেওয়া হত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই ধরনের ইথিওপিয়ান পাথর অর্থাৎ ছুরির কথা উল্লেখ করে গেছেন। এ জন্য এক ধরনের পবিত্র পাথর নির্মিত ছুরিই কেবল ব্যবহার করা যেত। ধাতব অস্ত্রকে এক্ষেত্রে অচ্ছুৎ মনে করা হত। মৃতদেহকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা হত এই কারণে যে, জীবিতকালে এই ব্যক্তি ধরণীকে ভালবেসে তার মধ্যেই টিকে থাকতে চেয়েছিল। মিশরীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত প্রার্থনাতে দেখা যায় যে, মৃতদেহকে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য মাটির স্পর্শ বাঁচিয়ে উপরে রাখা হত। রাখা হত নিজেরই ঘরে। তারপর সময়মত কবরস্থ করা হত। এটাই হল দ্বিতীয় কবরপ্রথা। মিশরীয়রা মৃতদেহ ঘরে রেখে যথার্থরূপে শুকিয়ে নেবার পর তবে মরুভূমিতে কবর দিত। নব্যপ্রস্তর যুগের কবরে দেখা যায় যে, দেহের হাড়গুলো যথাস্থানে নেই। কেউ ভাবেন এটা হয়েছিল নরমাংস ভোজনের জন্য। কারণ প্রাগৈতিহাসিককালে অনেকেই মনে করত যে, মৃত মানুষের দেহ ভক্ষণ করলে তার সমস্ত শক্তি উত্তরাধিকীদের মধ্যে থেকে যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, হাড়গুলো এলোমেলো হত এই কারণে যে, দেহ থেকে মাংস সরিয়ে নিয়ে শুধু কংকালটিকে রাখবার চেষ্টা করা হত। এবং সেই কংকালকেই দ্বিতীয়বার কবর দেওয়া হত। মিশরের 'মৃতের পুস্তকে' নাকি এমন ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে দেহ থেকে অঙ্গচ্ছেদ করার উল্লেখ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এমন প্রার্থনার উল্লেখও রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, দেহের ছিন্ন অংশ যেন আবার তার দেহের যথাস্থানে জুড়ে যায়। অসিরিজের দেহও বোধহয় এইভাবেই কাটা হয়েছিল যা সেট ও অসিরিজের কাহিনীরূপে বিখ্যাত হয়ে আছে। তবে এ ধরনের ঘটনা যে সবগুলোই উপরোক্ত প্রথা থেকে এসেছে তা নাও হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ ও জন্তু-জানোয়ারদের জন্যও এমন হতে পারে।

প্রথমদিকে সর্বত্রই প্রায় বসা অবস্থায় মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। দেওয়া হত মাতৃগর্ভে শিশু যে অবস্থায় থাকে সেই ভঙ্গীতে। আশা করা হত যে, এতে পৃথিবী-মাতার গর্ভ থেকে সে আবার নতুন করে জন্ম নেবে। তবে মিশরে এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় রাজবংশ স্থাপিত হবার পর। এরপর থেকে দেহকে সরাসরি শুইয়ে কবর দেওয়া হত। এ সময় থেকেই মমিকরণ প্রথা প্রবল হয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও উভয় ধরনে কবর দেবার রীতিকে পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়। মিশরের পঞ্চম রাজবংশ স্থাপিত হবার পর থেকেই মমি তৈরি করে কবর দেবার প্রথা স্থায়ী কবররীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় রাজবংশ পর্যন্ত মৃতের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে প্রার্থনা করা হত ঃ—'অনুবিস (কবররক্ষক) অথবা অসিরিজ (মৃত্যুলোকের দেবতা) রাজকীয় অনুমোদন দান করুন। মৃতের আত্মাকে পর্যাপ্ত স্বর্গীয় আহার্য দেওয়া হোক।' মৃতের নামকে তাদের মধ্যে স্থায়ী করে রাখার জন্য তার কবরের উপর মিশরীয়রা এসময় পাথরের সৌধ তুলে দিত। এই প্রথা যতদিন পর্যন্ত মশরীয়রা পিতৃপুরুষের পূজা করত ততদিন চালু ছিল।

পরে অবশ্য পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি পাল্টে যায়। লোকে মনে করত যে মৃত ব্যক্তি পরলোকের অধিকর্তা অসিরিজের সঙ্গে মিলে যেত। ফলে মৃতের নামে পুজো না করে লোকে অসিরিজেরই পুজো করত। এই বিশ্বাস না জন্মালে মিশরের অধিবাসীরা পূর্বপুরুষের পূজা কখনই পরিত্যাগ করত না। কারণ, মিশরের পারিবারিক বন্ধন ছিল অতি দৃঢ় ও প্রীতিপূর্ণ। এই জন্য মিশরে প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের উপর বসানো পাথরে লেখা থাকত, 'এখানে তাঁরাই রয়েছেন যাঁরা জীবিতকালে জীবনকে ভালবাসতেন ও মৃত্যুকে ঘৃণা করতেন।' মিশরীয়দের এই আত্মীয়প্রীতি থেকেই বোধহয় জাঁকজমকপূর্ণ কবর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে মরেও লোকে মমি হয়ে তার মধ্যে বেঁচে থাকে।

প্রাচীনতম কবরের যে সন্ধান এখানে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, মাদুরে শায়িত ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে খাদ্য, পানীয় ও অস্ত্রশস্ত্র। মৃতদেহ এ-সব ব্যবহার করতে পারবে বলেই তাদের ধারণা ছিল, কারণ সহুকে তারা সেরকমই মনে করত। তারা মনে করত মৃতদেহে 'ক' (দ্বিতীয় সত্তা) ও 'ব' (তার প্রাণশক্তি) ফিরে আসতে পারে। প্রাচীন বর্বরদের মত মিশরীয়দেরও ধারণা ছিল যে, একদিন যে জীবিত ছিল চিরদিনের মত সে কিভাবে মরে যেতে পারে! এ ধারণা মিশরীয়রা সভ্য হয়ে উঠলেও পরিত্যাগ করতে পারেনি বরং নানা অনুষ্ঠানপদ্ধতি তৈরি করে একে বাড়িয়েই তুলেছিল।

পরবর্তীকালে দেহরক্ষার জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা করা হয়। করা হয় এই কারণে, যাতে এই দেহে তার 'ক' (দ্বিতীয় সত্তা), 'ব' (প্রাণশক্তি) ও 'ইখু' ফিরে আসতে পারে, বন্ধু-বান্ধবদের দানসামগ্রী গ্রহণ করতে পারে এবং জাদুবলে যেখানে খুশি সেখানে চলাফেরা করতে পারে। এজন্য সহজে পচনশীল অন্ত্র ও মাথার ঘিলু বের করে নিয়ে অস্থিমজ্জা ও মেদ শুকিয়ে মমি করা হত। এই মমি করা হলে দেহ আর অবক্ষয়ের মুখে পড়বে না মিশরীয়রা এই বিশ্বাস করত। এজন্য নানা মসল্লাদি ব্যবহার করা হত। যে অংশ দেহ থেকে বের করে নেওয়া হত, তাও যে ফেলে দেওয়া হত, তা নয়। ভিন্নভাবে শুকিয়ে ঢাকনা দেওয়া এক ধরনের পাত্রে রেখে দেওয়া হত। এগুলোকে বিশেষ এক ধরনের দৈত্যশক্তির হেফাজতে রাখা হত, যাতে মমি ইচ্ছে করলেই এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারে।

প্রথম দিকে অগভীর গর্ত খুঁড়ে মরুভূমিতে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। পরে বড় লোকেরা পাহাড়ের উপর কবর তৈরি করে তার মুখ বন্ধ করে দিত, যাতে শেয়াল বা হায়েনারা বালি খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে এনে খেতে না পারে। এ ছাড়া মৃতের সঙ্গে যে-সব মূল্যবান আসবাবপত্রাদি দেওয়া হত, তা যাতে চোরেরা চুরি করে নিতে না পারে সেজন্যও সুরক্ষিত কবরের ব্যবস্থা করা হত। মিশরের লোকেদের স্বর্ণাদি মূল্যবান দ্রব্যের প্রতি দারুণ লোভ ছিল। এজন্য দেবদৈত্য ও ভুতপ্রেতের ভয়কে অগ্রাহ্য করেও তারা এসব চুরি করার সাহস দেখাতো। এই জন্যই শতাব্দীকালের

মধ্যেই নানা প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও বহু সমাধি ভেঙে নানা জিনিস চুরি করে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক রাজকীয় সমাধিও ছিল, যেমন চতুর্থ থোথ্‌মিস-এর। মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী মিশরীয়রা এইজন্য কবরের রক্ষক হিসেবে জাদুক্ষমতাসম্পন্ন পশু-মূর্তি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে রাখত। হয়ত মিশরের স্ফীংস এমনই এক ধরনের জন্তু। এজন্য এরা 'ডি হেটেপস্‌টেন' নামে একটি পদ্ধতি তৈরি করে। এই জন্য মিশরীয়দের কবরের ওপর বসানো পাথরে লেখা থাকত 'অনুবিস রাজকীয় অনুমোদন দান করুন।' অনুবিস (শেয়াল)-এর স্থান অসিরিজ ও অন্যান্য দেবতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে রীতিমত তোয়াজ করা হত [আমাদের শিবাভোজের মত?] সাটেন বা সুটেন নামে এক ধরনের শব্দও পাওয়া যায়। এর অর্থ রাজা। সম্ভবত মৃতকে রক্ষা করার জন্য জীবিত রাজাদের কাছেও অনুরোধ জানানো হত। রাজারা অনেক সময় প্রিয় সভাসদদের জন্য প্রচুর ব্যয়ে পিরামিড তৈরি করে দিতেন।

কোন কোন স্থানে অনুবিস মৃত্যুদেবতা অসিরিজের অপেক্ষাও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, যেমন থিব্‌সে। থিবিয়ানদের প্রাধান্যের কালে সূর্য-দেবতা 'আমেন-রা' প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য সূর্য-দেবতার অনুরূপ হয়েও মৃত্যুর সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্যুত হননি। এই সূর্য-দেবতা মধ্যগগনে হতেন 'রা' অস্তাচলে 'টুম'। রাত্রিবেলা তিনি মৃত্যুর জগতে পুণ্যাত্মাদের নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন। এইজন্য দেখা যায় মৃত আমেন-রার বর্ণ নীল অসিরিজের মত, কিন্তু আমেনের মত মেষশীর্ষ। তখন একে রহস্যময় অউফ্ (Auf) নামে ডাকা হত। অউফ মানে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এর সঙ্গে থাকতেন দেবী আইসিস ও নেফথাইস (Nephthys)। পরবর্তীকালে অবশ্য থিব্‌সের পুরোহিতরা আবার মৃত্যুজগতে আত্মার রক্ষাকবজ হিসাবে নানা ধরনের মন্ত্র ও জাদুবিদ্যা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাদের এই মন্ত্র ও জাদুবিদ্যার কথা মৃত সম্পর্কিত গ্রন্থ ও 'পরলোকের পথ' সম্পর্কিত গ্রন্থে স্থান লাভ করে আছে।

মিশরীয়রা প্রেতলোককে যথার্থই পৃথিবীর নিচে বলে ভাবত। একে তারা বলত দুয়াৎ (Duat)। এই চিন্তা এসেছিল পৃথিবীর উপর সমাধিসৌধ ও নিচে মৃতের কক্ষ লক্ষ্য করে। মৃতের জগৎকে এইজন্য তারা বলত 'খেরতি-নেতার' (Kherti-neter) বা দিব্য পাতাল-প্রাসাদ। মিশরীয়রা ভাবত, এই পাতালনগরীতে 'সহু' বা মৃতের সূক্ষ্মদেহ রাজকীয় কৌলীন্যে বাস করত। তবে মৃতের প্রেতাত্মা এক কবর থেকে আর এক কবরে ঘুরে বেড়াতে পারত। পরবর্তীকালে সূর্যের বাহক হিসাবে নৌকোর কল্পনা করা হত, যে নৌকো দিনের বেলা পৃথিবীর আকাশে থাকলে রাত্রিবেলা সে পরলোকের আকাশ পরিভ্রমণ করে। মিশরীয়রা ভাবত মিশরের নিচে যে জগৎ আছে তাতে রাজত্ব করেন অসিরিজ, যেমন মিশরে রাজত্ব করেন ফ্যারাও। জীবিতকালে মানুষ যেমনভাবে বাস করে, মৃত্যুলোকেও আত্মা তেমনই ভাবে বাস করে বলে মিশরীয়দের ধারণা ছিল [এ-কথা সত্য। যারা যথার্থ সূক্ষ্ম জগতে জীবের সূক্ষ্ম সত্তাকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, যে যেমন ভাবনা নিয়ে বা সংস্কার

নিয়ে মরে তেমনি সংস্কার বা চিন্তাভাবনা নিয়ে সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম সত্তা হিসাবে বিরাজ করে। একথা বর্তমান গ্রন্থে উপক্রমণিকা অংশে বলা হয়েছে।] এইজন্য মৃতের গ্রন্থে এ ধরনের বর্ণনা আছে, যদি কেউ পরলোকে অসিরিজকে কোন শ্রমের কাজ করার জন্য আবেদন করে, যেমন, ভূমিকর্ষণ, গাছে জল দেওয়া, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বালুকা বহন করা প্রভৃতি, তাহলে দেখবে অসিরিজ সাড়া দিচ্ছেন। 'যখনই তোমরা স্মরণ করবে আমি তখনই সেখানে আছি' অসিরিজের এই উক্তির উপর বিশ্বাস থেকেই কোন শ্রমিক ব্যক্তি মারা গেলে তার সঙ্গে কবরে ছোট ছোট অসিরিজ তৈরি করে দেওয়া হত—যাদের নাম ছিল উশাবতিউ (Ushabtiu)। এই উশাবতিউরা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রতীকী শক্তি। আদিকালে এদের পরিবর্তে রাজ-রাজড়াদের দাসদাসীদের হত্যা করে তাঁদের সঙ্গে কবর দেওয়া হত। পরে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি সহানুভূতিসম্পন্ন হলে যথার্থ জীবিত দাসদাসীর পরিবর্তে কাঠের দাসদাসী তৈরি করে মৃতের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হত! তবে মাঝে মাঝে যে যথার্থই দাসদাসীদের হত্যা করে কবরে দেওয়া হত না, তা নয়। দ্বিতীয় আমেনহেটেপের (২২০০ খ্রীঃ পূঃ) কবরে বহু জীবন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে সমাধিস্থ করতে দেখা গেছে। অ্যাবিডোসে মিশরীয় রাজাদের প্রথম রাজবংশের কবরেও এমন সব জীবিত দাসদাসীদের সমাধি দেওয়া হত।

পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের অপেক্ষা মিশরীয়রা অনেক সহৃদয় হলেও তাদের মধ্য থেকে নির্মমতা যে একেবারেই চলে গিয়েছিল তা নয়। তাদের কাছে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষা মানুষের মূল্য খুব বেশি ছিল না। পরলোকে যাত্রার জন্য, বিশেষ করে রাজ-রাজড়াদের ক্ষেত্রে, খাদ্য, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির মত মানুষ হত্যা করে তাদেরও দিয়ে দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমগ্র ফ্যারাওদের শাসনকাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

পরলোকে যাত্রার জন্য মিশরীয়রা যে ব্যবস্থা করত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা থেকে সে সম্পর্কে বেশ কিছুটা অনুমান করা যায়। হেরোডোটাস লিখেছেন, 'যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মারা যান, তখন তাঁর পরিবারের মহিলারা মাথায় ও চুলে কাদা মেখে ঘরের বাইরে এসে শহরের পথ পরিক্রমা শুরু করে। এই সময় কোমর অবধি কাপড় তুলে তারা নিজেদের পিটতে থাকে, বুক থাকে খোলা। সকল আত্মীয়-স্বজন তাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। পুরুষেরা অনুরূপভাবে নিজেদের আহত করতে করতে পথ চলে। এইভাবে পথ পরিক্রমা শেষে তারা মৃতদেহকে কবর থেকে বের করে আনে ঔষধি মলম মাখাবার জন্য। এই বিদ্যায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের ডাকা হয়। এরা মৃত ব্যক্তির অনুরূপ রঙিন কাঠের মূর্তি তৈরি করে এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মলম মাখাবার কলাকৌশল প্রদর্শন করে। এ ছাড়া নিকৃষ্ট মানের কিছু নমুনাও তাদের দেখানো হয়—যার খরচ কম। এর মধ্য থেকে শোকার্ত ব্যক্তিরা যে ধরনের মমিকরণ আশা করে তারা সেই অনুপাতেই ব্যবস্থা করে। এরপর দেহে মলম

লাগাবার জন্য তৈরি হয়। প্রথম তারা নাক দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে আনে। এ জন্য এক ধরনের লোহার হুক ব্যবহার করে। এইভাবে ঘিলুর কিছু অংশ বের করে ওষুধের সাহায্যে বাকীটুকু বের করা হয়। এরপর এক ধরনের ইথিওপিয়ান পাথরের ছুরি দিয়ে পেটের এক পাশ ফুটো করে অন্ত্র বের করে পরিষ্কার করার পর তাড়ি জাতীয় এক ধরনের মদ দিয়ে তা ধুইয়ে দেয়। পরে এর মধ্যে সুগন্ধি ছিটিয়ে দেয়। এরপর অন্ত্র ভর্তি করা হয় এক ধরনের আঠা দিয়ে। সঙ্গে থাকে নানা ধরনের সুগন্ধি। এরপর পেট সেলাই করে দেওয়া হয়। পরে এক ধরনের সোডিয়ামে ভিজিয়ে সত্তর দিনের মত তা বন্ধ করে রাখে। এর বেশি ভিজিয়ে রাখার নিয়ম নেই। সত্তর দিন পার হয়ে গেলে এরা মৃত দেহ ভাল করে ধুয়ে মুছে নিয়ে এক ধরনের কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে থাকে আঠা। এরপর আত্মীয়স্বজনেরা দেহ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেহ অনুপাতে একটা কাঠের আবরণ তৈরি করে। পাত্রটি তৈরি হলে মৃতদেহকে তার মধ্যে রেখে ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর এই শবাধারটিকে ভাল করে বেঁধে কবরের দেয়ালে খাড়া অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখে। দরিদ্রদের ক্ষেত্রে এই দেহরক্ষার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরনে করা হয়।'

হেরোডোটাস মিশরের মমি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়েছেন ডিওডোরস নামে আর এক গ্রীক ঐতিহাসিকও অনুরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন। এঁদের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর আগেই অনেকে নিজেদের সমাধিসৌধ বা পিরামিড তৈরি করে যেতেন। এবং সেই পিরামিডে মৃতদেহ সংরক্ষিত থাকত। মৃতের আত্মীয়-স্বজন যখন তখন সেখানে ঢুকতে পারত। এঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর বেশ কিছু দিন মৃতদেহ পরিবারের গৃহেই থাকত। হয়তো প্রাচীন বর্বরদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই এ প্রথা মিশরীয়দের মধ্যে এসেছিল।

বয়স্কদের মত শিশুদের ক্ষেত্রেও মমি করার প্রথা ছিল। তবে এদের জন্য পৃথক কোন সমাধিসৌধ তৈরি করা হত না, ঘরের নিচেই তাদের সমাধি দেওয়া হত। বয়স্ক ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মমি তৈরি হবার পর পৃথক সমাধিসৌধে তাকে রাখা হত। সমাধিসৌধ তৈরি হতে বিলম্ব হলে কিছুদিন তা ঘরেই থাকত। অবশ্য সে জন্য বাড়ির মধ্যেই পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হত। ডিওডোরসের লেখা পড়ে মনে হয়, অনেক সময় দুষ্ট রাজার জন্য স্থায়ী কবর দেবার ক্ষেত্রে প্রজারা বাধা দিত। তবে সেটা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। স্থায়ী কবরখানায় মমিকৃত অবস্থায় স্থান পাওয়া ছিল মিশরীয়দের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। এটা করা হলে দেবতাদের রোষ চলে যায় এরকমও ভাবা হত। তবে কোন রাজা বলপূর্বক সিংহাসন লাভ করলে ভূতপূর্ব রাজার ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবহার করা হত সেটা জানা কষ্টকর। এমন প্রমাণ আছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মৃতদেহকে অনেক সময় কবর থেকে বের করে বাইরে এনে ফেলে দেওয়া হত।

ডিওডোরস কিভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হত সে বিষয়ে বিশদ কোন বিবরণ রেখে যাননি। তবে মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে বর্বরদের মত মিশরের শাসকদেরও একটি নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বাঁচতে দেওয়া হত না। তাঁকে হত্যা করা হত। এরপর অন্য আর একজন রাজা তাঁর পরিবর্তে সিংহাসনে বসতেন। তিনিও অন্য কোনভাবে মারা না গেলে নির্দিষ্ট সময় এগিয়ে এলেই নিয়ম অনুসারে নিহত হতেন। রাজত্ব করার ঊর্ধ্বসীমা ছিল ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর রাজাকে রীতিমত অনুষ্ঠান করে হত্যা করা হত। তবে অনুসঙ্গী হিসেবে জীবন্ত দাসদাসী ও পারিষদদের হত্যা করে কবরে দেবার প্রথা রাজার ইচ্ছানুসারেই অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ থাকত। কোথাও কোথাও বন্ধ থাকত মানবতার খাতিরে। ধীরে ধীরে জীবন্ত রাজাকে হত্যা করার প্রথাও উঠে যায়। এর বদলে রাজা জীবিতকালেই নিজের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান করতেন। নিজের প্রতিমূর্তির সামনে এক ধরনের ক্রিয়া করতেন তিনি। এই প্রতিমূর্তিকে অসিরিজ হিসেবে কল্পনা করা হত। এই অনুষ্ঠান করা হত নেকড়ে দেবতা সিয়াটের (Siut) পতাকাতলে। কখনও কখনও একে বলা হত উপুয়ত (Upuat) বা সেডি (Sedi) অর্থাৎ লেজওয়ালা দেবতা। এই সময় রাজার সঙ্গে যুবরাজও সিংহাসনে বসতেন এবং যথার্থ তিনিই ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। মিশরের প্রথম রাজবংশের ডেন বা উডিমুর আমলে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজা তৃতীয় আমেনহেটেপের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল। এরপর এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস ও অন্যান্যরা ত্রিশ বছরের অনেক কম সময়ে এই অনুষ্ঠান করতেন। মিশরীয় রাজতন্ত্রের মধ্যপর্বে এই অনুষ্ঠানটি একটি কৃত্রিম অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নকল অনুষ্ঠান করা হত।

ডিওডোরসের বর্ণনা থেকে আর একটি বিষয় যা জানা যায় তা হল এই যে, কেউ মারা গেলে তাকে বিশেষ একটি হ্রদের ধারে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে চল্লিশজন বিচারক মৃতের বিচার করতেন। যে কেউ তখন মৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারতো। যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হত, তাহলে ঘোষণা করা হত যে, সে আনুষ্ঠানিক কবরের উপযুক্ত নয়। যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হত, তবে অভিযোগকারীর কঠোর সাজা হত। তাকে নৌকোয় চাপিয়ে হ্রদ পার করে কবরখানায় পাঠিয়ে দিতেন বিচারকেরা। আসলে এসব বোধহয় মৃতলোকে অসিরিজ ও তার বিয়াল্লিশ জন বিচারকের কথা মনে রেখে অভিনয় হিসেবে করা হত। এই হ্রদ ও নৌকোও ছিল তার প্রতীক মাত্র। 'মৃতের পুস্তকের' বর্ণনানুসারে এই অভিনয় চলত।

যথার্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা বোধ হয় 'অনির প্যাপিরাস' নামক প্যাপিরাসপত্রে পাওয়া যায়, যে পত্রটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন মিশরের লোকেরা তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল ছিল। বিশেষ করে ধর্মের

ব্যাপারে সহজে তারা চিন্তাধারা পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিল না। মৃতের কবরে যে সকল জিনিস স্থাপন করা হত প্রথম দিকে তারা তা শ্লেজ জাতীয় গাড়িতে বয়ে নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করা হত। তবে চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করা হলেও শ্লেজ জাতীয় গাড়িও থাকত। এই গাড়ির নিচে চাকা বেঁধে নেওয়া হত। কবরে রাখার জিনিসপত্র গরুতে টানা গাড়িতে নিত। পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে যারা এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতেন তাদের বলা হত খের-হেব (Kher-neb), যার অর্থ দলবদ্ধ পুরোহিত ধর্মসঙ্গীতজ্ঞ, যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোভাগে যান। সমগ্র অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান এঁরাই পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে একজন হতেন মৃতের আত্মীয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে তিনিই মন্ত্র পড়তেন এবং জাদু-মন্ত্র আউড়ে মৃতের আত্মাকে রক্ষাকবচ দেবার চেষ্টা করতেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হত 'অন-মুট-ফ্' (An-Mut. F)। এই অনুষ্ঠানের যথার্থ অর্থ আজ আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পুরোহিতদের মধ্যে সর্বাগ্রে যিনি যেতেন তাঁকে অসিরিজের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবা হত। তাঁর সঙ্গে থাকত বঁড়শি ও কাঠের দণ্ড জাতীয় দুধরনের প্রতীক। এগুলি দেবতার প্রতীক হিসেবে কাজ করত। অগ্রবর্তী এই পুরোহিত—মিশরীয়রা যাকে ভিন্ন নামে বলত সেম (Sem), তাঁর কাজ ছিল অদ্ভুত ধরনের। সমাধি দেবার পূর্বরাত্রে যেস্থানে মৃতের দেহকে সমাধিস্থ করা হবে সেই স্থানে গিয়ে তিনি ঘুমোতেন। তাঁর পরনে থাকত এক ধরনের রহস্যময় গোরুর চামড়ার পোশাক। তাঁর মাথার কাছে দাঁড় করানো অবস্থায় থাকত মমিধারক কফিন। এই ঘুমোবার সময় তিনি মৃতব্যক্তি পরলোকে দেবতা হিসেবে বিরাজ করছেন এই স্বপ্ন দেখতেন। ভোরবেলা তিন ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। এরা তখন এক ধরনের ধর্মীয় প্রভাতফেরী গাইতেন। এদের মধ্যে দু'জন হোরাস ও আইসিসের ভূমিকা নিতেন আর সেম নিতেন অসিরিজের ভূমিকা। সবশেষে সেম চিতাবাঘের চামড়া পরে মৃতের মুখ ও চোখ খোলার মন্ত্র আওড়াতেন। এটা করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, মৃত ব্যক্তি যেন দেখতে পায় এবং আত্মীয়স্বজন প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করতে পারে। মৃত ব্যক্তির এই সব ইন্দ্রিয় খুলে দেবার জন্য এক ধরনের বাটালী ব্যবহার করা হত। 'ভূতের দাস' নামে এক ধরনের লোক ছিল যাদের দিয়ে মৃতের উদ্দেশে খাদ্য দেওয়া হত। এদের মিশরীয় শব্দে বলা হত – 'হেন-ক' (Hen-Ka)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এ-সব অনুষ্ঠান করতেন সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে কোন নিকট আত্মীয়, রাজরাজড়াদের ক্ষেত্রে রীতিমত নিযুক্ত পুরোহিত। রাজরাজড়াদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যারা করত সেই সব পুরোহিত প্রচুর জমিজমা পেত। উনবিংশতম রাজবংশের সময় পুরোহিতদের জন্য বড় বড় মন্দির তৈরি হয়েছিল। 'প্রেতলোকের পুস্তক' নামক গ্রন্থ থেকে নানা দৃশ্য দিয়ে এই মন্দিরগুলি সাজানো হত।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মন্দিরগুলির সঙ্গে অনেক গল্প জড়িত ছিল। এই গল্প ছিল অসিরিজকে নিয়ে। অসিরিজ পরলোকের শাসক হলে পরলোকে তাঁর

রাজধানী এই ধরনের নানা জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রেতাত্মারা এসে তাঁকে আনুগত্য জানাতো। সুতরাং বড়লোকেরা নিজেদের কবরে বড় বড় ফলকে দীর্ঘ কাহিনী খোদাই করে রাখত। রাজরাজড়ারা শহরের কাছে সমাহিত হলেও তাদের জন্য পরলোকের কল্পনায় দূরে কোথাও জাঁকজমকপূর্ণ দ্বিতীয় সমাধি তৈরি করা হত। পার্থিব শহরের মত প্রেতলোকের শহরেও যাতে তিনি অনুরূপভাবে থাকতে পারেন—সেই জন্যই এমন করা হত। কেউ কেউ হয়তো দ্বিতীয় সমাধিতে সমাধিস্থ হবার সুযোগ পেতেন না, তবুও এমন করা হত। এরকম ঘটেছিল তৃতীয় সেনুসরেট ও প্রথম আহ্‌মেস-এর ক্ষেত্রে। আহ্‌মেস-এর পিতামহী রাণী টেটাসেরার জন্য নকল একটি কবর তৈরী করা হয়েছিল। হয়তো মিশরের প্রথম রাজবংশেব অধিকাংশ রাজার জন্যই এমন করা হত।

তবে কয়েক শতাব্দী পরে মিশরীয়দের রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও সমাধি দেবার রীতির ক্ষেত্রে নানা-ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মিশরীয়দের কবরের সঙ্গে নতুন রাজত্বকালের কবরের তুলনা করলেই একথার প্রমাণ মিলবে। এই সময়ের ব্যবধানের মধ্যে কবরে রক্ষিত সম্পদের পরিমাণ বিচার করলেই তা বোঝা যায়.

মিশরে সমাধিক্ষেত্রে উসাবটিউ বা কৃত্রিম দাসদাসী, পরিচারক ইত্যাদি রাখার যে ব্যবস্থা ছিল পরের দিকে তার আধিক্য পূর্বেকার আধিক্যের তুলনায় কিছুই নয়। এ সময় বরং কবরে মন্ত্রনির্মিত ফলক বা জাদুরক্ষণের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আর ছিল অঙ্গদ ও বক্ষকবচ। এর উপর 'মৃতের পুস্তক' থেকে নানা উদ্ধৃতি খোদাই করা হত। মিশরের নতুন রাজবংশ থেকে মধ্য রাজবংশের সময়েই এই রক্ষাকবচের ছড়াছড়ি ছিল বেশি। মধ্য রাজবংশের কবরে রক্ষাকবচের উপর মৃত ব্যক্তির নামধাম দেখা যায়। এই রক্ষাকবচ জাদুমন্ত্রে উজ্জীবিত ছিল। যার ফলে মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসবে অথবা নবজন্মে আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই পুনর্মিলিত হবে।

মিশরে থিবসের প্রাধান্যকালে মৃতের মমির সঙ্গে প্যাপিরাস কাগজে লেখা 'মৃতের পুস্তক' থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত থাকত। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, পরলোকে যাত্রার পথে এই লেখাগুলো তাকে পরিচালিত করবে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করবে। প্রথম দিকে এরকম কোন উদ্ধৃত লেখা মমির সঙ্গে থাকত না। শুধুমাত্র রাজরাজড়াদের ক্ষেত্রেই কবরের দেয়ালে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হত। এই লেখাগুলো 'পিরামিড গ্রন্থ' নামে পরিচিত। এ থেকে মিশরের প্রাচীনতম ভাষা সম্পর্কেও জানা যায়। পরবর্তীকালে রাজাদের সঙ্গে 'পরলোকের প্রবেশপথ' ও 'পরলোক' সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকে নানা রচনা উদ্ধৃত করে দেওয়া হত। মমি তৈরি ও কফিন তৈরি করার ধারাও পরবর্তীকালে অনেক পাল্টে গিয়েছিল। চতুষ্কোণ ও মনুষ্যাকৃতি কফিন তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে। এর উপর নানা কৌতুকচিত্রও থাকত। রোমান যুগে মিশরে নকশা করা বাক্স বা প্লাস্টারে মনুষ্যাকৃতি কফিন তৈরি হত। এসময় রাজার অনুষঙ্গী

দাসদাসীদেরও মমির আকারে রাখা হত। পরে অবশ্য টোলেমিদের রাজত্বকালে এ-প্রথা উঠে যায়। এগুলো ধর্মীয় কৃত্রিম আচার ও এক ধরনের ভণ্ডামিতে পরিণত হয়েছিল। মমিকরণ, কবর দান, 'মৃতের পুস্তক' 'পরলোকের প্রবেশপথ' এসব প্রথা ও গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব হারিয়ে গিয়েছিল।[১]

পরবর্তীকালের মিশরীয়দের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: মিশরে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন চিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভাবধারার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। অবশ্য একদিনেই যে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়। তাছাড়া মিশরীয়েরা নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই এই সব বিশ্বাস ও প্রথা পরিত্যাগ করেছিল। মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের চিন্তাধারা মিশরীয়দের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব প্রতিভাত হয়েছিল। মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই তারা মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। আর বিশ্বাস করত ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে। এ-জন্য তারা সমাধি দেবার সময় নানা ধরনের মন্ত্রতন্ত্র ও জাদু করত। এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে ছিল যে, মৃত্যুর একজন দেবতা আছেন। তিনিও একদা পার্থিব জীব ছিলেন। অপশক্তি দ্বারা তিনি নিহত হন, কিন্তু পরে জাদুশক্তি দ্বারা বেঁচে ওঠেন এবং মৃত্যুলোকের অধীশ্বর হন। এই মৃত্যুলোকের অধীশ্বর হলেন অসিরিজ। মৃত ব্যক্তিকে মিশরীয়রা অসিরিজের মতই মনে করত, এবং বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর পরলোকে আবার তারা বেঁচে উঠবে। তাদের এই ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ধারণার অদ্ভুত একটা মিলও তারা দেখতে পেয়েছিল। খ্রীষ্টানরা মৃতের নবজাগরণে বিশ্বাস করত। আরও বিশ্বাস করত যে, মৃতেরা খ্রীষ্টের মধ্যেই বেঁচে উঠবে। সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও মিশরীয়েরা তাদের প্রাচীন প্রথাতেই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করত। যা কিছু পরিবর্তন হয়েছিল তা হয়েছিল নতুন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য।

প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করে রাখত এই বিশ্বাসে যে, এতে মৃতের আত্মা পরলোক এবং কবরে তার দেহের মধ্যে ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারবে। খ্রীষ্টানরাও মিশরীয়দের এই বিশ্বাসে তেমন বাধা দেয়নি, কারণ তাদের আত্মার পুনরুত্থানজনিত বিশ্বাসের সঙ্গে মিশরীয়দের আত্মা সম্পর্কিত বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত মিশরে মমিকরণ নীতি চালু ছিল। পরে চার্চের বাধাদানের ফলে এটা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এই বাধা দেওয়া হয়েছিল—খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসতত্ত্বের উদ্‌ভাবক অ্যান্টনির (Antony) জন্য। এই সময়কার খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী মিশরীয়দের কবরে দেখা যায়—দেহরক্ষার ব্যবস্থা রয়েই গেছে। মাঝে মাঝে মৃতের মস্তিষ্কে মালা জড়ানোও নজরে পড়ে। আগে যেমন দাড়ি গোঁফ কামিয়ে সমাধি দিত

১ Ref. E. A. W. Budge, The Book of the Dead, London, 1898, The Egyptian Heaven and Hell (do) 1906, The Mummy, Cambridge—1983, A. Ermar, Egyptian Religion. etc.

এ সময় এ-সব সুদ্ধই কবর দেওয়া হত। এর ফলে মৃতদেহ শুকিয়ে গেলে তার মুখের আকৃতি হত—মেষপালকের মত। এ সময়ও মৃতদেহকে ভাল করে কাপড়ে জড়িয়ে সমাধি দেওয়া হত। কখনও কখনও মুখে প্লাস্টার মেখে রঙ করে দেওয়ার রীতিও ছিল। ব্যতিক্রম ছিল এই যে, মৃতের হাতে খ্রীষ্টানদের কাপ ধরিয়ে দেওয়া থাকত, যে কাপে খ্রীষ্টানরা মনে করত যিশুখ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস থাকে। কখনও কখনও মৃতদেহের বাঁ কাঁধে থাকত স্বস্তিকাচিহ্নযুক্ত অলংকার। এই চিহ্নকে খ্রীষ্টানরা এক ধরনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করত। অথচ তার পোশাকের নিম্নদিকে আঁকা থাকত দেবী আইসিসের নৌকো।[১] এর ফলে খ্রীষ্টান বিশ্বাস ও মিশরীয়দের প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ধর্ম বিচার করলেই এই ধরনের অপূর্ব একটা সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিশ্বধর্ম যদি 'গ্রন্থধর্ম' অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থের ধর্মে রূপান্তরিত হয়—এবং সেই ধর্মের অনুরাগীরা যদি রক্ষণশীল হয়, তাহলে বিশ্বধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এরা অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারে না। তথাপি অজ্ঞাতসারেই নতুন ধর্মগুলে সেখানকার আদি অধিবাসীদের বিশ্বাস যে কিভাবে ঢুকে যায়—কড়া প্রহরা থাকা সত্ত্বেও রক্ষণশীল ধর্মবাহকেরা তা লক্ষ্য করতে পারেন না। ভারতবর্ষই বোধ হয় এই ধরনের সমন্বয়ের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমি—যেখানে শুধু দেশীয় নয়, বিদেশীয় গ্রহণযোগ্য ভাবধারাও সহজে তার পথ করে নিতে পেরেছে। সেইজন্য যদি কখনও পৃথিবীতে ধর্ম সমন্বয়ে আত্মিক সংকীর্ণতা কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে তবে এই মহাপবিত্র ক্ষেত্রে সর্বমানবিক এক সত্যধর্মের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব, যার লক্ষণ আধুনিককালে নানাভাবেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে কথা থাক, খ্রীষ্টীয় যুগ থেকে মিশরীয়দের মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছিল তাই লক্ষ্য করা যাক, এবং লক্ষ্য করা যাক, কিভাবে একদিন এই প্রাচীন বিশ্বাস সত্যি সত্যিই মরে গেল।

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিশরীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থাই যে থেকে গিয়েছিল তা নয়, আরো অনেক পুরানো ব্যবস্থাই বেঁচে ছিল। তবে এ-সব খ্রীষ্টানরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও দেখা যাচ্ছে মিশরীয়রা কবরে মৃতের উদ্দেশে খাবার দান করছে। কবর তৈরি করা হচ্ছে লম্বা করে। এর শেষের দিকে মৃতদেহকে স্থাপন করে প্রবেশপথে কুলুঙ্গির মত রাখা হচ্ছে যেখানে খাবার রাখা যেতে পারে। মদের জালা বা খাবারের বাক্স পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থাও থাকছে বা রাখা হচ্ছে। অ্যান্টিনোয়ী (Antinoe)-র এক মিশরীয় খ্রীষ্টানকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি উইল করে গেছেন যাতে তাঁর কবরে আত্মার শান্তির জন্য খাবার-দাবার দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত মৃতের উদ্দেশে এ ধরনের খাবার দেওয়া হত। কারণ

১ Gayet, AMG, xxx.

৩৯৩ খ্রীঃ হিপ্পোতে একটি খ্রীষ্টান অধিবেশনে দেখা যাচ্ছে (যেখানে সেন্ট অগাস্টিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন) পূর্বদেশীয় খ্রীষ্টানদের মৃতের মুখে খাবার রেখে সমাধিস্থ করার প্রথার নিন্দা করা হচ্ছে। তবুও কফিনের মধ্যে কিছু পবিত্র জিনিস রাখা হত। এছাড়া প্রাক্তন মিশরীয়দের আরও অনেক অন্ত্যেষ্টিব্যবস্থা তখনও চালু ছিল। মিশরে যেমন মৃতদেহের সঙ্গে অঙ্গকবচ ও দেবদেবী হিসেবে ছোট ছোট মূর্তিও কবরে দেওয়া হত, তেমনই খ্রীষ্টান মিশরেও দেখা যাচ্ছে মৃতের সঙ্গে কবরে দেওয়া হচ্ছে সেন্ট জর্জের মূর্তি ও যাজকদের পুতুল। প্যাপিরাস পত্রের পরিবর্তে কবরে রাখা হচ্ছে জলের মালা। মৃতের হাতে জেরিকো (Jericho) পুষ্প রাখার নিদর্শনেরও অভাব নেই। এটা ছিল এক ধরনের রহস্যময় গোলাপের মত যা ছিল অমরত্বের প্রতীক। খ্রীষ্টের জন্মদিনে প্রতি বছরই এই ফুল ফুটে থাকে। সেরাপিওঁ (Serapion) নামে এক খ্রীষ্টান যাজকের কবরে দেখা যাচ্ছে যে, মৃতদেহকে লোহার শিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে ঝুলছে ক্রুশচিহ্ন। অনেক ক্ষেত্রে মৃতের দেহাবরণের উপর প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে মৃত ব্যক্তির ছবিও এঁকে দেওয়া থাকত। প্রাচীন মিশরীয় জীবনের প্রতীক চিহ্নও অনেক সময় মৃতের হাতে থাকত। এই চিহ্ন এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত যে, পরে একে ক্রুশ চিহ্নরূপে ধরে নেওয়া হত, কারণ প্রাচীন মিশরীয় এই 'অনখ' চিহ্নটি দেখতে অনেকটা ছিল ক্রুশেরই মত। খ্রীষ্টীয় এই ক্রুশ চিহ্নটির নাম ছিল—ক্রাক্স আনসাটা (Crux Ansata)।

তবে আলেকজান্দ্রিয়াতে যে খ্রীষ্টান বিশপ থাকতেন, ক্রমে ক্রমে তাঁদের প্রভাব মিশরের দূরবর্তী স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে প্রাচীন মিশরের নানা অন্ত্যেষ্টিপ্রথা একে একে উঠে যায়। এর পরিবর্তে খ্রীষ্টান সমাধিপ্রথা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু গ্রীক রক্ষণশীল চার্চ থেকে মিশরীয় চার্চ পৃথক হয়ে যাবার পর পুরানো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনেক কিছুই আবার টিকে থাকার সুযোগ পায়। দেখা যায়, মৃতদেহকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবরণে আচ্ছাদিত করে কবর দেওয়া হচ্ছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্মচিহ্নযুক্ত পাত্রে রেখে তবে সমাধির ব্যবস্থা করছে তারা। পবিত্র পাত্রে একটি ফুটোও রাখা হচ্ছে যাতে করে অনুরাগীরা সেখান দিয়ে পবিত্র মরদেহ দেখতে পারে। [এখানে প্রাক্তন মিশরের প্রথা অনুসরণ করে মৃতের আত্মার আগমন-নির্গমনের পথ খোলা রাখার জন্যও যে এমন করা হচ্ছে না, একথা বলা যায় না।] তবে এসব পাত্রে শুকনো হাড় ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সুতরাং মনে হয়, এসময় দেহ মমিকরণপ্রথা বাদ দেওয়া হয়েছিল। তখনও মিশরীয় খ্রীষ্টানরা কবরে মৃতের উদ্দেশে খাবার দান করত, তবে রোমক খ্রীষ্টানরা যেমন 'মাস' বা ভোজ্য-দ্রব্য দিত আত্মার শান্তির জন্য—সে ধারণা মিশরীয় খ্রীষ্টানদের ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু কবরের উপর উৎকীর্ণ লিপিসহ পাথর রাখার ব্যবস্থা প্রায় সার্বিক ছিল এ-কথা বলা যেতে পারে। এতে সাধারণত এই ধরনের লেখা থাকত : 'এক ঈশ্বর যিনি সাহায্য করেন', 'ঘুমিয়ে আছেন' কিংবা 'বিশ্রাম নিয়েছেন' ইত্যাদি। মাসে (ইউকারিস্টে)

ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হত। তবে প্রাচীন মিশরীয়রা এই পাথরের উপর যেমন লিখত 'শোক কোরনা, কারণ কেউই অমর নয়' এমন কথার উল্লেখ খুব কমই থাকত। তবে একটি কবর-ফলকে লেখা ছিল—'হায়! বিচ্ছেদের বেদনা কি দুঃসহ! রহস্যময় জগতে তার যাত্রা চিরকালের জন্য তাকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মৃত্যুলোকের পরিবেশে আমরা কি করে তার দুয়ারে যেতে পারব? হে মৃত্যু তোমার নাম আমাদের মুখে তিক্ত শোনাক। যারা মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে ভালবাসে তারা সবাই এখানে এসে শোকপ্রকাশ করুক।' এই উদ্ধৃতির সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতের জন্য প্রার্থনা করার রীতির নিবিড় যোগসূত্র রয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরীয়রা এই পাথরে লিখত 'যারা মৃত্যুকে ঘৃণা কর, জীবনকে ভালবাস, তারা মৃতের জন্য প্রার্থনা কর।'

মিশরের খ্রীষ্টানরা মিশর মুসলিম শাসনের অধীনস্থ হলে নানা ধরনের নিগ্রহের সম্মুখীন হয়। ফলে অনেক খ্রীষ্টানই ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। মিশরের মুসলমান শাসকেরা এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মাটির সঙ্গে সমান করে কবর দিতে হবে যাতে কারো কবরের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে বের করা না যায়। ফলে চতুর্দিকে মুসলমানদের দ্বারা পরিবৃত মিশরের অবশিষ্ট খ্রীষ্টানরা এখন কবর দেবার ক্ষেত্রে প্রায় মুসলিম প্রথাই অনুসরণ করে থাকে। মৃতদেহকে সমাধিস্থলে নিয়ে আসা হয় কফিন দণ্ডের উপর। পেছনে পেছনে ক্রন্দনাতুরা হয়ে আসে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মহিলারা। সমাধির উপর বিত্তশালীরা মেষ বলি দিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে, গরীবেরা শুধুমাত্র রুটি রেখে দেয়। ভাড়াটে মহিলারা তিনদিন ধরে প্রয়াত ব্যক্তির জন্য মৃতের গৃহে কান্নাকাটি করে। এটা সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয় রীতিরই একটা অবশিষ্ট অংশমাত্র, কিংবা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া। শোককান্নার পুনরাবৃত্তি হয় সপ্তম ও চতুর্দশ দিনে। কোথাও কোথাও এর পরেও শোকপ্রকাশের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মিশরীয় ভাষা অল মিলাদ, অল ঘিতাস ও অল কিয়ামাহ্ (খ্রীষ্টীয় Nativity, Baptism of Christ and Easter)-তে মিশরীয় খ্রীষ্টানরা এখনও মৃতের কবরে রাত কাটায়। এজন্য ধনীদের মধ্যে অনেকে সেখানে গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করে রাখে। তাদের মহিলারা এই গৃহের উপরতলায় থাকে, পুরুষেরা থাকে নিচের তলায়। পরের দিন কোন ষাঁড় বা ভেড়া বলি দিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে মাংস বিতরণ করা হয়। এটা এখন ধর্মের অঙ্গ হিসেবে করা হলেও এর পেছনে হয়তো রয়েছে প্রাচীন মিশরীয়দের মাঝে মধ্যেই কবরে গিয়ে মৃতের উদ্দেশে খাবার দেবার রীতি—যে খাবার তাদের বিশ্বাস ছিল মৃতদেহের দ্বিতীয় সত্তা ('ক') গ্রহণ করে থাকে। এতে রসাতলের প্রেতলোকে মৃতব্যক্তি শান্তিলাভ করে। এখন মিশরের খ্রীষ্টানরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে অনুষ্ঠান করে তা করে সেণ্ট মার্ক নির্দেশিত রীতি অনুসারে। এটা করে সাধারণ নিয়মে বছরে একবার (হিন্দুদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মত)। অপরটি ঈষ্টারের সময়।[১]

১ A Gayet, AMG. xxx (1897), H. R. Hall. Coptic and Greek Texts of the Christan period in the Brit. Mus. London 1905, W. E. Crum, Coptic (roder Egyptian) Monuments.

সপ্তম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের মৃত্যু-চিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

প্রত্নপ্রস্তর যুগ : প্রত্নপ্রস্তর যুগে ইউরোপের মানুষ মৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা নিত সে বিষয়ে তেমন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পশুরা যেমন এক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীকে ফেলে রেখে চলে যায়, তেমনই এরাও করত কিনা তা বলার উপায় নেই। মানবসমাজে কোন্ পর্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার পদ্ধতি চালু হয় সেটা অনুমান করাও কষ্টসাধ্য। প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষ যখন বল্গা হরিণ শিকার করে বেড়াতো এবং গুহায় বাস করত তখনও এ যুগের মানুষ মৃতের সৎকার করতে শিখেছিল কিনা ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন না। গুহার মধ্যে কিছু কিছু পাথর চাপা দেওয়া যে-সব নরকংকাল পাওয়া গেছে সেগুলি চিন্তা-ভাবনা করে কবর দেওয়া, না গুহার ছাদ ধসে পড়ে স্বাভাবিকভাবে চাপা পড়া দেহের কংকাল তাও বোঝার উপায় নেই। ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষের দু-একটি নরকংকাল এমনভাবে চাপা দেওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে—যাকে 'সুচিন্তিত সমাধি দেওয়া' বলা যেতে পারে। তবে অনেকের মতে এরা প্রত্নপ্রস্তর নয়, নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ। কারো কারো মতে প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের মানুষ। তবে একথা জানা গেছে যে, নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহাতে মৃতদেহ কবর দিত। সুইজারল্যান্ডের গুহাতে এধরনের কমপক্ষে ২২টি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কবর খুঁড়ে প্রত্নপ্রস্তর যুগের ভূ-স্তরে এদের সমাহিত করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এরা হয়তো কবর দিত বা পোড়াতো। কারণ শবদাহের ভস্মের মত এখানে ছাইয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। শবদাহের এই রীতি রোমানদের কাল পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।

পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষের কোন ধর্মীয় চেতনা ছিল না। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানে ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণও কেউ কেউ পেয়েছেন বলে মনে করেন। তবে কবরের তৎকালীন পোশাক-আসাক ও গহনার সন্ধান পেয়ে—অনেকের ধারণা, সচেতনভাবেই এযুগের মানুষ কবর দিতে শিখেছিল। রেমন্ডের ছোট গুহাতে পাঁচ ফিট গভীরে সমাহিত করা কয়েকটি কংকাল দেখে মনে হয় এদের সচেতনভাবেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এদের হাত ও হাঁটু মুখের কাছে ভাঁজ করে আনা। এ-দেখে মনে হয়, এ কবর সচেতনভাবেই দেওয়া হয়েছিল। তবে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, কাৎ হয়ে পা ভাঁজ করে এরা যখন শুয়ে ছিল তখন পাথর চাপা পড়ে এমনতর অবস্থা হয়েছে। এতে সচেতনভাবে কবর দেবার কোন লক্ষণ নেই। প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের অনুরূপ একটি কংকাল দেখে মনে হয় যে, ঘুমন্ত মানুষের রূপে এই কঙ্কালটিকে অর্থাৎ কংকালের যথার্থ মৃতদেহকে সচেতনভাবেই কবর দেওয়া

হয়েছিল। মাটির নিচে নির্জনে এদের সমাহিত করা হয়েছিল। কংকালটির ডান হাত রয়েছে মাথার নিচে ও বাঁ হাত সটান। বাঁ হাতের কাছে রয়েছে প্রস্তরযুগের একটি পাথরের অস্ত্র। মাথার খুলি বিচার করে মনে হয় নিয়ানডারটাল জাতীয় মানুষ। এই কংকালটি একটি তরুণের। উচ্চতা ৪ ফুট দশ ইঞ্চি। আক্কেল দাঁত তখনও গজায়নি। কয়েকটি পশুর পোড়া হাড়ও পাশে পড়ে ছিল। অনেকে একে সচেতনসমাধি বলে মনে করেছেন। যেমন ডঃ ক্লাট্‌শ (Dr. Klaatsch)।[১] এ ধরনের আর একটি করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে কোমবে শাপেল (Combe Chapelle)-এ, ডোরডোন (Dordogne) অঞ্চলে। এর হাড় ও নানা চিহ্ন বিচার করলে মনে হয় যে, করোটিটি শেষ প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও ম্যাগডালেনিয়ান (Magdalenian) অর্থাৎ প্রাথমিক প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের।

পশ্চিম ইউরোপে প্রত্নপ্রস্তর যুগের সব মানুষের করোটিই ছিল লম্বা ধরনের। নব্যপ্রস্তর যুগের কবরের আশেপাশে কোথাও কখনও বা ছোট মাথার লোকের কবর দেখা যায়। শিকারী বাদে এ যুগে পাথর ও হাড়ের নানা শিল্পীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। শিকার্য পশুর অভাব দেখা দিলে এ অঞ্চলে এদের অর্থনৈতিক পটভূমিও পাল্টে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনও এ জন্য দায়ী ছিল। আদি প্রত্নপ্রস্তর ও পরবর্তী প্রত্নপ্রস্তর যুগের নানা চিহ্ন দক্ষিণ ইউরোপের সর্বত্রই চোখে পড়ে। তবে হরিণ-শিকারী সমাজের শিল্পকর্মীদের সীমানা একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ছিল, যেমন—দক্ষিণ ফ্রান্স। মেনটোন অঞ্চলের গুহাতে পরবর্তী প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ-ভাগের নানা জিনিস দেখা গেছে। তবে আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের কোন চিহ্নই প্রায় ফ্রান্সে পাওয়া যায়নি। তথাপি উভয় যুগের লোকেরাই এই সময়ে এই দুই অঞ্চলে বাস করত বলে মনে হয়। টগু উপত্যকাতে নানা স্তরওয়ালা পাথরের ঢিবি পাওয়া গেছে। তবে এখানে মৃতদেহ থাকলেও সমাধিতে দেওয়া হয় এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মুসস্তিয়ের (Moustier) ও শ্যাপেল অক্স সেন্টস (Chapelle-aux-Saints)-এ এমন কিছু নরকংকাল পাওয়া গেছে যেগুলো আদিমানব আকৃতির। এদের রীতিমত সমাধি দেবার অনুষ্ঠান মেনেই কবর দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। আর এই সমাধি দেবার ধারা পূর্বেকার কোন ধারা ধরেই এসেছিল। তবে একথাও সত্য যে নব্যপ্রস্তর-যুগেও যে কবর দেবার রীতি সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল তেমন নয়। এটা যে একটা পবিত্র কর্তব্য, এ বোধ হয়তো সবার ছিল না। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সাক্ষ্যাদি যতটুকু এখানে পাওয়া গেছে তাতে এ ধারণা করলে অন্যায় হবে না যে, এদের মধ্যে অধ্যাত্ম চিন্তা ও পরলোক সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

নব্যপ্রস্তরযুগের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : নব্যপ্রস্তর যুগে এটা প্রায় নিশ্চিত যে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের মধ্যে আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা

১ JE, 1909, p. 537.

দেখা দিয়েছিল। এ সময় সর্বপ্রাণবাদও ছিল। জীবের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতা, যেমন নিদ্রা, স্বপ্ন, ভাবাবেশ, ছায়াদর্শন, ভ্রান্তি দর্শন ইত্যাদি থেকেই স্থূলদেহের বাইরেও আরও কিছু আছে এমন ভাবনা এসেছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষকে ভৌতিক ও সূক্ষ্ম শক্তি সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিল। এ সময়কার সমাধিক্ষেত্রগুলি দেখে মনে হয়, মানুষ ও অতিপ্রাকৃত সত্তার মধ্যে একটা যোগ হতে পারে এ চিন্তাও দেখা দিয়েছিল। কোন উল্লেখযোগ্য লোক মারা গেলে তাঁর কবরে তাঁর প্রিয় জিনিসগুলি দিয়ে দেওয়া হত। হয়তো তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল যে, অদৃশ্য জগতে তাঁর সূক্ষ্ম সত্তার পক্ষে এগুলির প্রয়োজন হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দাসদাসী, সহধর্মিণী, প্রিয় জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতিকেও হত্যা করে কবরে দিয়ে দেওয়া হত এমন প্রমাণেরও অভাব নেই। কবরস্থিত জিনিসপত্র দেখে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদাও অনুমান করা যায়। এসব দেখে মনে হয়, মৃত্যুর পরের জগৎও এ জগতেরই অনুরূপ এমন ধারণাতে তারা আস্থা স্থাপন করেছিল। মৃত্যু মানেই তাদের কাছে ছিল পরলোকে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যাবার একটা ছাড়পত্র মাত্র। এই পরলোকে মানুষের জীবন আরও পূর্ণ এরকম ধারণাও তারা হয়তো পোষণ করত। সুতরাং, জীবিতদের বাসস্থান অপেক্ষা মৃতের কবর তৈরির ক্ষেত্রে তারা বেশি যত্ন নিত। এই জন্য মৃতের কবর এমন স্থানে এবং এমন করে তৈরী করা হত যে, দূর থেকেও তা নজরে পড়ে। পরে হয়তো এর প্রাথমিক অর্থ পরিবর্তিত পরিবেশ ও নতুন প্রজন্মের চরিত্রের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। মৃতের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তার কবরের উপর হয় পাথরের, নয়তো মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি করা হত। এরই চূড়ান্ত সিদ্ধি নজরে পড়ে মিশরের পিরামিড, ভারতের স্তূপ, দগোবা (Dagoba), নিউগ্রেঞ্জের সিলবারি ঢিবি, বৃহৎ প্রস্তরের বৃত্তাকার ক্ষেত্র, ব্রিটেনের প্রাগৈতিহাসিক পাথরের বেড়া, দুটি পাথরের দণ্ডের উপর দাঁড় করানো পাথরের ছাদ প্রভৃতিতে। আফ্রিকা পর্যন্ত এ ধরনের কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় কবর তৈরির প্রকৃতি, এতে রক্ষিত জিনিসপত্র, কবর ঘেরাও-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি লক্ষ্য করে। তবে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ভাবধারা ও রীতিনীতির ফলে এই সব সমাধিস্থাপনের নানা রূপান্তর আছে। ফলে মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত এবং পরবর্তীকালে এদের সমাধিকরণ ব্যবস্থা দেখে সেকালের মানুষের চিন্তাধারা সম্পর্কে বেশ নিবিড়ভাবে চিন্তা করে নিতে হয়। এ থেকেই ইতিহাসের বৃত্তে ধরা দিয়েছে ধর্মের ভিত্তি, পূর্বপুরুষ পূজা, মৃত্যুতত্ত্ব প্রভৃতি।

সমাধি ও শবদাহ : প্রাগৈতিহাসিককালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এত বিভিন্নতা রয়েছে যে, এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নথিভুক্ত করা প্রায় অসাধ্য কাজ বললেই চলে, বিশেষ করে শবদাহ প্রথার ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এই শবদাহপ্রথার মূল প্রচলন ছিল পূর্ব দেশে। ক্রমে সেটা ছড়াতে ছড়াতে প্রস্তরযুগের শেষভাগে ব্রিটেন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। ফলে প্রাচীন কবরদান প্রথার

ক্ষেত্রে অভিনব সব পন্থা তৈরি হয়। ব্রিটেনে কবরদান প্রথা বেশি ছিল ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে। এ সম্পর্কে গ্রীনওয়েল যা বলেছেন তা নিম্নরূপ : 'এখানে শরীর গুটিয়ে, হাঁটু ভাঁজ করে, মুখ বুকের কাছে এনে কবর দেওয়া হত। এখানকার কবরে দেহের কোন অংশে দাহের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও পিঠ থাকতো সোজা সরল ভঙ্গীতে। তবে এর সংখ্যা কম, কারণ, খুব কম সংখ্যক (চার) কবরেই সোজা করে শুইয়ে কবর দেবার রীতি দেখা যায়। মাটির ছোঁয়া থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। দু-এক জায়গায় মৃতদেহের চারপাশে পাথর বা খড়িমাটির ঘের তৈরি করে দেওয়া হত। কোথাও কোথাও মৃতদেহের উপর শক্ত মাটি বা ঘাসের চাপড়াও বসিয়ে দিত। হয়তো এ-ভাবেই মৃতদেহকে সরাসরি ভেজা মাটির স্পর্শ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হত।

কিন্তু মৃতদেহ যখন পোড়ানো হত, তার কিছু ভস্ম কোন মাটির আধারে রেখে কবর দেওয়া হত। যদি কোথাও মৃৎপাত্র না পাওয়া যেত সেখানে দেহভস্ম কোন মাটির গর্তে রেখে তার উপর ঢিবির আকারে মাটি চেপে দিত। এতে যেন কবর ও শবদাহ একত্রে স্থান লাভ করেছে, যেমন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি ভারতে স্থানলাভ করে আছে যজ্ঞ ও পূজার মধ্যে। এর ফলে কবরক্ষেত্রের আয়তন ছোট হয়ে যেত, কফিনও হত ক্ষুদ্র, যাতে মৃতদেহকে ঠেলেঠুলে সংকুচিত করে এর মধ্যে ভরা যায়।

সাধারণ কবর দেওয়া হত এইভাবে ঃ—গর্তের মধ্যে দেহ রেখে মাটি চাপা দেওয়া হত। পরে আবার মাটি খুঁড়ে তা তুলে মৃতের কবরের উপর মাটির স্তূপ তৈরি করত। অনেক সময় স্তূপ তৈরি হত পাথর দিয়েও। পরে যখন মানুষ স্থায়ী বাসভূমি তৈরি করে তখন মাটির চাপ থেকে মৃতদেহকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নেয়। এটা করা হত কবরের চারধারে ও মৃতদেহের উপরে পাথর বসিয়ে। অনেক সময় পাথরের বদলে কাঠও ব্যবহার করা হত, ঠিক যেমন কফিন হয়। এজন্য কি ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। অনেক জায়গাতেই কবরে মৃতের সঙ্গে নানা জিনিস দিয়ে দেওয়া হত। দেওয়া হত নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস থেকে যে, স্থূল দেহের মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না। সূক্ষ্ম একটা সত্তা থাকে। এবং তার ব্যবহার স্থূলদেহীর ব্যবহারেরই মত। সুতরাং তার ভোগের জন্যই এ-সব দেওয়া হত। এমন কি যুদ্ধ করা ও আত্মরক্ষার জন্য কবরে হাতিয়ারও রাখা হত।

প্রথম দিকে মৃতের কবর সম্পর্কে যা জানা যায়, তার মধ্যে ব্যাপক প্রচলন ছিল পাথর দিয়ে চৌবাচ্চার মত তৈরি করে তাতে মৃতদেহ রেখে দেওয়া। এ থেকেই গড়ে ওঠে বড় বড় সমাধি, মাটির নিচের ঘর, কবরগৃহের সাজসজ্জা ইত্যাদি। তবে এর কোন ধারাবাহিকতা নেই।

প্রথমদিকে কবর দেওয়া হত শত্রুদের ও বন্য পশুদের হাত থেকে মৃতদেহ রক্ষা করার জন্য। পরে যখন কবর নির্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তখন এই আদি ধারণার উপরেই নতুন চিন্তাভাবনা দেখা দেয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে,

মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত সাময়িক কালের জন্য। কারণ লোকের ধারণা ছিল যে, স্থূলদেহ পচে গলে যতক্ষণ নষ্ট না হয়ে যাবে ততক্ষণ আশেপাশে থাকবে জীবের আত্মা। পচনক্রিয়া শেষ হলে আত্মা পরলোকে বা প্রেতলোকের দিকে যাত্রা করবে। অপর পক্ষে দাহ পদ্ধতি আসে এই চিন্তা থেকে যে, এতে মৃত্যুদূষণ দূর হবে এবং আত্মাও পবিত্র হয়ে পরলোকে যেতে পারবে। এই জন্য কবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, দেহকে সামান্য পুড়িয়ে তবে কবরস্থ করা হচ্ছে। শবদাহ প্রথা ব্যাপকতর হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, স্থূল দেহের নাশ যদি আত্মার মুক্তির কারণ হয়, তবে তাকে পুড়িয়ে দিলে আত্মা আরও তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। এই ধারণা থেকে শবদাহ প্রথা একটি রীতিতে পরিণত হয়।

শবদাহপ্রথা ধর্মবিশ্বাসজাতই হোক আর স্বাস্থ্যের কারণেই হোক, এটা মনে রাখতে হবে যে, মাটিতে কবর দেবার রীতিও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরোপে শবদাহ প্রথা আমদানি হবার আগেই এসেছিল। সারা ব্রোঞ্জযুগ ধরে এই দাহপ্রথা ও কবরদানপ্রথা দীর্ঘদিন পাশাপাশি চলে এসেছে। খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের আগে এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই দুটি প্রথাই চালু ছিল। গ্রীক ও রোমান যুগেও এই দুটি প্রথা ছিল। বড়লোকেরা শবদাহ করত, গরীবেরা সমাধি দিত। এর কারণ শবদাহে ব্যয় হত অনেক বেশি। তবে কোন কোন জায়গায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই শবদাহ বা সবাই মৃতদেহ কবর দিত, যেমন ওল্ডস (Wolds)-এর নানা জায়গায় শবদাহ প্রথা ছিল, আবার কোথাও ছিল কবরপ্রথা। ইয়র্কশায়ারে কবর প্রায় সার্বিক রীতি ছিল। ক্লীভল্যান্ডে অপর পক্ষে দাহহীন কোন দেহ কবরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। মৃতের উপর ছোট পাথরের যে স্তূপ তৈরি করা হয় ইংরেজীতে তাকে বলে 'Cairns' শুধুমাত্র মাটি দিয়ে ঢিবি তৈরি করলে তাকে বলে 'Barrow'. কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, মাটি এবং পাথর উভয় জিনিসই এই ধরনের কবর তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। নানা ধরনের কবর তৈরি করা হত, যেমন, লম্বা, গোল, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে শবদেহ সরাসরিই কবর দেওয়া হত বা দেহভস্ম কবর দেওয়া হত। মাটির নিচে সে জন্য গর্ত ছাড়া আর কিছুই করা হত না। কবর চিহ্নিত করার জন্য যদি কোন ধরনের ঢিবি তৈরি করা না হত, তাহলে হয় তার উপর একটি পাথরের দণ্ড, নয়তো বৃত্তের আকারে উঁচুমাটি বা পাথরের দণ্ড প্রভৃতি বসানো হত। কখনও কখনও এক ধরনের গুহার মত তৈরি করা হত। তাতে প্রবেশপথও থাকত। কেউ কেউ এমন বড় করে এটা তৈরি করত যে বংশ পরম্পরায় সেখানে মৃতের হাড় জমা পড়ত। এ হাড় পোড়ানো হাড় নয়। তবে কোন কোন মাটির কবরে পোড়ানো হাড়ও সমাধি দেওয়া হত। স্কটল্যান্ডে এ ধরনের কবরের মধ্যে প্রাচীনতম যে কবর পাওয়া গেছে সে কবরে কিন্তু পোড়ানো হাড়ই রাখা হয়েছে।

দুটি পাথরের দণ্ডের উপর আড়াআড়ি পাথর বসানো কবর: প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপে এমন অনেক কবর দেখা যায় যা দণ্ডায়মান পাথরের উপর আড়াআড়ি করে

পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যেন সেটা পাথরের একটি গোলপোস্ট। এগুলির বিরাটত্ব, বহুসংখ্যা, নানা স্থানে অবস্থান এ ধরনের কবরগুলিকে বিশেষ একটি গুরুত্ব দান করেছে। একে এক ধরনের কলাকৌশলহীন স্মৃতিস্তম্ভ বলা যেতে পারে—যারই চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে অনবদ্য সমাধিসৌধ আগ্রার তাজমহলে। ইংল্যান্ডে এ ধরনের অনবদ্য নিদর্শন রয়েছে কিট্‌স কয়টি হাউস (Kits Coity House)-এ। কখনও কখনও এগুলো দৈর্ঘ্য হত ১১ ফিট, উচ্চতায় ৮ ফিট। দুটি দণ্ডের মাঝখানে অনেক ছোট ছোট পাথরও থাকতো। সম্ভবত সঠিক কবরস্থানটিকে রক্ষা করার জন্যই এমন করা হত। এর মধ্যে পাথরের বা মাটির কোন ঢিবি বা স্তূপ না থাকলেও অনেকে মনে করেন যে, আদিতে এ-সব ছিল। কোন কোন জায়গার নিচে রীতিমত ঘরের মত তৈরি করা হত।

এই ধরনের কবরগুলির রূপ এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। এর কারণ বোধহয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোথাও বা মাটির উপর মাটির স্তর জমে একে উচ্চতায় ছোট করে দিয়েছে, কোথাও বা এর ব্যাস কমে গিয়েছে। এইসব কবরে প্রবেশের পথ যে কোন্ দিকে থাকবে সে-বিষয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম লক্ষ্য করা যায় না। কখনও দেখা যায় এটা সামনের দিকে, কোথাও পাশে, কোথাও বা শেষ প্রান্তে। বেশ কয়েক জায়গায় সূর্যোদয়ের দিক লক্ষ্য করে এই প্রবেশপথের ব্যবস্থা হয়েছে এমন দেখা যায়। এর হয়তো কোন বিশেষ ধরনের তাৎপর্যও ছিল। জার্মানীতে এ-ধরনের কবরের অস্তিত্ব বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তবে মধ্য ইউরোপে এধরনের কবরের কোন অস্তিত্বই প্রায় লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্য অনেকেই মনে করেন যে, এক ধরনের যাযাবর লোকই এই ধরনের কবর তৈরি করত। এরা ঘুরে বেড়াতো স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আফ্রিকা অথবা আফ্রিকা থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া পর্যন্ত। তবে এখন এ ধরনের অভিমত কেউ মানতে চান না। এই সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে মনে হয় বিভিন্ন অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরাই এই সব সৌধ নির্মাণ করেছিল। তাছাড়া এই সৌধের নিচে যেসব কঙ্কাল পাওয়া গেছে সে কঙ্কালগুলোও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর। অনেকে একে ড্রুইড জাতীয় জাদুশক্তিসম্পন্ন পুরোহিতদের বেদী বলে মনে করেন (ভারতে যেমন নরমুণ্ডের উপর তান্ত্রিক বেদী স্থাপন করা হয় তেমনই)। পাথরগুলির উপরিভাগের চ্যাপ্টাভাব ও মসৃণতা লক্ষ্য করেই অনেকে এমন ধারণা করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থাৎ এর চ্যাপ্টা ভাব ও মসৃণতা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত বলে মনে হয়। এছাড়া আড়াআড়ি পাথরের উপরে কাপ জাতীয় কোন জিনিস এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের চিহ্ন দেখে মনে হয় এর একটা বিশেষ অর্থ ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছে।

সমাধি ঘর : পাশ্চমী, বিশেষ করে ইংরেজদের ভাষায় 'Cromlechs' বলে একটি শব্দ আছে। ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এর অর্থ করেছেন পাষাণদণ্ডের উপর আড়াআড়ি-ভাবে বসানো সমাধিসৌধ। কিন্তু ইউরোপীয় অভিজ্ঞরা মনে করেন যে, এ হল

কবরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার, ডিম্বাকার বা চতুর্ভুজাকার ঘের (রেলিং জাতীয়)। পাথরের দণ্ড দিয়ে কবরের চারদিকে বৃত্ত রচনার উদাহরণ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই বেশি পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বা বৃত্ত একাধিকও হয়। বৃত্তের চারদিকে অনেক জায়গায় পরিখাও দেখা যায়। বৃত্তের অন্তস্থিত ছোট বৃত্তই হল যথার্থ কবরস্থান। এখানে মাটি খুঁড়তেই মৃতের অস্তিত্ব ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এই বৃত্ত যে শুধু কবর দেবার জন্যই করা হত তা মনে হয় না। মৃত্যু-তত্ত্বের সঙ্গে এর একটা যোগ রয়েছে বলে মনে হয়। সেটা যে কি, ঐতিহাসিকেরা তা ধরতে পারেননি। হয়তো বা এটা বিশ্বজগতের গোলাকৃতি কল্পনা থেকেই এসেছিল। যেখান থেকে জন্ম সেখানেই লয় হয়, এমন ধারণাও এতে থাকতে পারে। আবার এই বৃত্ত থেকেই আত্মা নবজন্মে উঠে আসবে এ বিশ্বাসও কাজ করতে পারে। ভারতীয় যোগচর্চাকালে দেখা যায়, শক্তির প্রথম স্ফুরণ হয় বৃত্তাকার বিন্দুরূপে। এই বিন্দু ঘূর্ণায়মান হয়ে ভেতরে শূন্যতা সৃষ্টি করে কিছুটা ডিম্বাকারে জগৎ হয়ে মহাশূন্যে ভাসতে থাকে। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের এই গভীর তত্ত্ব আয়ত্তের মধ্যে ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই জন্যই ঐতিহাসিকদের কাছে এ ধরনের কবর বা সমাধি একপ্রকার হেঁয়ালী হয়ে আছে।

সমাধি-গুহা ঃ পর্বতগুহাতে সমাধি দেবার প্রথা অতি প্রাচীন। সমগ্র প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগে এ ধরনের সমাধি দেবার রীতি বর্তমান ছিল। ইউরোপের নানা স্থানে এধরনের কবরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ছেলে বুড়ো সবাইকে এধরনের গুহা-কবরে সমাধিস্থ করা হত। অনেক গুহাকবরে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় দেখা গেছে। এটা হয়তো গুহার ছাদ ধসে পড়ে চাপের ফলে হয়েছে। হাড় টুকরো করে কবর দেবার যে রীতি পরবর্তীকালে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় এটা হয়তো সে ধরনের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। তবে মৃতদেহকে দুমড়ে বসানো ভঙ্গীতে কবর দেওয়া হত বলে মনে হয়। এর কারণ হয় তো এই যে, জন্মের সময় যে ভঙ্গীতে সে ছিল সেই ভঙ্গীতে কবর দেওয়া, যাতে করে গুহা থেকে নবজন্মে সে বেরিয়ে আসতে পারে। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হত। এটা হয়তো করা হত বন্যজন্তু যাতে ভেতরে ঢুকে মৃতদেহ আহার করতে না পারে সেইজন্য।

গুহাকবর দেখে অনুমান করে লাভ নেই যে, এ যুগের মানুষ কবর দেবার রীতি জানতো না। কোন নিরাপদ স্থানে মৃতদেহকে রেখে দেবার জন্যই এমন করত। গুহাকবরের বাইরে বিশেষভাবে মাটি খুঁড়ে কবর দেবার রীতিরও প্রাধান্য ছিল। এবং স্থূলদেহের মৃত্যু হয়ে গেলেই যে সব শেষ হয়ে যায় না তারা এতে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় কবরে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখে। ফ্রান্সে এ ধরনের বহু কবরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। সুতরাং সূক্ষ্ম একটা আত্মা সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই এসেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ধারণা তাদের এল কোত্থেকে এটাই ভাববার বিষয়। তখন যোগতন্ত্র

বা দেহের মধ্যে অসীমের যে বিরাট একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে এ ধারণা তাদের মধ্যে আসা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে কি এ ধারণা জীবের সহজাত ?

কবরস্থিত দ্রব্যাদি ঃ কবরে কি ধরনের জিনিস দেওয়া হবে সেটা নির্ভর করত এক এক জাতের মানুষ কি অবস্থায় বাস করত এবং মৃতব্যক্তির সামাজিক অবস্থা কি ধরনের ছিল তার উপর। এতে আর একটি জিনিসও প্রমাণ হয়, তা এই যে, মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ সেই প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। অবস্থা যার ভাল তার কবরে থাকত অনেক বেশি জিনিস। যার কম, তার কম জিনিস। যেসব কবরে মৃতের অনুগামীদেরও হত্যা করে কবর দেওয়া হত সে-সব কবর যে জবরদস্ত লোকের ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা করা হত এই বিশ্বাস থেকে যে, এরা স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহী হয়ে মৃতকে জীবিতকালের ন্যায় সঙ্গ দেবে। এ-সব চিন্তার যথার্থ কোন মূল্য আছে কিনা তা পূর্বে আধুনিক বিজ্ঞান ও মৃত্যুচিন্তা এবং অধ্যাত্ম যোগদর্শনে সূক্ষ্ম সত্তা দর্শন অংশে আলোচিত হয়েছে। আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানও এ সম্পর্কে কত আলোচনা করেছে তাও দেখানো হয়েছে। শুধু যে মৃতের সমজাতীয়দেরই হত্যা করে সঙ্গে দেওয়া হত তা নয় তার প্রিয় পোষা জন্তু-জানোয়ারদেরও দেওয়া হত। এতে বোঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ ইতর প্রাণীর সূক্ষ্ম সত্তাতেও বিশ্বাস করত।

কবরে মৃৎপাত্র ঃ বহু কবরে মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে প্রায়ই পাওয়া গেছে পোড়া হাড় বা এমনি হাড়। তবে এর সবই যে শবাধার বা ভস্মাধার হিসাবে কাজ করত তা নয়। কোন কোন পাত্রে খাদ্য ও পানীয়ও দিয়ে দেওয়া হত। শবধারক বা শবভস্মধারক পাত্র এক এক জায়গায় এক এক পরিমাপের হত। খাদ্যপাত্রগুলি ছিল আকৃতিতে ছোট ও গোলাকার। এগুলিতে কারুকার্য বেশি করে থাকত। মৃতাধারপাত্রগুলি ছিল আকারে বড় ও কম কারুকার্যময়।

সমাধিক্ষেত্র বা শ্মশান ক্ষেত্র ঃ জনসংখ্যা যতই বাড়তে থাকে এবং ধর্মের প্রভাব মানুষের ওপর বেশি পড়তে থাকে ততই ছড়ানো ছিটানো সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্রগুলি বিশেষ একটি স্থানে এসে সীমাবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। ইউরোপের বহু অংশে এই ধরনের বিরাট সমাধিক্ষেত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। আয়ারল্যান্ডের এক লেখকের পাণ্ডুলিপি[১] থেকে জানা যায় যে পৌত্তলিকদের তিন ধরনের সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র ছিল। পাণ্ডুলিপিটির বর্ণনা এ ধরনের ঃ—

> পৌত্তলিকদের তিন ধরনের কবর আছে,
> বিশেষভাবে নির্বাচিত টেইলটেনদের,
> পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্রুয়াচানদের এবং ব্রুগদের সমাধি।"

প্রাচীনতম শাহরিক গোরস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে গোরস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে তা হল নরিক আল্‌পস-এর একটি সরু নির্জন উপত্যকাতে। দূরত্ব হোলস্টাট (Hollstatt) শহর থেকে পায়দলের পথে ঘণ্টাখানের রাস্তা। আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৪৬

১ Leabhar na h Udhere

সালে। এই কবরে সাধারণ সমাধি এবং দগ্ধঅস্থিপূর্ণ সমাধি, দুরকম সমাধিই দেওয়া হত। যেসব দেহকে সাধারণভাবে সমাধি দেওয়া হত সেগুলির মাথা থাকত পূবে পা পশ্চিমে (সম্ভবত উঠতি সূর্যের মত সে আবার তাড়াতাড়ি জেগে উঠবে এই বিশ্বাসেই এমন করা হত)। মাথা রাখা হত প্রায়শই পাথরের উপর। কোথাও কোথাও শক্ত মাটির বিছানাও তৈরি করা হত (রোদে শুকানো কাদা মাটি)। দুটি ক্ষেত্রে কাঠের কফিনও পাওয়া গেছে। কোন কোন কবরে একই সঙ্গে দুতিনটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে (এটা হতে পারে যে একটি কঙ্কাল বাদে অন্যান্যগুলি জীবন্ত সহকর্মী বা পরিচারক পরিচারিকাদের, যাদের হত্যা করে সেখানে রাখা হয়েছিল। কিংবা একই পরিবারের লোকদের সেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।) কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যে কঙ্কালের কোন কোন অংশ নেই (অন্য কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সেগুলো হয়তো বাইরে বা গৃহে রেখে দেওয়া হত)। শবভস্ম কোথাও কোথাও পাথরের পাত্র বা পোড়ামাটির পাত্রে রাখা হত। তবে যে হাড়কে দুবার পোড়ানো হয়েছে সেগুলিকে রাখা হত ব্রোঞ্জের পাত্রে (সম্ভবত, এগুলি ব্যয়সাপেক্ষ উৎকৃষ্টতর শেষকৃত্যের নিদর্শন, যেমন আমাদের দেশে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ)। এইসব মৃতদেহ বা শবাধার বা শবভস্মাধারের পাশে নানাপ্রকার দ্রব্যও রাখা হত। তবে দেখা যায় শব দাহ করে কবরে যারা ভস্মাধার রাখত তাদের ক্ষেত্রে খরচ বেশি পড়ত। এই ভস্মাধারের পাশে নানা মূল্যবান জিনিস আত্মার উদ্দেশে দিয়ে দেওয়া হত। তবে হোলস্টাটের কবরে কোন রুপো বা সিসে জাতীয় জিনিস পাওয়া যায়নি। এগুলি এবং মুদ্রার অনুপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, এ ধাতু আবিষ্কৃত হবার আগেই এ কবরে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা বন্ধ হয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে, নব্যপ্রস্তর যুগে ইউরোপে (পশ্চিম ইউরোপে) লম্বা মাথা ও খর্বকায় কিন্তু শক্তিশালী এক জাতি সাধারণভাবে তাদের মৃতদেহ কবর দিত। অনুমান করা হয় এদের রঙ ছিল কালো, কেশ কুঞ্চিত, অক্ষিগোলক ঘনকৃষ্ণ। এরপরে যারা এ স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে—তাদের মাথা ছিল ছোট, রঙ হাল্কা, চুল পাতলা। তবে প্রত্নতত্ত্ব এমনতর ধারণার পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয় না। ব্রোঞ্জযুগে এ ধরনের লোক ছিল। ছোট মাথার লোকেরা ছোট পাত্রে ও গোলাকার স্থানে কবর দিত। অনেকের মতে এদের ব্রোঞ্জ সম্পর্কে ধারণা ছিল। তুলনামূলকভাবে লম্বা মাথার লোকেরা এদের সঙ্গেই বাস করত। এ-সময় শব দাহ করে কবর দেওয়া হত। এই শবদাহ তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে জাত হয়েছিল। এর পরে দীর্ঘাকৃতি ভয়াবহ কেল্টরা ইউরোপের পশ্চিমাংশে প্রাধান্য বিস্তার করে। এদের চুল ছিল স্বর্ণাভ, রঙও অনুরূপ, চোখের মণি নীল। এরপরে ব্রিটেন অঞ্চলে যে জাতি এসে বাস করতে আরম্ভ করে—তারা ছিল অপেক্ষাকৃত লম্বা মাথার টিউটন জাত। এদেরও রঙ ছিল স্বর্ণাভ। এরা স্মরণাতীত কাল থেকে মধ্য ইউরোপে বাস করত। এরা সম্ভবত প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিয়ানডারটাল মানবদের উত্তরপুরুষ। রোমানরা এ-দেশ জয় করেও এদের রোমানীকৃত করতে পারেনি।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাচীন গ্রীসের মৃত্যুতত্ত্ব ও মৃতের সৎকার

প্রাচীন গ্রীকরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা রসাতলের অন্ধকারে দুঃখের জীবন যাপন করত। অভিজাত, বীরপুরুষ বা সাধারণ মানুষ কারো আত্মার ক্ষেত্রেই পরলোকভাগ্যে তেমন কোন ব্যতিক্রম ছিল না। রসাতলের হতাশাচ্ছন্ন অন্ধকারের জ্বালাময় পথে ভগ্ন হৃদয়ে তাদের হাঁটতে হত। পাপ করলে মৃত্যুর পর আত্মার শাস্তি হত। তবে যথার্থ পারলৌকিক ক্রিয়া করা হলে শাস্তি থেকে কিছু অব্যাহতি পাওয়া যায় তাদের এরকম ধারণা ছিল। এইজন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তারা যথেষ্ট মনোযোগ দিত। মৃতের আত্মার খাদ্য পানীয় ইত্যাদি প্রয়োজন হয় এ ধরনের বিশ্বাসও তাদের ছিল। দেবদেবীদের অসন্তুষ্ট করা হলে তাঁরা রীতিমত শাস্তি দেন এ বিশ্বাসেরও অভাব ছিল না। এ ধরনের বিশ্বাস 'সিসিফাস ট্যানটালাস' এবং দনেইদেসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

নব্যপ্রস্তর যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি ছিল কবর বা সমাধি দেওয়া। হোমারের যুগ পর্যন্ত এই প্রথাই চালু ছিল। মাইসেনিয়ানপূর্ব যুগের গ্রীকরা যে মৃতদেহ কবর দিত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মৃতদেহ দাহ করার প্রথম উল্লেখ হোমারের রচনাতেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে পেট্রোক্লাস-এর সৎকার প্রসঙ্গে এব্যাপারে পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই শবদাহ প্রসঙ্গে হোমার যে কারণ দেখিয়েছেন তা হল এই যে, যারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের হাড় দেশে নিয়ে যাবার জন্যই এই দাহপদ্ধতি চালু হয়েছিল। সম্ভবত আর্যজাতি, যারা গ্রীসে গিয়েছিল তারাই এই পদ্ধতি এখানে চালু করেছিল। তবুও হোমারের যুগে শবদাহ ও সমাধিদান উভয় প্রথাই চালু ছিল। হোমারের পরেও এই দুই পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীসে মাইসেনিয়ানপূর্ব ও মাইসেনিয়ান যুগে কবরের উপর সমাধি তৈরি করা হত নিম্নোক্তভাবে (১) গম্বুজওয়ালা কবর (২) করবগৃহ (৩) নলাকার (Cylindrical) কবর এবং (৪) গর্তখোঁড়া কবর। গম্বুজওয়ালা কবর দেওয়া হত হয়তো দিগন্তে নত গম্বুজাকার আকাশ লক্ষ্য করে। সাধারণ কবর দেওয়া হত চতুষ্কোণ গর্তে। এর বারান্দা থাকত, এবং ভেতরে ঢোকার পথ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে, মৃতের উদ্দেশে কবরের অভ্যন্তরে খাদ্য ও পানীয় দেবার জন্য মাঝে মাঝেই যাওয়া হত। নলাকার কবর পাথরের চাপ দিয়ে ঢাকা থাকত। এ ধরনের কবরে মৃতদেহ চিৎ করে শুইয়ে রাখা হত। গর্তওয়ালা কবর অধিকাংশই হত পাহাড়ে। এতে নিচে যাবার জন্য পথ থাকত। শেষপ্রান্তে থাকত খিলান জাতীয় গাঁথুনি। দুটো করে দেওয়াল দিয়ে এই খিলান ধরে রাখার চেষ্টা হত।

---

১ History of Religion. Sergei Tokarev p. 254-55.

গ্রীসের লোকেরা সাধারণত মৃতদেহকে গ্রীসের কোন স্থানে বা গৃহেই সমাধি দিত। মাইসেনিতে গৃহেই গম্বুজাকৃতি কবর দেওয়া হত। এথেন্সেও গৃহে সমাধি দেবার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্লেটো এ ধরনের সৎকারকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করেছেন। সোলোন ক্ষমতায় এসে গৃহে কবর দেবার রীতি বন্ধ করে দেন। অ্যাগোরা (Agora)-তেও কবরপ্রথা ছিল। তবে এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই কবর দেওয়া হত।

গ্রীসের লোকেরা আদি যুগে কবরে আত্মার তৃপ্তির জন্য মানুষ বলি দিত। পাহাড়ী কবরে এই মনুষ্যবলি ও পশুবলি দেবার নিদর্শন পাওয়া গেছে। উভয়েরই হাড় দেখা যায় পাশাপাশি বা আড়াআড়ি করে সাজানো। কারো কারো ধারণা যুদ্ধে নিহত বীরদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য শত্রুপক্ষের লোকদের এখানে ধরে এনে বলি দেওয়া হত। গ্রীকদেরও যে বলি দেওয়া হত প্লেটোর রচনা থেকে এ-কথা জানা যায়।

মৃতের জন্য গ্রীকদের এক ধরনের ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল। সমাধিস্থানে অনুষ্ঠান পালন করাকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। ফলে এটা এক ধরনের আইনে পরিণত হয়েছিল। সোলোন পর্যন্ত আইন করেছিলেন যে, পিতা যদি অপদার্থও হন —তবু পুত্র তাকে সসম্মানে কবর দিতে বাধ্য। গ্রীসের লোকেরা মনে করত যে, মৃতদেহকে কবর না দেওয়া হলে পরলোকে (অর্থাৎ পাতাল রাজ্যে) সে যেতে পারবে না। আত্মা তখন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবে। পরলোকে যাবার জন্য যে নদী পার হতে হয় সেই নদী (আমাদের বৈতরণীর মত) পার হতে পারবে না।

অতি প্রাচীনকালের গ্রীকেরা মৃত্যু ও সমাধির অন্তর্বর্তী সময়ে কি প্রথা অনুসরণ করত তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে ঐতিহাসিক কালে যে পদ্ধতি তারা অনুসরণ করত তা যে প্রাচীন ধারারই একটি প্রবাহ একথা আমরা অনুমান করতে পারি। ক্রীটে প্রাগৈতিহাসিক কালের নোস্‌সস (Knossos)-এ মৃতদেহ হয় কবরে রাখা হত নয়তো মৃতের কুঠুরির কোন সিঁড়িতে রেখে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে সাধারণত মৃতদেহকে চুনাপাথর বা পোড়ামাটির পাত্রে রাখত। কখনো সোজা করে কখনো ভাঁজ করে মৃতদেহ কবর দিত তারা। তবে কোন্‌ দিকে মাথা বা পা থাকবে এ বিষয়ে তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। গম্বুজাকৃতি কবরে মৃতদেহের সঙ্গে থাকত নানা ধরনের জিনিস। লিঙ্গ ও চরিত্রভেদে কবরসামগ্রীর চরিত্রও ভিন্নতর হত। পেট্রোক্লাসকে যেভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল ইলিয়াদ থেকে যদি তার বর্ণনা পাই তাহলেই বোঝা যাবে যে, কবর দেবার রীতি ছিল কি ধরনের। ইলিয়াদের অষ্টবিংশতি ও ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—"পেট্রোক্লাসের মৃতদেহ গরম জলে ধোয়ানো হল। তারপর দেহে মাখানো হল এক ধরনের স্নিগ্ধ তেল ও মলম। তারপর আগাগোড়া দেহ মোড়ানো হল এক ধরনের বস্ত্র দিয়ে (Linen)। তারপর তাঁকে শোয়ানো হল বিছানায়। পরে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে একিলিজ (Achiles) ও থিসিলির সহ-

যোদ্ধারা চোখের জল ফেললেন। যে যুদ্ধে হেকটর বধ হলেন, সেদিনও ফিরে এসে একিলিজ ও সহযোদ্ধারা পেট্রোক্লাসের কফিনের উপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদলেন। কাঁদলেন এই কারণে, যে, কান্না হল বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এর পরই বসল অন্ত্যেষ্টি-ভোজ। ভোজের পরে পেট্রোক্লাসের দেহ পোড়ানোর জন্য বিরাট এক চিতা সাজানো হল। চিতার অগ্নি জ্বলে উঠলে মৃতদেহকে যোদ্ধারা শবযাত্রা করে নিয়ে গেলেন। একিলিজ মৃত বন্ধুর মাথা ধরলেন। যোদ্ধারা একে একে নিজেদের কেশ-গুচ্ছ কেটে মৃতের উপর রাখল। একিলিজ নিজের চুল কেটে মৃত বন্ধুর হাতে গুঁজে দিলেন। যে রাতে শবদাহের প্রস্তুতি চলল—শবদাহকারীরা সে রাতে একিলিজের সঙ্গেই থাকলেন। পরদিন গোরু ও ভেড়ার চর্বিতে মৃতদেহ সিক্ত করে তাকে চিতাতে তোলা হল। এই গোরু ও ভেড়া মৃতের উদ্দেশেই বলি দেওয়া হয়েছিল। মৃতের পাশে রাখা হল মৃত গোরু, মেষ ও মাটির পাত্র ভর্তি মধু ও তেল। চারটে ঘোড়া বলি দেওয়া হল। পেট্রোক্লাস যে নটি কুকুর পুষতেন, তার মধ্য থেকে মারা হল দুটো কুকুরকে। আর বারজন তরুণ ট্রয়বাসীকে জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হল। সারারাত ধরে চিতা জ্বলল। পরদিন সকালে—মদ ঢেলে নেভানো হল সেই চিতা। মদ ঢালা হল এই কারণে, যাতে পেট্রোক্লাসের দগ্ধহাড় অন্যান্য হাড় থেকে পৃথক করে বের করে আনা যায়। পেট্রোক্লাসের দেহ ছিল মধ্যিখানে, অন্যান্যদের চারদিকে। সুতরাং হাড় বের করায় অসুবিধা হল না। দুই টুকরো চর্বি দিয়ে জড়িয়ে তার দগ্ধ অস্থিকে ভরা হল মাটির পাত্রে। মাটি দিয়ে একটি কৃত্রিম ঢিবিতে সেই পাত্রটি রাখা হল। এটাই হল তার সাময়িক কবর। কিন্তু অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হল না। একিলিজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আদেশ দিয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করলেন।"

গ্রীসের ক্লাসিকাল যুগে মৃতদেহ ধুয়ে তার উপর এক ধরনের স্নিগ্ধ তেল মালিশ করে সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। তবে সব সময়ই যে মৃতদেহ সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত তা নয়। কখনও কালো কাপড়েও মোড়ানো হত। মৃতের চোখ ও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। দেহ শক্ত হয়ে গেলে কাপড় বেঁধে মুখ বন্ধ করে রাখা হত। মৃতের যত্ন নেওয়া পরিবারের লোকেদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ কাজের দায়িত্ব বিশেষ করে ছিল মহিলাদের উপর। মৃতের মাথায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত। এরপর মৃতদেহকে সাধারণ বিছানায় শুইয়ে দিত, যাতে সকলে দেখতে পায়। মৃত-দেহের মুখ খোলা থাকত ঘরের মধ্যে। পা দুটি দুয়ারের দিকে রাখা হত। মৃতদেহ দেখানো হত মৃত্যুর পরদিন। এটা করা হত এই কারণে যে, সে যে যথার্থই মারা গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য। তবে মৃতদেহ বহু সময়ের জন্য খুলে রাখা যেত না। এরপর তাড়াতাড়ি কবর দেবার ব্যবস্থা হত। কারণ গ্রীসে বিশ্বাস ছিল যে, মৃতদেহ কবর দিতে দেরী হলে মৃতের আত্মা পরলোক যাবার পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে পারে। পেট্রোক্লাসের দেহ বারদিন লোককে দেখাবার জন্য খুলে রাখা হলে তিনি নাকি স্বপ্নে একিলিজকে এই কথা জানিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে মৃতের মুখে একটি মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত। এই মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত পারের কড়ি হিসেবে, যাতে পাটনি তাকে নদী পার করে মৃত্যুর জগতে নিয়ে যেতে পারে। মৃতের সঙ্গে ঘন মধু দিয়ে পিঠে তৈরি করে কবরে দেওয়া হত। এটা দেওয়া হত প্রেতলোকের দুয়ারের প্রহরীকে ঘুষ দেবার জন্য, যাতে সে প্রেতলোকে ঢুকতে বাধা না দেয়। ভিন্নমতে এই পিঠে টাকার কাজ করত—আর মাথার মালা কাজ করত—দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জন্য যে সংগ্রাম হত সেই সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে।

কফিনদণ্ডের উপর রাখা হত একটি মৃৎপাত্র, যার মধ্যে থাকতো তেল। এই মৃৎ-পাত্রের গায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর নানা ছবি আঁকা থাকত। আসলে এটা ছিল মৃতের প্রতীক। গৃহে ঢোকার মুখে দরজার উপর বসানো হত একটি মাটির কলসী। এরমধ্যে ঝরণার জল থাকত। অ্যারিস্টোফেনিসের বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায়, এই জল, যারা মৃতদেহ স্পর্শ করত তাদের গায়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের দেহে ছিটিয়ে দেওয়া হত। আমাদের দেশে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মত।

গৃহ থেকে কবরে যাবার পথে মৃতদেহকে খোলা রাখা যেত, তবে দিনের বেলায়। সমাধি দেওয়া হত সাধারণত দিনের বেলাতেই। শুধু অপরাধীদের রাত্রিবেলা কবর দেওয়া হত। তবে সব অপরাধীকে কবরও দেওয়া হত না। যে বিছানায় শুইয়ে রেখে মৃতদেহ সকলকে দেখানো হত, সেই বিছানাতেই তাকে বহন করে নেওয়া হত। মৃতদেহ কারা বহন করে নিয়ে যেত বোঝা ভার। আমাদের দেশে যেমন পরিবারের লোক ও আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে যায়, গ্রীসে বোধহয় তেমন ছিল না। মনে হয় এজন্য বিশেষ ধরনের লোক ছিল। প্লেটো, প্লুতার্ক, লুসিয়ান প্রমুখ লেখকের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই শববাহকেরা সাধারণত যুবক হত। এটা তারা কর্তব্য হিসেবে করত। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় শবযাত্রা করে যাওয়া হত, অর্থাৎ বহুলোক মিছিল করে যেত। সোলোনের আইন অনুযায়ী শবযাত্রায় পুরুষেরা যেত আগে, মেয়েরা পরে। মেয়েদের মধ্যে ষোল বছরের কম বয়সী মেয়ে শবযাত্রায় অংশ নিতে পারত না। একথা জানা যায় ডিমোস্থেনিসের লেখা থেকে। প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায় যে, মাতৃত্ব অর্জন করতে পারে—এমন বয়ঃসীমার কম বয়সী মেয়েদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। কবর দেওয়া হত অবশ্যই মাটির নিচে। কবর হত লম্বা ধরনের। পাথর দিয়ে এই কবর তৈরি করতে হত। সব সময়ই যে কফিন ছাড়া এই পাথরের কবরে মৃতদেহকে সমাহিত করা হত তা নয়। কফিন তৈরি করতে হলে সাধারণত সাইপ্রেস কাঠ দিয়ে করতে হত।

শবযাত্রায় আত্মীয়-স্বজনেরা বিলাপ করতে করতে যেত। যারা মৃতদেহ দেখতে আসতো তাদেরও কাঁদতে হত। হয়তো কান্নার মাত্রা একটু বেশিই হত। [এতে আদিবাসীদের বিশ্বাস কাজ করত কিনা বলা যায় না, অর্থাৎ মৃতের প্রেতকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া]। পরে অবশ্য বর্বরোচিত এ ধরনের কান্না আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রাস্তায় বীভৎসভাবে চিৎকার করে রোদন করা চলত না। তবে

বুক চাপড়ে ও মুখ আঁচড়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দুঃখ প্রকাশ করা যেত। চুল খোলাও চলত। তবে প্রাচীন বর্বরদের এই রীতিকেও চলতে দেওয়া হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইসকাইলাস ও ইউরিপিদিসের বর্ণনায় এ ধরনের শোক প্রকাশের দৃশ্যের কথা থাকলেও মনে হয় না যে, পরবর্তীকালে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় আইন এ-সব অনুমোদন করত। তবে আইন যাই থাকুক, স্বাভাবিক দুঃখ প্রকাশকে আটকানো যেত বলে মনে হয় না। শববাহকদের পাশাপাশি শোকসঙ্গীত গায়কেরা যেত (আমাদের দেশে যেমন হরিসংকীর্তন হয়)। মেয়েরা শোকসঙ্গীতে অংশ নিতে পারত।

প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে গৃহে, রাজপথে, গ্রামে এবং অ্যাগোরায় মৃতদেহকে সমাহিত করা হলেও ক্ল্যাসিকাল যুগে এজন্য শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থান ছিল। কেউ যদি নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহকে কবর না দিত তবে শহরের বাইরে কোন রাস্তার ধারে শবকে সমাহিত করতে পারত। কবরের উপর মৃত্যু সম্পর্কিত চিহ্ন বা লেখা রাখতে হত। নান ধরনের কবর হত, নামও ছিল নানা প্রকার। কোথাও কোথাও কবরের উপর স্তম্ভ, সৌধ, মন্দির ইত্যাদি তোলা হত। পরলোকে যাত্রার সুবিধার জন্য কবরে নানা জিনিসও দিয়ে দেওয়া হত। কবর দেবার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ভোজ হত। অবশ্য এতে ট্রয়ের যুদ্ধের আগে যেমন আনন্দ-নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল—সে ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মৃতের জন্য যত্নআত্তির কোন ত্রুটি হত না। মৃতদেহ সমাহিত করার তৃতীয় দিনে কবরের উপর বলি দেওয়া হত। নবম দিনে আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটত। শোকপ্রকাশ চলতেই থাকত। শোকপ্রকাশ অর্থাৎ অশৌচ চলত ত্রিশদিন। সবচেয়ে কম সময় ছিল বার দিন (আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এগার দিন অশৌচ, কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে একমাস)। শোকপ্রকাশ করা হত কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করে। যেমন, এসময় কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান করা যেত না (আমাদের দেশেও যায় না)। কালো কাপড় পরতে হত, সম্পূর্ণ কালো না হলেও কালো একটা চিহ্ন তাতে থাকতই। গ্রীসে শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক নিয়ম ছিল—অর্থাৎ এসময় মেয়েদের ন্যাড়া হতে হত—যদিও সাধারণ নিয়মে চুল ছাঁটতো পুরুষেরাই, মহিলারা নয়। ইউরিপিদিসের লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কোথাও কোথাও শোক-প্রকাশের জন্য সাদা ধুতিও ব্যবহার করত লোকেরা।

হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, এথেন্সে যখন মৃত্যুবাৎসরিক পালন করা হত (আমাদের দেশে অদ্যাবধি হয়।) তখন শ্রাদ্ধের ভোজের মত ভোজ দেওয়া হত। মৃতের উদ্দেশে বলি দেবার রেওয়াজ ছিল। এছাড়া মৃতের উদ্দেশে জল দান ও অন্যান জিনিস দান করা হত, যাতে পরলোক তার কল্যাণ হয়।

গ্রীসে একমাত্র হতভাগ্য ছিল অপরাধী ব্যক্তিরা যাদের জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অনেকক্ষেত্রে কবরদানের ব্যবস্থাও ছিল না। এক্ষেত্রে শহরের দেওয়ালের উত্তর দিকে অপরাধীদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হত। প্লুতার্ক থেমিসটোক্লিসের উপর যে রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকেই এ তথ্য জানা যায়। প্লেটোর রিপাব্লিক গ্রন্থেও এর

প্রমাণ মেলে। আত্মহত্যাকারীর ডানহাত কেটে নেওয়া হত, অবশ্য কবরদানের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হত না। প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায় যে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির দেহ নীরবে সমাধিস্থ করা হত। যে সব মৃতের দেহ পাওয়া যেত না তাদের নামে কবর তৈরী করে তার উপর সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হত। সমুদ্র ডুবে মারা গেলে খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের ছোট বস্ত্র পরিয়ে তাদের কবর দিত লোকেরা। তাদের প্রায় উলঙ্গই দেখাতো।

নবম অধ্যায়

হিন্দুদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ভারতবর্ষে সাধারণ নিয়ম অনুসারে জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পর পরস্পরের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় তাতে এমনতর ধারণাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। দেবদেবীর নামে এদেশে যখন কোন ক্রিয়া করা হয়—তাতে যে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় সেই অগ্নি হাতে নিয়ে পুরোহিতেরা বেদী প্রদক্ষিণ করেন ডানদিক থেকে বাঁয়ে। কিন্তু প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে যখন কোন অনুষ্ঠান করা হয়, তখন ঘুরেন বাঁ থেকে ডাইনে। এটা করা হয় সূর্যের গতির বিপরীত দিকে। পুজো-আর্চার ক্ষেত্রে যে ক্রিয়া করা হয় তাতে ডান হাঁটু মাটিতে ঠেকানো হয়, কিন্তু মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাটিতে ঠেকানো হয় বাম হাঁটু। দেবপুজোর সময় পুরোহিতেরা পৈতে রাখে বাম কাঁধের উপর ও ডান বগলের নিচে। কিন্তু পারলৌকিক ক্রিয়ার সময় এই পৈতে রাখা হয় দক্ষিণ কাঁধ থেকে বাঁ বগলের নিচে। জোড়সংখ্যা ব্যবহার করা হয় পুজো-আর্চার ক্ষেত্রে, বেজোড় সংখ্যা মৃতের ক্ষেত্রে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সবই চাই তরতাজা, পারলৌকিকক্রিয়ায় বাসী। সূর্যের উত্তরায়ণ কাল হল—দেবতার সময়, দক্ষিণায়ন কাল প্রেতাত্মার সময়। দেবপুজো যদি হয় দিনের প্রথম অর্ধে, প্রেতাত্মার অনুষ্ঠান দ্বিতীয়ার্ধে। নৈশ অন্ধকারই এক্ষেত্রে প্রশস্ত। এমনকি আয়ুর সময়কালের মধ্যে পঞ্চাশ বছর বয়সই হল সীমারেখা। পঞ্চাশপূর্বরা দৈব পর্যায়ে, পঞ্চশোর্ধ্বে প্রেত পর্যায়ে।

হিন্দুরা পারলৌকিক যে-সব ক্রিয়া করে থাকে তার মূললক্ষ্য প্রেতভীতি। যাতে তারা ফিরে এসে কোন অশান্তি বা ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যত ক্রিয়াকলাপ। পারলৌকিক ক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্বলন ও জল ছিটানো সবই হয় প্রেতাত্মার ক্ষতিকর দিককে সামলাবার জন্য। গ্রাম ও শ্মশানভুমির মাঝখানে পাথর বসিয়ে রাখা হয়। ঘর থেকে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাবার সময় পদচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা চলে (খই ছিটিয়ে মৃতদেহ অনুসরণকারী অন্যান্য প্রেতাত্মাকে প্রলুব্ধ করে পেছনে রাখার চেষ্টা হয় ?) যাতে সেই চিহ্ন অনুসরণ করে মৃতের আত্মা আর ফিরে আসতে না পারে, কিংবা পায়ের দাগের উপর যাতে মৃতের আত্মার কোন প্রভাব না পড়ে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এমন সব গাছ ব্যবহার করা হয় যাদের ভুত তাড়ানোর ক্ষমতা আছে, যেমন, অপামার্গ, অবকা, যব ইত্যাদি।

মৃতের উত্তরাধিকারী হিসেবে যারা বেঁচে থাকে তাদের প্রধান কর্তব্য হল যাতে তার পরলোকে যাবার পথ সুগম হয়—এবং সহজে বৈতরণী-নদী পার হতে পারে তা

দেখা। পরলোক এক্ষেত্রে দুধরনের—যমলোক ও দেবলোক। যমলোকে যাদের যেতে হয় তাদের বৈতরণী পার হবার প্রয়োজন নেই। যমলোক এড়িয়ে যারা স্বার্গলোকে যাবে তাদেরই শুধু বৈতরণী পার হতে হবে। এই জন্যই হিন্দুদের মধ্যেও মৃতের সঙ্গে প্যারের কড়ি দেবার ব্যবস্থা আছে। যে জন্য বাঙালীদের মধ্যে কাঙাল হরিশের বিখ্যাত গান আজও প্রচলিত ঃ—'হরি দিনতো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।' এই পার করা হল বৈতরণী পার করা। দেখা যায় পরলোকে যাবার পথে এই নদী পার হবার চিন্তা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যেই রয়েছে। এই চিন্তা কেমন করে এল একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ছাড়া একথা আর কেউ বলতে পারবে না। এর যথার্থ সত্যতা কি যোগদর্শনে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনার সময় তা বিস্তৃতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ চিন্তার একটা মূল ভিত্তি আছে, যে সম্পর্কে চর্চার অভাবে পরবর্তীকালের মানুষ এর মূল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

এই বৈতরণী পার হবার জন্য এবং যমের দুয়ার ফাঁকি দিয়ে স্বর্গের দুয়ারে পেঁছাবার জন্য আদিকালে হিন্দুরা শবযাত্রায় অনুষ্টরণী গাভী নিয়ে যেত। এর মূত্রাশয় মৃতের হাতে গুঁজে দেওয়া হত, যাতে সে যমদুয়ারের প্রহরী-কুকুরকে এটা খাইয়ে স্বর্গের দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এই বৈতরণী পার হবার জন্যই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এক খন্ড নলখাগড়া দেওয়া হয়, যেন তা নৌকো হিসেবে কাজ করবে।

হিন্দুরা প্রেতলোকের স্থান নির্ণয় করছেন হয় দক্ষিণে নয়তো পশ্চিমে। কোথাও কোথাও পূর্বদিকও চিহ্নিত করা হয়। এই চিন্তা তারা নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদ থেকে লাভ করেছে। ঋগ্বেদে মৃত্যুলোককে বলা হয়েছে 'অরুণীনাম উপস্থে' অর্থাৎ উষার বুকে। মৃতের খোঁজ করা হয় মাটিতে, বায়ুতে, আকাশে, সূর্যে, চন্দ্রে ও তারায়। তারকা বা নক্ষত্রে মৃতের আত্মার খোঁজ করা হয় খুবই কদাচিৎ। এ ব্যাপারে নানা জাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির ভাবনা-চিন্তার জন্যই এমন হয়েছে বলে মনে হয়, পরে যা হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একত্রিত হবার সুযোগ পেতে চেয়েছে।

হিন্দুরা সাধারণ মৃতের সৎকার করে দাহ করে। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০—১৫, ১৪) এই সৎকার কার্যের দুটি ধরনেরই উল্লেখ আছে, যেমন 'অগ্নিদগ্ধস' এবং 'অনগ্নিদগ্ধম'। এতে বোঝা যায়, শবদাহ বাদেও মৃতের সৎকারের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল যার কিছুটা অদ্যাবধি বিদ্যমান। কোন সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে শবদাহ হলেও সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে হয় সমাধি, আবার সর্পদংশনের ক্ষেত্রে জলে ভাসিয়ে দেওয়া, শিশুদের ক্ষেত্রে সমাধি ইত্যাদি। ভিনতারনিজের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০,—১৮, ১০ ও আরও) সমাধি দেবার নীতির প্রতিও ঈঙ্গিত আছে। বর্তমানে শিশু ও সাধুসন্ত ছাড়া সমাধি দেবার আর কোন রীতি নেই। এর পেছনে রয়েছে অর্ধদর্শন ও অর্ধকুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকেই মাথার খুলি নারকেল দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এখনও সমাধিব্যবস্থার সামান্য স্মৃতি রয়ে গেছে 'শ্মশানচিতি'র

মধ্যে। অর্থাৎ শবদাহের পর মৃতের ভস্ম একটি ভস্মাধারে রাখা হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এটাও একটা প্রাচীন প্রথা। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা, ভস্মাধার সমাধিপ্রথারই একটি ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র। এই ভস্মাধারকে সব সময় মাটিতে পুঁতে না দিয়ে এথেকে চিতাভস্মও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে একদা যে সমাধি দেওয়া হত বৈদিক স্তোত্রতেই তাব প্রমাণ আছে, বিশেষ করে সূত্র সাহিত্যে, যেমন, গৃহ্যসূত্র, পিতৃমেধসূত্র ইত্যাদি। এই সূত্রগ্রন্থের নির্দেশ অদ্যাবধি ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন, শ্মশান থেকে ফিরে আসার সময় মাঝপথে যে পাথর রাখার নির্দেশ আছে তা সূত্রগ্রন্থের। ভারতীয় উপজাতিসমূহেব মধ্যেও অনুরূপ অনেক বিধান কাজ করে যাচ্ছে। নেপালে ম্যাঙ্গার (Mangers)-রা শ্মশান থেকে ফেরার সময় পথের মাঝখানে কাঁটাওয়ালা গাছের ডাল রেখে আসে। তারা মনে করে যে, আত্মা হল ক্ষুদ্রাকৃতি মানব। অত্যন্ত নরম ও দুর্বল। কাঁটা গাছ ডিঙিয়ে তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়।[১] কিন্তু সূত্রগ্রন্থের অনেক নির্দেশ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজ করলেও এসব গ্রন্থে বহু প্রাচীন নিয়মকানুন, এমন কি ঋগ্বেদেব অনেক বিধিরও উল্লেখ নেই। যেমন ডঃ ব্লক (Dr. Block) লরিয়া (Lauriya) অঞ্চলে কটি ঢিবি খুঁড়ে এমন কাষ্ঠদণ্ডের সন্ধান পেয়েছেন যাকে বলে 'স্থূণা'। সূত্রগ্রন্থে তাব কোন উল্লেখ নেই।[২] এছাড়া নানা স্থানে নানা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে নানা ধরনের নিয়ম আছে। শাস্ত্রগ্রন্থে এ ব্যাপারে অন্তত ১১৪টি বিধি আছে। এর বাইরে আঞ্চলিক ধ্যানধারণা তো রয়েছেই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নামে নানা স্তোত্র আছে যার অর্থ অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। জন্মের সময়কার অনুষ্ঠানের মত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও নানা অনুষ্ঠান আছে যাকে বলে সংস্কার। 'বৌধায়ন পিতৃবোধ'-এ উল্লেখ আছে 'জন্মের পর সংস্কার দ্বারা পৃথিবী জয় করা যায়, মৃত্যুর পর স্বর্গ।' সুতরাং যারা অনুষ্ঠানপ্রিয় তারা নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠান করার পক্ষপাতী।

কোন হিন্দু যদি বিদেশে মারা যায় তবে তার মরদেহ দেশে নিয়ে আসার রীতি আছে—তা না হলে তাকে সাধারণত ভুলেই যাওয়া হয়। যে মৃতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তার পলাশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। অর্থাৎ পলাশ গাছের ডালপালা দিয়ে মূর্তি তৈরি করে তাকে দাহ করা হয়। যদি দেখা যায় যে, যাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল সে মারা যায়নি, আবার ফিরে এসেছে, তাহলে তাকে অনুষ্ঠান করে নবজন্মের ছাড়পত্র নিতে হয়। এক্ষেত্রে জাতকর্ম করার বিধি রয়েছে। মাতৃগর্ভে যেমন করে শিশু গুটিয়ে থাকে তেমনি করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাকে বসে থাকতে হয়। এরপর জাতকর্ম হয়। বারবণিতা মারা গেলে কারো মতে তাকে দাহ করা চলে না,

---

১ Census of India, 1901, 1, 355.

২ Annual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle *for the year ending in April 1905, Calcutta, 1905.*

[ZDMGI×227 ff]

কারো মতে বন্য কাঠে দাহ করা যায়। আবার বিধবা ও সন্তান প্রসবকালীন মৃত জাতিকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় ভিন্ন ধরনে। অনেক বয়সেও মৃত্যু না হলে তার মৃত্যুর জন্য বিশেষ ক্রিয়া করা হয়। পুজো করতে গিয়ে কারো মৃত্যু হলে তার জন্যও রয়েছে ভিন্ন বিধান। শ্রৌত সূত্র পাঠ করলে তবেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। নানা বিচিত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুদের কতকগুলি মূল ধারার কথাই এখন বর্ণনা করা যাক।

হিন্দুদের মৃত্যুচিন্তা: কোন হিন্দু যদি বুঝতে পারে যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে. তাহলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ডেকে শেষ কথা বলবে। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে বালুকাশয্যায় শয়ন করবে। অর্থাৎ তাকে মৃত্তিকায় নামানো হবে। মৃত্যুর আগে ব্রাহ্মণদের দান করে যেতে পারলে পরলোকে তার ভাল হবে এই বিশ্বাসও হিন্দুদের রয়েছে। এই দানসামগ্রীর মধ্যে থাকে গোরু—যে গোরু তাকে বৈতরণী পার হতে সাহায্য করবে। যে শয্যায় তার মৃত্যু হবে তা তিন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার কাছে বা গৃহের অগ্নির কাছে রাখা হয়। এই সময় তার মাথা রাখা হয় দক্ষিণ দিকে। কানে বেদ বা ব্রহ্মবিদ হলে আরণ্যক থেকে পাঠ করে শোনানো হয়। সাধারণ মানুষের কানে তার ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ করে, যেমন বাঙালীদের কানে সাধারণত জপ করা হয় 'হরে কৃষ্ণ' নাম। মৃত্যু হবার পর মুক্ত আকাশের নিচ থেকে শবদেহকে আচ্ছাদনের নিচে নিয়ে আসা হয়। এই সময় তার চুল ও নখ কেটে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা আছে। ঋষি গৌতম এই অভিমত পোষণ করেন। অনেকে এই সময় দেহ ব্যবচ্ছেদ করে অন্ত্র বের করে পবিত্র জলে ধুইয়ে নেয়। তারপর মাখন দিয়ে এই অন্ত্র পূরণ করে। এটা করা হয় মূলত দেহ দগ্ধকরণ দ্রুতকরণের জন্য। মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণ শিয়রে শয়ন করিয়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় এক ধরনের সুগন্ধী ফুলের মালা। মৃতকে নববস্ত্র পরিধান করানো হয়। তার পরিধেয় বস্ত্র পরানো হয় পুত্রকে, শিশুকে অথবা স্ত্রীকে। এই কাপড় যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তা পরতে হয়। কোথাও কোথাও মৃতের বস্ত্রের এক টুকরো সংরক্ষিত করেও রাখা হয়। কোথাও বা কেউ মৃতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা পায়ের আঙুল বেঁধে দেয়। এই ব্যবস্থা যে ভারতীয়েরা বাদে অন্যদের মধ্যেও ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। যদি মৃতব্যক্তি জীবিতকালে কোন পশু বলি দিয়ে দেবতার তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করতেন তবে তার জন্য তিনটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। অপর পক্ষে কেউ যদি দেবারাধনার জন্য মিষ্টি ও দধি দিয়ে পুজো করতেন, তবে তার জন্য ঢালা হয় দুধ। যদি ছাগল বলি দেওয়া না হয় তবে তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কালো তিল। উল্লেখযোগ্য দানের মধ্যে থাকে শিঙবিহীন বয়স্ক গোরু বা অত্যন্ত তেজস্বী। একে বলে 'অনুস্টরণী' বা 'অনুস্তরণী'। গোরু যখন কেনা হয় বাড়ির চাকরেরা কাঁধের উপর তিনবার ধুলো ফেলে। শবযাত্রার পুরোভাগে মশাল হাতে থাকে এক ব্যক্তি। এই মশাল গৃহের চুল্লি থেকে ধরানো হয়। তার পেছনে পেছনে চিতাগ্নি নিয়ে আসে অন্যান্যরা। তাদের সঙ্গে থাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিভিন্ন জিনিসপত্র। এদের পেছনে খাটে শুইয়ে

নিয়ে আসা হয় মৃতদেহকে। আত্মীয়-স্বজন ও ভৃত্যেরা এই খাট বহন করে নিয়ে আসে। অনেক জায়গায় মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায় কালো ষাঁড়ে টানা গাড়ি। পেছনে পেছনে এলোথেলো বেশে আসে আত্মীয়-স্বজনেরা। এদের প্রত্যেকেরই চুল থাকে অবিন্যস্ত। মৃতদেহ তোলার সময় ধ্বনি দেওয়া হয় 'পূষণ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।' রাস্তার এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ পার হলেই একটি ছাগলকে বলি দেওয়া হয়। কিংবা খই ছিটোন হয়। এই খই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুঁড়ে দেয় শবানুসরণকারীরা। তরুণ শবযাত্রীরা তিনবার দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে। এই সময় তারা দক্ষিণ ঊরুদেশে হাত দিয়ে আঘাত করে। এবং কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃতদেহকে হাওয়া দেয়। আবার তিনবার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা হয়। এবার প্রদক্ষিণ করা হয় বাম থেকে দক্ষিণে। মাথার চুল ডানদিকে খোলা থাকে, বাঁ দিকে থাকে বাঁধা। এর পর হাত দিয়ে আঘাত করে বাম ঊরু। এবার অবশ্য কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃতদেহকে আর হাওয়া করা হয় না। এই কাজ করতেই যাত্রাপথের দুই তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়ে যায়। এবার মাটিতে ভাতের হাঁড়ি এমন করে আছড়ে দেওয়া হয় যে, এই হাঁড়িটি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এক ফোঁটা জলও থাকে না। অবশ্য সর্বত্রই যে একই ধরনের প্রথা রয়েছে তা নয়। কেউ কেউ ছোট ছোট লৌহপিণ্ড বা খই কিংবা মুড়ি ছড়ানো রাস্তা ধরে হেঁটে যায়। এই সময় তারা ধর্ম-সঙ্গীত গেয়ে থাকে। মাধ্যন্দিনরা মৃত্যুস্থানে এক চাপড়া ভাত পুঁতে দেয়। আর এক থোকা ভাত পুঁতে দেওয়া হয় দরজার কাছে; কিছু পরিমাণ ভাত পুঁতে দেয় শ্মশানের দিকে অর্ধপথে ভুতেদের জন্য। শ্মশানে এসে পৌঁছানো মাত্র এক চাপড়া ভাত বাতাসেও ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এক থোকা ভাত গুঁজে দেওয়া হয় মৃতের হাতে।

শবদাহ ঃ শবদাহের স্থান কেউ ঠিক করে কোন পুজোর থানের কাছে, বা অন্যত্র। যেমন গ্রামীণ শ্মশানক্ষেত্রে বা তীর্থক্ষেত্রে, যেমন কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে। যেখানে গঙ্গা প্রবহমান সেখানে গঙ্গার তীরে। যেখানে শবদাহ করা হবে সে স্থান আগে পবিত্র করে নেওয়া হয়, যাতে কোন ভুতপ্রেত না থাকতে পারে। শ্মশানে সাজানো দাহের কাঠ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারে চলতে হয়। এবার মৃতদেহকে তোলা হয় চিতার উপর। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা পায়ের আঙুলের বাঁধন ঢিলে করে দেওয়া হয়। যে খাটে মৃতদেহকে বেঁধে নেওয়া হয় সে খাটের বন্ধনও কেটে দেয়। এবার খাটটিকে কেউ বা জলে ফেলে দেয়, কেউ দেয় চিতার উপর চাপিয়ে। নিয়মমাফিক সব যখন করা হয় তখন নিয়ে আসা হয় অনুস্টরণী বা অনুস্তরণী গাভী। যুবকেরা তার পেছনে দিক ছুঁয়ে থাকে, বয়স্কেরা ছুঁয়ে থাকে যুবকদের। এরপর দ্বিতীয় গাভীটিকে মেরে ফেলা হয় নয়তো যথেচ্ছ বিসরণ করার অধিকার দিয়ে ছেড়ে দেয়। যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় কোন পশুবলি দিয়ে অনুষ্ঠান করেনি—তার ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে গাভীটিকে। গাভীটিকে কয়েকবার মৃতদেহ ও চিতা ঘুরিয়ে

কিছু অনুষ্ঠান করে ছেড়ে দেয়। চিতার উত্তরদিকে মৃতের বিধবাপত্নী হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে বসে থাকে। এরপর তাকে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে যেতে বলা হয় (সম্ভবত সতীদাহ প্রথার এটি একটি নিয়মরক্ষা মাত্র)। মৃতের কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকলে সেই স্থানে রাখা হয়, এরপর সেগুলিও তুলে দেওয়া হয় চিতায়। মৃতের মুখে একটুকরো সোনা গুঁজে দেওয়া হয় (সম্ভবত খেয়া পারের কড়ি হিসেবে) কিংবা ঢেলে দেওয়া হয় গলানো মাখন। যেসব পাত্রে মৃতের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলিকে তারা মৃতদেহের নানা অংশে স্থাপন করে। এ-সব করা হয় অগ্নিদেবতাকে খাওয়ানো হবে বলে। দুটো লোহার চাকতি মৃতের পুত্র তুলে নেয়। তা ছাড়া, তামা, কাঁসা, মাটির পাত্র যা থাকে তাও তুলে নেয় সে। উৎসর্গীকৃত গাভীর নানা অংশ (যেখানে গাভীটিকে হত্যা করা হয়) আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। চর্বি দেওয়া হয় মৃতের মাথায় ও মুখে। হাতে দেওয়া হয় মূত্রাশয়। এই মূত্রাশয় দেওয়া হয় যমের কুকুরের উদ্দেশে। মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে দেওয়া হয় ঘন দধি। 'সামনায় যজ্ঞ' যারা করেছে তাদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা। এরপর সর্বত্র জল ছিটিয়ে চিতাকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ কাজ করেন তিনি তার বাঁ কাঁধের উপর একটি কলসী নেন। এই কলসীর পেছন দিকে কুড়োল বা পাথর দিয়ে ফুটো করা হয়। সেই ফুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করার পর তিনি সেই কলসী পেছন দিকে ফেলে দেন। এরপরই আরম্ভ হয় শ্মশানকৃত্য।

মৃতদেহকে আগুনে তোলা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের আহুতি বিশেষ। উদ্দেশ্য মৃতকে স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া। চিতার দক্ষিণ দিকের আগুনে দেওয়া হয় অগ্নি, কাম ও লোক (লোকদেবতা)-এর জন্য আহুতি। এরপর মৃতের বুকের উপর অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বলা হয়ঃ 'অগ্নি থেকে যেমন একবার তার জন্ম হয়েছিল, আবার তেমনই জন্ম হোক।' যদি মৃত ব্যক্তি অনাহিতাগ্নি হয় তবে আগুন নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি থেকে। যদি সে আহিতাগ্নি হয় তবে যে তিন বা পাঁচ ধরনের অগ্নির তিনি পুজো করতেন—সেই অগ্নি দিয়ে তাকে দাহ করা হয়। পাঁচ ধরনের আগুনের মধ্যে কোন্ আগুন আগে চিতাতে জ্বলে উঠেছে তা দেখেই অনুমান করা হয়—মৃতের আত্মা স্বর্গে অথবা প্রেতলোকে গিয়েছে। আহবানীয়ের উত্তর-পূর্বে একটা পরিখা খনন করা হয়। এতে কিছু জলোগাছও বসানো থাকে। এটা হয়তো প্রাচীন কুসংস্কারের অবশিষ্ট একটা রীতি মাত্র। যাতে মনে করা হত, অগ্নির দাহিকা শক্তি স্নিগ্ধ হয়েছে।

শ্মশানে শবদাহ করার অর্থ সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা এই, অগ্নির ধোঁয়ার সঙ্গে মৃতের আত্মা স্বর্গে উঠে যাবে। চিতার পেছনে একটি ছাগল বাঁধা থাকে। যদি আগুন জ্বলে ওঠার পর সে পালাতে পারে, ভাল, নয়তো সেখানেই তাকে থাকতে হয়। চিতাগ্নি জ্বলার সময় মৃত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী শ্লোক আবৃত্তি বা সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। চিতার অগ্নি জ্বলতে থাকলে আত্মীয়-স্বজনেরা সে দিকে না তাকিয়ে চলে যায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারীরা তাদের হাতে সাতটি করে পাথরের টুকরো দিয়ে দেয়।

ঘরে ফেরার পথে বাঁ হাত ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে এগুলি তারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফিরে যায়। কেউ কেউ চিতার পেছনে তিনটি করে পরিখা খনন করে। বেজোড় সংখ্যক কলসী থেকে জল ঢেলে সেই পরিখাগুলি ভর্তি করে। তারপর এর মধ্যে পাথর ছুঁড়ে দেয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা এই পরিখাতে নেমে পুঁতে দেওয়া গাছের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে এবং দূর্বা ঘাসের দড়ি দিয়ে নিজেদের বাঁধে। শেষে যে ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় সে গাছগুলোকে অর্থাৎ গাছের ডালগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে। এই গাছের ক্ষেত্রে গৌতম বিধান দিয়েছেন কণ্টক বৃক্ষের, বৈখানস ঘাসের ফাঁদের। শবযাত্রীরা যখন ফিরে আসবে তখন কোন রকম শোকের চিহ্ন দেখানো চলবে না। নীরবে মাথা নিচু করে তাদের যেতে হবে। একে অপরের সঙ্গে কথা বললে বলতে হবে ইঙ্গিতে বা বা ধর্মকথা। এমন করা হয় এই কারণে যে, শোকের অশ্রু ঝরলে মৃতের দাহ বৃদ্ধি পায়। এমনতর ধারণার উল্লেখ রয়েছে কালিদাসের 'রঘুবংশে'। ভ্রাতুষ্পুত্রদের মৃত্যুর জন্য যুধিষ্ঠির যখন কাঁদছিলেন ব্যাসদেব তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। এই জন্য শোকার্তদের শোক ভুলাবার উদ্দেশে গল্পকথকদের নিয়োগ করা হত এক সময়।

উদককর্মণ ঃ শ্মশানকৃত্যের পর মৃতের উদ্দেশে যে জলদান করা হয়—সে ক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ম আছে। এক দলের মতে অধস্তন সাত বা দশ পুরুষ পর্যন্ত সকলেই নিশ্চয় জলে নামবে। এক কাপড়ে থাকতে হবে এবং ডান কাঁধের উপর পৈতে ঝুলাতে হবে। কারো কারো মতে চুল আঁচড়ানো চলবে না এবং গায়ে ছড়াতে হবে ধুলো। দক্ষিণমুখো হয়ে, জলে নেমে তারা মৃতের নামে তর্পণ করবে। তর্পণ করবে মৃতের উদ্দেশে আঁজলা করে জল দিয়ে। এরপর জল থেকে উঠে বাঁ হাঁটুতে ভর করে কাপড় নিংড়াবে।

বর্তমানে অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটে। স্নান সারার পরেই মৃতের উত্তরাধিকারীরা ভাত নিয়ে কাকেদের খাওয়ানোর জন্য অপেক্ষা করে। এটা করা হয় প্রাচীন এই ধারণা থেকে যে, প্রেতাত্মারা পাখির বেশে এসে খাবার নেয়। কাক এখানে মরুতের প্রতিনিধি। কারণ মরুতের উৎপত্তি মৃত-পূজার বিধি থেকেই। এর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছেরও একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। বুদ্ধগয়া-বিহারের উত্তরদিকে বড় অশ্বত্থ গাছের নিচে পিণ্ড দান করা হলে দেখা যায় যে, অসংখ্য কালো কাক গাছের ডালপালায় উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্নান করার পর মৃতের উত্তরাধিকারীরা পরিষ্কার ঘাসের উপর বসে পড়ে (যার বদলে এখন কুশাসন ব্যবহার করা হয়)। এখানে তারা যমলোক সম্পর্কে নানা গল্প বা গান শোনে। যতক্ষণ না আকাশে সন্ধ্যাতারার উদয় হচ্ছে, তারা ফিরে যায় না। কখনও কখনও সূর্য ডোবার মুহূর্তে কেউ কেউ অবশ্য ফিরে আসে—যে সময়টাকে বলা হয় গোধূলি। ঘরের দরজায় এসে তারা পিচুমণ্ড পাতা চিবিয়ে খায়, মুখ ধোয়, পবিত্র অগ্নি, জল ও গোবর স্পর্শ করে। কেউ কেউ বা পাটখড়ির ধোঁয়া টানে, এবং পাথর মাড়াবার পর (বঙ্গদেশে পাটা) ঘরে ঢোকে।

অশৌচ ঃ মৃত্যু হলেই গৃহ অশুচি হয়ে যায় বলে হিন্দুদের ধারণা। সুতরাং এক একজন এক এক সময়ের জন্য অশৌচ পালন করে—এক দিন থেকে দশ দিন, দশ দিন থেকে এক মাস, ক্ষীণভাবে এক বৎসরও এই অশৌচ পালনের বিধি আছে। 'রঘুবংশে' দেখা যায় ইন্দুমতীর মৃত্যুর দশ দিন পরে অশৌচ পালন শেষ হচ্ছে। অশৌচ পালনের সময় বিশেষ বিশেষ কোন খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ, যেমন মদ্য মাংস ইত্যাদি। এ সময় কেশবিন্যাস বা কর্তন করাও চলে না। বেদ পাঠ বা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ। তবে কিছু কিছু পুজো-পার্বণ করা চলে। প্রথম রাতে মৃতের উদ্দেশে ভাতের পিণ্ড দান করা হয়। এরপর ঢালা হয় তার উদ্দেশে জল। মৃতের নামও উচ্চারণ করা হয়। মুক্ত অঙ্গনে মৃতের জন্য দুধ ও জল রাখা হয়। অনেকে মৃতের উদ্দেশে সুগন্ধি ও মদ্য জাতীয় পানীয় দান করে এবং প্রদীপ জেবলে দেয়, যাতে যমলোকের ভয়ানক অন্ধকার পথে সে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। অনেকে এক ধরনের পরিখা খনন করে। এতে সুগন্ধি ও ফুল দেয়। এর উপর একটি পাত্রও ঝুলিয়ে রাখা হয়। এখানে একটি দড়ি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে, মৃতের আত্মা যেন দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে এসব গ্রহণ করতে পাবে।

সঞ্চয়ন ঃ বেজোড় কোন দিনে মৃতের হাড় সংগ্রহ করার বিধি আছে। কারো কারো মতে এটা করা হয় বিশেষ নক্ষত্রে, কৃষ্ণপক্ষে। নিরলংকার একটি মাটির পাত্রে এই হাড় রাখা হয়। মেয়েদের হাড় সংগ্রহের জন্য এই পাত্রে আঁকা থাকে স্তন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে এই হাড় একে একে তোলা হয়। এবং নিঃশব্দে এই হাড় ভরা হয় মৃৎপাত্রে। তৈত্তিরীয় মতে এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয় মহিলাদের। তবে ভিন্ন রীতিও আছে।

বৌধায়নের মতে বাঁ হাতে লাল বা কালো সুতোয় বৃহতি বৃক্ষের ফল পরে, পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে, অপামার্গ গাছের পাতা দিয়ে হাত মুছে এবং চোখ বুজে বাঁ হাতে এই হাড় তুলতে হবে। এরপর পাত্রের মুখ ঢেকে সেই পরিখা বা গর্তে তা রেখে দেবে। কোন গাছের গোড়াতেও এই মৃৎপাত্রটি পোঁতা যেতে পারে। কেউ কেউ গর্তে ঘাস ও হলুদ কাপড় রেখে তার উপর হাড়গুড়ি ফেলে দেয়। পরে এ হাড় নতুন পাত্রে ভরে জলে ফেলে দেবাব ব্যবস্থা হয়। ধারে কাছে কোথাও নদী না থাকলে এ হাড় কোন মরুভূমি বা নির্জন স্থানে রাখারও বিধান আছে। কপোল বানিয়ারা সিল্কের কাপড়ে হাড়গুলো বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। এ গাছ সাধারণত থাকে শ্মশানের কাছেই। অনেকে এই হাড় গুঁড়ো করে মাখন বা ঘি মেখে দ্বিতীয়বার দাহ করে।

শান্তিকর্ম ঃ মৃত্যু সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে শান্তিকর্মও একটি অধ্যায়। আশ্বলায়নের মতে শান্তিকর্ম করতে হয় শুক্লপক্ষের প্রথম প্রকাশে। তাঁর মতে মৃতের চিতাভস্ম অগ্নি ও অগ্নিপাত্র সহ দক্ষিণদিকে নিয়ে গিয়ে একটি চৌরাস্তার মোড়ে পুঁততে হবে। অন্যত্রও পোঁতা যেতে পারে। এই পোঁতার কাজ শেষ হলে স্থানটিকে তিনবার

প্রদক্ষিণ করবে। এ সময় বাম উরুতে বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করারও নিয়ম আছে। অনেকে এসময় শ্মশান ও গ্রামের মাঝামাঝি কোন স্থানে আগুন জেবলে দেয়। এর পর এরা পেছন ফিরে না তাকিয়েই ফিরে আসে। এই সময় নানা জিনিস তাদের গ্রহণ করতে হয়, যেমন জগ, কলসী, অগ্নিশলাকা, শমী কাঠ ইত্যাদি। নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে লোকেরা তার চারদিকে বসে থাকে। সন্ধ্যার আগে কেউ গ্রামে বা ঘরে ফেরে না। এ সময় তারা ভাল ভাল গল্প করে সময় কাটায়। রাত্রির নীরবতা নেমে এলে ঘরের চারদিকে দরজার দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে ঘুরে ঘুরে জল ঢালে। এরপর গোরুর চামড়ার আসন বিছিয়ে শ্মশানযাত্রীরা তার উপরে বসে। এসময় তারা যে মন্ত্র পাঠ করে তার অর্থ জীবনকে ভালবাসা ও মৃত্যুকে ঘৃণা করা। অগ্নির উত্তরদিকে একটি পাথর ফেলে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য প্রেতাত্মাকে দূরে রাখা। যুবতী নারীরা টাটকা মাখন দিয়ে চোখে কাজল পরে। কেউ কেউ বাড়ি পরিক্রমা করে গোরুর পেছনে পেছনে। এই পরিক্রমার সময় যে পেছনে থাকে তাকে পা দিয়ে অন্য সব পদচিহ্ন মুছে দিতে হয়। বোম্বে গেজেটিয়ারে অদ্ভুত এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, মৃত্যুর দ্বাদশ দিনে শ্মশানযাত্রীদের একটি অধিবেশন বসে। তাতে একজনের উপর প্রেতের আত্মা ভর করে জানিয়ে দেয় যে, তার জন্য কি করতে হবে, অথবা সে আত্মীয়-স্বজন দর ত্যাগ করে চলে যায়।

শান্তিকর্মণের মূল উদ্দেশ্য প্রেতাত্মার দুষ্ট শক্তিকে দূরে রাখা এবং আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। সুতরাং যে অগ্নি দ্বারা মৃতের কাজ করা হয়েছিল সেই অগ্নি তারা বাড়ির বাইরে গিয়ে নিভিয়ে ফেলে। মৃতের চিতাভস্ম একটি মাদুর বা পুরানো বাক্সে ভরা হয়—তার পর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব কোন এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে কোন নোনা জায়গায় পাত্রটি রেখে দেয়। বাড়িতে নতুন আগুন জ্বালায় জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঋগ্বেদেও এ ধরনের অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। তবে এর সঙ্গে সবটাই যে মিল আছে তা নয়।

পিতৃমেধ বা শ্মশান: কাকে কখন শ্মশানে নিতে হবে এ নিয়ে নানা আনুষ্ঠানিক আলোচনা আছে। নানা জনে এ বিষয়ে নানা প্রকার বিধান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন্ ঋতু ও কোন্ ক্ষেত্রে কার মৃত্যু হয়েছে সেটাও বিচার্য। শুক্লপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্মশানে নেবার আগের দিন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উত্তরদিকে মাটি খুঁড়ে লোকেরা বিশেষ এক ধরনের গাছ লাগায় এবং মাটি দিয়ে ছ'শ থেকে ছাব্বিশ শ পর্যন্ত ইঁট তৈরি করে শ্মশান-মঞ্চ তৈরি করে। শবভস্মাধার তিনটি পলাশের ডাল মাটিতে পুঁতে তার মধ্যে রাখা হয়। বসানো হয় ঘরে। এই ঘর তৈরি হয় শ্মশান ও গ্রাম থেকে মাঝামাঝি জায়গায়। যদি শবদাহ শেষে হাড় পাওয়া না যায়—তাহলে নদীর ধারে গিয়ে লোকেরা মৃতের নাম ধরে ডাকতে থাকে। তারা একটি কাপড় বিছিয়ে ধরে। যদি কোন হাড়ের সন্ধান নাই পাওয়া যায় তাহলে যে-কোন প্রাণী মাটি থেকে এই কাপড়ে এসে পড়ে তাকেই হাড় বলে ধরে নেওয়ার বিধান আছে।

এবার ফুটো করা একটি মৃৎপাত্রে টকদই রেখে তা তিনটি পলাশ ডালের মধ্যে রাখা হয়। ফুটো দিয়ে দইয়ের জল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনির মধ্য দিয়ে শবদাহকেরা শ্মশানক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃৎপাত্র বা হাঁড়িটিকে হাওয়া দেয়। (কোথাও কোথাও আবার এক্ষেত্রে নৃত্যের ব্যবস্থাও আছে। মহিলারাই নেচে থাকে। কোথাও বা ঘরে খালি একটা পাত্র বসিয়ে জুতো দিয়ে তা পিটতে হয়)।

এই ভস্মাধার বসানো অনুষ্ঠান হয় রাত্রির প্রথম, মধ্য ও শেষ প্রহরে। যারা এই শেষনৃত্যে অংশ নেয় তারা কার্য সমাধা হওয়া মাত্রই স্থান ত্যাগ করে। এই শ্মশানের এক্তিয়ার কতদূর তা নিয়েও লোকের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শ্মশান-ক্ষেত্রটি এমন জায়গায় হওয়া বিধেয়, যে স্থান সহসা দৃষ্টিগোচর হবে না। তবে মধ্য দিনের সূর্যের আলো সেখানে পড়া চাই। শ্মশানক্ষেত্রের চারদিকে দণ্ড পুঁতে—তাতে দড়ি বেঁধে ঘর তৈরি করা হয়। শ্মশাননৃত্যের একটির নাম 'অগ্নিচয়ন'। এতে শ্মশানের নানা দিক আছে। এক্ষেত্রে শ্মশানের উপরিভাগ ছোট ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় (সম্ভবত প্রাচীন পাষাণ স্তূপের একটি ক্ষীণ ধারা)। পরে এর উপর ছটি ষাঁড়ের সাহায্যে লাঙল চষে লোকেরা। কখনও কখনও ছয়ের বেশি সংখ্যক ষাঁড়ও নেয় কেউ কেউ। তারপর সেখানে নানা ধরনের শস্যবীজ ছড়িয়ে দেয়। জমির মাঝখানে একটি গর্ত করে সেখানে পাথর ও নোনা মাটি ফেলা হয়। বৎস্য মারা গেছে এমন গাভীর দুধ একটি পাত্রে আর্ধেক ঢেলে, তাতে এক ধরনের বীজের গুঁড়ো মিশিয়ে পানীয় তৈরি করে শোকার্তরা। এই পানীয় এবং আরও অন্যান্য জিনিস মৃতের ভোজের জন্য রাখা হয়। দক্ষিণদিকে দুটি আঁকাবাঁকা পরিখা খুঁড়ে তাতে দুধ ও জল ঢেলে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। শ্মশানে অনেকে এক টুকরো নলখাগড়াও পুঁতে দেয়। এই নলখাগড়া বৈতরণী পার হবার তরী বিশেষ। যদি ভস্মাবশেষে কোন হাড় থেকে যায় তবে সেই হাড়কে দূর্বাঘাসের বিছানায় রাখা হয়। এক্ষেত্রে একটি মানুষের প্রতিকৃতিও তৈরি করে কেউ কেউ। তাতে পুরানো কাপড় পরিয়ে দিয়ে সর্বত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যে আধারে হাড়টি রাখা ছিল তা ভেঙে ফেলে। মৃত ব্যক্তির ভস্মাবশেষের উপর একটি সৌধ ধরনের জিনিসও নির্মাণ করা হয়। এই সৌধই সম্ভবত পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে স্তূপের রূপ গ্রহণ করে। এই স্তূপ তৈরির কাজ কিছুটা এগুলেই এর মধ্যে মৃতের জন্য রেখে দেওয়া হয় খাদ্য। এসব কাজ হয়ে যাবার পরে শ্মশানের উপর মাটি ফেলে তার উপর কলসী থেকে জল ঢালা হয়। পরে যে কলসী থেকে জল ঢালা হয় সেই কলসীটিকেও লোকেরা নষ্ট করে ফেলে। ভাঙা কলসীর টুকরোগুলো অবকা গাছ ও কুশের সঙ্গে মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। মৃতের জগৎ থেকে জীবজগৎকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নানা ধরনের রীতিও রয়েছে। এই ব্যবধান তৈরি করা হয় মাটির ঢিবি, পাথর ও গাছগাছালির ডালপালা দিয়ে। এ জন্য কিছু মন্ত্রপাঠেরও ব্যবস্থা আছে।

মরা মাত্রই সে জীবের আত্মা ইহলোক ছেড়ে পিতৃলোকে চলে যায়—ভারতীয় হিন্দুরা তা মনে করে না। প্রেত হিসেবে কিছুদিন পিতৃলোক থেকে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই সময় প্রেতাত্মার জন্য নানা খাদ্য পানীয়াদি দিতে হয়। পরে নির্দিষ্ট একটি সময় পার হলে আত্মা পিতৃলোকে যেতে পারে। এজন্য সপিণ্ডীকরণ করা হয়। এবার থেকে তিনটি মাত্র পিণ্ড দানের ব্যবস্থা। পিতামহ বা প্রপিতামহ পিণ্ডলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। মৃত ব্যক্তির আত্মা পূর্বপুরুষের দৈবসত্তা লাভ করে। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের জনজীবনে গভীরভাবে বসে আছে। শ্রাদ্ধাদিতে দেখা যায়—এই পিতৃপুরুষদের খাওয়ানো, খুশি করা, তাদের সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই শ্রাদ্ধকর্মে প্রকটভাবে বিদ্যমান। পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে মাঝে মাঝেই বা বিশেষ শুভ অনুষ্ঠানে শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এই শুভ অনুষ্ঠানগুলি হল বিবাহ, নবজাতকের আগমন, নামকরণ প্রভৃতি। এ সময় পিতৃপুরুষদের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তা দেবতাদের পুজো করার মতই। বৎসর শেষে অন্বষ্টক্য-এর সঙ্গে অষ্টকা উৎসবও করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় মৃত্যুর পর হিন্দুরা কি ধরনের আচরণ করে থাকে সে কথারও উল্লেখ আছে। এ থেকে একটি জিনিস বোঝা যায় যে, স্থূল দেহের অবসানের পরেও কিছু একটা থেকে যায়। সেই থেকে-যাওয়া সত্তাকে এরা যত না শ্রদ্ধা করে তার চাইতে ভয় করে বেশি। সেইজন্য এত নানা ধরনের অনুষ্ঠান। বস্তুত পৃথিবীর সব মানুষই এই ভীতি থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে। তবে এ নিয়ে ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে যেমন বেশি করে আলোচনা হয়েছে অন্য কোন দেশে তেমন করে হয়নি। ইদানীং অবশ্য ইউরোপের অধিমনোবিজ্ঞান এ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল প্রদর্শন করে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং করছে।

ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের যুগে যেমন ঈশ্বর সম্পর্কিত একটা স্বচ্ছ ধারণা আছে মৃত্যু বা পরলোক সম্পর্কে তেমন নেই। এদের বিশ্বাস ছিল যে নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান করলে মানুষ জীবনীশক্তি বাড়াতে পারে। নানা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মৃত্যুর পরে আত্মা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। তথাপি মাঝে মাঝে চমকপ্রদ কিছু বর্ণনাও অবশ্য রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ঃ যজ্ঞ করলে, বলিদান করলে, মানুষের আত্মা শাশ্বত সমৃদ্ধি এবং অগ্নি ও আদিত্যের সঙ্গে একই স্থান লাভ করবে। যিনি সচেতনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবেন—তিনি অমরত্ব ও দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। কিন্তু অনুষ্ঠানকার্যে অবহেলা করলে পূর্ণ জীবন ভোগের আগেই মানুষকে পরলোকে যেতে হয়। কর্মানুসারে তারা ভাল ও মন্দ ফল লাভ করে। এখানে বোধহয় পরলোক-ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণরা তাদের অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে বেশি করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফলে এমন কথাও তাঁরা বলেছেন যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান নির্ভুলভাবে করলে পরলোকে সূক্ষ্মতনু ও ভোগ লাভ করবে। একথার সূক্ষ্ম একটা তাৎপর্য হয়তো

আছে—কিন্তু ব্রাহ্মণের বর্ণনাতে তার পূর্ণ পরিচয় নেই—এ পরিচয় শুধুমাত্র যোগই দিতে পেরেছে।

তবে একথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে পরলোক সম্পর্কে তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। ঋগ্বেদের ধারণা, মৃত্যুর পর পাপী অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে কিন্তু পুণ্যবান অমরত্ব লাভ করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধারণা পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগের জন্য পুনর্জন্ম লাভ করবে। এই জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—'মানুষ নিজের কর্মফল দ্বারা সৃষ্ট জগতেই জন্মলাভ করবে।' আবার ঐ গ্রন্থেই অস্পষ্ট একটা বাক্য আছে, যেমন 'এ জগতে যেমন খাদ্য গ্রহণ করবে পরলোকে মানুষ তেমন খাদ্য দ্বারাই ভক্ষিত হবে।'

ব্রাহ্মণে জন্মান্তরের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। তবে কর্মফল ভোগের পর যে পুনর্জন্ম হয় একথা আছে। এই পুনর্জন্ম কেমন করে হয় তা বলা নেই। তবে কর্মফল ভোগের কারণে মানুষ যে জন্মমৃত্যুর এক চিরন্তন আবর্তে বন্দী হয়ে আছে একথার উল্লেখ আছে। চির প্রশান্ত শাশ্বত জগতের কোন কথা নেই সেখানে যেখানে গেলে জন্মমৃত্যুর আবর্ত পেরিয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়।

তবে আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে যথার্থ সত্যের প্রতিও ব্রাহ্মণগ্রন্থের কোথাও কোথাও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, 'দেবতার উদ্দেশে দান করলে নয়, আত্মার উদ্দেশে দান করলে তবেই বৃহত্তর জগতে যাওয়া যায়।' ঐ ব্রাহ্মণেই বলা হয়েছে 'যিনি বেদজ্ঞ (জ্ঞানী) তিনি পুনর্বার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান এবং ব্রহ্মে লীন হন।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নির্বিকল্প ব্রাহ্মণের কল্পনাও আছে। বলা হয়েছে, 'অগ্নি আছে বাক্যের মধ্যে, বাক্য হৃদয়ে, হৃদয় আমার মধ্যে, আমি অমৃতের মধ্যে এবং অমৃত ব্রহ্মণের মধ্যে।'

আনুষ্ঠানিকতার অসারতার কথা ব্রাহ্মণেও ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল। কারণ শতপথ ব্রাহ্মণেই বলা হয়েছে ঃ—'না বুঝে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলে অমরত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। তাকে পুনর্জন্ম লাভ করে মৃত্যুর শিকার হতেই হবে।' কোথাও কোথাও উপনিষদের অতি উচ্চ কল্পনাও রয়েছে ব্রাহ্মণে, যেখানে বলা হয়েছে 'আত্মাই হল সমস্ত কিছুর শেষ। এই আত্মার কোন ইচ্ছা নেই, কিন্তু এতেই আছে আকাঙ্ক্ষিত সকল বস্তু।' মানুষ জগতে আকাঙ্ক্ষারহিত হলে তবেই আত্মার নিষ্ক্রিয় পরম প্রশান্ত অবস্থাতে যেতে পারে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বলিদান করে সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে যাওয়া যায় একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই।

কিন্তু উপনিষদীয় উচ্চকোটির ধারণা মাঝে মাঝে দেখা দিলেও ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ পারলৌকিক জীবনের যথার্থ সন্ধান পায়নি। পুনর্জন্ম জিনিসটি কি ব্রাহ্মণ তা—যথাযথ বুঝতে পারেনি। ব্রাহ্মণের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব। মোক্ষের ধারণা থেকে এ ধরনের চিন্তা শত যোজন দূরে।

উপনিষদে এই জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান আরও উজ্জ্বল। যেখানে স্পষ্ট

করেই বলা হয়েছে যে, স্থূলদেহের মৃত্যু হলেও মানুষের কামনা-বাসনা সূক্ষ্ম দেহে বাস করে। এই সূক্ষ্মদেহের উপাদান বর্তমানে যেমন অনুমান করা সম্ভব হয়েছে সে কালে তেমন ছিল না হয়তো। উপনিষদের মতে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। যদি কেউ নিজের কল্যাণ কামনা না করে, অর্থাৎ যথার্থ সত্যের সন্ধান না পায়, কামনা-বাসনার আক্রমণে বিক্ষত থাকে তবে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ফলে দৈহিক মৃত্যু হলেও কর্মফল ভোগের জন্য পুনরায় সে জন্মগ্রহণ করবেই।

কর্মফল দ্বারা আত্মার মুক্তির উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ. সেই পরম সত্যের মধ্যে বা পরমাত্মনের মধ্যে কোন কামনা-বাসনা নেই। আত্মার এই নিস্তরঙ্গ স্বরূপ যে জানে এবং তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে কেবলমাত্র সেইই মোক্ষ লাভ করতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদ তাই বলেছে, 'যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ না জেনে, সত্য আকাঙ্ক্ষা কী না বুঝে এই পৃথিবী ত্যাগ করে, সর্বত্রই তার জীবন সংকুচিত।'

কর্ম মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এমন ধরনের একটা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই উপনিষদে আর একটি চিন্তা এসে গেছে—যে চিন্তা বেদ-সংহিতার যুগে তেমন ছিল না। উপনিষদের ধারণা, কর্ম একটা প্রবণতা তৈরি করে। সেই প্রবণতা কখনও বস্তুমুখী, কখনও মুক্তিমুখী। যে কর্মপ্রবণতা মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়, সত্যস্বরূপ জানতে দেয় তার ভবিষ্যৎ নেই, অতীতও স্তব্ধ। এক চিরবর্তমানের মধ্যে তার স্থিতি। এই অবস্থাই ব্রহ্মণের অবস্থা। শুধু মানুষ নয় সমগ্র জগৎই ক্রমবিবর্তনের পথে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যে কর্ম মানুষকে আত্মার স্বরূপ জানতে দেয় না সেই কর্মই কর্মফল হিসেবে থেকে যায়। থেকে যায় সূক্ষ্ম আকারে। এই সূক্ষ্ম আকার বা সত্তাই জীবাত্মা, কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার যার পুনর্জন্ম হয়।

উপনিষদের পূর্বে ব্রাহ্মণেও এই ধারণা ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যার সত্য জ্ঞান আছে, যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন—তিনি মৃত্যুর পর জন্ম নেন অমরত্ব লাভের জন্য। কিন্তু যাদের সত্য জ্ঞান নেই, দায়িত্ব পালনও করেননি, তারা বার বার জন্ম গ্রহণ করেন মৃত্যুর কবলিত হবার জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই নতুন মৃত্যুহীন জন্ম ও মৃত্যুকবলিত হবার জন্য জন্ম সব পরলোকে, ইহলোকে নয়। কিন্তু উপনিষদ পুনর্জন্মবাদে ইহলোকে ফিরে আসার কথাই বলেছে। অবশ্য কখনও কখনও শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের চিন্তা পাশাপাশি মিশেও গেছে, যেমন 'ভাল ও মন্দ কর্মফল হিসেবে আত্মা (জীবাত্মা) যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে মুক্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ পরলোকে কর্মফল ভোগ করে আবার জন্ম গ্রহণ করে। পুণ্যবান স্বর্গে সুখভোগ করে। পুণ্যক্ষয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। পাপী পাপ ভোগ করে আবার জন্মগ্রহণ করে।' বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রন্থে আছে, দেহ ভস্মীভূত হবার পর আত্মা উজ্জ্বল আকারে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা

করে। কিন্তু সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিনলোক অতিক্রম করে নতুন অস্তিত্বে ফিরে আসে।

আত্মস্বরূপ না জানা পর্যন্ত স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও জীবাত্মা আবার জন্মগ্রহণ করে উপনিষদ এ-কথাই স্বীকার করেছে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'আমি যেন সেই শুভ্রদন্তহীন আগ্রাসী বাসস্থানে না যাই।' কঠোপনিষদ বলেছে, শস্যকণার মত মরণহীন মানুষের মৃত্যু হয়। এবং শস্যকণায় মতই পুনর্জন্ম লাভ করে। মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যু নতুন জীবনের তোরণ। যারা পরমাত্মনের জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের কাছে এটা অনন্ত জীবনের দুয়ার স্বরূপ। মৃত্যু নবজীবনের তোরণ হলেও নতুন জীবনের চরিত্র নির্ভর করবে কর্মফলের উপর। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 'যারা ভাল কাজ করেছেন তারা শীঘ্রই ভাল জীবন লাভ করবেন—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় বা বৈশ্য হবেন। কিন্তু যারা খারাপ কাজ করবেন তারা খারাপ জন্মলাভ করবেন, যেমন, শুয়র, কুকুর, চণ্ডাল এই ধরনের।'

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে—খারাপ কাজের ফলে যদি পশুজন্ম হয় তখন আত্মা পরিচালিত হবে স্বভাব দ্বারা। মনন বা বুদ্ধি দ্বারা নয়। সেই ক্ষেত্রে ভাল বলতে যা বোঝায় তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই কর্মফল হিসেবে সেই পশুজগতেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তাহলে তাদের পক্ষে আত্মার মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিংবা পশুজীবনে আবদ্ধ আত্মা পুনরায় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে মানবজীবন প্রাপ্ত হয়ে আবার চেষ্টা করবে তার সত্যস্বরূপে ফিরে যেতে? পশুজীবনের মধ্যেই স্বাভাবিক একটা আকুতি থাকে অসীমের প্রতি। সেই জন্যই ক্রমবিকাশ হয়। এই ক্রমবিকাশের কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করে। হিন্দুরাও এই ক্রমবিকাশের ধারণায় বিশ্বাস করে। ৮৪ লক্ষ যোনি পার হয়ে মানবজীবন, এই তত্ত্বে আস্থা রাখে। উপনিষদ এক জীবন ও আর এক জীবনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র সচেতন চেতনার মধ্যে খোঁজেনি;—খুঁজেছে মূল্য সংরক্ষণের মধ্যে, বিজ্ঞানে যাকে বলা হয়েছে—conservation of value.

আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—দেহের মৃত্যুর পর আত্মা কি বেঁচে থাকে? কারণ মৃত্যুর পরে যদি জীবনীশক্তি অগ্নিতে চলে যায়, শ্বাস বাতাসে, দৃষ্টি সূর্যে, মন চন্দ্রে, স্বপ্ন আকাশে, দেহ মৃত্তিকায়, আত্মা অন্তরীক্ষে, লোমরাজি লতাগুল্মে, কেশ বৃক্ষে, রক্ত ও বীর্য জলে—তাহলে মানুষের আর থাকে কি?' এর জবাবে উভয়েই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, 'সত্য সত্যই ভাল কাজের জন্য কেউ ভাল হন, মন্দ কাজের জন্য মন্দ।' অর্থাৎ তাঁরা বলেছিলেন যে, 'স্থূল সত্তা' সৃষ্টির মৌল উপাদানে মিশে গেলেও তার মানবিক ক্রিয়াজাত প্রবণতা থেকে যায়। মৃত্যুকে অতিক্রম করেও তা বেঁচে থাকে। তবে কিভাবে, কেমনভাবে থাকে বর্তমান বিজ্ঞান সে সম্পর্কে যে বিস্তৃত অনুসন্ধিৎসা ও চেষ্টা দেখাচ্ছে তেমনভাবে এঁরা বিশ্লেষণ করে কিছু বলতে পারেন নি।

যাজ্ঞবল্কের আলোচনাতে পশুজীবন সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। অবশ্য পরবর্তীকালের উপনিষদ—ছান্দোগ্য, কৌশিতকী, প্রভৃতি উপনিষদে মানবাত্মার পশুদেহে প্রবেশের উল্লেখ আছে। এ ধরনের চিন্তা আর্যদের মধ্যে সম্ভবত অনার্য বা প্রাগার্য ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে এসেছিল—কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, মানবাত্মা পশুদেহে প্রবেশ করতে পারে।

কর্মফলরূপে মানসিক প্রবণতার সংরক্ষণজাতীয় ধারণা বৈদিক ঋষিদের কাছে এসেছে সম্ভবত পরলোকে আত্মার পুরস্কার ও শাস্তিলাভের চিন্তা থেকে। কিন্তু এ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে গিয়ে জটিলতাও এসেছে উপনিষদকারদের মনে। মৃত্যুর পরে এই জন্য আত্মার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা আলোচিত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ধরনের উক্তি আছে ঃ মানুষের জন্য দুটো পথের কথা আগে শুনেছি —একটি নিয়ে যায় পিতৃলোকে, আর একটি দেবলোকে। দ্যৌ এবং পৃথ্বীর মধ্যবর্তী সকল প্রাণীকেই সেই পথে পরিভ্রমণ করতে হয়। মৃত্যুর পর আত্মা কর্মফল অনুযায়ী এই দুটি পথে অগ্রসর হয়। দেবযান, যাকে আর্কিমার্গ বা আলোর পথও বলা হয় সেই পথে আত্মা অগ্নির নানা স্তর পার হয়ে সত্যলোকে গিয়ে পৌঁছায়। আর পিতৃযান বা ধূম্রমার্গ বা অন্ধকারের পথে আত্মা চন্দ্রলোকে গিয়ে পেঁছোয়। পিতৃযানে যারা যায় তারা তাদের সৎকর্মের ফলভোগ শেষে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্ম নেয়। আত্মার আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথও আছে যা নাকি নিরানন্দ এক জগতে আত্মাকে নিয়ে যায়। এই জগৎ পোকামাকড়, পতঙ্গ প্রভৃতির আত্মায় পরিপূর্ণ।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পুণ্যবানেরা অর্থাৎ আত্মা (পরমাত্মা) সম্পর্কে জ্ঞানী লোকেরা মৃত্যুর পর আনন্দলোকে বা প্রশান্তলোকে ফিরে যান আর ফেরেন না। সংসারী ব্যক্তি, যারা পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন নি তারা পিতৃযান থেকে কর্মফল ভোগের পর আবার ফিরে আসেন। পাপীরা নিরানন্দ পশুজগতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ আত্মা পশুদেহ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু পরলোকের এই কল্পনায় উপনিষদকারদের মধ্যে চিন্তার অনেক ফারাক আছে। যেমন, কঠোপনিষদের মতে আত্মন (পরমাত্মা) সম্পর্কে ধারণাসম্পন্ন মানুষের মৃত্যুর পর দেবযানে যাবার প্রয়োজন নেই। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রহ্মণত্ব লাভ করেন। বৃহদারণ্যকে এ ধারণা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'দেবযানে তাঁরাই যান যাঁরা এই পৃথিবীতে আত্মনের স্বরূপ বোঝেন নি, অথচ চেষ্টা করেছিলেন। এই পথে তারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। একে কর্মমুক্তিও বলা হয়।'

মৃত্যুর পর আত্মার নবজন্মের ধারা বোঝাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে— 'মানুষের, জ্ঞান, কর্ম ও প্রাক্তন অভিজ্ঞতা তাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। শুঁয়োপোকা যেমন এক ঘাসের ডগা থেকে আর এক ঘাসের ডগাতে ঢেউ খেলে খেলে এগিয়ে যায় তেমনি মানুষ দেহ ত্যাগ করার পর নতুন অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে চলে।' আরও বলা হয়েছে, 'স্বর্ণকার যেমন এক খণ্ড স্বর্ণপিণ্ড নিয়ে তাকে আর এক রূপ দেয়—, আরও

গ্রহণযোগ্য রূপ, সেই প্রকার দেহ ত্যাগ করবার পর আত্মা নতুন গ্রহণীয় আকৃতি গ্রহণ করে—যা নাকি এই পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী। ভাস্কর যেমন এক মূর্তি থেকে মসল্লা নিয়ে আর এক মূর্তি তৈরি করে, নতুন এবং আরও সুন্দর, আত্মাও তেমনই আরও নতুন ও আরও সুন্দর হয়। আত্মা দেহ ত্যাগের পর এবং অজ্ঞানতা দূর হবার পর নিজের জন্য অন্য দেহ তৈরি করে। যেমন, পিতৃ, গন্ধর্ব, দেবতা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবতা।' কৌশিতকী উপনিষদে আছে, 'মৃত্যুর পর আত্মা দেহের জীবনীশক্তি আহরণ করে কর্মফল অনুযায়ী অন্য দেহে চলে যায়। এই সূক্ষ্মদেহের মধ্যে থাকে তার কর্মলব্ধ প্রবণতা।' আবার এমন কথাও বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে, যেমন, 'এক মহা অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর সে আবার সেখানেই চলে যায়।'

মৃত্যুর পর আত্মার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপনিষদকারদের কল্পনা তাঁদের ব্রহ্মণ কল্পনার মত সুস্থ নয়। তবে এ থেকে একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে· আত্মার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পরও কিছু থেকে যায়। কর্ম সম্পর্কে ধারণাই তাঁদের এ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিল। যৌন প্রক্রিয়া আত্মার জন্য শুধু মাত্র একটি পরিবেশ তৈরি করে। আত্মা সেই পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে নতুন জীবনে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হল এই যে, আত্মাই যদি কর্মফলের জন্য নতুন জীবন নেয়, তাহলে নিত্য নতুন জীবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি করে? তার জবাব এই যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তাতে প্রাথমিক স্তরের জীবন উন্নীত হয় আত্মচেতনার স্তরে। তখন কি তার পক্ষে মানুষের যৌন প্রক্রিয়ায় নতুন অস্তিত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব? আত্মা যতক্ষণ না নিজের স্বরূপ অর্থাৎ আত্মন বা ব্রহ্মণের স্বরূপ উপলব্ধি করছে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। ততক্ষণ তার ধ্বংসও নেই। ধ্বংস কোন জিনিসই হয় না, শুধু রূপান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে মহা এক অস্তিত্বে এক হয়ে যায়। যতক্ষণ আত্মা সেই মহা অস্তিত্বে মিশে যেতে না পারছে ততক্ষণ তার জীবাত্মাস্বরূপ আত্মার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটতে পারে কিন্তু আত্মার বিলোপ ঘটে না। আত্মার জন্য থাকে আত্মনকে (পরমাত্মন) অনুভব করবার জন্য ভবিষ্যৎ জীবন—যতক্ষণ না কালের (Temporal) সীমার ঊর্ধ্বে সে যেতে পারছে। এটা করতে হলে তাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে হবে। মুক্তির স্বাদ বুঝতে হলে নিজেদের মুক্ত হতে হবে। সেই মুক্ত হবার পথনির্দেশই হল যোগ। ইন্দ্রিয় জ্ঞান থাকলে মুক্ত হওয়া যায় না। উপনিষদ জানতো যে, ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলে মুক্তি সম্ভব নয়। তাই কঠোপনিষদে বর্ণনা আছে, পর্বতপৃষ্ঠে বৃষ্টির জল পড়লে তা যেমন নিচে চতুর্দিকে গড়িয়ে পড়ে, তেমনটি যে ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে, চতুর্দিকে সে সেই গুণের পিছনেই ধাবমান হয়। নির্মল জলবিন্দু নির্মল জলে পড়লে যেমন জল জলই থাকে তেমনি যিনি আত্মনের স্বরূপ জানেন তাঁর আত্মা

আত্মা নষ্ট থেকে যায়।' এর আগে মানুষের দেহান্তর হয় বটে, মৃত্যু হয় না। মৃতদেহের একটি সূক্ষ্ম ছায়া পুনর্জন্মের জন্য থেকেই যায়।[১]

ভারতের অনার্য মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ভারতের অনার্যদের মৃত্যুচিন্তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বর্বরদের চিন্তা থেকে খুব একটা পৃথক নয়। বর্বর বলতেই যে অসভ্য বা এ জগৎ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না তা নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে অনার্য তত্ত্ব আর্যদের চিন্তাধারা থেকে অনেক বেশি উন্নত। বহু আর্য-বিশ্বাস অনার্যদের কাছ থেকেই ধার করা। ভারতের অনার্যরা মনে করে যে, মৃত্যু দেহের একটা স্বাভাবিক পরিণতি নয়। নানা দুষ্ট শক্তির প্রভাবেই মৃত্যু হয়ে থাকে, যেমন, দৈত্য দানো, অশুভ প্রেতাত্মা ইত্যাদি। বিশেষ করে পাগলামি, রোগের ঘোরে ভুল বকা ইত্যাদিকে তারা অশুভ শক্তির প্রভাব বলেই মনে করে। আকস্মিক দুর্ঘটনা, বন্য জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া, বা মহামারীর কবলে পড়ে মৃত্যু প্রভৃতিকেও এরা বিভিন্ন অপশক্তির প্রভাব বলেই ধরে থাকে। সুতরাং বহু উপজাতি গুণিনদের সাহায্যে এগুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। আত্মা সম্পর্কে তাদের ধারণা—একটা ছোট মনুষ্যাকৃতি বা কোন জন্তুর আকার এই আত্মাই মানবদেহকে পরিচালিত করে। এই আত্মা মস্তিষ্ক ব্রহ্মরন্ধ্র বা মুখ কান নাক ইত্যাদি অন্য রন্ধ্র দিয়ে বাইরে যায়। এ ধরনের আত্মার নির্গমন হয় ধর্মাত্মাদের ক্ষেত্রে। দুষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অপবিত্র রন্ধ্র দিয়ে এই আত্মা নির্গত হয়, যেমন গুহ্যদ্বার। আত্মা এমনই এক জিনিস যখন খুশি দেহ থেকে বাইরে যেতে পারে। স্বপ্নে আত্মা দেহ থেকে বাইরে গিয়ে নানা জিনিস দেখে। একই দেহে বহু আত্মা থাকাও সম্ভব। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তারা বাস করে। তবে আত্মারও মৃত্যু আছে। আধুনিককালে অতীতের অনেক কিছু ভুলে গিয়ে অনার্যরা কেবলমাত্র সদ্য মৃতদের সম্পর্কেই ব্যবস্থা নেয়। এরা মনে করে যে, আত্মা দেহত্যাগ করার পর উলঙ্গ থাকে। এ সময় সে অত্যন্ত দুর্বল মনুষ্যরূপে চলাফেরা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে (অর্থাৎ যথার্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি) তার সংগতি ও নবজন্ম হচ্ছে, ততক্ষণ নানা বিপদের সম্মুখীন থাকে। কখনও কখনও এই আত্মা সাময়িক কালের জন্য কোন কুটীরে, পাথরে, গাছে বা কোন পবিত্র ঘাসে (যেমন দুর্বা) আশ্রয় নেয়। কখনও কখনও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সাময়িক আশ্রয় বা রূপান্তর অনেকে মৃত্যুস্থানে ছাই বা আটা জাতীয় জিনিস ছড়িয়ে দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। এই জাতীয় জিনিসের উপর যে ধরনের পায়ের ছাপ পড়ে তা দেখেই এরা ঠিক করে যে, মৃতের আত্মা কি ধরনের প্রাণীকে আশ্রয় করেছে। জঙ্গলের লোকেরা ভাবে যে, মৃত্যুর পর আত্মা গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই জন্য কোথাও কোথাও তারা মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়েও রাখে। পশ্চিম ভারতে সাধারণত জীবাত্মার আশ্রয় হিসেবে এক ধরনের

১ ঈশ্বর সন্ধানে ভারত—সচ্চিদানন্দ সরকার—পৃ, ১৬৯,

পাথরকে ধরা হয়—যাকে বলে জীবখাড়া। (এই জন্যই কি গয়াতে পাথরের বুকে ভগবানের পদচিহ্ন এঁকে তাকে জীবাত্মার আশ্রয় হিসেবে দেখানো হয়েছে?)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই পাথর কাজে লাগে। এতে রীতিমত নানা জিনিস উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তীকালে এই পাথরের পরিবর্তে মৃতব্যক্তির মূর্তি গড়ে গৃহ-দেবতাদের (বিগ্রহাদির) পাশে বসিয়ে তাঁদের পুজো করার রীতি প্রচলিত হয়। উর্ধ্ব ব্রহ্মদেশের কাচিনদের মধ্যে এমন রীতিও ছিল—যাতে দেখা যায়, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার আত্মাকে আটকে রাখার জন্য বাঁশের ঘের তৈরি করা হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে তবে এই ঘের তারা তুলে নিত, অর্থাৎ আত্মাকে মুক্তি দেওয়া হত।[১] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত আত্মা যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে সেখানে মাঝে মাঝেই আসে অনার্যদের মধ্যে এ বিশ্বাসও ছিল। পরে তাকে সমাধি দেওয়া হলে বা চিতায় দাহ করা হলে সেখানেই সে থেকে যায়। এ ধরনের বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে তারা স্বভাবতই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর বিশেষ ধরনের জোর দেয়। তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মার জন্য যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হলে আত্মা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তাতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ জন্য হিন্দুরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর বিশেষ ধরনের জোর দেয়।

ক্ষতিকর ও কল্যাণকর আত্মা : অনার্য ভারতীয়রা আত্মাকে দুভাগে ভাগ করে—ক্ষতিকর ও কল্যাণকর। তাদের পারিবারিক ও গোষ্ঠী-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই এমন হয়ে থাকে। পরিবারের কেউ মারা গেলে আত্মার কল্যাণ কামনায় যারা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নেয় অনার্যরা মনে করে যে, সেই আত্মা কল্যাণকর। গোষ্ঠী বহির্ভূত কোন লোকের আত্মাকে এরা শত্রুভাবাপন্ন ও ক্ষতিকর বলে মনে করে। পরিবারভুক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য এরা যত্নআত্তির বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। কোন কোন উপজাতি মৃতের আত্মাকে তাদের মধ্যে এসে গৃহরক্ষক হিসেবে বাস করার জন্য আবেদনও জানায়। কেউ কেউ এজন্য ছোট একটি সেতু তৈরি করে রাখে, যেন আত্মা নদী পার হবার সময় জলের অপদেবতার কবলে না পড়ে। অনেকে এমন কতকগুলি ক্রিয়া করে যা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আত্মাকে তারা খাঁচায় বন্দী করে ঘরে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, বাইরে থেকে ধরে আনছে। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ঘরে বা সমাধি স্থানে কিংবা শ্মশানে প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থাও করে এরা। কখনো কখনো এমন ক্রিয়া করা হয়—যাতে আত্মা তার বিশ্রামের স্থানে যেতে পারে। কখনও সমাধি বা শ্মশান থেকে আত্মাকে উর্ধ্বে উঠে—পরলোকে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যও আহ্বান জানানো হয়। পশ্চিমীদের মতে এ ধারণা এসেছে হিন্দুধর্মের প্রভাবে। কিন্তু হিন্দুধর্ম হল আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফল, যার মধ্যে অন্তত পঁচাত্তর ভাগ হল অনার্য ভাবধারা। সুতরাং অনার্যদের এ ধরনের প্রভাবের জন্য বাইরে হাত বাড়াবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মৃতের আত্মা

১ Gazetteer Upper Burma, I, 1409

যাতে অপ্রতিহতভাবে ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে এজন্য অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে মুক্ত অঙ্গনে এনে রাখে। কেউবা গৃহে যাতে আত্মা আবদ্ধ হয়ে না থাকে সে জন্য গৃহকে মৃত্যুদূষণজনিত অশৌচের হতে থেকে রক্ষার চেষ্টা করে। এই জন্যই শবদাহের সময় মাথার খুলি ভেঙে দেওয়া হয়, যাতে সেখানে কোন রকমে আত্মা আবদ্ধ হয়ে পড়লে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। মৃত্যু হওয়া মাত্র ক্রন্দনের রোল তুলে মৃতের জন্য সকলে সমবেদনা প্রদর্শন করে থাকে। কান্ধরা ভূত ছাড়াবার নাম করে আত্মাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে যাতে সে কোন জন্তু-জানোয়ারের দেহে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে।[১] নাগারা (নাগাল্যাণ্ড) আরও আশ্চর্য জিনিস করে। তারা মনে করে, কোন ক্ষতিকর আত্মার জন্যই কারো মৃত্যু হয়েছে। এইজন্য সেই দুষ্ট আত্মাকে হত্যা করার জন্য বর্শা তুলে ধরে।[২] তবে মণিপুরের নাগাদের মধ্যে এ ধরনের কোন রীতি নেই।[৩]

অনার্যরা মৃত্যুর পর আত্মার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে দ্বিধা করে না। যেমন, খাদ্য পানীয়, সবই দিয়ে দেয়। অনেকে মৃতের জিনিসপত্র তার সঙ্গে দিয়ে আসারই পক্ষপাতী, কারণ তারা ভাবে যে, এ না হলে দুষ্ট আত্মা ফিরে এসে গ্রামের লোকদের ক্ষতি করতে পারে। ভারতের পাহাড়িয়ারা এখনও মৃতের সঙ্গে অর্থ দিয়ে দেয়। এই অর্থ দেয় পরলোক যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে। অনেকে, যারা মৃতের মূল্যবান সম্পদ হাত ছাড়া করতে চায় না, তারা মৃতের ব্যবহারের অযোগ্য জিনিসগুলিই দেয়, বাকীগুলো নিজেরা রাখে। যারা শবদাহ করে তারা মৃতের ব্যবহৃত জিনিসগুলি চিতার আগুনের উপর ঘুরিয়ে নেয় মাত্র। অন্যান্য বর্বরদের মত ভারতীয় আদিবাসীরাও মৃতের অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত তার সঙ্গে কবর দেয়, বা চিতায় দেয়। দেয় এই বিশ্বাসে যে, পরলোকের পথে আত্মরক্ষার্থে এ-সব তার-প্রয়োজনে লাগতে পারে। অনেকে আবার অস্ত্রশস্ত্র তার সঙ্গে ভেঙে দেয়। এর অর্থ এই যে, অস্ত্রশস্ত্রকেও এরা জীবন্ত বলে গণ্য করে। ফলে মৃতের জন্যই তাদের হত্যা করে। অস্ত্রশস্ত্রের আত্মাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্যই এমন করা হয়। এরা মৃতের জন্য পরিধেয় বস্ত্রাদিও দিয়ে দেয়। কারণ, মৃত্যু-দূষণের ভয়ে কেউ তা ব্যবহার করতে চায় না। তবে এক ধরনের গুণিন আছে যারা মৃত্যু-দূষণ ভীতি থেকে মুক্ত, তারা এগুলো গ্রহণ করে। দক্ষিণ ভারতের তিন্নেভেলি জেলাতে দেখা যায়, আদিবাসীরা মৃতের কবরে জাদুমন্ত্র বা চিহ্ন অঙ্কিত গহনা রাখে। এটা করে এই বিশ্বাস থেকে যে, পরলোকে দুষ্ট আত্মার হাত থেকে এগুলি তাকে রক্ষা করবে।[৪]

কোন কোন উপজাতিকে দেখা যাচ্ছে যে, মৃতের সঙ্গে তাদের গুণিনদের দ্বারা

১ Risley, T. C. i, 408
২ JAI, xxvi, 195, xxvii, 84 ; Daton—40
৩ T. C. Hodson, The Naga tribe of Manipur, 1911 p. 146 ff.
৪ Thurston—Notes 149 f

লিখিত চিরকুট কবরে দিচ্ছে। আসামের গারোদের মধ্যে দেখা যায় কবরে বা সমাধিতে কুকুর মেরে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এই, কুকুরের আত্মা—মৃতের আত্মাকে চিকমাঙ অর্থাৎ স্বর্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গন্ডদের মধ্যে দেখা যায় যে, সমাধির উপর মাটির ঘোড়া রেখে দেওয়া হচ্ছে। রেখে দেওয়া হচ্ছে এই ধারণা থেকে যে, এই ঘোড়ায় চেপে আত্মা স্বর্গে যেতে পারবে।[১] আদিম বর্বরদের রাজরাজড়ার সঙ্গে দাসদাসী হত্যা করে যে বিশ্বাসে কবর দেওয়া হত, সেই ধরনের বিশ্বাস অদ্যাবধি এদের মধ্যে টিঁকে আছে। এরা মনে করে যে, রক্তপান করাকে সূক্ষ্মদেহ বা আত্মা খুব পছন্দ করে, সেই জন্য সমাধিক্ষেত্রে এরা বলিও দিয়ে থাকে। বলি দিয়ে রক্ত সমাধির উপর ঢেলে দেয়। আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, মৃত শিশুর কবরের উপর মা পাত্র ভর্তি নিজের বুকের দুধ রেখে আসছে। উত্তরপ্রদেশের দোসাদরা রক্ত ঢেলে দেয় কবরের একটা গর্তে। যাতে মৃতের কাছে এই রক্ত পেঁছিতে পারে সেইভাবেই গর্তটি খোঁড়া হয়। একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকে কবরের উপর জল ঢালে বা মরণোন্মুখ ব্যক্তির মুখে জল দেয়। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এ ব্যবস্থা অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায়। মৃতের সঙ্গে যে নানা ধরনের খাবার দিয়ে দেওয়া হয় এর একটি উদ্দেশ্য হল দুষ্ট আত্মাদের ভয় দেখানো। এরই একটা ক্ষীণধারা টিকে আছে বলেই মাঝে মধ্যেই মৃতের আত্মার উদ্দেশে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়। এটা করা হয় কখনও গৃহে, কখনও বা কোন তীর্থক্ষেত্রে। অনেক সময় মৃতের প্রতিকৃতির কাছেও খাবার রাখা হয়। গুণিন বা ব্রাহ্মণদের যে ভোজ দেওয়া হয়, তাও এই উদ্দেশে যে. তাদের মাধ্যমে এই খাবার মৃতের আত্মার কাছে চলে যাবে।

অপশক্তি বিতাড়নের জন্য ব্যবস্থা ঃ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য অপশক্তিই দায়ী ভারতের উপজাতীয়রা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে। সুতরাং এই অপশক্তিকে বিতাড়নের জন্য নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অপশক্তি তারাই হয় যাদের মৃত্যু সময়ের আগেই কোন না কোন অপঘাতের ফলে হয়েছে, কিংবা আততায়ীর হাতে যারা নিহত হয়েছে, সমাধি বা শ্মশানকৃত্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে, অবিবাহিত অবস্থায় মরেছে (যা আজও বাঙালীদের মধ্যে রয়ে গেছে), নিঃসন্তান মহিলা হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছে প্রভৃতি। এরা ভুত হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস। সংস্কৃতে ভুত অর্থ হল নির্মিত, উৎপন্ন। সুতরাং ভুত (অতীতও) বলতেই যে খারাপ কিছু বোঝায় তা নয়। তবে বর্তমানে সেরকমই মনে করা হয়।

উপজাতীয় অনার্যদের ধারণা, এই ধরনের কোন ব্যক্তির আত্মা সর্বদাই জীবিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। ফলে হয় তাদের শান্ত করার চেষ্টা চলে, নয়তো দমিয়ে দেবার বা ভয় দেখাবার চেষ্টা হয়।

কুমার কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তাদের তৃপ্ত করার জন্য নকল বিয়ের উৎসব চলে। এ ক্ষেত্রে জীবিত কোন তরুণকে বা তরুণীকে তারা মৃতের

১ The Garos by Playfair, 1909, p. 109

প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেয়; অর্থাৎ তারাই যেন সেই মৃত কুমার বা কুমারী। অজ্ঞাত স্থানে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে তার কোন চিহ্ন বা প্রতিমূর্তি তৈরি করে শেষকৃত্য করা হয়। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ মৃতের আত্মা যেন না ভাবে যে, তার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে, যে কারণে সে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, উত্তর ভারতের কোন কোন ডাকাতের আত্মাকেও দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হয়। এটা করা হয় সম্ভবত তার দুষ্ট স্বভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে। কারণ এরা বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের দুষ্ট ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরও অনুরূপভাবেই ক্ষতিকর হয়। সেই কারণে তাদের আত্মাকে খুশি করার জন্যই এই তোয়াজের ব্যবস্থা। উত্তর ভারতে অতৃপ্ত আত্মাদের মধ্যে সব চেয়ে ভয়ংকর মনে করা হয় চুড়েলদের অর্থাৎ বাংলায় যাদের বলা হয় শাকচুন্নি। এরা সাধারণত নিঃসন্তান অবস্থায় বা রজস্বলা অবস্থায় মারা যায়। অন্যান্য দেশে, যেমন দৈত্যদের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, তাদের পায়ের পাতা উল্টো করে বসানো, এদের ক্ষেত্রেও তেমন অনুমানই করা হয়। তার শেষকৃত্য করার পর এইজন্য লোকেরা শ্মশান বা কবর থেকে ফেরার কালে মন্ত্রপূত সরষের দানা রাস্তায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফিরে যায়। সিকিমে সাধারণত এধরনের মহিলাদের শেষকৃত্যের সময় এজন্য আরও ভয়ানক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার হাত পায়ের আঙুলে পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়, যাতে হাত বা পা দিয়ে সে ক্ষতি করতে না পারে।[১]

আকস্মিক দুর্ঘটনায় দেহ বিকৃত হয়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে এ ধরনের মৃতদের আত্মাও ভারতীয় উপজাতিদের কাছে ভয়াবহ। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা এ ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। কোন কোন দেশে বর্বরদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, শত্রুপক্ষের মৃতদেহকে বিকৃত করে তারা কবর দেয়। উদ্দেশ্য সে যাতে ফিরে এসে ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের কোন রীতি লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। তবে সিকিমে এক ধরনের উপজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, মৃতব্যক্তির কনুই থেকে কব্জি অবধি কেটে নিয়ে তবে তাকে সমাধি দিচ্ছে। এর অর্থ নৃতত্ত্ববিদদের কাছে স্পষ্ট নয়।[২] হয়তো কোন ধরনের অপশক্তি বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই এমন করা হয়। কোন কোন উপজাতি গৃহ থেকে ভুত তাড়ানোর জন্য অনুষ্ঠানও করে। [বাঙালীরা কার্তিক মাসে এই ভুত তাড়ানোর অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে এই মাসের শেষ দিনে। তখন পাকাটির মনুষ্যমূর্তি তৈরি করে তার হাতে মাছি, মশা, মাছ ইত্যাদি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গ্রামের চতুর্দিকে নৃত্য করে এবং উচ্চশব্দে এই বাক্য বলতে থাকে, যেমন, ভাল্লা (ভাল) আসে, ভুল্লা (অপশক্তি) যায়। বঁচার (ভুত) নাক কুমীরে খায়। ইঁচার গুড়া, খলসার মুড়া, ভুত যায়, দক্ষিণ (প্রেতলোক) মুড়া (দিকে)]। কখনও বা এরা ভুত

১ Hosten, 673, 679
২ Hosten, 679

তাড়ানোর জন্য নকল যুদ্ধের আসর সাজায়। এজন্য বন্দুক ছোড়া, ঢাক বাজানো, বাজি ফোটানো সব হয়। নাচ গান, এমন কি বিকৃত ও অশ্লীল ধরনের নাচগান পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক উপজাতি আছে যারা মৃতের দেহ ওজন করে দেখে রাখে। শেষকৃত্যের সময় পুনরায় ওজন করে দেখে নেয়। দেখতে চায় যে, একই ওজন আছে কিনা। ওজন যদি বেড়ে যায়, তাহলে মনে করে, কোন অপশক্তি মৃতের দেহে ভর করেছে।

দুষ্ট আত্মা যাতে কবর বা শ্মশান থেকে ফিরে আসতে না পারে এজন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। অনেক ক্ষেত্রে কবরের উপর পাথরের স্তূপও তৈরী হয়। এর অর্থ হয়তো এই যে, এই স্তূপ ভেদ করে মৃতের আত্মা আর উপরে উঠে আসতে পারবে না। কেউ কেউ এজন্য কবরের মধ্যেই মৃতের উপর কাঁটা গাছের ডাল ও পাথর চাপা দিয়ে দেয়। ঠগী দস্যুরা এই কারণেই মাথা উল্টো দিকে রেখে পা উপরে তুলে মৃতকে কবর দিত, যাতে তার আত্মা উপরে আসতে না পারে। উত্তর ভারতে ইংরেজ আমলে কোথাও কোথাও এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, মেথর জাতীয় লোককে স্বাভাবিকভাবে কবর দেবার চেষ্টা করার ফলে দাঙ্গা পর্যন্ত বেঁধে গেছে। কখনও কখনও এ ধরনের ব্যক্তির কবর বা শ্মশানের চারিদিকে বেশ উঁচু করে বেড়া দিয়েও দেওয়া হয়—যাতে এ বেড়া টপ্‌কে তার আত্মা আর বাইরে আসতে না পারে। এই বেড়ার আর একটি উদ্দেশ্য হল স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া, যাতে সেদিকে আর কেউ না যায়। এই প্রথাই অর্থাৎ মৃতের কবরের উপর তৈরী করা পাথরের স্তূপের চারিদিকে বেড়া দেবায় ব্যবস্থাই বোধ হয় পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের রেলিংওয়ালা স্তূপের সৃষ্টি করছে। বৌদ্ধদের স্তূপ কোন মৃতের দেহ বা দেহাংশের উপরই তৈরি হয়। এই জন্যই কোথাও কোথাও আগে ঘর থেকে বের করা হয় মৃতদেহের পা। এমন দরজা দিয়ে তাকে বের কয়া হয় যা নিয়মিত নয়, অর্থাৎ সে যেন ফিরতে এলে পথ ভুল করে ঘরে আর ঢুকতে না পারে। যারা গাছে ঘর বাঁধে তারা সেই কারণে সিঁড়ি সরিয়ে রাখে। কেউ কেউ অতি দ্রুত আঁকাবাঁকা পায়ে হেঁটে মৃতদেহ নিয়ে শেষকৃত্যের স্থানে যায়। কেউ আবার এই জন্য বেশ কিছু দিন মৃতের নাম পর্যন্তও উচ্চারণ করে না, পাছে মৃতের আত্মা মনে করে যে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শেষকৃত্যের পদ্ধতি ঃ—নরমাংস ভোজ ঃ—কোন কোন উপজাতি (পৃথিবীর বহুস্থানে) মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগে তার মাংস খেয়ে নেয়। এ অতি প্রাচীন ব্যবস্থা।[১] তবে ভারতের উপজাতিদের মধ্যে এমন কোন ঘটনার স্পষ্ট বিবরণ আজও পাওয়া যায় না। কিন্তু আসামের লুসাইদের মধ্যে এবং ঊর্ধ্ব ব্রহ্মদেশের চিংপাওদের মধ্যে এক সময় বৃদ্ধদের মাংস খাবার পদ্ধতি চালু ছিল। উদ্দেশ্য, মৃতের গুণ ও শক্তি নিজেদের মধ্যে রেখে দেওয়া।[২] তবে এ রীতি অত্যন্ত অল্প

১ Hartland। L. P. ii, 278

২ Hill tracts, Lewin, 107, Gazetteer of Upper Purma, I, i 436, 496.

সংখ্যক কিছু বর্বরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। Dalton সাহেব ছোট নাগপুরের বিরহোড়দের মধ্যেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহেরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। হয় তো একদা কখনও আরো পূর্ব প্রান্তের কোথাও এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

খাড়া পাথরের উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড় করানো তোরণবিশেষ কবর ঃ— প্রাচীনতম শেষকৃত্যানুষ্ঠানের যে নজির এখনও আমরা পাই তা হল এই ঃ—কবরের দুই দিকে দুটি পাথরের দণ্ড রেখে তার উপর আড়াআড়িভাবে আর একটি পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আছে পাথরের স্তূপ, পাথরের সৌধ ইত্যাদি। ভারতে কোথাও কোথাও এ ধরনের কবরের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। বিশেষ করে পাওয়া গেছে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ অংশে এবং গোদাবরী অঞ্চলে।[২] কৃষ্ণা উপত্যকাতেও অনুরূপ নিদর্শন মিলেছে। তাছাড়া পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলেও এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে দক্ষিণ ভারতে সর্বত্রই এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের সমাধি মূলত তিন প্রকার ঃ (১) কবরের উপর বেড়া দেওয়া পাথরের স্তূপ (২) গর্ত করা সমাধি ও (৩) পাথর চিহ্নিত সৌধ। পাথরের স্তূপওয়ালা কবর খুঁড়ে মাটির পাত্রে দগ্ধ অস্থিও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র, যে ধরনের জিনিসপত্রের অস্তিত্ব প্রাচীন ব্যাবিলনেও লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরনের কবর নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ হয়নি। পাথরের স্তূপে ঘের দেওয়া কবর ভারতীয় টোডাদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। হয়তো লৌহ যুগের কোন এক সময়ে এগুলো হয়েছিল। তবে এই লৌহ যুগ কখন ভারতে আরম্ভ হয়েছিল তা বলা শক্ত। ভি. এ. স্মিথের মতে ১৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। কারো কারো মতে ৮৫০-৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের পরে নয়। তবে আজও প্রাচীন ধারণা অনুসরণ করে ছোটনাগপুরের কোল, আসামের খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি কবরের উপর পাথর তুলে সৌধ রচনা করে। আধুনিককালেও খাসিয়াদের মধ্যে তিন ধরনের শেষকৃত্যের চিহ্ন নজরে পড়ে, যেমন (১) সাময়িক কবর, যা থেকে গোষ্ঠী কবরে মৃতের কঙ্কাল স্থানান্তরিত হয়। (২) কবরের উপর স্মারক পাথর স্থাপন ও (৩) মৃত্যু দূষণের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পাথর চিহ্নিত তলাও (পুকুর) খনন।[১] মাদ্রাজ এবং পূর্ব সীমান্তের নানা জাতির মধ্যে হাড় কবর দেবার রীতির সন্ধানও পাওয়া গেছে। তারা প্রথম সমাধি থেকে দ্বিতীয় সমাধিতে এই হাড়গুলি জমা দিত।

শিকারী পাখি ও বন্য জন্তুর কাছে ফেলে দেওয়া ঃ—অনেক উপজাতির ক্ষেত্রে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা এই ধরনের ঃ—তারা মৃতদেহকে পশুপাখির খাবার হিসেবে ফেলে রাখে (যেমন জরথুস্ত্রবাদীরা করে)। তিব্বতে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অনেক জায়গাতেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। সম্ভবত পরিবেশ ও আবহাওয়ার জন্যই

---

২ Rude Stone Monuments, Fergusson, 475 f.

১ The Khasis, Gurdon, 144 ff.

এমন হয়। এ সব জায়গায় এক এক সময় এত প্রবল শীত বা তুষারপাত হয় যে, গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া বা কাঠ সংগ্রহ করে শবদাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এরা উন্মুক্ত আকাশের নিচেই শব ফেলে রাখে। অনার্যদের মধ্যে যারা অচ্ছুৎ কখনও কখনও তাদের মধ্যেও এ ধরনের রীতি দেখা যায়। যেমন দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি, বাঙলার পাহাড়িয়া ও নাগাল্যান্ডের নাগা। উত্তর ভারতের কোন অংশেও এমন ব্যবস্থা ছিল।[১]

ঘেরাও পাথরের স্তূপওয়ালা কবর :—কবরের উপর পাথরের স্তুপ ও তাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবার রীতি বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যেই বেশি ছিল। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ভিলু ও উধর্ব ব্রহ্মদেশের (প্রাক্তন ভারতের অংশ) কাচিনদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। আসামের কোন কোন স্থানেও এ ধরনের কবরের কথা Dalton ও Crook সাহেব উল্লেখ করে গেছেন।[২]

গুহা সমাধি :—পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়াতে গুহাতে কবর দেবার রীতি প্রবল হলেও ভারতে এর তেমন প্রচলন নেই। তবে এও হতে পারে যে, নানা গুহা অধিকৃত হয়ে যাওয়াতে বা বহু গুহা আবিষ্কার করা বাকি থাকার জন্যও এর যথার্থ নিদর্শন আমরা পাচ্ছি না। তবে মালাবার উপকূলে এ ধরনের দু-একটি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে মৃৎপাত্র এবং লৌহযন্ত্রেরও সন্ধান মিলেছে। 'পান্ডুকুলী' নামক স্থানেও এর নমুনা আছে। লোকের বিশ্বাস এক সময় মহাভারতের পাণ্ডবেরা এখানে বাস করেছিলেন।

গৃহ-সমাধি :—গৃহ-সমাধির নমুনা উপ-জাতীয়দের মধ্যে প্রচুর আছে। নানা কারণে গৃহসমাধি দেওয়া হত, যেমন, মৃতকে ঘরেই রাখা। এই আশাতে রাখা যে, শস্যের মত সে একদিন আবার গজিয়ে উঠবে। দ্বিতীয় কারণ, পাছে কেউ মৃতের হাড়গোড় বের করে নিয়ে জাদু বা তুক্‌তাক করে। তৃতীয়ত—এই বিশ্বাস যে, মৃতের আত্মা পরিবারের কোন মহিলাকে আশ্রয় করে নব প্রজন্মে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ তার আর ভিন্ন পরিবারে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। আন্দামানের আদিবাসীরা এই শেষ বিশ্বাস থেকেই ঘরের মধ্যে তাদের মৃতদেহ কবর দেয়।[৩]

সলিলসমাধি :—ভারতে মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। কাশীতে আধুনিককালে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জন্য গঙ্গায় দূষণ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা গঙ্গা অথবা তীর্থক্ষেত্রের পবিত্র কোন কুণ্ডে মৃতের ভস্ম বা অস্থি নিক্ষেপ করে। গরীবেরা সাধারণত এমনিই, না হলে সামান্য মুখাগ্নি করেই মৃতদেহকে কাছের কোন নদীতে ফেলে দেয়। গঙ্গা হলে তো

---

১ Rice, Essays, 60 ; Crook. TC. ii 92, i, 7 i, iii, 144 [TC (tribal community)]।

২ Dalton Risley TC ii 112.

৩ JAI, xii, 141-44, Temple Census Report, 1901. p. 65. The Nagas of Assam (JAI, xxvi, 200. etc.

কথাই নেই, কারণ, তারা মনে করে যে, পতিতপাবনী গঙ্গার স্পর্শ পেলে সকলেই স্বর্গে যায়। অনেকে আবার মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয় এই বিশ্বাসে যে, এতে হাড়ের পচন বিলম্বে হবে, মৃতের আত্মা খুশি থাকবে। তবে অধিকাংশে ক্ষেত্রেই নদীতে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় মৃত্যুদূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। মহামারীর সময়ে মৃতদেহ এইভাবেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এদেশে সাধুসন্তদের দেহও নদীতে ভাসিয়ে দেবার রীতি আছে। বাংলায় দেখা যায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে লোকে সাধারণত তাদের নদীর জলেই ভাসিয়ে দেয়।[১]

বৃক্ষে শেষকৃত্য : ভারতে মৃতদেহ গাছেও ঝুলিয়ে রাখা হয়। অংশত বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, যাতে মৃতের আত্মা পরিতৃপ্ত থাকতে পারে, অংশত গাছ প্রেতাত্মাদের আশ্রয়স্থল বলে বিবেচ্য হবার কারণে। আন্দামানের আদিবাসী, নাগা ও মারিয়া গন্ডদের মধ্যে এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। খাসিয়াদের মধ্যে গাছের খোলে মৃতদেহ রাখারও ব্যবস্থা আছে।

বেদী-সৌধ :—বেদী তৈরি করে তাতেও মৃতদেহের শেষকৃত্য করা হয়। এই ব্যবস্থা ভারতের আন্দামানের আদিবাসী ও পূর্ব ভারতের কিছু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।

মৃৎপাত্র-সমাধি : ভারতের অনার্যদের মধ্যে বর্তমানে মৃৎপাত্রে ভরে মৃতদেহ সমাধিস্থ করাব ব্যবস্থা আর নেই। তবে দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের প্রাচীন কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে এই ধরনেই কবর দেওয়া হত। ব্যাবিলনেও দেখা যায় অনুরূপ সমাধি-প্রথা ছিল। তবে এই ধরনের সমাধির স্মৃতি আজও টিকে আছে দেহ ভস্মাবশেষ মৃৎপাত্রে ভরে সমাধি দেওয়া বা নদীতে ফেলে দেবার মধ্যে। মৃৎপাত্র মাতৃগর্ভ হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য এর একটি ভিন্ন ধরনের গুরুত্বও আছে।

দেহ ভাঁজ করে সমাধি দেওয়া : প্রাচীন বর্বরদের মধ্যে মৃতদেহ ভাঁজ করে কবর দেবার ব্যবস্থা ছিল। এর কারণ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতের আন্দামানের আদিবাসী ও নিকোবরের পেন উপজাতিদের মধ্যে আজও এর একটি ক্ষীণ ধারা প্রবহমান।[২] এ ব্যবস্থা আর লক্ষ করা যায় পূর্ব ভারতে লুসাই ও কুকিদের মধ্যে।[৩] এরা মনে করে যে, এমনভাবে কবর দিলে মৃতের প্রেতাত্মা আর হেঁটে বেড়াতে পারবে না। এই কারণেই কেউ কেউ, মৃতের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও পায়ের আঙুল বেঁধে দেয়। কেউ কেউ আবার মাতৃগর্ভে শিশু যেভাবে ছিল সেইভাবে তাকে পৃথিবী-মাতার গর্ভে রাখার জন্যও দেহ এমন করে ভাঁজ করে কবর দেয়। কোথাও কোথাও বৃহৎ ধরনের কবর খোঁড়ার অসুবিধা থাকার জন্যও হয়তো এমন করা হয়।

---

১ Buchanan, E. India, i, 114, Asiatic Res. iv, 69.

২ JAI, xii, 141, PNQ, iv, 66.

৩ Lewin, Hill Tracts, 1091, Wild Races 246.

কেউ কেউ মনে করেন, আদিবাসীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে এইভাবে শয়ন করত, এবং তারই ধারা ধরে এই কবর দেবার প্রথা। উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী এবং দক্ষিণ ভারতের শেনবি ও লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ও এইভাবে নিজেদের অনুগামীদের কবর দেয়। এখানে হয়তো ধ্যানে বসার ভঙ্গীতেই কবর দেওয়া হয়। এদের মধ্যে পুরুষ মারা গেলে এই ভঙ্গীতে বসিয়ে কেউ তাঁদের পুজোও করে।

কুলুঙ্গি-সমাধি ঃ ভারতের কোন কোন উপজাতি কবর খুঁড়ে তা বাঁধিয়ে কবরের দেয়ালে মৃতকে রাখার জন্য কুলুঙ্গি জাতীয় স্থান তৈরী করে। মাটি যাতে সরাসরি দেহের উপর প'ড়ে তার অস্বস্তি তৈরি করতে না পারে সেইজন্য এমন ব্যবস্থা। আসামের মীরী প্রভৃতি বন্য জাতির মধ্যে আজও এই ব্যবস্থা চালু আছে।[১] তা ছাড়া মণিপুরের কউপুঈ ও মালাবারের পনিয়ানদের মধ্যেও এমনতর সমাধি দেবার সাক্ষ্য মেলে। বাংলার যুগী সম্প্রদায়ও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের মধ্যেও যারা গোঁড়া তারাও এই ধরনের কবর দেয়। উদ্দেশ্য, মৃতের আত্মা মুনকর ও নকিবের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে। এঁদের প্রশ্নের মূল কথাই হল পয়গম্বর ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে তারা কতটা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে তা যাচাই করা।

গোপন সমাধি ঃ অনেক সময় কবর এমন করে দেওয়া হয় যে, বাইরে থেকে তার কোন চিহ্নই আর অনুমান করা যায় না। এটা করা হয় প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বন্য জাতিদের মধ্যে এ ধরনের কবর দেবার রীতি আছে।[২]

কবর খুঁড়ে মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার ঃ কবরস্থ স্থূলদেহের মাংস পচে গলে পড়ে যাবার পর হাড়গুলো উঠিয়ে দ্বিতীয়বার কবর দেবার যে-রীতি মানুষের মধ্যে ছিল তার উৎসে ছিল এই বিশ্বাস যে, হাড়ের মধ্যে মৃতের আত্মা থেকে যায়। ভারতবর্ষে এই ধরনের কবর খুঁড়ে হাড় বের করবার রীতি লক্ষ্য করা যায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আজও অনেকেই এই প্রথা অনুসরণ করে। এরা কবর খুঁড়ে মৃতের হাড় বের করে জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে কাপড় অথবা গাছের পাতায় মুড়ে দ্বিতীয় বার কবর দেয়, নয়তো জলে ফেলে।[৩] আসামের খাসিয়াদের মধ্যে যারা সংক্রামক রোগে মারা যায় তাদের দেওয়া হয় কবর। যখন দেহের পচনের পর সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট হয়ে যায় তখন হাড়গুলো তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলে।[৪] এই ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ হিসেবে কেউ কেউ এই হাড় ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে রাখে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এ জাতীয় শেষকৃত্যের

---

১ Dalton—34, 8 JAI xvi, 355 f. Notes Thurston 144.

২ Oppert, 199, Scott, Burma, 408.

৩ JAI, xxxii, 209, 219 f.

৪ Gurdon, 137.

নানাস্থানে সন্ধান পাওয়া গেছে।[১] এই রীতি থেকে এমনতর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে, দেহের যে-কোন অংশে আত্মা থাকতে পারে। এর ফলে উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-কবর বা সমাধিক্ষেত্র থাকে, যেখানে দূর দূর প্রান্ত থেকে সমগোষ্ঠীয়দের হাড় এনে জমা দেওয়া হয়।

দ্রুত ও ধীর শেষকৃত্য: সমাধি বা শবদাহ দ্রুত অথবা দেরীতে হবে তা নির্ভর করে একটি দেশের আবহাওয়ার উপর। ভারতে বিলম্বে শেষকৃত্যানুষ্ঠান খুব কম। শেষকৃত্যে বিলম্ব করা হয় এই কারণে, যাতে দূর দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে। তবে ভারতের আবহাওয়ায় পচনক্রিয়া দ্রুত হবার জন্য তাড়াতাড়িই শেষকৃত্য করা হয়। পূর্ব ভারতে খাসিয়া, নাগা ও লুসাইরা শেষকৃত্য করে থাকে বিলম্বে।[২]

দেহ ঔষধিকরণ: মৃতদেহকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বনজ তেল বা মলম জাতীয় যে জিনিস মাখার নিদর্শন পৃথিবীর বর্বরদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, ভারতবর্ষে তার সাক্ষ্য খুব কম। তবে পূর্ব ভারতের প্রান্তদেশে ও ব্রহ্মদেশে এ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে লোকেরা দেহে মধু মাখানোর পর মাছ শুকানোর মত দেহটিকে আগুনের উপর রেখে ঝলসে নেয়।[৩]

সমাধি ও শবদাহ: এ পর্যন্ত যে ধরনের শেষকৃত্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে এর কোনটাই স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক শেষকৃত্যের ব্যবস্থা হল মৃতদেহ হয় সমাধিস্থ করা অথবা দাহ করা। অতি প্রাচীনকালে ভারতে মৃতদেহ বাইরে ফেলে দেওয়া হত। এর পরই আসে সমাধি দেবার প্রথা এবং শেষে আসে শবদাহ ব্যবস্থা। অনেকের ধারণা, শবদাহ প্রথা আর্যদের অবদান, কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাস বিচার করি তাহলে দেখব আর্যদের আগেও শবদাহ প্রথা ছিল। এই দাহপ্রথা ব্যয়বহুল বলে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান লোকেদের শবই দাহ করা হত। তবে শেষ পর্যন্ত শবদাহ কেন যে সমাধির পরিবর্তে ভারতে স্থান করে নিল তা পশ্চিমীরা বুঝতে পারে নি। এর তাত্ত্বিক দিক হল এই যে, দেহের কোন অংশকে না রাখা গেলে আত্মা পৃথিবীতে থাকার মত কোন অবলম্বন পায় না। ফলে লঘু আত্মা কর্মফলের ভার অনুযায়ী সূক্ষ্ম জগতের বিভিন্ন স্তরে ভেসে থাকে।[৪] তবে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা[৫] মনে করেন যে, শবদাহ প্রথা এসেছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, অগ্নিদাহের ফলে ধূমাকৃতি আত্মা অগ্নিনির্গত ধোঁয়ার সঙ্গে দ্রুত স্বর্গলোকে (ঊর্ধ্বে)

১ JAI, v, 401, vii, 21, ff.
২ JAI, xxvi, 195, Tiwin Hill Tracts 109.
৩ Hooker, H. J. Ed. Lond. 1891, 486 f.
Shaway Yoe (Sec H) The Burman.
৪ দিব্য জগৎ ও দৈবীভাষা, নিগূঢ়ানন্দ।
৫ Ridgeway, (Early Age of Greece, Cambridge, 1901, i, ch.vii).

দেবতাদের কাছে চলে যাবে। এই ধোঁয়াই ভারতীয়দের মতে আকাশে গিয়ে আত্মাকে পিতৃপুরুষদের মধ্যে স্থাপন করে। জংলীরাও দাহ করত। মৃত্যুদূষণ দূর করার জন্য যে-ঘরে কেউ মারা যেত সেই ঘরসুদ্ধই পুড়িয়ে দিত। সুতরাং শবদাহপ্রথা আর্যদের উদ্ভাবন একথা ঐতিহাসিকেরা মনে করেন না।

বর্তমানে ভারতে সমাধি দেবার প্রথা রয়ে গেছে অতি প্রাচীন আদিবাসী এবং কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী শ্রেণীর মধ্যেই। কিছু কিছু উপজাতীয় গোষ্ঠীও বর্তমানে দাহপ্রথা অনুসরণ করে। এটা করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে। এমন কোন গ্রন্থ নেই যাতে শবদাহ প্রথা উদ্ভবের ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে। কোন কোন উপজাতি সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেহকে কবর দেয়। কিন্তু মৃত্যু যদি দূষিত হয়, তবে শবদাহ করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও আছে। বিত্তবানদের ক্ষেত্রে শবদাহ প্রথা চলে, গরীবদের ক্ষেত্রে সমাধিপ্রথা। কোথাও কোথাও ব্যক্তি কোন্ ঋতুতে মারা গেছে তার উপরই তাকে দাহ কি সমাধি দেওয়া হবে তা নির্ভর করে। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তো রয়েছেই। নাগেরা বেদী-সমাধির সঙ্গে শবদাহও করে। কফিনে করে মৃতদেহকে বেশ উঁচুতে স্থাপন করা হয়, তারপর দাহ শেষে অবশিষ্ট অংশ সমাধি দেয়। বঙ্গদেশের কামীরা সুযোগ সুবিধা অনুসারে কখনও মৃতদেহ কবর দেয়, কখনও পোড়ায়, কখনও আবার নদীর জলে ফেলে দেয়। উত্তরপ্রদেশের হাবুরেরা যাযাবর জাতীয় লোক। তারা সুযোগ-সুবিধা অনুসারে কখনও শবদাহ করে, কখনও বা মৃতদেহ জঙ্গলে ফেলে রাখে।[১] নাগেরা সমাধি দেওয়া, গাছে ঝুলিয়ে রাখা, বাইরে ফেলে দেওয়া, পোড়ানো, নানা প্রকারেই মরদেহের শেষকৃত্য করে।[২] শবদাহের পরে দেহের দগ্ধাবশেষ সকলেই নদীর জলে ফেলে দেয়, কিংবা কোন পাত্রে ভরে মাটিতে পুঁতে বা গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এ সব করা হয় যাতে মৃতের আত্মা যেখানে তার হাড় রয়েছে, সেখানে এসে দেখে যেতে পারে।

মৃত্যু দূষণ: প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মৃত্যু সম্পর্কে একটা ভীতি আছে। সুতরাং কেউ মারা গেলে তারা এই দূষণের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ব্যবস্থা নেয়। যারা মৃতদেহ স্পর্শ করে তাদের অশুচি বলে ধরা হয়। ভারতের মধ্যাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শব বহনকারী ব্যক্তিদের নিম্নোক্তভাবে শোধন করে, যেমন, তাদের কাঁধে তেল, দুধ ও গোবর দিয়ে ঘষে দেয়। নিমগাছের পাতাসুদ্ধ ডাল দিয়ে তাদের উপর গোচনা ছিটোয়। মৃতের জন্য যে শোক প্রকাশ করা হয়, সেটা আসে মৃত্যুদূষণভীতি থেকেই। (তবে নিকটজনেরা বিয়োগজনিত ব্যথাতেই ক্রন্দন করে)। কোন কোন জাতি শোক প্রকাশের সময় ভিন্ন ধরনের পোশাকও পরে। এটা এক ধরনের ছদ্মবেশ, যাতে প্রেতাত্মা তাদের চিনতে না পারে। একই উদ্দেশ্যে

১ Crooke, Tc, ii, 476.

২ JAI, xi, 203, 213, Hodson 146 ff.

আন্দামানের আদিবাসীরা তাদের মাথায় কাদা মাখে।[১] মৃত্যু গৃহকেও দূষিত করে বলে পরিবারের লোকেরা কয়েকদিন রান্নাবান্না বাদ দেয়, উপোস করে, কিংবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা খাবার পাঠালে তাই খায়। এ জন্য পরিবারের লোকদের গৃহ এমন কি সেই গ্রামের লোকদেরও গ্রাম ত্যাগ করে বাইরে যেতে অন্য লোকেরা বাধা দেয়। আরাকান ও নাগাল্যান্ডে এ ধরনের রীতি লক্ষণীয়। মৃত্যু-দূষণ কালে শোকার্তদের মাটিতে শুতে হয়। অংশত এই ভয়ে তারা শয্যা ব্যবহার করে না যে, এতে বিছানা দূষিত হতে পারে। তাছাড়া মাটিতে শয়ন করে এই কারণে যে, প্রেতাত্মা মৃত্তিকা স্পর্শ করতে ভয় পায়। টোডা গোয়ালাদের কাছে মৃত্যুর জন্য শোক পালন অবশ্য কর্তব্য। কারণ এতে নাকি দেহের শক্তি রক্ষা পায়। মৃত ভেবে কারো শেষকৃত্য করবার পরে আবার যদি সে ফিরে আসে, তাহলে সে অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হয়। কারণ লোকের ধারণা যমের অরুচি বলে যমালয়েও তার স্থান হয় নি। অশৌচ পালনও এক এক সম্প্রদায় এক এক সময়ের জন্য করে থাকে। মৃতের আত্মার গৃহে বা সমাধিস্থলে কত দিন ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা থাকে সে-কথা বিচার করেই বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠী, বিভিন্ন সময়ের জন্য শোক বা অশৌচ পালন করে।

অশৌচান্ত ও শুদ্ধিকরণ : বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে অশৌচান্ত করে নিজেদের শুদ্ধ করে। আন্দামানের আদিবাসী ও গণ্ডরা অশৌচ শেষ করে ঘর পুড়িয়ে দিয়ে এবং মৃতের ব্যবহৃত সব কিছু নষ্ট করে ফেলে।[২] তবে সাধারণত অশৌচান্ত হয় ভিন্ন ধরনে। এক ধরনের পাতা জাতীয় ফুল দিয়ে গা ঝেড়ে অশুভ আত্মার প্রভাব থাকলে দেহ থেকে তা নামানো হয়। কখনও কখনও এ জন্য দেহে গোবরও মাখে তারা। ভারতে গোবরকে সবাই প্রায় পবিত্র বলে বিবেচনা করে। এই জন্য শ্মশান থেকে ফিরে এসে সকলেই প্রায় আগুন ছোঁয় এবং এক ধরনের প্রদীপের ধোঁয়োয় পা সেঁকে নেয়। এ ক্ষেত্রে পা-ই মৃত্যু দূষণে বেশি দূষিত হয় বলে ধারণা। কোথাও কোথাও বলিদানের পশুর উপর মৃতব্যক্তির পাপ চাপিয়ে দিয়েও অশৌচ দূর করার ব্যবস্থা আছে। মাদ্রাজের বদগদের মধ্যে এ জাতীয় অশৌচ দূর করার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। কোথাও কোথাও মৃতব্যক্তির পাপ অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধের সময় সর্বাগ্রে খাদ্য গ্রহণ করে নিজেরা নিয়ে নেয়। তাঞ্জোরের রাজার ক্ষেত্রে মৃত রাজার দগ্ধ হাড়ের গুঁড়ো ব্রাহ্মণদের খাওয়াবার ঘটনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।[৩]

সর্বশেষে মস্তিষ্কমুণ্ডিতকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হয়তো চুলের মধ্যে মৃত্যুদূষণ থেকে যেতে পারে এই চিন্তা থেকেই চুল ফেলে দিয়ে অনেকে ন্যাড়া হয়। অশৌচের সময় এই জন্যই কেউ কেশচর্চাও করে না। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ের পাদদেশে অনেকে মস্তিষ্ক মুণ্ডন করে কেশরাশি মৃতের

১ Temple, Census Report, 1901, p. 65.
২ JAI, xii, 142, Hislop, 19.
৩ Dubois, Manners and Customs, 1906, p. 366.

উদ্দেশে অর্পণ করে।[১] এটা করা হয় এই বিশ্বাসে যে, এতে দুর্বল আত্মা শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। কারণ সুস্থ ও সবল দেহেই কেশরাশি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কেশ এইজন্য শক্তির প্রতীক।[২] কোথাও কোথাও এই কেশ কর্তন করা হয় অশৌচের আরম্ভ থেকে, কোথাও অশৌচকাল শেষ হলে। মস্তক মুন্ডন করে থাকে সাধারণত আত্মীয়-স্বজনেরা। কিন্তু কোথাও কোথাও প্রধান ব্যক্তি বা রাজার মৃত্যু হলে সমাজের সকলেই মাথা ন্যাড়া করে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের মৃত্যু হলে এমন করার বিধান আছে।

জৈনদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে জৈনদের চিন্তার কোন ভেদ নেই। তারা মনে করে যে, যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণ দেবতা কি নর সবারই মৃত্যুশেষে পুনর্জন্ম হবে। যখন কর্ম শেষ হবে, অর্থাৎ ভালমন্দ কোন প্রকার ফলই আর তার থাকবে না তখন আত্মা জন্মমৃত্যুর বৃত্ত থেকে মুক্তি পাবে। আত্মা নিজের যথার্থ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

পুনর্জন্ম ও আত্মার মুক্তি : জৈনদের মতে কর্ম হল—আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম বস্তু। পার্থিব কাজের ফলে এই সূক্ষ্ম আত্মার সৃষ্টি হয়। কর্মফলের আত্মায় এই অনুপ্রবেশকে জৈনরা বলে 'আস্রব'। কর্মবস্তু বালুকণা যেমন বস্তায় ঢুকে তাকে ভারি করে তুলে তেমনই মানুষের আত্মায় প্রবেশ করে তাকে ওজন দান করে। আত্মা স্বভাবত 'ঊর্ধ্বগুরুত্ব' অর্থাৎ যার স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বমুখি। কর্মবস্তু হল অধোগুরুত্ব' যার গতি নিম্নমুখি। সুতরাং কারো আত্মায় যদি কর্মফল প্রবেশ না করে তবে তা অতি দ্রুত ঊর্ধ্ব দিকে উঠে মুক্তাত্মারা যেখানে অধিষ্ঠান করেন সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে বাস করে। চালকুমড়ো যেমন কাদায় জড়িয়ে থাকলে পুকুরের তলায় গিয়ে পড়ে, আবার কাদা গলে গেলে জলের উপর ভেসে ওঠে তেমনি হল আত্মার অবস্থা। কর্মফলরূপ কাদায় জড়ালেই তা নিচে নামে, কাদা মুছে গেলে উপরে ওঠে। কর্মভারযুক্ত আত্মা মৃত্যুর পর সরাসরি উপরে উঠতে পারে না। ধাপে ধাপে এঁকেবেঁকে ওপরে ওঠে (কোয়াণ্টাম পদ্ধতিতে), তারপর যতদূর সম্ভব সেই স্তরে পেঁছুলে আবার কর্মফল অনুযায়ী নিচে নেমে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। চুম্বকের গায়ে যেমন লোহার গুঁড়ো এসে জড় হয় তেমনই কর্মফলযুক্ত আত্মার আকর্ষণে বস্তুকণা এসে আত্মাকে ঘিরে ধরে। আত্মা তার কর্মফল অনুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করে।

ইচ্ছামৃত্যু : ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে স্বেচ্ছায় দেহত্যাদের প্রচুর নজির আছে। ধর্মীয় কারণে স্বেচ্ছায় এই দেহত্যাগকে বলে 'ধর্মীয় আত্মহত্যা।' কোন দেবতার নামে নিজেদের উৎসর্গ করে তারা অনাহারে, বিষ পান, জলে ডুবে, বা কোন উঁচু স্থান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করে। জৈনরা একে বলেন 'বালমরণ' বা 'অজ্ঞান-মৃত্যু'।

১ B G. xvii, 1, 364, 149, NINQ, iii, 117.

২ Frazer, GB. pt i (1911) MA and BK i. 31, 102.

এই অজ্ঞান-মৃত্যুর পরিবর্তে তারা সজ্ঞান-মৃত্যুর বা 'পণ্ডিতমরণ'-এর কথা স্বীকার করে। ধর্মীয় আত্মহত্যা হয় দু-কারণে। যেমন, অতি প্রয়োজনে এবং ধর্মীয় জীবন শেষ হলে। সাধারণ মানুষ বা সাধুসন্ত সকলেই এধরনের মৃত্যু বরণ করতে পারে। [তবে জৈনদের ক্ষেত্রে অনাহারে প্রাণত্যাগের ঘটনার কথা জানা যায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করার পর দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন এ ধরনের কাহিনী ইতিহাসে লিখিত আছে।]

অতি-প্রয়োজন-মৃত্যু বলতে বোঝায় বিশেষ কোন অবস্থায় মৃত্যু। যেমন, দুরারোগ্য ব্যাধি, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া প্রভৃতি। এক্ষেত্রে জৈনরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এমনতর মৃত্যুবরণ অদ্যাবধি তাদের মধ্যে বিদ্যমান। যদি কোন জৈন সন্ন্যাসী জৈনধর্মের বিধি মেনে চলতে অসমর্থ হন তবে এক্ষেত্রে তাঁর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করাই বিধেয়। যদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি কোন সাধুকে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে উপবাস করে জৈন সাধুরা মৃত্যুবরণ করেন। যদি ইতিমধ্যে আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় তবে পুনরায় তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। যদি আরোগ্য লাভ করতে না পেরে তাঁর মৃত্যু হয়, সেটাই জৈনদের মতে উত্তম ঘটনা। শর্তসাপেক্ষ এই 'ইচ্ছা-উপবাসকে' বলে 'ইত্বর'।

গৃহী জৈনদের মধ্যে ধর্মাত্মা ব্যক্তি এগারটি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে পারেন—যাকে বলে প্রতিমা। এই স্তরগুলির কোনটা একমাসের, কোনটা দু'মাসের ইত্যাদি। একাদশ স্তরে এগার মাস যাবৎ অনুষ্ঠান করবার পর তিনি সাধন পর্যায়ে উপনীত হন। এই স্তর শেষে স্বেচ্ছায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। এই ধরনের উপবাস এক মাস চলার পরে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহ করতে হয়—করতে হয় বারবছর ধরে। গৃহীর বার মাসের পরিবর্তে তাঁদের বার বছরের ব্যবস্থা। যদি কোন জৈন সাধু মনে করেন যে, এবার তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করবেন তবে গুরুর কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চাইতে পারেন। গুরু তখন নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখার পর অনুমতি দেন। এবার শিষ্য বার বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করে সমস্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হন। এর ফলেই হয় কর্মনাশ। এইভাবে বার বছর কৃচ্ছ্রসাধনের পর অনাহারে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে তিনপ্রকারে। যেমন, (১) ভক্তপ্রত্যাখ্যান মরণ, (২) ইঙ্গিতমরণ ও (৩) পাদলোপগমন। শেষ দুটিতে—ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। হাত পা নাড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিধিনিষেধ। জৈনদের তিনটি গ্রন্থ—চৌসরণ, আউরপচ্চকখান ও ভট্পরিন্নতে এই ধরনের মৃত্যুবরণ করার বিধিনির্দেশ লিখিত আছে।

দশম অধ্যায়

জাপানীদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

জাপানী ধর্মে পিতৃপুরুষের পূজা একটি বিশেষ করণীয় কর্তব্য। চৈনিক কনফুসিয়বাদের প্রভাবে জাপানের নিজস্ব ধর্ম শিন্টোবাদে এই ধারণা প্রবেশ করেছিল। জাপানীরা এই কারণে মনে করে যে, যে ব্যক্তিরই মৃত্যু হোক না কেন সে তৎক্ষণাৎ কমি (Kami) বা দিব্যশক্তিতে পরিণত হয়।[১] সেইজন্য মৃত পূর্বপুরুষদের পূজো তাদের কাছে একপ্রকার বাধ্যতামূলক। ফলে মৃত ব্যক্তি নিয়ে তারা যতটা ব্যাপকভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে অন্যত্র তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের পর এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থা আরও নিখুঁত ও ব্যাপকতর হয়েছে।

জাপানে কারো মৃত্যু হলে অতি প্রাচীনকালে মৃতদেহকে মোয়া (Moya) বা কুটীরেই কবর দেওয়া হত। অনেকদিন পর্যন্ত তারা ঘরেই তাকে রেখে দিত। এই সময় ঘরে ধর্মীয় সঙ্গীত ও নৃত্য চলত। মৃতের উদ্দেশে নানা ধরনের প্রশংসা বাক্য উচ্চারণেরও প্রথা ছিল। এই প্রশংসাবাক্য পাঠ করতেন গৃহের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। এই সময় মৃতের উদ্দেশে ভোজেরও ব্যবস্থা হত। কোন পুরুষ ব্যক্তির এবং বিশেষ করে গণ্যমান্য হলে তার স্ত্রীবর্গ, দাসদাসী সবাই মৃতের কবরে আত্মহত্যা করত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করার পর এই ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আসে। জাপানে শবদাহ প্রথাও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেই প্রচলিত হয় (৭০৩ খ্রীঃ)। সেই সময় থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের সকল সম্রাটকেই দাহ করা হয়েছিল। দশম শতাব্দী থেকে অশৌচপালন বিধি দেখা দেয়। চতুর্দশ শতকে দেহরক্ষীদের আত্মহত্যার প্রবণতাও কমতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত আইনত তা নিষিদ্ধ হয়। তবে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে এমনতর ঘটনা ঘটতই। যেমন আজও আমাদের দেশে গোপনে এখানে সেখানে নরবলি হয় এবং সতীদাহও চলে (রাজস্থানের বর্তমান ঘটনা ১৯৮৮-৮৯ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য)। টোকুগয়া রাজবংশের আমলে শিন্টো ধর্মের রীতি অনুসারে জাপানের সম্রাটদের সমাধি দেবার প্রথা চালু হয়। এখনও সেই শিন্টো প্রথাতেই সমাধি দেবার প্রথা চালু আছে।

জাপানে যখন কোন ব্যক্তির রোগ বৈদ্যের আয়ত্তের বাইরে যেত—তখন তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা মুমূর্ষুর চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে তার শেষ জীবনসংগ্রাম লক্ষ করতেন। কেউ কেউ তার শুষ্ক ওষ্ঠ ভিজিয়ে দিতেন পাখির পালক ভিজিয়ে তাই দিয়ে। আবার কেউ তার চোখের পাতা ও ঠোঁটের উপর হাত বুলিয়ে দিতেন—যাতে তা বন্ধ হয়ে যায়। আইয়ো (Iyo) প্রদেশের শিকোকু জেলায় মৃতের আত্মাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টাও করা হয়—বিশেষ করে মৃত্যুর মুহূর্তে যদি তাকে কিছু জানানোর থাকে। তিনজন লোক ঘরের ছাদে উঠে গা ছড়িয়ে বসে উচ্চরোলে চিৎকার

---

১ Hisrory of Religion—Sergei Tokarev, p. 155-56.

করে বলতে থাকে—'ফিরে এস, আবার ফিরে এসো।' ঘরের মধ্যে কেউ যেন এ শব্দ শুনতে পায়নি এমন ভাব করে। কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য চেতনা ফিরে পায়,—এবং আরও ঘণ্টাখানেক বা ঘন্টা দুয়েক বেঁচে থাকে।

জাপানের বৌদ্ধরা কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার দেহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। তবে শিন্টো ধর্মাবলম্বীরা সর্বত্র একাজ করে না। এর পর মৃতের মুখ সাদা তুলোর বা রেশমের বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়। এসময় তারা মৃতদেহকে একটি মাদুরে শুইয়ে দেয়—শুইয়ে দেওয়া হয়—টোকো-নো-মা বা কুলুঙ্গির কাছে। যে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়—গৃহের মধ্যে সেটাই হয় সব চাইতে ভাল ঘর। মৃতের মাথা হয় উত্তর অথবা পশ্চিম মুখে রাখা হয়। তাকে শুইয়ে দেওয়া হয় চিৎ করে। তার মাথার কাছে রাখা হয় একটি আয়না ও একটি তরবারি। এগুলি রাখা হয় তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনে। প্রাক্তন সামুরাই যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই করা হত। জাপানীরা মৃতদেহের চারিদিকে পর্দা টাঙিয়ে দেয়। এই পর্দার বাইরে থাকে আটপায়া টেবিল—যার উপর মৃতের জন্য থাকে নানা ধরনের উপহার। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে টেবিলের উপর রাখা হয় মৃতের নাম খোদাই করা একটি ফলক ও নিরামিষ। একটি পাত্রে দেওয়া হয় গাজর জাতীয় জিনিস যাকে বলা হয়—শিকিমি। মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়, কোন গাছের একটি মাত্র ডাল। এই জন্য ফুলবিলাসী জাপানীরা একশাখাওয়ালা কোন ফুলের ডাল গৃহসজ্জার জন্য কখনও ব্যবহার করে না। জাপানের বৌদ্ধ ও শিন্টো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি সকলেই বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু হলেও দেহ সমাধিস্থ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা থাকে দেহের সঙ্গে সঙ্গেই। এসময় মৃতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেওয়া এবং তার শারীরিক স্বস্তির জন্য তাকে এপাশ ওপাশ ফেরানোও হয়। মৃতের সঙ্গে তখন পর্যন্তও কথাবার্তা চালু থাকে।

মৃতদেহকে পোশাক পরানো হয় প্রাচীন জাপানী প্রথায়। এর মধ্যে থাকে—তফুসাগি (কোমরে জড়ানো Apron) হাদাগি (হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো শার্ট) এবং শিতাগি (নিম্নবাস) ও উয়াগি (উর্ধ্ববাস)। আরও দেওয়া হয় ওবি (বেল্ট) ও শিতাগুতসু (জুতো)। শুভ অনুষ্ঠানের জন্য যে পোশাক পরা হয় মৃতদেহকে তেমন পোশাক পরানো হয় না কখনও। পরবর্তীকালে এসবই কফিনে দিয়ে দেওয়া হয়। বৌদ্ধদের ঘরেও অনুরূপ পোশাক থাকে। পার্থক্য শুধু শীতের ও গ্রীষ্মের পোশাকে। মৃতদেহকে পোশাক দেওয়া হয় উল্টো করে। পোশাক ভাঁজ করাও হয় উল্টো দিকে। পোশাকের নানা জায়গায় এই কথাগুলি ভিন্ন কোন কাগজে বা কাপড়ে লিখে সেলাই করে দেওয়া হয়—'নমু অমিদা বুৎসু' অর্থাৎ—'অমিতাভ বুদ্ধের গৌরব বৃদ্ধি পাক' বা 'নমু মাইও হো রেঙ্গেকিও' অর্থাৎ রহস্যময় সত্যবিধি পদ্মশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি পাক।' এই বাক্যগুলো মৃতের আত্মাকে রক্ষা করে বলে জাপানী বৌদ্ধরা মনে করে। নানা ধরনের পোশাকের সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধরা মৃতদেহকে 'ওয়ারাজি' নামে এক ধরনের খড়ের চটিও পরিয়ে দেয়। তবি (Tabi) বা মোজাও

হয় খড়ের। তবে চটি পরানো হয় উল্টো করে। মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হয় জুদাবুকুরো (Dzudabukuro) বা এক ধরনের ব্যাগ। তাতে থাকে রোকুমোনসেন নামে ছটি মুদ্রা। এই মুদ্রা দেওয়া হয় সনজুনোগাওয়া (Sandzunogawa) বা প্রেতলোকের নদী পার হবার জন্য খেয়ার ভাড়া হিসেবে। আদিতে সত্যি সত্যি মুদ্রাই দেওয়া হত, পরে দেওয়া হত ছয় টুকরো কাগজ। কাগজগুলি জাপানী মুদ্রার আকৃতিতেই কেটে দেওয়া হত। অতি আধুনিককালে একটুকরো কাগজের উপর মুদ্রার ছটি স্ট্যাম্প মেরে দিলেই চলে। তবে সব ক্ষেত্রে মুদ্রা সংখ্যা যে একই প্রকার তা নয়। ৬, ১২. ১৮, ৪৯, নানা জনে নানা সংখ্যার মুদ্রা দেয়। ব্যাগে দেওয়া হয় দূর পথে যাত্রার জন্য যে সব জিনিস প্রয়োজন তাই। থাকে শিশুকালে তার মাথা থেকে যে চুল কেটে নেওয়া হয়েছিল সেই চুল, গোঁফের কিছু অংশ, কাটা এক জোড়া নখ, দাঁত, জপের মালা, অনুমতি পত্র, তামাক খাবার নল, চিরুনী, পিন, সূচ, সুতো, নতুন কাপড় ও গামছা। তবে এসব কিছুই একটির বেশি দেওয়া হয় না কখনও। যদি স্বামী মারা যায়, স্ত্রী নিজের চুলের একগুচ্ছ কেটে স্বামীর ঝোলায় দিয়ে দেয় ; যদি মরেন পিতা সন্তানেরা এক জোড়া করে হাতের নখ কেটে এতে ঝুলিয়ে রাখে।

কোন গৃহে কারো মৃত্যু হলে বাড়ির সামনে 'কিচু' নামে এক ধরনের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় জাপানীরা যাতে যারা সে গৃহে আসবে তারা পূর্বাহ্ণেই এই অশৌচের কথা জানতে পারে। এ ছাড়া বাড়ির সামনে রাস্তায় রাখা হয় সাদা এক ধরনের টেবিল। এর উপর থাকে সাদা ঢাকনা ও একটি মাত্র পাত্র। এক ডগাওয়ালা ফুলও থাকে ফুলদানিতে। এই এক ডগাওয়ালা ফুলের গুচ্ছকে বলে শিকিমি।

কেউ মারা গেলে জাপানীদের প্রথম কাজ হল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া। সাধারণ লোকেরা জানায় গ্রামপ্রধান বা মেয়রকে। শিন্টো ধর্মাবলম্বীরা জানায় উজিগাম বেদীর পুরোহিতকে। যদি এই বেদী মৃতের গৃহ থেকে অনেক দূরে হয় তবে নিকটবর্তী কোন শিন্টো মন্দিরে খবরটি পেঁছে দিলেই চলে। অবশ্য শেষকৃত্যের ব্যাপারে শিন্টো পুরোহিতদের খুব বেশী করণীয় নেই। তারা শুধু কবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে সেই কথাটাই বলে দেয়।

তবে বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিক্ষুদের এ ব্যাপারে বিরাট একটা ভূমিকা আছে। পূর্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাদের গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। প্রাচীন অনেক বৌদ্ধ বিহারে যুকাম্বা (Yukamba) নামে এক ধরনের বাথরুম আছে যেখানে বৌদ্ধরা যুকাম (Yukam) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেত। সেখানে মৃতদেহের ধৌতি হত। ধৌতিকার্য আরম্ভ হত মধ্যরাত্রের পরে। এ সময় মৃতের নানা জিনিস ধোয়া হত। এমন কি চুল, নখ ইত্যাদি কেটে দেবারও ব্যবস্থাও ছিল। এসবই কোন এক নির্জন জায়গায় পুঁতে রাখার রীতি ছিল। মৃতদেহের দাড়ি গোঁফ চুল ইত্যাদি কাটাবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল পুরোহিতদের। মুণ্ডিতকরণ শেষ হলে ছাড়পত্র লেখা

হত। এই ছাড়পত্র একটি ব্যাগে পরপারে যাবার অনুমতিপত্র হিসেবে মৃতের সঙ্গে দিয়ে দিত বৌদ্ধরা, যা দেখিয়ে মৃতের রাজ্যে তারা বিচরণ করার অধিকার পেত।

এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই কবে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে তাও ঠিক করে দিতেন। মৃতের নতুন নামকরণও করা হত। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটলেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যাপারটা ছিল পরিবারের স্বাধীন ব্যাপার। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ঠিক করতে হত মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। তবে সব সময়ই যে এ সব বিধিনিষেধ মেনে চলা হত তা নয়। কখনও কখনও অনেকদিন পরেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ধার্য হত। অনেক সময় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাদি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কথা কাউকে জানানোও হত না। সাতদিনে সপ্তাহের বাইরেও জাপানে ছয়দিনের একটি বৃত্তের মধ্যে শুভ অশুভ দিন ঠিক করা হত। জাপানী এই ছয় দিনের নাম—সেনশো, টোমোবিকি, সেম্পু, বুৎসুমেৎসু, দইয়ান এবং শেক্কো। টোমোবিকি দিনে কখনই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হত না! মৃতের মরণোত্তর নাম হত ধর্মীয় চিন্তা থেকে। এর দ্বারা কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সে বাস করত তা জানানো হত। যেমন 'যো (Yo)' শব্দটি জো-ডো ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতই, যেমন হত 'নিচি' ও 'জেন' নিচি ও জেন ধর্মমতে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে। ভূম্যধিকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত 'কোজ', ভূম্যধিকারিণীর ক্ষেত্রে 'দইশি', সাধারণ ক্ষেত্রে 'শিনজি', সাধারণ মহিলার ক্ষেত্রে 'শিন্‌ন্যো', ছেলেদের ক্ষেত্রে 'দোজি' মেয়েদের ক্ষেত্রে 'দোনিও'। নাম খোদাই করা হত 'ইহাই' নামক ফলকে। খোদাই করা হত দুটি ফলকে। একটি ফলক থাকত মন্দিরে, একটি গৃহে। মৃত্যুর একশ দিন পরে লেকারিং করা ফলকের পরিবর্তে নাম লেখা হত সাধারণ কাঠের ফলকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রথম দিকে মৃতদেহ রাখা হত সাময়িক কোন মৃতাধারে, জাপানী ভাষায় যাকে বলা হয় 'কারিমিতা মায়া'। পঞ্চাশ দিন পরে মৃতের আত্মাকে স্থায়ী সমাধিতে রাখা হত—যাকে জাপানী ভাষায় বলা হয়—'মিতামায়া'। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, যেমন 'শিনশু' দু ধরনের মরণোত্তর নাম রাখে, পুরোহিতদের দেওয়া নাম 'কইমিও' এবং স্বর্গে অমিতাভ বুদ্ধের স্বয়ং দেওয়া নাম 'হোমিও'।

এরপরই জাপানীরা ডাকঘরের মাধ্যমে বা ভিন্ন প্রকারে বন্ধুবান্ধবদের কাছে মৃত্যুর কথা ঘোষণা করত। জাপানীদের মধ্যে এ প্রথা বেশ ভাল রকমে চালু আছে যে, মৃত্যু সংবাদ পেলে সেখানে যেতেই হয়। এবং কিছু উপহারও দিতে হয়। কিভাবে কি দিতে হবে তাও বিধিবদ্ধ। তবে বর্তমানে অন্য কোন ধরনের উপহারের পরিবর্তে টাকা দেওয়াই হয়ে থাকে। জাপানীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এতটাই ব্যয়বাহুল্য হয় যে, সেই জন্য সাধারণ মানুষও এই অর্থ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।

যথা সময়ে জাপানীরা মৃতদেহকে কফিনে রাখে। কফিনকে এরা বলে 'হিৎসুগি' বা 'কোয়ান'। শিণ্টোরা বলে 'হিৎসুগি'। কফিনও হয় দুধরনের—বসে থাকার কফিন ও শুয়ে থাকার কফিন। বসে থাকার কফিনকে বলে 'জাকোয়ান,' শুয়ে থাকা

বা ঘুমোবার কফিনকে বলে—'নেকোয়ান'। বসে থাকার কফিনে মৃতদেহকে এমন করে রাখা হয় যেন সে প্রার্থনা করছে। শুয়ে থাকার কফিনে রাখা হয় আরাম করছে এমনভাবে। কফিনের তলায় সুতোয় বোনা শাদা কাপড়ও রাখা হয়। বস্ত্রটি প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে আট হাত। এর উপর রাখা হয় শাদা 'ফুটন' বা লেপ কিংবা তোষক ('কুসুমা') বা চাদর। একটি বালিশও থাকে। এরপর কফিনের মধ্যে মৃতের আকাঙ্ক্ষিত নানা বস্তুও দেওয়া হয় এবং মৃতদেহকে এমন করে বন্ধ করা হয় যাতে সে নড়াচড়া করতে না পারে। শাতুদ্রব্যও কফিনে দেওয়া যেতে পারে। মৃতদেহকে কফিনে ঢোকানো এবং শেষকৃত্য করার মধ্যেকার সময়টুকুতে জাপানীরা মনে করে 'শব' সব কিছু দেখতে পায়। শিন্টোরা এই সময় আগে নানা অনুষ্ঠান করত, এখন করে নীরবতা পালন। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে শেষের দিন এই নীরবতা ভঙ্গ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তখন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করে। এই সময় যে স্তোত্র পাঠ করে তার নাম 'মাকুরাগিও' বা উপাধান স্তোত্র। প্রচুর সুগন্ধি ধূপও পোড়ানো হয়। আপ্যায়ন করা হয় অতিথিদেরও। বৌদ্ধ ভিক্ষুকদেরও স্বতন্ত্রভাবে আহার্যদানের ব্যবস্থা আছে। তাঁদের ভোজন শেষ না হলে সাধারণ মানুষও কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। শোকে ভেঙে পড়া হয়নি এইভাব বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝেই তখন তারা চায়ের পাত্র থেকে 'যেকি' নামে মাদক পানীয় পান করে।

কোথায় মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হবে এ নিয়ে জাপানে অনেকগুলি আশ্চর্য ধরনের রীতি আছে। যেমন পাহাড়ী গ্রাম তোসাতে মৃতদেহকে যখন মাদুরে শুইয়ে রাখা হয় তখন কেউ একজন এসে লাথি মেরে তার মাথার নিচ থেকে বালিশটা সরিয়ে দিয়ে সেটা নিয়ে যায় সমাধিক্ষেত্রে। সমাধিক্ষেত্র নির্বাচিত হবার পর চারটি মুদ্রা সে চারদিকে ছুঁড়ে দেয় এবং বালিশটাকে সেখানে ফেলে রাখে। টাকা ছড়িয়ে দেবার সময় লোকটি বলে, 'পৃথিবী-দেবতার কাছ থেকে আমি সাত বর্গ ফুট জায়গা কিনে নিচ্ছি!' আরও একটি প্রাচীন ব্যবস্থা যা অদ্যাবধি টিকে আছে তা হল এই—মৃতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তি শেষকৃত্যের স্থানে ঝাড় লাগাবে। এবং এর উপর একধরনের ঘাসের মাদুর বিছিয়ে দেবে। এই মাদুরের উপর একটি টেবিল পেতে তার উপর তৈরি করবে সাময়িক গৃহ। একে বলে 'হিমোরোগি'। 'হিমোরোগি' হল পৃথিবী-দেবতার ঘর। এই গৃহটি তৈরী করা হয়—'সাকাকি'-ডাল ও কাগজের নকশা দিয়ে। এখানে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্যও রাখা হয়। এরপর জানানো হয় নিম্নোক্ত প্রার্থনা: 'এই অঞ্চলের মহান দেবতাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অমুকের জন্য এখানে কবর তৈরি হবে। সুরা, ভাত, নুসা ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমি প্রার্থনা করছি, মৃতকে এখানে শান্তিতে শুয়ে থাকতে দেওয়া হোক। যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গেই আমি এই কথা কয়টি বলছি।'

মৃতদেহকে যখন বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, তার কাছে আবার দেওয়া হয় নানা সুগন্ধি, আলো, একবৃন্ত ফুল ইত্যাদি। এক সেট 'জেন' গ্রন্থও দেওয়া হয়। দেওয়া

হয় এক পাত্র ধান সেদ্ধ। তার সঙ্গে থাকে সুপ, দেশী নুন, একজোড়া ভাত খাবার কাঠের ও বাঁশের কাঠি। এরপরই অনুষ্ঠান শেষ। শবযাত্রা চলতে থাকে।

জাপানে শিন্টো, বৌদ্ধ ও জেন বৌদ্ধদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিম্নরূপে বিচিত্র ধরনের—

(১) শিন্টো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : শিন্টো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পাঁচভাগে বিভক্ত : (ক) মিতামৌৎসুশি বা কাঠের ফলক-এর সঙ্গে মৃতের আত্মার পরিচয় করিয়ে দেওয়া (খ) শুক্কোয়ান বা ঘরের বাইরে কফিন নেওয়া (গ) সোসো বা শবযাত্রা (ঘ) মাইসো বা কবর দেওয়া এবং (ঙ) শুচিকরণ। মোশু বা প্রধান শোকার্ত ব্যক্তিই (পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী) সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তবে ঊর্ধ্বতন পুরুষদের উপর জোর না দিয়ে এ ব্যাপারে অধস্তন পুরুষদের উপরই জোর দেওয়া হয়। মোশু পরেন কালো পোশাক। তার উপর সাদা 'হিতাতারে' বা আলখাল্লা ও মুখঢাকনা। মধ্যবিত্তেরা এক্ষেত্রে পরে ঊর্ধ্ববস্ত্র (হাওরি) ও নিম্নবস্ত্র (হাকামা)।

কাঠের ফলকের সঙ্গে আত্মাকে পরিচয় করিয়ে মিতামৌৎসুশি পর্ব শেষ হয়। প্রথম শোকার্ত ব্যক্তি এবার ফলকের সামনে বসে পড়ে দুবার মাথা নিচু করে হাততালি দেন। এবং ঘোষণা করেন যে, আত্মা ফলকে আশ্রয় নিয়েছে। একেই বলা হয় জোর্কুজি। এরপর নিম্নোক্ত নোরিতো বা প্রার্থনা করা হয় : 'হায় তুমি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছ। আমি এবং অন্যান্যরা পেছনে রইলাম। বিশ্বস্ততা সহকারে হৃদয় ভরে আমরা তোমার সেবা করব। এই মাটিতেই তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছ। এখানে যখন তোমার পারলৌকিক ক্রিয়া করতে আসব আমাদের কথা যেন তুমি শুনো। হে উন্নত আত্মা—এই ফলকে আশ্রয় গ্রহণ করে চিরদিন তুমি তোমার গৃহেই থাক। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তোমাকে প্রার্থনা জানাই।' এই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করা হয় কয়েকবার। সেই সঙ্গে মৃতের আত্মাকে ভোজে অংশ নেবার জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে শিন্টোরা। শিন্টোদের গৃহে যে দেববেদী আছে এরপর সেখানেই এই ফলকটিকে রেখে দেয়।

মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার আগে শিন্টোরা আর একবার তাকে ভোজ দেয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি এবার মৃতদেহের সামনে বসে মাথা নিচু করে হাততালি দেন। একটি নকশা করা পবিত্র গাছের ডাল উপহার দিয়ে বলেন : 'সূর্যাস্ত হলেই তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। তোমাকে উদ্বেগহীন শান্ত চিত্তে আমাদের শবযাত্রা দেখতে বলছি। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তোমাকে এ সব জানাচ্ছি।' এই কথা উচ্চারণ করে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি আবার দুবার মাথা নত করে হাততালি দিয়ে পিছিয়ে যান। এরপর সাদা পোশাক পরিহিত চার ব্যক্তি কফিন নিয়ে আসে উঠানে। উঠানে তখনও আগুন জ্বলে। এরপর নিম্নোক্তভাবে শবযাত্রা আরম্ভ হয়—প্রথম থাকে অগ্রবর্তী ঘোড়সওয়ার, পরে মশাল বহনকারী, এর পরে ঝাড়ু হাতে ভৃত্যেরা, সব শেষে শ্বেত ধ্বজাধারী। এই পতাকা হয় ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৮ বা ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত। এতে মৃতের নাম ও উপাধি লেখা থাকে। একটি বাঁশের ডগায় এটিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়

কবরক্ষেত্রে। এরপর যায় সাকাকি গাছের ডালপালা এবং তার পেছনে জিনিসপত্র সহ মৃতের সিন্দুকবহনকারী লোকেরা। আর থাকে মশালধারী। এরপরে কফিন। কফিন যদি বসে থাকার ভঙ্গিতে হয় তা নিয়ে যাওয়া হয় পাল্কী বা ডুলীতে। আর কফিন যদি হয় শুয়ে থাকার তা নিয়ে যাওয়া হয় কাঁধে। এখানে কফিনদণ্ড হয় সাদা কাঠের। এরপর যায় 'বোহিও' অর্থাৎ একটি দণ্ড, যাতে মৃতের নাম খোদাই থাকে। কবরের উপর এই দণ্ড পুঁতে দেওয়া হয় কবর চিনিয়ে দেবার প্রয়োজনে। এরপরে চলেন প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি ও অন্যেরা। সঙ্গে যায় ভোজ রাখবার টেবিল ও জিনিসপত্র।

শব নিয়ে যাওয়া হয় ঘের দেওয়া কোন কিছুতে। বড় বড় শহরে শবযাত্রার অনুষ্ঠান হয় মন্দিরে।

শবযাত্রা নির্দিষ্ট স্থানে এসে শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে থাকে। এই সময় কফিন দণ্ড স্থাপিত হয় যথাস্থানে। ফুলের পতাকার ব্যবস্থাও করা হয়। বড় একটি বেদী থাকে। পরে শবযাত্রীরা সেখানে নকশা করা নানা জিনিস ঝুলিয়ে দেয়। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি কফিন দণ্ডের কাছে এসে মাথা নোয়ান। বাজনা এবার থেমে যায়। কিন্তু পুরোহিতরা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা বেজে ওঠে।

এবার প্রধান শোকার্ত ব্যক্তির সহায়ক বসেন কফিনদণ্ডের সামান্য ডানদিকে। পুরোহিতের সহায়কেরা এবার নিয়ে আসে পতাকাদণ্ডের পতাকা এবং মৃতের ভোজটেবিলের জন্য খাদ্য। আবার বাজনা বন্ধ হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি এগিয়ে যান। তাঁর বাঁ উরুর উপরে থাকে গদা। তিনি নতুন করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেন। এই মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল—মৃতের জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, জীবিকা এবং অন্যান্য কৃতিত্বের কথা। অনুষ্ঠান শেষ করেন এই বলে ঃ 'আমাদের মাননীয় ব্যক্তি গভীর মর্মবেদনা দিয়ে চলে গেছেন। গভীর দুঃখ দিয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তিনি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকুন। কিন্তু এটা যে অনিত্য জগতের বাস্তব ঘটনা। আমাদের প্রার্থনা, তিনি শান্তভাবে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লক্ষ্য করুন এবং শান্তিতে এই কবরে নিদ্রা যান। তাঁর আত্মা যেন পেছনে থেকে আমাদের (গৃহ) রক্ষা করেন। সশ্রদ্ধ বিনয় সহকারেই এই প্রার্থনা জানাই।'

এই প্রার্থনাকে বলা হয়—সাইসো-নো-কোটোবা বা প্রতিশ্রুতি বাক্য। এই প্রার্থনা করার সময়ে উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার নতুন করে বাজনা বেজে উঠলে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি কালো আলখাল্লার উপর সাদা কামিজ পরে এবং মুখে সাদা কাপড় বেঁধে মৃতের উদ্দেশে সাকাকি শাখা দান করেন। নানা নকশা কাটা বা নকশায় জড়ানো এই শাখা দান করাকে বলে তামাগুশি (Tamagushi)। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরাও অনুরূপ কাজ করেন। কখনও বা তামাগুশির আগে কখনও বা পরে অন্ত্যেষ্টি-বক্তৃতা হয়।

এই অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হলে হয় 'মাইসো' বা সমাধি দেবার পর্ব। সমাধি দেবার সময় কখনও অনুষ্ঠান হয়, কখনও বা হয়ও না। এর পরই কয়েক মুষ্টি মাটি কফিনের উপর ফেলে দেয় সকলে। যে ফলকে মৃতের পরিচয় লেখা থাকে মাটি দেওয়া হয় তাতেও। এরপর আরম্ভ হয় শুচি হবার পালা।

শিন্টোরা অশৌচমুক্ত হয় তিনভাবে ঃ—শুচি হয়ে, গৃহশুচি করে ও 'তমাশিরো' বা স্মরক ফলকের কাছে খাদ্যাদি ও সাকাকি শাখা দান করে। এই সময় শিন্টো পুরোহিত বা মোশু নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন ঃ—'যে আত্মা এখন দেবত্ব অর্জন করেছে, তাকে বলছি ঃ দিনরাত আমি প্রার্থনা জানিয়েছি, তুমি শতায়ু হও। কিন্তু এখন তুমি এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে অন্ধকার জগতে চলে গেছ। কান্না আর শোক প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। আমরা, তোমার সমবেত আত্মীয়-স্বজনেরা যে প্রার্থনা করছি শান্ত চিত্তে তা শ্রবণ কর। নানা ধরনের খাদ্য দিয়েছি, দেখ।' এই প্রার্থনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব ভোজ্য দ্রব্য সরিয়ে নেয় লোকেরা।

শিন্টো রীতি অনুসারে মৃত্যুর পর প্রথম পঞ্চাশ দিন তমাশিরোর কাছে নিত্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। প্রতি মাসের দশ, বিশ ও ত্রিশ তারিখে এ ব্যাপারে বিশেষ অনুষ্ঠান করারও ব্যবস্থা আছে। পঞ্চম দিনে তমাশিরোকে সাময়িক বেদী থেকে সরিয়ে আত্মার স্থায়ী বেদীতে স্থাপন করে আত্মীয়েরা। এরপর সদ্য মৃতের আত্মার সঙ্গে অন্যান্য পূর্বপুরুষের আত্মারও অর্চনা হয়। এই সময় সদ্য প্রয়াত আত্মাকে পূর্বপুরুষদের আত্মার মধ্যে গ্রহণ করার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম—'সৈশি-নো-কোটোবা'। একই ধরনের প্রার্থনা মৃত্যুর একশততম দিনেও জানানো হয়। কবরের উপর যে সাময়িক পরিচয়দণ্ড পোঁতা হয়েছিল এই দিন তা তুলে নেয়। প্রথম বাৎসরিকও ভালভাবেই পালিত হয়। এরপর যার যতদিন খুশি এই বাৎসরিক পালন করে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বিত্তবান ও শক্তিমানদের গৃহেই এত নিখুঁতভাবে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান হতে পারে, সাধারণের ক্ষেত্রে নয়। তবে প্রতি শতবছরেই প্রত্যেকে একবার করে পিতৃপুরুষদের স্মৃতি চারণা করেই।

বৌদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় তার স্তরগুলি এই ধরনের—প্রথম থাকে ফুল বাহকেরা, এর পরে কৃত্রিম পুষ্পবাহক, পরে বাঁশের ডগায় চারটি কাগজের ড্রাগন (সম্ভবত বুদ্ধের সঙ্গে ভারতীয় নাগেদের নিবিড় সম্পর্কের স্মৃতি থেকেই এই ড্রাগনের ব্যবস্থা), মৃতের নামাঙ্কিত পতাকা, কোন বিহারে কর্মরত পুরোহিত বা ভিক্ষু ও তার সহকর্মী, সাদা কাগজের আলোদানি, স্বচ্ছ ফলক, সুগন্ধি দণ্ডের উপর স্থাপিত কফিন, এবং শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় খাঁচা ভর্তি পাখি নিয়েও কবরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কবরের উপরিভাগে তৈরী করা হয় স্তূপাকৃতি প্রতীক। এতে সংস্কৃত অক্ষরের মত অক্ষরে কিছু লেখা থাকে।

বৌদ্ধদের মধ্যে জেন বৌদ্ধদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরও চমকপ্রদ। জেন বৌদ্ধদের স্বীকৃত পুরোহিতকে বলা হয়—'ইন্দোশি'। তাঁর প্রধান কাজই হল মৃতের আত্মাকে পরলোকে সুস্থভাবে পরিচালনা করে নিয়ে যাওয়া। ইন্দোশির প্রথম কাজ হল—কফিনের ঢাকনার উপর 'হোসসু' (Hossu) ঝুলানো। এই হোসসু হল এক ধরনের সাদা চুল দিয়ে তৈরি ব্রাশ বিশেষ। এরপর মৃতের মস্তিষ্ক মুণ্ডনের জন্য যে ক্ষুর ব্যবহার করা হয়েছিল ইন্দোশি সেই ক্ষুরটি তুলে নেন। তুলে নিতে নিতে বলেন—'তোমার কেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফ কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রার্থনা করি প্রত্যেকটি জীব তার হিংসাবৃত্তি চিরকালের জন্য ভুলে যাক এবং মোক্ষের পথে এগিয়ে চলুক।' এই শ্লোকটি তিনি সঙ্গীতের মত করে তিনবার গান। কখনো একা, কখনোও সমবেত কন্ঠে। এরপরে তিনি যা পাঠ করেন তার অর্থ এই : 'তিন জগতের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে, তখন দয়ামায়া ক্ষমতার বন্ধন ছেদ করা সহজ নয়। যিনি এই বন্ধন কেটে নিঃশর্ত অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছেন তিনি যথার্থই মহান।' মৃতকে পাপমুক্ত করার জন্য তিনি যে প্রার্থনা জানান তা এই রকম—'হে সুবংশজাত যুবক তুমি যদি দৃঢ় আশ্রয়ে দ্রুত গিয়ে দাঁড়াতে চাও, যদি শাস্ত্র নির্দেশ মানতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমেই তোমার সকল পাপের কথা স্বীকার কর। তোমার সকল পাপ ক্ষমা পাবে। আমি যে ভাবে বলছি তুমিও বল।' এরপর পুরোহিত বা ভিক্ষু স্বীকারোক্তি পাঠ করেন। প্রতি স্বীকারোক্তির শেষে সমবেতরা হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানায়। ধরে নেওয়া হয় মৃতের আত্মাও এই স্বীকারোক্তিতে অংশ নিচ্ছে। স্বীকারোক্তি এই ধরনের—'এ পর্যন্ত আমি যত অন্যায় কাজ করেছি তার উৎস আমার কামনায়, ঘৃণায় অথবা অজ্ঞানতায়। এই পাপ জন্ম জন্মান্তর ধরেই এসেছে। এই পাপের জন্য দায়ী আমার স্থূলদেহ, জিহ্বা ও মন। আমি এ কথা স্বীকার করছি।'

পুরোহিত বা ভিক্ষু তখনও বলে চলেন—'তুমি তোমার দেহ, জিহ্বা ও মনের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছ, ফলে সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত। এখন তুমি দৃঢ়ভাবে তিনটি আশ্রয়েই দাঁড়াতে পারবে,—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। তিনটি রত্নের তিন প্রকার গুণ আছে। এই গুণ বুদ্ধের সময় যেমন ছিল এখন যে বুদ্ধ নেই তবুও তেমনই আছে। তুমি যখন এই তিন রত্নে আশ্রয় নিয়েছ তোমার ধর্ম পূর্ণ হবে।'

এরপর নতুন ধরনের আবৃত্তি হয়, যেমন—

যে বুদ্ধে আমি আশ্রয় নিয়েছি তাঁর গৌরব বৃদ্ধি পাক,
যে ধর্মে আমি আশ্রয় নিয়েছি তার গৌরব বৃদ্ধি পাক,
যে সংঘে আমি আশ্রয় নিয়েছি তার গৌরব বাড়ুক।
আমি সর্বোত্তম বুদ্ধে আশ্রয় নিয়েছি।
আমি নিষ্কলঙ্ক ধর্মে আশ্রয় নিয়েছি।
আমি সমন্বয়পন্থী সংঘে আশ্রয় নিয়েছি।
বুদ্ধে আশ্রয় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে।

ধর্মে আশ্রয় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে।
সঙ্ঘে আশ্রয় নেওয়ার আমার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই বাক্যগুলির এক একটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হবার পরই সমবেতজন একবার মাত্র করতালি দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হবার পরে করতালি দেয় দুবার।

এরপর স্বীকৃত সেই ভিক্ষু বা পুরোহিত আবার বলেন—

'এরপর তোমার গুরু হলেন তথাগত, সম্যক সত্য, সম্যক জ্ঞান। লোভকে বিশ্বাস করো না, অধর্মীর কথা শুনো না, করুণাঘন বুদ্ধ তোমাকে যে উপকার, মুক্তির আশ্বাস ও করুণা প্রদর্শন করেছেন তাতে আস্থা রাখো। এবার আমি তোমার জন্য দশটি নির্দেশ পাঠ করব।' এই নির্দেশগুলি হল—

'প্রাণ হনন করো না।
চুরি করো না।
লাম্পট্য দেখিও না।
মিথ্যে বলো না।
মাদক দ্রব্য বিক্রয় করো না।
পরনিন্দা নয়।
অপরের নিন্দা করে নিজের প্রশংসা অনুচিত।
ধর্মের উপহারে বিরক্ত হয়ো না।
ক্রুদ্ধ হয়ো না।
ত্রিরত্ন সম্পর্কে নিন্দা কদাচ নয়।'

এরপর ভিক্ষু বলেন 'এই দশটি নির্দেশ বুদ্ধ স্বয়ং দিয়েছেন এবং এগুলি পিতৃপুরুষদের হাত দিয়েই আমাদের কাছে এসেছে। আমি এখন তোমাকে দিচ্ছি। তোমার যুগযুগান্তরের বিভিন্ন সত্তায় এগুলিকে সযত্নে রক্ষা কর। জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁরা বুদ্ধের নির্দেশ পালন করেন, তাঁরা বুদ্ধের সঙ্গে একই সারিতে স্থান পান। পূর্ণ জ্ঞানীর সমান স্তরে যিনি আছেন, তিনি সত্যই বুদ্ধের পুত্র।'

এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করার পর দুবার কাঠের ঘণ্টা বাজানো হয় এবং তিনবার বেল। এরপর সমবেত ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা 'দইহিশু' নামে পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন। একজন (প্রথম দিনে যিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন তিনি বাদে) পুরোহিত এটা আবৃত্তি করার পরই আর একজন তা বলতে থাকেন 'এই জ্ঞানগর্ভ দইহিশু গীত হবার পরে এই সঙ্গীতের পুণ্যফল তার উপর (যে ব্যক্তি মারা গেছে) বর্তাক। কাফনে এই দেহ যখন আমরা দিচ্ছি, সম্ভোগভূমি তাকে গ্রহণ করুক।'

সমবেত অন্যান্য ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা তৎক্ষণাৎ গেয়ে উঠেন: ত্রিলোকের দশদিকে দশবুদ্ধ, সকল বোধিসত্ত্ব এবং মহাসত্ত্ব এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা, সম্ভোগ-কান্নার জগৎ।'

পূর্ববর্তী পুরোহিত বা ভিক্ষু আবার বলতে থাকেন: 'আমরা যদি এ-সব জিনিস

নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝবে জীবন ও মৃত্যু একে অপরকে অনুসরণ করে, যেমন শীতের পর আসে গ্রীষ্ম। নিবিড় আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মত তাদের যাতায়াত। বিদায় হল সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের শেষ হয়ে যাওয়া। আজ অকস্মাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছ। এটা ঘটেছে বর্তমান দেহে প্রাক্তন কর্মফল শেষ হয়েছে বলে। তুমি বুঝতে পারছ, নানা উপাদানে গঠিত দেহ এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বুঝতে পারছ জীবন শেষ হওয়া মানে পরম আশীর্বাদ। এখানে যে পবিত্র সমাবেশ হয়েছে তারা সাধুসন্তদের নাম উচ্চারণ করবে। তাদের এই নাম উচ্চারণের শুভফল নির্বাণের দিকে তোমার পথকে অলংকৃত করবে।' এরপর তিনি যে শ্লোক উচ্চারণ করেন, তা হল এই ধরনের :—

'বৈরোচন হলেন পবিত্র ধর্মকায়ার বুদ্ধ।
বুদ্ধের নির্ভেজাল সম্ভোগকায়া হলেন রোচন।
শাক্যমুনিরূপে বুদ্ধের নির্মাণকায়া অসংখ্য।
আমরা অপেক্ষা করছি মহান মৈত্রেয় বুদ্ধের জন্য।
দশদিক ও ত্রিলোক সর্বত্রই রয়েছেন বুদ্ধ।
মহাযান সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র।
মহার্ঘ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব।
মহাযান সমন্ত ভদ্র বোধিসত্ত্ব।
মহাকারুণিক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব।
মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা।'

এরপরই বুদ্ধের প্রতিমূর্তির পূজাসংক্রান্ত মন্ত্র পাঠ করা হয়। এবার এই মন্ত্র পাঠ করেন মাত্র একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত, যেমন, 'এই বিজ্ঞব্যক্তির জন্য পবিত্র নানা বুদ্ধসত্তার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, সূত্র পাঠ হয়েছে। এই নাম উচ্চারণের পুণ্যফল মৃতের উপর বর্তাবে, সম্ভোগ জগতে তাকে অলংকৃত করবে। এই প্রার্থনা আত্মাকে পবিত্র সীমার বাইরে নিয়ে যাবে (নির্গুণে, নির্বাণে)। নিয়ে যাবে এই কারণে যে, যাতে মৃতের কর্মফল শেষ হয়, উন্নত পদ্মের দল খুলে যায় এবং বুদ্ধ তাঁকে জীবনের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করতে পারেন।' এই বাক্য উচ্চারণ করার পর আবার সমবেতজনকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলা হয়। সকলে তখন উচ্চারণ করে—'ত্রিলোক ও দশদিকে সকল বুদ্ধ, সকল বোধিসত্ত্ব ও মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা।' এরপর প্রধান ভিক্ষু বা পুরোহিত, যাঁকে বলা হয় ইন্দোশি—তিনি পাঠ করেন—'এবার আমরা পবিত্র কফিন তুলে ধরব, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু করব। সমবেত জনগণ মৃতের আত্মা যাতে নির্বাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য মহাপুরুষদের নামকীর্তন করুন।

প্রধান পুরোহিতের এই বাক্য উচ্চারণের পরই গৃহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্ব শেষ হয়। এবার বাইরে চলে শবযাত্রার আয়োজন। সকলে কোন বৌদ্ধ বিহার বা সমাধিক্ষেত্রের দিকে চলতে থাকে।

মন্দিরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুসরণে এইভাবে যখন শব নিয়ে যাত্রা শুরু হয়—তখন শবযাত্রীরা এগিয়ে চলে কোন মন্দিরের দিকে। শবযাত্রাকে স্বাগত জানাবার জন্য কিছু ব্যবস্থাও করা হয়। মন্দিরে এ সময় বেল বাজতে থাকে—যতক্ষণ না শবাধার প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। মন্দির চত্বরে চতুর্দিকের জন্য তৈরি করা হয় চারটি কাঠের প্রবেশপথ। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের উপর লেখা থাকে এই শব্দগুলি, যেমন, (১) হোসশিম্মোন বা আত্ম জাগরণের পথ, (২) শুগিয়োমোন বা ধর্মাচরণের পথ (৩) বোদাইমোন বা বোধির পথ এবং (৪) নেহাম্মোন বা নির্বাণের পথ। এই প্রবেশপথগুলি হল প্রতীকী পথ যা আত্মাকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করে। কফিন নিয়ে তিনবার করে এই প্রবেশপথগুলি পরিক্রমা করা হয় এই বোঝাবার জন্য যে, নির্বাণের জন্য চারটি পথই প্রয়োজনীয়। অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান এর পর মন্দিরের ভেতরে বা প্রাঙ্গণেও হতে পারে।

কফিন নিয়ে যখন প্রবেশপথগুলি পরিক্রমা চলতে থাকে, তখন একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত মন্দিরের ঢুকে পাঠ করেন 'ধারণী' বা গুহ্যমন্ত্র। বৌদ্ধ জেনরাও এই পদ্ধতিকে পূর্ববর্তী চৈনিক প্রথার জাদুমন্ত্র অপেক্ষা বেশি উপযুক্ত বলে মনে করে। এরপর সমবেত শবযাত্রীরা একে একে আসন নেন। বাজনা ও মন্ত্র উচ্চারণ থেমে যায়। প্রধান ভিক্ষু 'ইন্দো' বা পরলোকের পথনির্দেশক মন্ত্র পড়েন। আর একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত বলতে থাকেন—'আজ এই মৃত ব্যক্তি জীবনের সকল কারণ নিঃশেষিত করে নির্বাণত্ব লাভ করেছেন, এখন এঁকে সমাধিস্থ করা হবে। সমবেত ভিক্ষু বা পুরোহিতদের এইজন্য অনুরোধ, তাঁরা যেন বোধিলব্ধ ব্যক্তির আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন।'

এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারি বেঁধে ভিক্ষুরা দাঁড়িয়ে প'ড়ে আবৃত্তি করতে থাকেন : 'এই জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য পবিত্র নামগুলি উচ্চারণ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাবান আত্মাকে সাহায্য করাও বাদ পড়েনি। প্রার্থনা করা যাক যে, জ্ঞান-দর্পণের আলো এর উপর ছড়িয়ে পড়ুক। সত্যের বায়ু তার মহিমা এই ব্যক্তির উপর ছুঁইয়ে যাক। বোধি-উদ্যানে জ্ঞানের ফুল ফুটে উঠুক। বাস্তব সত্যের সমুদ্রের ঢেউ এর পাপ ধুয়ে মুছে নিক্। নির্জন মেঘাচ্ছন্ন পথে একে সাহায্য করার জন্য তিন কাপ চা ও সুগন্ধি দিচ্ছি। সন্তাত্মারা একত্রে সমবেত হোন।'

এই আবৃত্তি শেষ হতেই সমবেত সকলে 'রাইওগোনশু' পাঠ করেন। এরপর শুধু ভিক্ষু বা পুরোহিতই বলেন—'এর জন্য মহাত্মাদের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। সূত্রও আবৃত্তি করেছি। এরফলে যে পুণ্য অর্জিত হয়েছে তা সমাধিকালে সদ্য মৃতের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর সম্ভোগজগৎ অলংকৃত করুক।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপস্থিত ভিক্ষু বা পুরোহিতরা বলে ওঠেন : 'দশদিক ও ত্রিলোকের সকল বুদ্ধ' ইত্যাদি। তাদের বলা শেষ হতেই একটি ছোট বেল, করতাল,

আর ঢোল, একসঙ্গে তিনবার বেজে ওঠে। সমাধি দেবার জন্য তখনই কফিন তুলে নেয় সকলে।

সমাধির সময় আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হয় না। মৃতের উত্তরাধিকারী বা নিকট আত্মীয় কাছে এসে কফিনটিকে শুধু নামিয়ে দেন। সব পতাকা কফিনের উপর নামিয়ে রাখা হয়। উপস্থিত আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেই এক মুঠো বা এক কোদাল মাটি সমাধির উপর ফেলে দেন। এরপরই সমাধির মুখ বুজিয়ে দেওয়া হয়।

শিঙ্গোনদের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান ঃ জাপানের শিঙ্গোনরা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যথার্থ অর্থ উদ্ধার করা রীতিমত কষ্টকর, কারণ তারা সবকিছুই করে নানা ইঙ্গিত ও মুদ্রার সাহায্যে। বিকৃত সংস্কৃতে এমন কিছু গুহ্য মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয়, যে সংস্কৃত বোঝা দায়। কিছু কিছু ক্রিয়া অত্যন্তই গুহ্য এবং আড়ালে তা করা হয়। জাপানে বৌদ্ধদের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে শিঙ্গোন সম্প্রদায়ই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ। এরা শুধু যে জাপানের শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে তাই নয়,—আলেকজান্দ্রিয়ার নোস্টিকদের কার্যকলাপের সঙ্গেও এদের কার্যকলাপের মিল আছে। ইহুদীদের কাবালার সঙ্গেও এদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

গৃহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গৃহেই অস্থায়ী প্রার্থনা-স্থান তৈরী করে নেয় এরা। যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়—প্রধান ভিক্ষু বা পুরোহিত,—যাঁকেও বলা হয় 'ইন্দোশি',—তিনি কফিনের দিকে দীর্ঘ হাতলওয়ালা একটি হাতাতে ধূপ নিয়ে এগিয়ে যান আর মাথা নোয়ান। এরপর প্রার্থনার জন্য নির্মিত একটি উচ আসনে গিয়ে বসেন, যার নাম রেইবন। এক ধরনের তরল সুগন্ধি দিয়ে তিনি হাত ঘষেন, যার নাম জুকো (dzuko)। এখানে কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্নও থাকেন। ধ্যানের বিষয়ে তিনটি গুহ্যতত্ত্ব—ধারণী, অনুষ্ঠান ক্রিয়া ও উপদেশ। এরপর চলে মৃতের দেহ, মুখ ও হৃদয় শুদ্ধ করা। শুদ্ধ করা হয়—বুদ্ধের জগৎ, পদ্মের জগৎ ও রত্নের জগৎ। তারপর চলে মৃতের দেহে অধ্যাত্ম বর্ম পরিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি ধ্যানের সঙ্গে চলে গুহ্যক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। এই পর্ব শেষ হয় এক ধরনের সুগন্ধি জলের উপর ধ্যান করে। যাকে বলা হয়—'কজিকোসুই'। সুগন্ধি জল দ্বারা বোঝায়—তথাগতের করুণা যা জীবের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এরফলে পূজারী ও বুদ্ধের হৃদয় এক সমতলে এসে উপস্থিত হয় শিঙ্গোনরা এমতই বিশ্বাস করে।

এবার অনুষ্ঠানে পরিচালক নানা বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। প্রথম যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় তার নাম বিশ্বাস, যার ফলে বোধির দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। সঙ্গে থাকে ধারণী। পুরোহিত বা ভিক্ষু তখন কতকগুলি মুদ্রা করেন। এর দ্বারা আহ্বান করা হয় জগৎ ও অনুপরমাণুকে। নৈর্ব্যক্তিক জগৎকে আহ্বান করে তিনি ব্যক্তি-জগতে চলে যান। চলে যান পঞ্চবুদ্ধের কাছে ও অমরত্বদানকারী অমিতাভ

বুদ্ধের নিকটে। অমিতাভের সঙ্গে থাকে অবলোকিতেশ্বর ও মহাস্থানপ্রাপ্ত। ধরে নেওয়া হয়, তাঁরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে মৃতের আত্মাকে সানন্দস্বর্গে প্রবেশ করান। এই আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হলে—পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের মন্ত্র তিনবার করে পাঠ করা হয়, যাকে বলে—'কোমিওশিঙ্গোন'। এরপর আরও নিম্নতলের দেবতাদের ডাকা হয়, যেমন—ক্ষিতিগর্ভ। ক্ষিতিগর্ভ হল ছয় ধরনের মৃতদেহরক্ষাকারী দেবদূত। এর পর আহ্বান জানানো হয় অন্যান্যদের, যেমন, বিদ্যারাজ, মহাতেজ, বজ্রযক্ষ, কুণ্ডলি এবং ত্রিভববিজয় প্রভৃতি। ক্ষিতিগর্ভদের মন্ত্র হল 'কককবি-সময়ে-ই অবিরউনকেন সোবাক।' এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তিনবার। এরপর উচ্চারণ করা হয় ফুডো মাইও-ও। এই মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয় বার তিনেক। এই ধরনের আরও কিছু মন্ত্র পাঠ চলে। এই সংস্কৃত শব্দগুলির যে অর্থ কি, আজ তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

এরপর তিন ধরনের মুদ্রা দেখানো হয়। এই মুদ্রাতে রয়েছে বৈরোচনের তিনক্রিয়ার প্রচার—যেমন, ধর্মকায়া, সম্ভোগকায়া ও নির্মাণ কায়া। তিনটি অক্ষর 'অ-বম-উন' (সম্ভবত সংস্কৃত ওঁ, বা অ-উ-ম) উচ্চারণ করে বৈরোচনের ত্রিত্ব বোঝানোর চেষ্টা চলে। এরপর আলংকারিক অর্থে স্তূপ খোলা ও বন্ধ হয়। সম্ভবত এর ইঙ্গিত রয়েছে সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের প্রতি। এবার আর এক ধরনের মুদ্রা করা হয়, যাকে বলে 'অভিষেক' অর্থাৎ ফুডো-মাইও-ও-র অভিষেক। তিনবার উচ্চারণ করা হয় 'নমুবস'। এই তিনবার উচ্চারণ দ্বারা বোঝায়—ধর্মকায়া, সম্ভোগকায়া এবং নির্মাণ কায়া (এঁরাই সম্ভবত ফুডো-মাইও-ও)। এই তিন কায়ার জন্য পড়া হয় তিন মন্ত্র—'অন বন রন কন কেন, অবিরউনকেন এবং অরহসনো।' ফুডো ক্ষিতিগর্ভের মত তার কর্মপদ্ধতিও ছয় প্রকার। প্রজ্ঞার জগতে ছয়টি স্তরে তিনি কাজ করেন। এর জন্য যথোপযুক্ত মুদ্রাও রয়েছে। এর জন্য যে মন্ত্র রয়েছে সে মন্ত্র, হল অবিরউনকেন। সঙ্গে রয়েছে গুহ্য কলা যা লিপিবদ্ধ করা চলে না কিন্তু সঠিকভাবে অগ্নি ধ্যান করলেই পাওয়া।

এইভাবে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে দেবতাদের আহ্বান করার পর, যার জন্য এই আহ্বান করা তাঁর একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলে। এজন্য চার ধরনের মন্ত্র পাঠ শুরু হয়। এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য এই বুঝিয়ে দেওয়া যে, দেহ (রূপধর্ম) চিত্ত (চিত্তধর্ম) এবং দেহ ও চিত্ত একত্রে ধারণ করা হয়েছিল কেন। দেহ ও চিত্ত অভিন্ন কিছু নয়। পরে ধর্মধাতু অর্থাৎ বিশ্বজগতের উপরও ধ্যান করা হয়। এজন্য যে মন্ত্র বা ধারণী পাঠ করা হয় তা হল—'ওঁ, মৈত্রেয় স্বাহা' শিঙ্গোনরা অন্যান্য বুদ্ধ অপেক্ষা বুদ্ধ মৈত্রেয়-এর উপরই বেশী নির্ভর করে। তাঁরা মনে করে যে, জাপানে এই ধর্মের প্রচারক 'কোবো দইশি' অক্ষত অবস্থায় সমাধিতে মৈত্রেয়-এর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর সমাধি রয়েছে 'কোয়াসান-এ'। এইজন্য শিঙ্গোনরা তাদের মৃতদেহের অস্থি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর প্রায়শই 'কোয়া-সান'-এ পাঠিয়ে দেয়, যাতে করে পুনরুত্থানের

সময় 'কোবো'-এর কাছাকাছি থাকা যায়। পুনরুত্থানের ঘটনা ঘটবে তখন যখন মৈত্রেয়-এর আবির্ভাব ঘটবে।

এইবার মুখ্য ভিক্ষু বা পুরোহিত তিনবার উপস্থিত দেবতাদের উদ্দেশে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন ও সুগন্ধি দান করেন। তিনবার বেল বাজিয়ে এক ধরনের বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করেন, যেমন—'সমস্ত উপস্থিত বুদ্ধের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি তাতে আশ্রয় নিচ্ছি। সকলে আমার উদাহরণ অনুসরণ করুন। আমি ধর্মে আশ্রয় নিচ্ছি। সকলে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি সঙ্ঘে আশ্রয় নিচ্ছি, সকলে আমাকে অনুসরণ করুন। তথাগতের দেহসৌন্দর্যের তুলনা নেই। তথাগত শাশ্বত রূপের অধিকারী। ধর্মও চিরন্তন। গভীর শ্রদ্ধা আমি মহাবৈরোচন, তথাগত এবং শিঙ্গোন বৌদ্ধধর্মের প্রচারকে আরোপ করছি। বজ্রধাতু ও গর্ভধাতুভুক্ত সকল সাধুসন্তদেরও স্মরণ করছি। বিশেষ করে স্মরণ করছি শাশ্বত আনন্দজগতের অধিকর্তা অমিতাভ ও করুণাময় মৈত্রেয়কে, যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। পবিত্র 'কোবো দইশি', যিনি পদ্মাসনে গভীর ধ্যানে বসে আছেন তাঁকেও স্মরণ করি। ভারত চীন ও জাপানে ধর্মের আলো যাঁরা ছড়িয়েছেন সেই মহান আচার্যদের স্মরণ করি। আর স্মরণ করছি সেই সকল দেশের মহান পুরুষদের যাঁরা বুদ্ধের দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ ও ত্রিরত্নের করুণাপ্রাপ্ত।

যে মুহূর্তে ইচ্ছার তাড়নায় দিব্য শান্ত আকাশে চন্দ্রালোক ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তকে ধ্যান করি (স্থির প্রকাশকে ?), বর্ণের উৎসকে (যা এখন আর নেই) যা ফুল হয়ে অনন্তে ফুটে আছে, সেই উৎসকে স্মরণ করি।

আবির্ভাব হল অনাবির্ভাব।
অদৃশ্য হল অনদৃশ্য।
অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয়েই অলভ্য।
তারা নামহীন।

মৃত ব্যক্তি জীবনের কারণ (কর্মফল) শেষ হলে ভিন্ন জগতে চলে গেছেন। তিনি জম্বুদ্বীপ (ভারত চীন ও জাপান)-এ দেহরক্ষা করেছেন এবং অন্তরীক্ষে বা অন্তর্ভব-এ প্রবেশ করেছেন। এবার দশগুণের অধিকারী শাক্যরাজ্যের (বুদ্ধ) বিধান অনুসারে সজল নেত্রে আমরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করছি। পবিত্র বেদী তৈরি করেছি। আমাদের প্রার্থনা অনুসারে তথাগত সেখানে অবতরণ করবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করব মৃতের আত্মা যাতে মহাত্মাদের দ্বারা গৃহীত হয়ে মুক্তি লাভ করে। পবিত্র অগ্নি তৈরি করেছি যা ষড় উপাদানের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এখানে তাঁর শেষকৃত্য করছি যার বাস্তবিকই কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রার্থনা করি, সকল বুদ্ধ তাঁকে ছাড়পত্র দিন, সকল সন্তব্যক্তি তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁরা যেন মৃতকে মহান পদ্মদন্তের কাছে নিয়ে যান। বৈরোচন ও অমিতাভ বুদ্ধ তাকে বুদ্ধত্ব দান করুন। ধর্মধাতুর সকল

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি একই প্রকারে উপকৃত হোন। আমি সশ্রদ্ধভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করছি।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান অর্থাৎ শব সমাহিত করার অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'হাইওহাকু' অর্থাৎ 'বিশ্বাস প্রকাশ'। এরপর 'জিমবুন' শিংগিও বা 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র' আবৃত্তি করা বা গাওয়া হয়। এটা করা হয় সমবেত অন্যান্য আত্মাদের আনন্দ দেবার উদ্দেশে। এই আনন্দ পেলে তাঁরা বেদীতে অবতরণ করেন শিঙ্গোনরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে।

'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র' আবৃত্তি হবার পর একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত বলেন ঃ—'যে প্রাঙ্গণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় সেখানে পাপ নষ্ট হয়ে পুণ্য স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। এই হল মৃতের শান্তির জগতে ঊর্ধ্বগতি লাভ করার সময়। পরলোকের অধীশ্বর যম ও তাঁর পাঁচজন কর্মচারী এখানে আসবেন। সুতরাং প্রার্থনা জানাচ্ছি, তেরজন মহান বুদ্ধ পরলোকের বিভিন্ন কর্মচারী এবং তাঁদের সঙ্গীসাথীরা মৃত ব্যক্তিকে কর্মনাশ করে পূর্ণ বোধি লাভ করতে সাহায্য করবেন।'

সমবেত সকলে এক সঙ্গে তখন বলে ওঠেন—'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্রকে প্রণাম করি।' পুরোহিত বলেন—মৃতের আত্মা দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত সুসজ্জিত পুষ্পময় স্তরে আরোহণ করুক। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ 'মহান বুদ্ধ বৈরোচনকে স্মরণ করি।' এরপর আর একবার বেল বাজে।

পুরোহিত তখন বলেন,—'মৃতের আত্মা এমন জগতে যাক যেখানে কোন ব্যক্তি ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বোধ করেন না। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'অমিতাভ বুদ্ধকে স্মরণ করি। অবলোকিতেশ্বরকে স্মরণ করি।' আবার বেল বাজে।

পুরোহিত বলেন—'মৃতের আত্মা তুষিত লোকে বাস করুক এই আকাঙ্ক্ষা জানাই।

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'মৈত্রেয় বুদ্ধকে স্মরণ করি। তাঁর বৃত্তের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের অন্যান্য সন্তদেরও শ্রদ্ধা জানাই।' আর একবার বেল বেজে ওঠে।

পুরোহিত বলেন—'বুদ্ধের জগতে যাঁরা যেতে চান তাঁরা সকলেই সেখানে চিরকাল প্রবেশাধিকার লাভ করুন এই কামনা করি।'

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'ত্রিরত্নের জয় হোক।' আবার একবার মাত্র বেল বাজে।

পুরোহিত বলেন—'যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করছি, তাঁর সঙ্গে সকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সমান কল্যাণ হোক।'

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'ধন্য অবলোকিতেশ্বরের নাম, ধন্য বজ্রপাণির নাম।' আর একবার বেল বাজে।

এইবার পুরোহিত তার ধূপদানি নামিয়ে রেখে হাতে দণ্ড তুলে নেন। তারপর বলেন—'নানা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব যাঁদের আমি নত মস্তকে অর্চনা করছি, তাঁদের জানাই, পবিত্র এই মৃতের আত্মা শান্তির জগতে পুনর্জন্ম লাভ করুক। অতীন্দ্রিয় শিক্ষাবেদীতে এই যে সুসজ্জিত অবস্থায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাতে যেন মুহূর্তে বুদ্ধত্ব

লাভ হয়। বুদ্ধের শিক্ষার কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্থূলদেহ বুদ্ধের সঙ্গে এক হয়ে যায়। মহান বুদ্ধেরা বৌদ্ধতত্ত্বের বোধি বৃদ্ধি করুন··· ।'

পুরোহিতের এই প্রার্থনার পর স্থানান্তরিত করণের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। পুরোহিত হাতের দণ্ড নামিয়ে রেখে পুনরায় ধূপদানি তুলে নেন। আর একবার বেল বেজে ওঠে। শুধুমাত্র একবার। পুরোহিত বলেন—'তিনটি শাশ্বত রত্নকে পূজা করি। বুদ্ধ তথাগতের প্রশংসা করছি—যিনি জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তের বাইরে নির্বাণ লাভ করেছেন। যদি কেউ তাঁর (বুদ্ধের) কথা মন দিয়ে শ্রবণ করে তাঁর হৃদয় বর্ণনাতীত আনন্দে পূর্ণ হবে। বহু উপাদানে গঠিত সব জিনিসই ক্ষণস্থায়ী। এরই মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ। আবার তারা জীবন ফিরে পায়। আবার তারা ধ্বংস হয়। সব কিছুর নিঃশেষ ধ্বংসই হল স্বয়ং শান্তিস্বরূপ।' এই কথা বলে পুরোহিত 'রিশুকিও' বা বুদ্ধিসূত্র পাঠ করেন। গৃহ থেকে মন্দির পর্যন্ত পুরোহিতগণ 'ফিডো'র উপর ধ্যান করেন এবং তাঁর মন্ত্র পাঠ করেন।

মন্দিরের অনুষ্ঠানঃ প্রত্যেক শিঙ্গোন মন্দির বা সমাধি চত্বরের প্রবেশ পথেই ছয়টি ক্ষিতিগর্ভের মূর্তি দেখা যায়। এরাই হলেন মৃতের বন্ধু, ও রক্ষাকর্তা। এঁদের এবং এঁদের সঙ্গে ছজন অবলোকিতেশ্বরের পূজা দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকটি শিঙ্গোন-মন্দিরেই অগ্নি-বেদী আছে। পুরোহিতেরা মন্দিরে প্রবেশ করেই তিনবার এই অগ্নিবেদী প্রদক্ষিণ করেন। পাঁচটি মৌলিক রঙের প্রতীক হিসেবে তাঁরা পাঁচ ধরনের মুদ্রা ও গুহ্যমন্ত্র আওড়ান। তারপর নরক ভেঙে ফেলে অধ্যাত্ম বর্ম পরিধান করেন। পরে মন নিবিষ্ট করেন বোধি ও ফুগেন (সামন্ত ভদ্র)-এর উপর। ফুগেন হলেন সত্যের পৃষ্ঠপোষক। এই অনুষ্ঠানের শেষ ধারণী হল —'ওঁ সম্ময় সত্তোবন।'

এর পরই মন্দিরের মধ্যভাগে বা কেন্দ্রস্থলে হয় অভিষেকপর্ব, জাপানী ভাষায় যাকে বলে 'কোয়ানজো'। এখানে পবিত্র জল ছিটিয়ে এক ধরনের নবধর্মকরণ হয়। এটি একটি গুহ্য ক্রিয়া। পরে মৃতের উদ্দেশে তা চালনা করে দেওয়া হয়। অভিষেক হয় তিন ধরনের। এতে পরলোকে আত্মাকে পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ থাকে। জেন বৌদ্ধরাও এমনই করে। শিঙ্গোনদের ক্ষেত্রে এ সবকিছু লিখিত নেই। এই গুহ্য প্রক্রিয়া 'কোবো দইশি' প্রচলিত করেছিলেন। যুগে যুগে এই গুহ্য প্রক্রিয়া গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। প্রত্যেক শিঙ্গোন পুরোহিতই যে এই প্রক্রিয়া জানেন তা নয়। এই গুহ্য প্রক্রিয়া করার পর 'দইনিচিকিও' অর্থাৎ মহাবৈরোচনা-ভিসম্বোধি' সূত্র পাঠ হয়। এটিও এক ধরনের গুহ্য প্রক্রিয়া। এতে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তা এই রকম—'এই দেহত্যাগ না করেও অনেকে অতীন্দ্রিয় শক্তি 'জিনকিওৎসু' অর্থাৎ ঋদ্ধিপাদ অর্থাৎ জাদুক্ষমতা লাভ করতে পারে, মহাশূন্যে বিচরণ করে দেহতত্ত্ব অবগত হতে পারে।

এরপর পাঁচবার অবিরউনকেন অর্থাৎ অগ্নি ধ্যান করেন। বুদ্ধের অনুকরণে মুদ্রা ও মন্ত্র পাঠ করা হয়। ছয়টি উপাদান যা দিয়ে এই দেহ গঠিত সে জন্য ছয়টি

মন্ত্রপাঠ ও মুদ্রার ভঙ্গী করা হয়। এই উপাদানগুলি হল—ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম ও চিৎ (মন)। এই অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির নানা কার্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়। এরপর আরও নানা ধরনের মন্ত্র পাঠ করা হয়। আবার 'একো' নামে গুহ্য ক্রিয়া করে পুরোহিতেরা অনুষ্ঠানের সমস্ত পুণ্য মৃতের আত্মার উদ্দেশে চালনা করে দেয়। মৃত্যুর ছায়াজগতে চলার জন্য মৃতের উদ্দেশে একটি যষ্টিও দেওয়া হয়। এরপর অলিখিত আরও অনেক মন্ত্র পাঠ করা হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি গুহ্য প্রক্রিয়া এবং মুদ্রাও করা হয়। তারপরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ।

টেনডাইদের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : টেনডাইরা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যে বিশ্বাস করে। চীনে যখন এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তখন সুই ও টাঙ্ সরকারকে এরা সমর্থন করত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। এই সম্প্রদায় জাপানে আত্মপ্রকাশ করে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে আইয়েয়াসু (Iyeyasu) যখন জাপানে শান্তি আনেন টেন্ডাইরা তখন জাপানের ধর্মীয় নীতি নির্ধারণে বিরল ভূমিকা নিয়েছিলেন। টোকুগাওয়া-যুগ ধরে সমগ্র জাপানে এদের প্রাধান্য ছিল।

গৃহে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : অটোগী বা জাগরণ পর্ব : এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ত্রিরত্নকে পুজো করে। প্রধান পুরোহিত এই বলে আরম্ভ করেন—'আমি ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করছি। সমগ্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে শাস্ত্রগ্রন্থের কোষাগারে প্রবেশ করুন এবং সমুদ্রের মত বিশাল জ্ঞান লাভ করুন। আমি সংঘে আশ্রয় নিচ্ছি। সমগ্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে ধর্মবীথিতে আশ্রয় নিন।'

এর পরই কতকগুলি নির্দেশাত্মক স্তোত্র পাঠ করা হয়—শাক্য যুগের পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ যে শিক্ষা দিয়েছিলেন এর বিষয়বস্তু সেইগুলি। যেমন—'প্রার্থনা জানাই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকুন। তাঁরা শুভকর্ম করুন ও নিজেদের মনকে পবিত্র রাখুন। সকল বুদ্ধ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। সৎ-আত্মাদের প্রণাম করি।' তারপরই সন্ধ্যাস্তোত্র আরম্ভ হয় : 'সন্ধ্যার রূপের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করুন। যখন এই ক্ষুদ্র দিন শেষ হবে—আমাদের জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমরা অদৃশ্য হয়ে যাব। আমরা এখানে স্বল্পজলে মাছের মতন। হে ভিক্ষু, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস কি আছে যা আনন্দদায়ক? দক্ষতা সহকারে নিজেকে প্রয়োগ কর, অগ্নির দাহ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে সময়ের অপব্যবহার বন্ধ কর। বস্তু-বিষয়ে অস্থায়িত্ব কল্পনা কর। এগুলি শূন্যের মত ফাঁকা। সুদক্ষ হও, আলস্য ত্যাগ কর।'

এবার আরম্ভ হয় অস্থায়িত্ব সম্পর্কে স্তোত্র পাঠ : 'নানা উপাদানে গঠিত সকল বস্তুই অস্থায়ী, কারণ তারা বৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের অধীন। তাঁরা অস্তিত্ব লাভ করে ধ্বংস

হয়ে যায়। এই অস্তিত্ব হারানো আশীর্বাদস্বরূপ। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণত্ব লাভ করে জীবন ও মৃত্যুকে জয় করেছেন। যারা হৃদয় মন দিয়ে এই শিক্ষার কথা শ্রবণ করবে—তারা অপরিসীম আনন্দ ভোগ করতে পারবে।'

ছটি 'জন্য' : এরপর টেন্ডাই বৌদ্ধরা বুদ্ধের জন যে ছটি মন্ত্র উচ্চারণ করে তার নাম ছটি 'জন্য'। এগুলি এ ধরনের :

(১) 'আসুন দশদিকে সকল বিশ্বাসীর জন্য তথাগত শাক্যমুনিব ধ্যান করি।' এই বাক্যটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বেল বেজে ওঠে।

(২) 'আমাদের মহান সম্রাটের জন্য আসুন আমরা ইয়াকুশি রুরিকো নোরাই'-এর উপর ধ্যান করি।' একটি বেলধ্বনি।

(৩) 'ত্রিলোকে তিনটি উপকারের জন্য আসুন আমরা অমিতাভ নিওরাই-এর উপর ধ্যান করি।' একটি বেলধ্বনি।

(৪) 'আমাদের মহান শিক্ষক দেনগিও দইশি ও মহাত্মাদের জন্য আসুন আমরা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র ধ্যান করি।' একটি বেলধ্বনি।

(৫) 'সকল দেবতার জন্য আসুন আমরা মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ধ্যান করি।' বেলধ্বনি।

(৬) 'ধর্মধাতুতে সকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জন্য আসুন আমরা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর উপর ধ্যান করি।' একটি বেলধ্বনি।

চারটি সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ—

ছয়টি 'জন্য'-এর প্রয়োজনে উপরোক্ত স্তোত্রের বাইরেও পাঠ করা হয় চারটি সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণবাক্য। এগুলি এই ধরনের—

(১) ফুল ছড়িয়ে যাওয়াতে আনন্দ আছে।

(২) দশদিকের সকল তথাগতকে এই পবিত্র বেদীতে অবতরণ করার জন্য সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাই। এতে আনন্দ আছে—ইত্যাদি।

(৩) আমরা শ্রদ্ধা সহকারে তথাগত শাক্যমুনিকে আমন্ত্রণ জানাই। ইত্যাদি।

(৪) আমরা তথাগতঅমিতাভকে শ্রদ্ধা সহকারে আমন্ত্রণ জানাই। অবলোকিতেশ্বর মহাস্থানপ্রাপ্তকে আমন্ত্রণ করি। আমন্ত্রণ করি আর সকল বোধিসত্ত্বকে। ফুল ছড়িয়ে আনন্দ আছে।

জাপানী ভাষায় শব্দ কয়টি এই ধরনের : নমু অমিদা বৎসু, অমিদা বুৎসু, অমিদা বুৎসু।

সুখাবতীব্যূহ পড়া হয় এইভাবে, যেমন, 'নমু, অমিদা বুৎসু, অমিদা বুৎসু, অমিদা বুৎসু।'

এর পরই আরম্ভ হয় পুণ্যফল স্থানান্তরিতকরণ। এতে বলা হয়—'আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা যে ফল পেয়েছি সেই ফল আসুন আমরা আনন্দের জগতে ভগবান

অমিতাভ বুদ্ধকে দান করি। তাঁর প্রতিশ্রুত আসরে আমরা গৃহীত হতে পারি। আমাদের কর্মনাশ হতে পারে, সমাধি পর্যন্ত লাভ করাও যেতে পারে। মর্ত্যে ও স্বর্গে দেবতাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হোক। এখানে সমবেত দেবতারা এই অনুষ্ঠানের আনন্দ ভোগ করুন। মহা আচার্য বা শিক্ষক, যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের জ্ঞান পূর্ণ হোক। উঁচু নিচু সকল আত্মাই বুদ্ধত্ব লাভ করুন। আমাদের মহান শিক্ষক জিক্কু ক্রমবর্ধমান আনন্দ লাভ করুন। গত সাত পুরুষ ধরে আমাদের যাঁরা কল্যাণ করেছেন তাঁরা আনন্দের জগৎ প্রাপ্ত হোন। পদ্মাসনে বসে তাঁরা বুদ্ধত্ব অর্জন করুন। আমাদের বিজ্ঞ সম্রাটের দরবার নিরাপদ হোক। তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ হোক। দেশে শান্তি আসুক। ধর্মের অগ্রগতি হোক। দশ দিকে যত সাধারণ মানুষ আছেন দুঃখ ও অশুভের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পান। যাঁরা বুদ্ধকে স্মরণ করেন ও সৌভ্রাতৃত্বের জীবন যাপন করেন তাঁরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোন। জীবন সায়াহ্নে তাঁরা যেন আনন্দের জগৎ থেকে বঞ্চিত না হন। অমিতাভ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মুখোমুখি তাঁদের সাক্ষাৎ হোক। তাঁদের 'বোধি' লাভের ইচ্ছা যেন ব্যর্থ না হয়। ধর্মধাতু ও ত্রিলোকে তাঁরা প্রজ্ঞাবান লোকের নেতা হোন। সমান অধ্যাত্ম চরিত্রের ব্যক্তি—যাঁরা এই অনুষ্ঠান করছেন তাঁরা সকলেই অনুরূপভাবে বোধিলাভ করুন।'

হস্তান্তর পরবর্তী বিষয়ক প্রার্থনার শ্লোকসমূহ :—'আমরা যারা পৃথিবীতে আছি তারা যেন নিষ্কলঙ্ক জলপথের মত স্বর্গের আনন্দ ভোগ করি। ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম কর। আমরা দীপ্যমান এক মহাপুরুষকে প্রণাম করি—যাঁর হৃদয় পদ্ম অপেক্ষাও নিষ্কলঙ্ক।'

এর পরই ত্রিরত্নের গুণকীর্তন হয়। তারপর পাঠ করা হয় পূর্ববর্তী সাতজন বুদ্ধের নির্দেশাত্মক বাক্য।

পাপের স্বীকারোক্তি : 'চারজন উপকারী পিতামাতা, আমাদের রাষ্ট্র ও শাসকবর্গ, সমগ্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও ধর্মের ত্রিরত্নের কল্যাণের জন্য মুখ্য তিনটি বাধা—কামনা-বাসনা, কর্ম ও কর্মজাত ফল দূর হোক। ধর্মধাতুর সকল স্তরে সকলের পাপ দূর হোক। তাঁদের কল্যাণে আমরা আমাদের সকল পাপকর্মের জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দশদিকের সকল বুদ্ধের সামনে অনুতাপ করছি।'

এরপরই আরম্ভ হয় ধ্যান। ধ্যান হয় পাঁচটি প্রবেশপথের উপর যে পথে অমিতাভের গুণকীর্তন করে মানুষ অপাপবিদ্ধ জগতে প্রবেশ করে। বসুবন্ধু লিখিত নিষ্পাপ জগৎ, জাপানী ভাষায় 'জোডোরোন' থেকে এগুলি নেওয়া হয়। এগুলি হল :—রেইহেইমোন বা পূজার দরওয়াজা, কোয়ানসৎসুমোন বা নিয়ম পালনের দরজা, একোমোন বা রূপান্তরের দরজা প্রভৃতি। সংক্ষেপে টেনডাইরা এই সময় এই অন্ত্যেষ্টি বাক্যগুলি উচ্চারণ করে—'ভূমিতে মাথা নত করে যাঁকে সম্মান জানিয়ে দেবতা ও মানুষ সবাই আনন্দ পায়, যিনি আনন্দ ও আরামদায়ক স্বর্গে বুদ্ধের অসংখ্য সন্তান

পরিবৃত হয়ে বাস করেন সেই সন্ন্যাসী অমিতাভকে প্রণাম করি। বুদ্ধের স্বর্ণাভ দেহ পর্বতরাজের মত। নিঃশব্দে তিনি যখন হাঁটেন শব্দহীন হাতির পায়ের মত তাঁর পা পড়ে। পদ্মের মত তার চোখ দুটি পবিত্র। সুতরাং ভূলুণ্ঠিত হয়ে অমিতাভকে প্রণাম করছি। তাঁর গোলমুখ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মত। শত সহস্র সূর্য ও চন্দ্রকিরণের মত তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রের মত, আবার নরম হলে পাখির কণ্ঠের মত। সুতরাং মাটিতে মাথা রেখে অমিভাতকে আমি প্রমাণ করছি।

এইভাবে বুদ্ধকে প্রণাম করে আমি তাঁর পূজা ও গুণকীর্তন করছি। ধর্মধাতু ধর্মদ্বারা সজ্জিত হোক। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা জীবন-সায়াহ্নে পশ্চিম জগতে অমিতাভ বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করে বুদ্ধত্ব অর্জন করুন। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা আনন্দের জগতে পুনর্জন্ম লাভ করুন। মহান অমিতাভকে তাঁরা দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করুন।'

এরপর ধূপধুনো জ্বালিয়ে পিষ্টক, চা, মিষ্টি, গরম জল, ভাত প্রভৃতি দিয়ে নৈবেদ্য হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন এরপর সুগন্ধি দান করেন। বিভিন্ন দরওয়াজার ব্যাখ্যা করে সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র থেকে পাঠ করা হয়। স্বীকারোক্তি বা ওটোসি অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।

গৃহে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : এবার গৃহে যে অনুষ্ঠান হয় তা পরিচালনা করেন দ্বিতীয় কোন পুরোহিত বা ব্যক্তি। তাকে বলা হয় ফুকুদোশি। তার সঙ্গে থাকে আরও ছজন সহায়ক। প্রধান পুরোহিত 'দোশি' মন্দিরে শবযাত্রীদের ও অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করেন।

অটোগি বা স্বীকারোক্তির মত এখানেও চারটি আমন্ত্রণক্রিয়া করা হয়। এখানে যে 'অনুতাপ সূত্র' পড়া হয় তা নিম্নরূপ :—যেমন, 'আমার সকল পাপকর্ম…' ইত্যাদি।

এছাড়া আছে তিনটি আশ্রয়ের কথা, যেমন,

বুদ্ধকে অভিনন্দন জানাই।
আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে আশ্রয় নিই।
দ্বিপদজীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাক্যমুনিতে আশ্রয় নিই।
কামনাহীন ধর্মে আশ্রয় নিই।
মহত্তম সঙ্ঘে আশ্রয় নিই।
আমি বুদ্ধে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি
আমি ধর্মে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি।
আমি সঙ্ঘে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি।'

সমবেত প্রত্যেকেই তখন শপথ নিয়ে বলেন—'প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অসংখ্য। সংসারসমুদ্রে এদের সকলকে চলতে সাহায্য করি। দুষ্টবৃত্তি অসংখ্য, আমি প্রজ্ঞাবান

ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট করতে সাহায্য করি। ধর্মের দুয়ার অসংখ্য, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা তা বুঝতে পারেন। চূড়ান্ত বুদ্ধত্ব আসবেই। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সেই অবস্থা লাভ করুন।

এরপর বুদ্ধে আস্থা স্থাপনের সূত্র পাঠ করা হয়। সূত্রপাঠ করা হয় সুখাবতিব্যূহ বা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক থেকে। এরপর পুণ্য দান করার অনুষ্ঠান চলে। ধূপধুনো ও নৈবেদ্য রাখা হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনেরা ধূপ জেবলে দেন। দশলোকের বুদ্ধদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ধরনের মন্ত্র পঠিত হয়ঃ—

'দশলোকের বুদ্ধদের অভিনন্দন জানাই।
ধর্মকে অভিনন্দন জানাই।
সংঘকে অভিনন্দন জানাই।
শাক্যমুনি বুদ্ধদের অভিনন্দন জানাই।
বুদ্ধ প্রভুতরত্নকে স্মরণ করি।
দশদিকে যাঁর দেহ ছড়িয়ে আছে সেই শাক্যমুনিকে প্রণাম করি।
সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রকে প্রণাম করি।
বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীকে প্রণাম করি।
বোধিসত্ত্ব সামন্তভদ্রকে স্মরণ করি।'

এই স্তোত্রগুলি পাঠ করার পর গৃহের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মন্দিরের অনুষ্ঠানঃ—টেনডাইদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মন্দিরে অনুষ্ঠান হয় নিম্নরূপেঃ—মন্দিরে আসা মাত্রই বেল রেজে ওঠে। ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা যে যার আসন গ্রহণ করেন। এরপর বসেন প্রধান পুরোহিত ও তার সহায়কেরা। সমবেত কণ্ঠে বিকৃত সংস্কৃতে চার ধরনের প্রজ্ঞার গান গাওয়া হয়। যেমন,

"ওঁ বসরসতর শিগিয়ারক
বসরারতনম দোতরন
বসরদরুম গিয়াগনই
বসরকরুম করো বব

অর্থাৎ, 'হে রত্নের উৎস, বজ্ররত্ন, তোমার অপেক্ষা কেউ বড় নেই।
বজ্রসত্ত্ববিধির স্বর্গ, তুমি বজ্রকর্ম কর।'

এবার প্রধান অনুষ্ঠানকারী উচ্চবেদীতে গিয়ে এক ধরনের মুদ্রা করেন। এ মুদ্রাকে বলে 'কোমিওগু'। এরপর আসন গ্রহণ করার উপর যে সঙ্গীত আছে তার এক চরণ গাওয়া হয়। নির্দেশবাক্য বলেন প্রধান পুরোহিত। এতে তীর্থযাত্রীদের দণ্ডের (লাঠির) প্রশংসা করা হয়, যেমন, 'আমি দণ্ড গ্রহণ করছি। সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করুন।'

প্রধান পুরোহিতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—'আমি ভোজ্য দান করছি, সত্য পথ দেখাচ্ছি, ত্রিরত্নের উদ্দেশে নৈবেদ্য বসাচ্ছি।...'ইত্যাদি।'

গান শেষ হলে প্রধান পুরোহিত উঁচু বেদী থেকে নেমে এসে ধূপ জ্বালিয়ে দেন। চা ও চিনির জল দেওয়া হয়। এরপর দণ্ড থেকে কফিন তুলে নিয়ে কফিন বন্ধ করা হয়। সহকারীরা অন্ত্যেষ্টি বাক্য পাঠ করেন। সূত্র আওড়ানো হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনেরা সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে দেয়। সবাই তাদের অনুসরণ করে। ধূপ পোড়ানো শেষ হলে পুরোহিতেরা মন্দির ত্যাগ করেন। এইভাবে টেনডাই বৌদ্ধদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়।

জোডোদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ—জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জোডো সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সম্প্রদায়ও টেনডাই বৌদ্ধধর্ম থেকে বেরিয়ে আসা একটি শাখা মাত্র। এরা অমিতাভের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আদি মহাযান বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিরও এদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গৃহানুষ্ঠান ঃ—গৃহানুষ্ঠান আরম্ভ হয় এই ধরনের বাক্য দিয়ে, 'ধূপের মত আমাদের মন পবিত্র হোক। জ্ঞানের আগুনের মত আমাদের হৃদয় উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন হোক। নীতি ও প্রশান্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে চিন্তাকে চিন্তা দ্বারা পুড়িয়ে ত্রিলোকে দশদিকের বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করি।'

এরা ত্রিরত্নের উপাসনা করে এই বলে ঃ—'দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ। আমাদের হৃদয় মন দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই।'···

'দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে আমরা সর্বমনঃপ্রাণে শ্রদ্ধা জানাই। দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংঘকে আমরা সর্বমনঃপ্রাণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।'

জোডোরা চার ধরনের প্রাণীকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আহ্বান জানায়। যেমন, (১) সমগ্র বুদ্ধ (২) শাক্যমুনি (৩) অমিতাভ ও (৪) কোয়ানেনোন, সেইশি ও অন্যান্য মহাবোধিসত্ত্ব।

এদের স্বীকারোক্তি হয় খুবই সংক্ষেপে, এবং জেন ও টেনডাইদের অনুকরণে। যেমন, 'সকল দুষ্ট কর্ম···' ইত্যাদি। এবার তারা পূর্ববর্তীদের মত তিন ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা করে—বুদ্ধ ও ধর্ম ও সঙ্ঘের।

মৃতের মস্তিষ্ক যখন কামানো হয় তখন দশবার অমিতাভের নাম করা হয়। একে বলে 'জুনেন'। মস্তিষ্ক মুণ্ডনের জন্য অতি অল্প সময় নেওয়া হয়। শুধুমাত্র প্রতীক হিসেবে এটা করা হয়। শিনশু সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'কমিশোরি' নামে এই মস্তিষ্ক-মুণ্ডনপর্ব আছে।' এর দ্বারা রীতিগতভাবে মৃতব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়। এ সময় যে শাস্ত্রবাক্য পাঠ করা হয় তা এই ধরনের ঃ—'ধর্ম যা প্রধান্য অর্জন করে আছে, যা গভীর ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়, কদাচিৎ সহস্রকল্পে একবার তাঁর দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, শুনেছি, ও গ্রহণ করেছি। আমরা এখন তথাগতের মূল শিক্ষার যথার্থ অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে পারি।'

এরপরই আরম্ভ হয় সূত্রবাক্য পাঠ। পাঠ করা হয় সাধারণত অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র থেকে। কখনও কখনও 'অভিতাভ তথাগত মূলধারণী' থেকেও পাঠ করা হয়।

প্রার্থনা বা মন্ত্রের ধারা এই ধরনের ঃ—'বুদ্ধে মূল প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তাঁর নাম যেন আমরা শুনতে পাই, এবং আনন্দের জগতে নবজন্ম লাভ করি।'...ইত্যাদি। এই সঙ্গে অমিতাভ বুদ্ধের কাছে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করা হয়—আন্তরিকভাবে তাঁর স্মরণ নেওয়া হয়। অমিতাভের নামে স্মরণ করে মৃতের আত্মার উদ্দেশে বলা হয়—"মৃতের আত্মা পবিত্র জগতে প্রবেশ করুক। তার আত্মা কর্মফল-জাত ধূলিকণাস্বরূপ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাক। তিনি বুদ্ধকে দর্শন করুন, ধর্মের কথা শুনুন এবং দ্রুত মোক্ষপথ অনুসরণ করুন।"

এই কামনা জানাবার পর চারটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয় এবং ত্রিরত্নের পুজো চলে। 'নমু অমিদা বুৎসু' শব্দটি একবার পাঠ করা হয়। এরপরই গৃহে শেষকৃত্যানুষ্ঠান শেষ হয়। সকলে এগিয়ে মন্দিরে যায়। মন্দিরেও এই অনুষ্ঠান হয় গৃহেরই প্রায় অনুরূপ। মন্দিরের অনুষ্ঠান শেষ হলে বুদ্ধের পবিত্র নাম, চারটি পবিত্র প্রতিজ্ঞা এবং অমিতাভের মূর্তিপুজা করা হয়। এরপরেই অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শিনশুদের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান ঃ শিনরান শোনিন নামে এক ব্যক্তি ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরা বিশ্বাসকে এদের ধর্মতত্ত্বের মূলভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।

মৃতের পুজা ঃ—শিনশুরা মৃতদেহের পুজো করত। বিশেষ করে পুরোহিতদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। শিনশুদের পুরোহিতেরা অন্যান্য বৌদ্ধদের মত সন্ন্যাস জীবনযাপন করত না। তারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে পারিবারিক জীবনযাপন করত।

মৃত্যুর তিনদিন পর এরা মৃতদেহকে ধূসর রঙের রেশমী বস্ত্র পরিয়ে দিত। কাঁধের উপর দিয়ে দিত 'কেস' নামে এক ধরনের বড় রুমাল বা গামছা। এক ধরনের কেদারায় বসার ভঙ্গীতে এদের বসানো হত। বসানো হত তারই কোন এক ঘরে। তার মুখ সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হত। শুধু চোখ দুটি অনাবৃত থাকত। কেদারার তিন দিকেই থাকত এক ধরনের ঝোলানো পর্দা। সামনের বাঁশে চ্যাটাইয়ে তৈরি ছোট পর্দা। সামনের এই পর্দা সহজেই ওঠানো নামানো যেত। ধূসর রঙের পোশাক পরিহিত ছয় ব্যক্তি সর্বদা তার সেবায় নিযুক্ত থাকত। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন দল মৃতদেহের পুজো করতে এলে সামনের পর্দাটি তুলে ধরা। পুরোহিতের অনুগামীরা এইভাবে পুজো করেই তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতো। নীরবে সাষ্টাঙ্গে তারা এই মৃতদেহকে প্রণামও করত।

দ্বিতীয় দিনে পুরোহিতের গৃহেরই ভিন্ন প্রকোষ্ঠে তাঁকে স্থাপন করতে হত এবং আর একদল ভক্ত এসে তাঁকে পুজো করে যেত। এই অনুষ্ঠানের সময়ে কফিনের পেছনে দেয়ালে অমিতাভের ছবি টাঙানো থাকত। এর দ্বারা এই বোঝাবার চেষ্টা হত যে, মৃত ইতিমধ্যে অমিতাভের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। জাপানের নানা স্থান থেকে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পুরোহিতের মৃতদেহ পুজো করার জন্য আসতো।

মৃতদেহকে বিদায় জানানো :—দ্বিতীয় এই অনুষ্ঠানের পরদিনই মৃতদেহকে বিদায় জানানো হত। এ জন্য তিনটি অল্প সময়ের অনুষ্ঠান করা হত। প্রথম অনুষ্ঠান হত গৃহে, যেখানে থাকত কফিন। পরে এই কফিনটি 'শিনরান শোনিন' —যিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জন্য আলাদা করে রাখা একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। এরপর কফিনটিকে নিয়ে যাওয়া হত অমিদার জন্য নির্দিষ্ট আর এক কক্ষে। প্রত্যেক ঘরেই যে পুজো হত তার মূল মন্ত্র ছিল : 'নমু অমিদ বুৎসু।' এ সময় প্রচুর সুগন্ধি ধূপ পোড়ানো হত।

তৃতীয় দিনের পুজোই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেই যথার্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান হত। এতে শুধু যে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরাই যোগ দিত তা নয়, শিনশুদের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দিতেন।

শবযাত্রা :—প্রথম দিকে জাপানে যে ধরনের শবযাত্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেই ধরনেরই শবযাত্রা হত। তবে শবযাত্রায় জাঁকজমক কি ধরনের হবে তা নির্ভর করত মৃত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর। প্রথম হত অস্থায়ী একটি প্রতীকসমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র। মৃতের সঙ্গে অভিষিক্ত নতুন পুরোহিত এখানে প্রথম পুজো দিতেন। প্রকৃত সমাধি বা দাহ হত কোয়াজান নামক স্থানে যেখানে ছিল স্থায়ী সমাধিক্ষেত্র। এক্ষেত্রে যথারীতি চারিটি আমন্ত্রণ, ত্রিরত্ন পূজা, বুদ্ধের স্তুতিপাঠ, অমিতাভকে আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি অনুষ্ঠান হত। জোডো সম্প্রদায়ের মতই প্রার্থনা হত। নতুন সংযোজনা ছিল এইটুকু :—'প্রার্থনা জানাই যে, এই অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সমভাব লাভ করুন। তাদের মানসিক বৃত্তি বোধিপ্রাপ্ত হোক। সুখ ও শান্তির জগতে তাঁদের নবজন্ম হোক।'

অস্থায়ী সমাধি বা দাহ : অস্থায়ী সমাধি ছিল প্রতীক-সমাধি। নতুন পুরোহিত সেখানে এসে কয়েকটি বড় খড় জ্বালিয়ে দিতেন। তা থেকে ধোঁয়া বেরুলেই মনে করা হত যে, যথার্থ সমাধি হয়ে গেছে। এরপর যথারীতি ধূপ পোড়ানো হত এবং কফিনকে স্থায়ী সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত।

শবদাহ : স্থায়ী শ্মশানক্ষেত্রে শবদাহ হত। এখানে শুধু মাত্র নতুন পুরোহিত, মৃতের নিকট আত্মীয়-স্বজন, দেহরক্ষী এ শ্মশানরক্ষকরাই থাকতে পারত। পাইন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হত। চারজন দক্ষ ছুতোর সাদা পোশাক পরে দুজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে সেখানে থাকতেন। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি হিসেবে থাকতেন নতুন পুরোহিত। পবিত্র অগ্নি জ্বেলে ঘৃত বা তেলের সাহায্যে তা প্রজ্বলিত রাখা হত। কফিন তৈরী করা হত এমন মজবুত করে যে এর পার্শ্বদেশ খসে পড়ার আগেই ভেতরে মৃতদেহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যেত।

শবদাহ শেষ হলে অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে খুব সংক্ষিপ্ত একটা অনুষ্ঠান করা হত। দেহ ভস্মাবশেষ একটি বাক্সে ভরা হত। এটা ঢেকে দেওয়া হত সাদা রেশমী কাপড়ে। এই বাক্স পুরোহিত গৃহে নিয়ে গিয়ে সেখান উপযুক্ত ব্যবস্থা করত।

তবে এক্ষেত্রে কিছু গোপনীয়তাও অবলম্বন করা হত। শবদাহের শেষে হাড় প্রভৃতি তোলা হত দু ধরনের কাঠি দিয়ে। যার একটি কাঠের এবং অপরটি বাঁশের তৈরি। একে বলে 'চপস্টিক'—চীনা বা জাপানীরা যা দিয়ে খাবার খায়। এই জন্য জাপানীরা দু' ধরনের বস্তু দিয়ে চপস্টিক তৈরি করাকে অশুভ বলে মনে করে। শিঙ্গোন মতবাদে বিশ্বাসীরা ভস্মাবশেষ হাড় কোয়াসানে পাঠায়, এচিগো ও শিনশুর লোকেরা পাঠায় গৃহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভস্মাবশেষ সমাধিস্থ হয়। এর জন্য বিশেষ যত্নও নেওয়া হয়।

নিচিরিনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—নিচিরেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এরা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রকে ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করে। এই সূত্রে দুটি অংশ আছে, যেমন, (১) শকুমোন, ও (২) হোম্মোন। নিচিরিনরা দ্বিতীয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু জাপানের অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রথমটির উপর জোর দেয়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিচিরেন চারজন মহান বোধিসত্ত্বকে প্রধান বোধিসত্ত্ব বলে মনে করতেন। এরকম ধারণা আছে যে, তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধধর্মানুরাগীদের নিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান খুবই দীর্ঘ। দীর্ঘ হবার কারণ এরা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের সবটাই পাঠ করে। এদের মধ্যেও গৃহানুষ্ঠান, অনুষ্ঠানের কল্যাণশক্তি অপরকে দান, জাগরণ প্রভৃতি ক্রিয়া রয়েছে। অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের মত এখানেও প্রচুর সুগন্ধি ও ধূপধুনো জ্বালানো হয়।

একাদশ অধ্যায়
ইহুদীদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

প্রাচীনতম ইজরাইলে মৃত্যু মূলত ছিল পারিবারিক ব্যাপার। অধিকাংশ মৃত্যুই হত ভয়াবহভাবে অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহে। সাধারণ ক্ষেত্রে রুগ্ণ ব্যক্তি বেশিদিন মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে পারত না, কারণ তখন আজকের মত এত আধুনিক ওষুধপত্র ছিল না। তবে মৃত্যুর পর পরলোক সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। তারা মনে করত যে জীবিত কালেই ঈশ্বর মানুষকে তার পাপের জন্য শাস্তি দেন। যদি কোন ব্যক্তিকে পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া না হয় তবে তার উত্তরাধিকারীরা সে জন্য শাস্তি পায়। তবে তারা এমন বিশ্বাস করত যে, মৃতের আত্মাকে ডেকে এনে তার সঙ্গে কথা বলা যায়। এভাবেই পরবর্তীকালে মৃতের পুনরুত্থানের কল্পনা তাদের মধ্যে এসেছিল বলে মনে হয়। তবে এই পুনরুত্থান হয় জগৎ ধ্বংস হবার পরে। তখন তাদের পাপপুণ্যের বিচার করে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হয়। অনেকে মনে করে জরাথুস্ত্রবাদ থেকে তাদের জন্য এই মৃত্যুর ধারণা এসেছিল।[১]

মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার গভীরতা নির্ভর করে এর কারণ এবং স্থূলদেহের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম কোন কিছুর অবস্থান সম্পর্কিত ভাবনা থেকে। আধুনিক মানুষ মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্থূল কারণকেই খুঁজে পায়। যেমন, রোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি। কিন্তু ইহুদীরা মৃত্যুকে ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করে। অল্প বয়সে মৃত্যু হলে তার কারণ হিসেবে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকেই ধরা হয়। দুর্দশার মধ্যে মৃত্যু হলে সেজন্যও ঈশ্বরের ক্রোধকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। কারণ এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাপের ফলেই মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মায়।

হিব্রুমতে মৃত্যু মানেই ব্যক্তিত্বের অবসান হয়ে যাওয়া নয়। তারা মনে করে যে, প্রেতলোকে মৃত ব্যক্তির একটি ভৌতিক ছায়াজাতীয় অস্তিত্ব ঘোরাফেরা করে। তবে এ ধরনের চিন্তার আগে হয়তো অন্য আর এক ধরনের চিন্তাও ছিল। কারণ ইজ্রায়েলে পূর্বপুরুষপূজার পদ্ধতি যে চালু ছিল সে ধরনের নজির পাওয়া যায়। মৃতের আত্মাকে নিয়ে জাদুক্রিয়া করার আভাসেরও অন্ত নেই। যেমন দেখা যায় 'স্যামুয়েল এনডোরের' ডাইনীর ডাকে আবির্ভূত হয়ে 'সল'-এর মৃত্যুর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১. এস ২৮)।[২] এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সাক্ষ্য না থাকলেও পূর্বেও যেমন ইজ্রায়েলের অধিবাসীরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করত আজও তেমনই করে। ইহুদীদের চিন্তার এই ধারা বেয়েই কবর থেকে যীশুর অভ্যুত্থানকে প্রেতাত্মা বা গোস্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে (L. K. 24 37 ft.)।

---

১ History of Religion—Sengei Tokarev, p. 225, 241.

২ W. H. Bennet—Religion of the Post exilee Prophety, 1907. p. 361 ff Edin.

ইজরায়েলের লোকেদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা হয়। এই জন্যই সমাধি দেবার সময় এরা বলে—'পিতৃপুরুষের সঙ্গে কবরস্থ করা হল' (2. K. 12[21]), 'পিতৃপুরুষের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে' (1. K. 2[17]) ইত্যাদি। তবে মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিল হবেই এমন প্রত্যয় আদিবাসীদের মত এদের মধ্যে ততটা দৃঢ় নয়। সুতরাং কার্যত মৃত্যু বলতে এরা বোঝে শেষ বিদায়।

মৃত্যু হলে স্থূলদেহ থেকে যা বেরিয়ে যায়, ইজরায়েলীরা মনে করে যে, তা হল 'নেফেশ' বা মূল সত্তা ; যা কিছুটা এলান ভাইটাল জাতীয়। অবশ্য নেফেশ বলতে অনেক সময় এরা মৃতদেহকেও বোঝায়।

সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে মৃত্যু সম্পর্কিত আদিবাসী জাতীয় বিশ্বাস ইজরায়েলীদের মধ্যেও ছিল। এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেমেটিক জাতীয় পুরাণ কাহিনী। তবে 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' সম্পাদকগণ বহু প্রাচীন বিশ্বাস বাদ দেওয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা এখন কষ্টকর। কিংবদন্তীর কাহিনীর মধ্যে যা এখনও বেঁচে আছে তা হল ঈশ্বরের মৃত্যু ও নবজাগরণ। এর হদিস পাওয়া যায় যখন মহিলাদের আমরা দেবতা তম্মুজের জন্য কাঁদতে দেখতে পাই (FZK, 8[14])। গ্রেসমান নামে একজন লেখক মনে করেন যে, যেহবার ভৃত্যের মৃত্যু ও পুনর্জাগরণের মধ্যে সেমিটিকদের এই পুরাণ কাহিনীই কাজ করেছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কবর থেকে পুনরভ্যুত্থানের ঘটনার ইঙ্গিত আছে। এইজন্য 'প্রত্যাদেশ' বা 'আবির্ভাব' একটি তত্ত্বকথাই হয়ে আছে। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সকলেই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে। এদের মতে মৃত্যু হল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশপথ। ইহুদীদের মধ্যে দেবদূতদের স্তরভেদ দেখা দিয়েছিল। এদের এক একজনের এক এক ধরনের দায়িত্ব ছিল। স্যামুয়েল নামে একজন ছিল মৃত্যুর দূত।

পরবর্তী কালে ইহুদীদের মধ্যে মৃত্যুর সময় সম্পর্কিত নানা ধরনের বিচিত্র চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তারা মনে করত যে, মৃত্যুর আগে মরণোন্মুখ ব্যক্তি 'শেকিনাহ্'-কে দেখতে পেত। খ্রীষ্টীয় অব্দে বেন খাফরা নামে একজন ইহুদী শিক্ষককে বলতে শোনা যায়, 'কবরের চারদিকে তিন দিন মৃতের আত্মা ঘুরে বেড়ায় এই আশায় যে, যদি দেহের মধ্যে আবার প্রবেশ করা যায়। কিন্তু যখন মৃতের আত্মা দেখতে পায় যে, তার স্থূলদেহের মুখ বিকৃত হয়েছে, তক্ষুনি দেহের আশা ত্যাগ করে পিছিয়ে যায়।'[১]

মৃতদেহের সৎকার :—প্রাচীন ইজরায়েলে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত। সেটাই মূলত টিকে আছে। দেহে মলম মাখিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ইহুদীদের মধ্যে তেমন ছিল না। ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিসে (৫০) যখন দেখা যায় যে, জেকব ও

১ Cf Expos. Greek Test, [1097] on Jn 44.

যোশেফকে মলম মাখানো হয়েছিল—তখন মনে করতে হবে যে, এঁরা সেখানে মিশরীয় হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছিলেন। কারণ এঁরা মিশরে ছিলেন। মিশরে মৃতদেহকে রক্ষা করে মমি তৈরি করার জন্য মলম মাখানোর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে অ্যারিস্টোবুলুস-এর দেহ মধু দ্বারা মলমিত হয়েছিল।[১] মৃতদেহ তৈলসিক্ত করণের যে উল্লেখ আছে, এবং তা মসল্লা দিয়ে মুড়ে রাখার যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, উপরে উল্লেখিত মলম মাখানো থেকে তাকে পৃথক করে দেখতে হবে। শবদাহ ইজরায়েলীদের মধ্যে কদাচিৎ ঘটে থাকবে। সামান্য একটি সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, 'জাবেশ গিলীড' সল এবং তাঁর পুত্রদের দেহ দাহ করেছিল।[২] এটা করা হয়েছিল ফিলিস্টিনদের হাতে যাতে তাঁদের মৃতদেহ না পড়ে সে জন্য—ইহুদীদের প্রথা হিসাবে নয়। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে শবদাহপ্রথার স্বল্প উল্লেখ এটাই প্রমাণ করে যে, দাহের প্রতি তাদের একটা ঘৃণার মনোভাব ছিল। শহদাহের প্রতি এই ঘৃণা থেকেই বোধহয় অনেক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর জীবন্ত দাহ করা হত। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দানের পর অর্থাৎ ফাঁসী দেবার পর দাহ করা হত।[৩] কিমচি (Kimchi) নামে এক লেখকের রচনা থেকে জানা যায়, হিল্লোম উপত্যকায় অপরাধী ও পশুদেহ দাহ করার জন্য অহোরাত্র সেখানে আগুন জ্বলত। এইজন্য ইহুদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, মোয়াবুরা এডমের রাজার হাড় পুড়িয়েছিল বলে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

ইহুদীরা মনে করত, কোন মৃতদেহকে যদি সমাধিস্থ না করে তাকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হয় সেটা তার পক্ষে অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কারণ। অপরাধী বা তার সহযোগীদের ক্ষেত্রে এ রকম করা যেতে পারে—তবে তাদের দেহকেও কবর দেবার নির্দেশ আছে। এ ধরনের দুর্ভাগ্য মৃতের ভাগ্যে ঈশ্বরের বিচারের ফলেই ঘটে বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করত। এই কারণে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদেশী, সকলকে কবরস্থ করা ইহুদীদের পরম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। এই জন্য ইহুদীদের মধ্য থেকেই জোব বলেছিলেন যে, ঈশ্বর দুষ্ট লোকদেরও কবরস্থ হবার সৌভাগ্য দান করছেন। সমাধিস্থল অপবিত্র করে অনেক সময় মরণোত্তর শাস্তি দেওয়া হত।

আধুনিককালে যেভাবে কবর খোঁড়া হয় ওল্ড টেস্টামেন্টে সে ধরনের কোন উল্লেখ নেই। তবে নিঃসন্দেহে এভাবেই কবর খোঁড়া হত। অধুনা প্রাপ্ত নানা তথ্য থেকে জানা যায়[৪] যে, পাহাড়ের গহ্বরে বা পাহাড় খুঁড়ে কবর দেবার প্রথা বেশ প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে দলবেঁধে কবর দেওয়া হত বেশী। 'কবরের-পাহাড়ের' গায়ে একব্যক্তি-

---

১ Jos, Ant, xiv, xii, 4

২ IS 31[12]

৩ Gn 38[24] LV, 20[14], 21[9]. Jos, 7[15], [25]

৪ Palestine Exploration Societies

পরিমাণ গর্ত খুঁড়ে কোন ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হত। এরা কবরের মুখ পাথর দিয়ে চেপে দিত। যে স্থানে এই কবর দেওয়া হত তার নাম—'কুক'। ইহুদীদের কাছে ম্যাকপেলাহ্ (Machpelah) গুহা বিশেষভাবে বিখ্যাত, কারণ, মনে করা হয় এখানে সারাহ্, আব্রাহাম, আইজাক, রেবেকা, লিহ্, জেকব প্রমুখ মহাপুরুষকে কবর দেওয়া হয়েছিল। স্থপতি দ্বারা তৈরি করা কবরের অস্তিত্বও আছে। কখনও কখনও প্রাচীন ইজরায়েলে কবরের উপর স্তম্ভও তোলা হত। এ রকম একটি সমাধিসৌধ রয়েছে মোদিন-এ। তাঁর পিতা ও ভ্রাতাদের সমাধির উপর এটি তৈরি করেছিলেন সাইমন।

প্রাচীনকালে কুল-প্রধানরাও স্বতন্ত্রভাবে সমাধিস্থ হতেন। পারিবারিক ভুমিতেই এই সমাধিক্ষেত্র ছিল। মানাসেহ্ নিজের গৃহউদ্যানে এবং আমোন উজ্জার উদ্যানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তবে ইহুদীদের রাজাদের সাধারণত রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রেই কবর দেওয়া হত। এই কবরখানা ছিল ডেভিড শহরে (City of David)। শহরে সকলেরই উদ্যানসমেত বড় বড় বাড়ি থাকত না। ফলে মৃতদেহকে নগর-দেয়ালের বাইরেও সমাহিত করা হত। গরীবদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র থাকত না। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে তাদের কবর দেওয়া হত। এ ধরনের সমাধি একটু অপমানজনক ছিল।

প্রাচীন ইজরায়েলে দেখা যায় যে, মৃত্যুর পরেও পরিবারের সকল লোক একত্রে থাকতে খুব পছন্দ করত, অর্থাৎ পারিবারিক কবরে সমাধিস্থ হতে চাইত। সমগোত্রীয় বা সমান পদাধিকারী ব্যক্তিরা একই স্থানে সমাধিস্থ হতে চাইতেন। এই জন্যই দুষ্ট রাজাদের প্রাচীন ইজরায়েলে রাজকীয় সমাধিভুমিতে সমাহিত না করে আলাদাভাবে সমাধি দেওয়া হত। মৃত্যুর পরেও এটা এক ধরনের শাস্তি।

বাইবেল লেখা হবার পর ইহুদীদের দেখা যায় যে, তারা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। এখনও ইহুদীরা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হবার আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে। যে সকল ইহুদী বহুক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে পারে না তারাও প্রায়শ্চিত্তের দিনটি ঠিকই রক্ষা করবে যাতে পারিবারিক বা স্বজাতীয় সমাধিক্ষেত্রে তার স্থান হতে পারে।

প্রাচীন সাধক ও বীরপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রকে ইহুদীরা বিশেষ মূল্য দিত। অনেক সময় এদের সমাধিসৌধ প্রার্থনাগৃহরূপে ব্যবহৃত হত। কবরের সঙ্গে প্রেতাত্মাদের সংযুক্ত থাকার ব্যাপারেও লোকেদের অবিশ্বাস ছিল না। দু-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত কবরস্থানকে অপবিত্র বলেই গণ্য করা হত। এখনও কবরে প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় এ বিশ্বাস রয়েই গেছে। ইহুদীরা মনে করে যে, মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে মাটির সঙ্গে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত প্রেতাত্মা সেখানে থেকেই যায়। এ ধরনের বিশ্বাস আদিবাসীদের সকলের ধর্মেই রয়ে গেছে। ইহুদীদের মধ্যেও এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশ ও অশৌচ পালন ঃ মৃত্যু যে দুঃখের কারণ ইহুদীদের নানা রচনাতেই তার সাক্ষ্য আছে। জেনেসিস ৩৭-এ দেখা যায় জেকব যোশেফ-এর সম্ভাব্য মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করছেন। ডেভিডও আবসালোমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ডেভিডের একটি ব্যবহার দেশের লোকদের হতচকিত করে দিয়েছিল, যেমন, তাঁর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার জন্য উপবাস করেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। কিন্তু সে মারা গেলে উপবাস ত্যাগ করে কান্নাকাটি ছেড়ে যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ডেভিডের বক্তব্য ছিল এই যে, মৃত্যু হয়ে যাবার পর আর যখন ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন শোক করা অর্থহীন। তাছাড়া এ শোকের তুলনায় কতটা দুঃখ প্রকাশ করাই বা সম্ভব!

মৃত্যুশোকের যন্ত্রণা মানুষের মধ্যে যে আবেগ তৈরী করেছিল তার ফলেই বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। শোকের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের শোক দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুর কারণ হিসেবে মূলত ধরা হত রোগকেই। এক্ষেত্রে মৃত্যু হলে মৃতের মুখ ও চোখ বন্ধ করে দেওয়া হত। দেহ ধুইয়ে দেওয়া হত। কখনও কখনও যে পোশাকে মৃত্যু হত, ইহুদীরা সেই পোশাকেই মৃতদেহকে কবর দিত। হেরোড অ্যারিস্টোবুলুকে তার অলংকারসহ কবর দিয়েছিলেন। ডেভিড-এর সঙ্গে তাঁর তোষাখানাও কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দেহে লাল ও নীলের সংমিশ্রণজাত এক ধরনের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজমুকুট রাজদণ্ড সবই তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এই ব্যবস্থায় বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ইহুদী পণ্ডিত গামালীয়েল (Gamaliel) বিধান দেন যে, মৃতদেহকে সাদা কাপড় পরিয়ে কবর দিতে হবে।

পরবর্তীকালে মৃতদেহের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে কবে এই ব্যবস্থা হয়েছিল তা জানা যায় না। জেনেসিস (১১৪৪)-এ দেখা যায় যে, ল্যাজারাসের হাত পা লিনেন কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মুখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল রুমাল দিয়ে। এছাড়া মসল্লাও ব্যবহার করা হত।

যোশেফ বাদে আদিকালে সমাধি দেবার জন্য ইহুদীদের মধ্যে কফিনের ব্যবস্থা ছিল না। যোশেফকে বাক্সের মধ্যে ভরে তার দেহে মলম মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে মিশরীদের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালেও লোকে এই ধরনের কফিনদণ্ড ও বাক্স ব্যবহার করত। এখনও তা পূর্বদেশীয় ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এরা কফিনদণ্ডকে কবর দেয় না।

প্যালেস্টাইনের জলবায়ুর জন্য মৃতদেহ বেশি সময় ঘরে রাখা যেত না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কবর দিতে হত। প্রকৃতি যা বাধ্য করেছিল ইহুদীদের মধ্যে তাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফলে শীতার্ত পশ্চিম ভূখণ্ডে ইহুদীরা দ্রুত মৃতদেহ কবর দিত। পরে অবশ্য পশ্চিম দেশে এই রীতি আর বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হত না।

মৃতদেহকে কবরে নিয়ে যেত বন্ধুবান্ধবেরা। সমাজের সকলেই এতে শোক

প্রকাশ করত। বিশ শতকের প্রথম ভাগেও এজন্য ভাড়াটে শোকপ্রকাশক ও গায়কদের নিয়োগ করা হত। বাইবেলের যুগে সমাধি দেবার অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত না। তবে তখন এবং পরেও মৃত্যু উপলক্ষ্যে এক ধরনের ভাষণ দেওয়া হত। শোকার্তরা সমাধি দেবার সময় ৯১ তম সাম (Psalm) আবৃত্তি করত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও ঘরে ফিরে শোকবার্তা থেকে কিছু পাঠ করে। প্রাচীনকালে মহিলারাও মৃতের শেষকৃত্যে যোগ দিত। বিদেশে এখনও অনেকে শবযাত্রার সঙ্গী হয়। কোথাও কোথাও আবার হয়ও না।

যোশেফস হেরোডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে:[১] সোনার কফিন দণ্ডে কফিন বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নানাধরনের মূল্যবান পাথর দিয়ে এই কফিনে নক্শা করা হয়েছিল। মৃতদেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল লাল নীল মেশানো অদ্ভুত রঙের কাপড়ে। কফিনও ঐ একই রঙের বস্ত্রে আবৃত হয়েছিল। মাথায় ছিল এক ধরনের পাগড়ি বিশেষ, তার উপর সোনার মুকুট। ডান হাতে ছিল রাজদণ্ড। কফিন দণ্ড বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল বা তা ঘিরে ছিল তাঁর পুত্ররা এবং আত্মীয়-স্বজন। এরপর সৈন্যরা। এরপর মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ। শবযাত্রা সাজানো হয়েছিল এইভাবে—'প্রথম রক্ষীবৃন্দ, তারপর থেস্রিয়ান, এরপর জার্মান, জার্মানদের পর গ্যালাসিয়ান। প্রত্যেকেই ছিল তার নিজ নিজ পোশাকে। এরপর সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর ভাবভঙ্গী ছিল যেন তারা যুদ্ধযাত্রা করছে। সবার পেছনে পাঁচশত গৃহ-ভৃত্য। তাদের হাতে ছিল মসল্লা।'

আধুনিক সামারিটানরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাতে মনে হয় প্যালেস্টাইনের প্রাচীন ইহুদীদের অনেক কিছুই তাদের মধ্যে টিকে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা যা করে তা এই ধরনের: মৃত্যু হলে মৃতদেহ যত্নে আনুষ্ঠানিকভাবে ধোয়ানো হয়। প্রধান পুরোহিতের মৃতদেহ ছাড়া সামারিটানদের ক্ষেত্রে মৃতদেহ ছোঁয়ার প্রশ্নে তেমন কোন বাছবিচার নেই। সমাধি দেবার আগে মৃতদেহের মাথা ও পায়ের কাছে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কবর দেবার জন্য কফিন ব্যবহৃত হয়। তবে আধুনিক প্যালেস্টাইনে কফিনের ব্যবহার নেই। অশৌচ থাকে মৃত্যুর পর শনি বা রবিবার-এর আগমন পর্যন্ত। এই সময় মৃতব্যক্তি যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর সকল ব্যক্তি নিত্য সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ও প্রার্থনা জানায়। শনি অথবা রবিবার দিন আবার তারা সমাধিক্ষেত্রে যায়। এখানে এরা আহার করে এবং সমাবেশে যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান সমাধা করে।[২]

ইহুদীদের মধ্যে অশৌচ পালনের সময় এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকমের ছিল। সেটা নির্ভর করত মৃতের সামাজিক মর্যাদার উপর। সাধারণত অশৌচ

১ Ant. xvii, viii, 3 cf. BJI xxxiii 9.

২ Stopfer, Palestine in the time of Christ, Philad, Eng. Tr. Lond. 1887, p. 168.

পালন করা হত সাতদিন। সল ও জোনাথনের জন্য জেবেশ গিলীডের লোকেরা সাত দিন শোকপালন করেছিল। যোশেফ জেকবের জন্য সাতদিন শোকপালন করেছিলেন। জুডিথের জন্যও সাত দিন শোকপালন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও দেখা যায় সাত দিনই ছিল শোকপালনের সময়। তবে অতি সাধারণ ব্যক্তির জন্য ত্রিশ দিন পর্যন্ত শোকপালনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের জন্য শোকপালনের সময় ভিন্ন ভিন্ন। শিশুদের জন্য সারা বছর ধরে শোকপালন করা হত।[১]

সমাধিক্ষেত্রে বহুসংখ্যক রক্ষী রাখার জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের প্রয়োজন হত। এটাও এক ধরনের অন্ত্যেষ্টি-ভোজ হিসেবে গণ্য হত। ওল্ড টেস্টামেন্টে এ ধরনের ভোজকে 'লেহেম ওনিম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ শোকার্তদের আহার। উপবাস শেষে আহার্য দান করতেন শোকার্তদের বন্ধুবান্ধবেরা। এই রীতি চিরকাল ধরে চলে আসছে।[২]

শোকপ্রকাশের একটি অঙ্গ ছিল উপবাস, বুক চাপড়ানো, রকের উপর বসে থাকা, মাথায় ছাই ছিটানো প্রভৃতি। শোকার্তরা মুখ বেঁধে খালি গায়ে ও খালি মাথায় হেঁটে যেত। কেউ কেউ মাথার চুল ফেলে দিত। কিন্তু পরে এ ধরনের প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টে নজির পাওয়া যায় যে, মৃতের বা মৃতব্যক্তিদের পুজো করা হত। তাদের উদ্দেশে বলি ও খাদ্য সরবরাহ করার রীতিও ছিল। পরবর্তীকালে যে অন্ত্যেষ্টি-ভোজের ব্যবস্থা দেখা যায়, তা হয়তো এই প্রথারই একটি ধারা হিসেবে এসেছিল। 'প্রেতাত্মারা ঘোরাফেরা করে' এই বিশ্বাস থেকেই মৃতের পুজো হত। প্রাচীনকালে গুণীজনের সমাধিক্ষেত্র উপাসনালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত। জেনেসিস (৩৫৲২০)-এ দেখা যায়, র‍্যাচেলের সমাধিক্ষেত্রে স্তম্ভ বসানো হয়েছিল। শেচেমের সমাধিক্ষেত্রে যোশেফেরও সমাধি আছে বলে মনে করা হয়। ইহুদী তাত্ত্বিকরা এই প্রথাকে বাতিল করে দিলেও দীর্ঘদিন তা চালু ছিল। কিছু কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন র‍্যাব্বিদের প্রাধান্য ছিল তখনও সাত দিন শোক পালন করা হত। এ সময় শোকার্তরা মাটিতে বা নিচু আসনে বসতেন। তারা এ সময় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন ও শোকজ্ঞাপকদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাতেন। নিয়ম ছিল যে, মৃতের সন্তানেরা এক বছর কোন আমোদপ্রমোদ করতে পারবেন না।

ইহুদীদের ক্ষেত্রে শোক পালনের সময় বার বার করে কাদ্দিশ পাঠ করার নিয়ম আছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর এগার মাস ধরে সন্তানদের এই গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। মৃতের সংবৎসর পালনের সময় কাদ্দিশ পাঠ করার বিধি আছে। কাদ্দিশের বক্তব্য এই ধরনের—'তার মহৎ নাম মহত্তর হোক, এবং তিনি নিজের ইচ্ছায় যে জগৎ

১ J.A. Montgomary, The Samaritans, Philad, 1907, p. 43 f.

২ Oesterley and Box, 304 ff.

তৈরী করেছেন সেখানে তা পবিত্র হোক। তিনি দ্রুত তোমার ও ইজ্রায়েলের জীবনকালে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করুন। বল আমেন' ইত্যাদি।

কারো কারো মতে এই মন্ত্র বা বাক্য প্রার্থনাকালেই উচ্চারিত হয়। মৃতের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র তৈরি হয় নি। তবে জনসমক্ষে মৃতের উদ্দেশে এই বাক্যগুলি পাঠ করার উদ্দেশ্য বোধহয় এই বোঝানো যে, মৃত ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার উত্তরাধিকারীরাও ধার্মিক ব্যক্তি। আবার কারো কারো মতে বার বার 'কাদ্দিশ' পাঠ করা হলে মৃতের নরকবাসকাল কমে যায় এবং তার আত্মার দ্রুত স্বর্গলাভ হয়। 'কাদ্দিশ' পাঠ শেষ হয় বাৎসরিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন। পিতামাতার পাপস্খালনের জন্য যদি এই পাঠকে এক বছরের বেশি সময় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেটাও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধার সামিল হয় বলে এর বেশি সময় আর পাঠ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মার সদ্‌গতির জন্য দিনে চার বার করে এই প্রার্থনা করা হয়। ইহুদীদের মধ্যে গোষ্ঠীগতভাবে শোকপালনের রীতি থাকলেও অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ছাড়া শোকপালনের নিয়ম নেই।

মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের গুরুত্বঃ—অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মতে শোক পালনের সময় চুল কেটে ফেলা, আত্ম নিগ্রহ, প্রভৃতি সর্বপ্রাণবাদজাত। আনুষ্ঠানিক-ভাবে পূর্বপুরুষ পুজা ও অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা তারা এই বোঝাতে চায় যে, মৃত্যুর পরও জীবন টিকে থাকে বা জীবাত্মা থাকে। এ সব অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। নানা পারলৌকিক ক্রিয়া মৃতের আত্মাকে দুষ্ট আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা করে। তা ছাড়া মৃতের ক্ষুব্ধ আত্মা যাতে জীবিত উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্যও এমন করা হয়। এ ধরনের বিশ্বাস যখন প্রবল ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে সেমেটিক জাতি তখন ধর্মের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সংশোধিত ধর্ম যখন প্রচলিত হয়, তখনও প্রাচীন এ রীতিগুলিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা যায় নি। তবে প্রত্যাদিষ্ট ইহুদীধর্ম এইসব রীতিনীতি তৈরি করে নি। তথাপি প্রাক্-খ্রীষ্টান যুগের অব্যবহিত পরবর্তী শতকে এ সব রীতিনীতির প্রাধান্য এ কথাই বোঝায় যে, মৃতদেহের পুজো করা হলে বা মৃতের আত্মার পুজো করা হলে জীবাত্মা খুশি হয়। পরে এমনও দেখা গেছে, মাঝে মাঝে অনেকেই মৃতের আত্মার উপদেশ লাভ করার জন্য সমাধিক্ষেত্রে যাচ্ছেন।

ইহুদীদের মধ্যে অনেকে শবযাত্রাকালে নিজেদের বিকৃত করে সাজাতো, নোংরা পোশাক পরত এবং মাথা ঢেকে রাখত। পণ্ডিতদের ধারণা, এটা করা হত ভীতি থেকে। এই ধরনের পোশাক পরে তারা মৃতের আত্মাকে বিভ্রান্ত করতে চাইতো, যাতে সে উত্তরাধিকারীদের চিনতে না পারে। আবার উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কাঁদা হত প্রেতাত্মাকে ভয় দেখিয়ে দূর করে দেবার জন্য। এ ধারণা আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাসের ধারা বেয়েই বোধহয় এসেছিল। যথাযথভাবে সমাধি দেওয়া হত এই কারণে, যাতে মৃতের আত্মা তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আটকে থাকে। অনেকে

যে মনে করেন, ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যই সযত্নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হত তা ঠিক নয়। আসলে এ হল হৃদয়ের স্বতোৎসারিত বিয়োগ-ব্যথার প্রকাশ মাত্র। এরই জন্য চিৎকার করে কান্না, আছাড়িবিছাড়ি, পোশাক-আসাকে অবহেলা প্রভৃতি দেখা দেয়। আমোদপ্রমোদের প্রতি উদাসীনতাও এ কারণেই আসে। এই স্বাভাবিক শোক প্রকাশই পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানরীতি হিসেবে দেখা দিয়েছে। শোকে মুহ্যমান ব্যক্তির এমন অদ্ভুত ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রুগ্ণ ব্যক্তির মৃত্যু হলে রোগের সংক্রামকতার' জন্য মৃতের দেহ অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এর সঙ্গে প্রেতাত্মার ভীতিও যুক্ত হয়েছে। ফলে জীবিতকালে যে ব্যক্তি প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৃতের অশুদ্ধি মৃতের সমাধিস্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। মৃতের দেহের প্রতি এই ভীতি থেকেই তার সমাধি না হলে লোকে এতে আরও ভয় পায়। সুতরাং শোক জ্ঞাপনের যে নানা প্রথা আছে কোন বিশেষ একটি সংজ্ঞা দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। মৃত্যু নানা দিক থেকে জীবিতদের স্পর্শ করে। ফলে দয়ামায়া, স্নেহ, কুসংস্কার, নানা জিনিস মিলেই অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। একদা কোন কারণে উদ্ভাবিত বিশেষ চিন্তা অপর সময়ে নব চিন্তা আরোপে হয়তো তার যথার্থ উত্তরসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং কোন প্রথারই মূলতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যথার্থই কষ্টসাধ্য।

জেনেসিস (৩)-এর মৃত্যু হল আদম ও ইভের ভুলের পরিণতি। এরপর থেকেই চিন্তার সূত্রপাত হয় যে, মানুষের মৃত্যু হয় নিজের পাপে। কিন্তু জেনেসিসের চিন্তা ওল্ড টেস্টামেন্টের মূল চিন্তা থেকে পৃথক; সেখানে মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস, সৎপথের পথিক দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। পরিণত বয়সে মৃত্যুর পর তার আত্মা পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। অবশ্য ইহুদীদের ধর্মপুস্তকের (Job 7. [15], [16] Ec 1[2]4[2], [8]) কোথাও কোথাও জীবনকে বোঝা এবং মৃত্যুকে আশীর্বাদ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কোন কোন স্থানে মৃত্যুকে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হয়েছে (Job. 28[22] Is 28[15], Hob. 2[5])। অন্যত্র মৃত্যু বলতে বোঝানো হয়েছে অধ্যাত্মতার মৃত্যু। এর দ্বারা দৈহিক মৃত্যু বোঝানো হলেও, এতে বোঝানো হয়েছে যে, মৃত্যু হল ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ, ঈশ্বরের রাজ্য থেকে নির্বাসন। সুলৎজ (Schultz) বলেছেন 'মৃত্যু হল পাপের পরিণতিস্বরূপ।' এইজন্য এখানে এমন কথাও আছে, 'আত্মার মৃত্যু মানে পুণ্যের অবক্ষয়, অশুভকে গ্রহণ।'[১]

ইহুদীতত্ত্বে মৃত্যু মানে প্যাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। সাধারণ বিশ্বাস, যখন দেহ কবরে পচতে থাকে তখন মৃতব্যক্তি ব্যথা বোধ করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যথা পাপকে ধুয়ে

১ Legg. Allegor, Ethics of Jewish Apocryphal Lit. Lond. 1909, p. 280

দেয়। এই ধরনের চিন্তাধারার বাইরে র‍্যাব্বি ও অন্যান্যদের মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ইহুদীরা বলে থাকে, 'অসাম্য, অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন, প্রভৃতি পাপ দ্বারা আমি যদি তোমাকে প্রথমাবধি ক্ষুণ্ণ করে থাকি মৃত্যুতে তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমার এক অংশ ইডেনের উদ্যানে থাক।'[১] আরও বলা হয়েছে 'যথার্থ অনুশোচনা দ্বারা সিক্ত হলে তবেই মৃত্যু ও প্রায়শ্চিত্ত যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

প্রলয়তত্ত্ব : মৃত্যুর পর আত্মার বিচার সম্পর্কিত বিষয় ইহুদীদের মধ্যে পরবর্তী সংযোজনা। মৃত্যুর পর আত্মা যায় পরলোকে। কিন্তু মৃত্যুই হল এ জগতের শেষ বিচার। কারণ এরপর সে ভিন্ন লোকে চলে যায়, যে জগৎ যেহোবার বিচারক্ষমতা ও করুণার বাইরে। ইহুদীদের শাস্তি ইহলোকেই সীমাবদ্ধ। এদের প্রলয়তত্ত্ব ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত। প্রলয়তত্ত্বের বিষয়ই হল ইহুদীজাতি। পরবর্তীকালের অনেক প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত উপাদান ইহুদীদের প্রোফেট সম্পর্কিত গ্রন্থেও পাওয়া যায়। মানবের উদ্ধারকর্তা দ্বারা নব স্বর্গরাজ্য সৃষ্টির চিন্তা ইহুদীদের মধ্যে পরবর্তীকালের। যেহোবা যে ইজরায়েল ও অন্যান্য জাতির বিচার করছেন তা কোন প্রতিশোধাত্মক বিচার নয়। বিচারের সময় পাপপুণ্যের উপস্থিতির বিচার এক কথায় 'যেহোবার দিন' নামে খ্যাত। এখানে যেহোবাকে পাপী জাতির বিচারক করে দেখানো হচ্ছে, যেখানে প্রতিশোধের ভাব প্রবল। তিনি শাস্তি দেন চাবুক কষে বা বন্দী করে রেখে। জেফানিয়াহ্ এবং পরবর্তী অন্যান্য প্রচারকদের এই প্রতিশোধাত্মক চিন্তার বৃত্ত আরও বৃহৎ। তখন যেহোবার ক্রোধ নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে। দুষ্ট ব্যক্তিরাই যেহোবার ক্রোধের বিষয়। তারা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেহোবা যখন শেষ বিচারের জন্য সক্রিয় হন তখন সমগ্র প্রকৃতিতে বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে যায়। সূর্য চন্দ্র তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। স্বর্গ কেঁপে ওঠে বা গুটিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পৃথিবী মহাপ্লাবনে ডুবে যায়। ভূকম্পন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বই থাকে না।

যেহোবার আবির্ভাবে প্রকৃতিতে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তার পেছনে রয়েছে এই ধরনের চিন্তা যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে রয়েছে যেহোবার উপস্থিতি। যেমন, ভূমিকম্প, প্লাবন, ঝড়, বজ্রপাত, সব। এগুলো তাঁর ক্রোধের প্রকাশ। এই ধরনের চিন্তার পেছনে রয়েছে প্রাচীনকালের প্রকৃতিধর্ম, যেখানে ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি কোন দৈবশক্তি হিসেবে প্রতিভাত হত।

ইহুদীদের প্রলয়তত্ত্বে বন্দীত্ব একটি অতিরিক্ত ঐতিহাসিক চিত্র। ইহুদীদের সঙ্গে যেহোবার আলোচনাতে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলেই শাস্তি দেওয়া হবে। এই শাস্তি দিয়েই (যার মধ্যে বন্দী করে রাখাও একটি ব্যবস্থা) তিনি পাপী জাতির মধ্যে তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং পাপের শাস্তি মানে

১ Koberle, Sunde and Onade, 334

ইজরায়েলের ক্ষেত্রে সংস্কার স্বরূপ। অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও তাই। এই শাস্তি দিয়েই তিনি পাপীকে ধ্বংস করেন এবং তাঁর অনুগামীদের রক্ষা করেন। অথবা অনুগামীদের শক্তিশালী করে মানুষকে সংশোধন করেন। তারা আবার নিজস্ব ভূমি ফিরে পায়, অথবা সেখানে থাকতে পারে, কারণ, চূড়ান্ত ধ্বংস হলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। ফলে যেহোবার শাস্তিদানের পরই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে শান্তি ও নিরাপত্তা। ইহুদীরা চিরকালই যেহোবাকে মুক্তিদাতা হিসেবে মনে করেছে। নতুন রাজ্যে তাঁরই শক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি জেরুজালেমে রাজত্ব করেন বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করে। আবার কারো কারো মতে উদ্ধারকৃত রাজ্যে যেহোবা নিজের করুণাভাজন কোন আদর্শ যোদ্ধা অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। ডেভিড জেন এমনই এক ব্যক্তি। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, তাঁর অধীনে ন্যায়পরায়ণ জাতিগুলি শান্তিতে বাস করবে। ঈশ্বরে ভীতি থাকলেই তিনি খুশি থাকেন। এই দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজাই উদ্ধারকর্তা বা মেশিয়ারূপে চিহ্নিত।

95, 82 থেকে 53 প্যাসিমে (passim) দেখা যায়, এই ধরনের বক্তব্য রয়েছে, 'ঈশ্বরের দান হিসেবে যে নিজের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করে, অপরের জন্য প্রাণত্যাগ করে, তার ঊর্ধ্বগতি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিই হলেন ইজরায়েলের পরিত্রাতা এবং অন্যান্য জাতির পথপ্রদর্শক। এই ব্যক্তি দ্বারা সমগ্র ইহুদী জাতি, অথবা ইহুদীদের মধ্যে সৎ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ ব্যক্তিকেও বোঝানো যেতে পারে। ইহুদীদের এই বক্তব্যের মধ্যে উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রভু যিশুর অনেক মিল রয়েছে। ইহুদীরা এই ধরনের কার্যকে উদ্ধারকর্তার কার্য হিসেবে যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে দেখে নি। ইহুদীদের তালমুদে ঈশ্বরানুরাগী যন্ত্রণাভোগী ব্যক্তিকে অনেক সময়ই উদ্ধারকর্তা বলে ভাবা হয়েছে। তিনি তাঁর জনগণের সঙ্গে একত্র দুঃখবরণ করছেন। ইহুদীদের এই শাস্তিভোগকারী উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে জাস্টিনই প্রথম বুঝিয়ে থাকেন। তবে সকল ইহুদীই যে এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে, তা নয়। বাইবেলের সুসমাচারের মধ্যে এমনতর চিন্তা নেই।

ইহুদীরা মনে করে যে, জিয়ন (Zion, প্যালেস্টাইনের একটি দুর্গ)-এর নবজাগরণ হবে। জিয়ন হবে জগতের অধ্যাত্মকেন্দ্র। পর্বতের চূড়ায় এই দুর্গ হবে অনড় ও শান্তির নিবাস। সব জাতিই জিয়নের দুয়ারে আসতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে প্রকৃতি বদলে যাবে। নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী দেখা দেবে। চন্দ্র তখন সূর্যের মত জ্বলতে থাকবে। সূর্যের জ্যোতি বেড়ে যাবে সাত গুণ। জলের অভাব থাকবে না। পশুদের শুকনো খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে। মানুষ ও পশুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য ও মদ্য পাওয়া যাবে। অনুর্বর পৃথিবী ইডেন-উদ্যানে পরিণত হবে। EZK-এর অভিমতে একটি মন্দির থেকে পবিত্র নদী প্রবাহিত হবে। এ নদী হবে মৎস্যপূর্ণ। এর তীরে থাকবে ফল ও ঔষধিদায়ক বৃক্ষরাজি। বন্য জন্তুরা পরস্পর মিলেমিশে বাস করবে। একটি ছোট

শিশু তাদের পরিচালিত করবে। কিংবা কোন হিংস্র পশুই আর থাকবে না। মানুষের সকল অশুভ দূর হয়ে যাবে। পঙ্গু হাঁটতে পারবে, বধির শুনতে পাবে, বোবা কথা বলতে শিখবে, অন্ধ দেখতে পাবে ; আর কোন দুঃখ, কান্না, দীর্ঘনিশ্বাস এসব থাকবে না। ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য ব্যক্তি আনন্দ ও সুখ অনুভব করবে। নবজাগ্রত জাতিসমূহ নতুন হৃদয় ও উদ্যম ফিরে পাবে। অসাম্য থাকবে না। ঈশ্বরের বিধি হৃদয়ে লিখিত থাকবে। সকলেরই ঈশ্বরজ্ঞান হবে।

উপরোক্ত যে সুখরাজ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা কোথাও ইন্দ্রিয়ধর্মী, কোথাও অধ্যাত্ম। পুরাণ কাহিনীর ইডেন উদ্যান ও স্বর্ণযুগের কথা স্মরণে রেখেই সমৃদ্ধ পৃথিবীর এই সুখচিত্র অংকন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই প্রলয়তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীতে এই সুখচিত্র পরবর্তীকালে পরলোকের সুখচিত্রের সঙ্গে এক। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সকলেই পরলোকে এই সুখরাজ্যের কল্পনা করেছে।

ভবিষ্যতের এই পার্থিব সুখচিত্র আঁকা হয়েছে ইজরায়েলের সৎব্যক্তিদের জন্য, যাদের মধ্য দিয়ে ইজরায়েল অমরত্ব লাভ করবে। তবে প্রশ্ন এই যে, প্রেতলোকের ভীতি তখনও মানুষের মধ্যে ছিল। এখানে যন্ত্রণাভোগের পর যদি নতুন পৃথিবীতে তারা সুখ-জগতের সন্ধান পায়, তাহলে সৎলোক মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে ? তারা তো প্রেতলোকের যন্ত্রণা সহ্য করবে না। তা হলে সুখী পৃথিবী যখন গড়ে উঠবে তারা কি তার স্বাদ পাবে না ? সুতরাং ধীরে ধীরে নতুন তত্ত্ব গড়ে ওঠে যাতে দেখা যায় যে, তারাও নবজন্ম লাভ করে সুখী পৃথিবী ভোগ করছে। তখনকার দিনে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল নতুন তত্ত্ব দিয়ে তা ভরিয়ে দেবার চেষ্টা চলে। এই ধরনের চিন্তার উপর ইরানীদের অনেক প্রভাব পড়েছিল বলে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা। সুতরাং দেখানো হয়েছে যে, শেষ বিচারের পর সৎব্যক্তিরা সৎজাতির সাহায্যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করবে। এই ঈশ্বরের রাজ্যে জেরুজালেম হবে কেন্দ্রস্থল।

যখন ইহুদীরা তাদের নিজভূমিতে ক্ষমতা ফিরে পেল তখনও দেখা গেল স্বর্গ রয়েছে ততটুকু দূরেই যতটুকু দূরে আদিতে সে ছিল। তথাপি দেখা গেল প্রচারকেরা শেষ বিচারের দিন সমাগত এবং দুষ্টের দমন আসন্ন একথা বলে চলেছেন। হেগ্‌গাই (Heggai)-এর মতে শেষ বিচার হবে অসভ্য বর্বরদের পক্ষে ধ্বংসের কারণ, যে ধ্বংসের উপর ত্রাতা-বিচারকদের নব রাজ্য স্থাপিত হবে। জোয়েল (Joel)-এর রচনাতেই প্রথম বিচারপর্বের যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। এই শেষ বিচারের আগে আকাশে কতকগুলি চিহ্ন ফুটে উঠবে। বিচারের দৃশ্যে দেখা যায় জেহোশফট প্রান্তরে নানা জাতি সমবেত হয়েছে। বিচারের পর তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, শুধু সংশোধিত ও নবজাগ্রত ইজরায়েল শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করছে। মালাচি (৩১ f)-তে দেখা যায় যেহবার আগে আসবেন এলিজা অথবা তাঁর

কোন দূত। যেহবা আসবেন বিচার করে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের ধ্বংস করতে এবং জেরুজালেমে বাস করতে।

ড্যানিয়েলে দেখা যায় চারটি পশুর স্বপ্ন দেখার পর বিচারের দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। এই চারটি পশু হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে চারটি দেশ, যেমন, ব্যাবিলন, মেডিয়া, পার্শিয়া এবং গ্রীস। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে প্রবীণতম ব্যক্তি পুস্তক খুলে বসে আছেন। পশুদের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চতুর্থ পশুটিকে হত্যা করার পরই পৃথিবীতে ইজরায়েলের সৎব্যক্তিদের অধীনে চিরন্তন সুখের রাজ্য নেমে আসছে।

ইজরায়েলের এই ত্রাণকর্তা 'মানবপুত্র' (son of man) নামে পরিচিত, যার কাছে পৃথিবীর সকল জাতি বশ্যতা স্বীকার করবে। ভিন্ন চিত্রে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর ঘোর দুর্দিনে মাইকেল ইজরায়েলকে উদ্ধার করছেন বা পবিত্র গ্রন্থে যাঁদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁরা সকলেই উদ্ধার পাচ্ছেন। পুনরুত্থিত হয়ে কেউ যাচ্ছে অনন্ত স্বর্গে কেউ অনন্ত নরকে এই অনন্ত নরকের ধারণা ছিল ইহুদীদের চিন্তাতে নতুন সংযোজনা।

হিব্রুদের চিন্তাতে ভবিষ্যতে শান্তির কথা একদিনে আসেনি। এসেছে ধীরে ধীরে। শুধু এজীবনে নয় পরলোকেও তাদের জন্য শান্তির চিন্তা এসেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে দুষ্ট লোকেরা মৃত্যুর পর সৎ ব্যক্তিদের আত্মা দ্বারা বিচার প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রলয় ও পরিত্রাতা সম্পর্কিত চিন্তাতেই এমনতর দৃশ্য বেশি দেখা যায়।

ইহুদীদের মধ্যে 'যেহোবার দিন' নামে একটি কথা আছে, যাতে দেখা যায় তিনি রাজকীয় ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে শত্রুভাবাপন্ন দুষ্ট শক্তিকে জয় করেছেন। পৌরাণিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই এমন চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। এতে দেখা যায় শেষ দিনে পৃথিবীতে বা জগতে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটছে। এই বিপর্যয় ও বিশৃংখলার মধ্য থেকে নতুন শৃংখলা আত্মপ্রকাশ করছে। এই ধরনের পুরানো চিন্তা আর একটি জনপ্রিয় চিন্তার জন্মদান করেছে। যাতে দেখা যায়, যেহোবা সেই বিশেষ দিনটিতে ইজরায়েলের শত্রুদের বিচার শেষে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। সুতরাং শেষ বিচারের দিন একটি রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মতই। এখানে কোন নীতিকথার স্থান নেই। ইজরায়েলের শত্রুদের শাস্তিদান করা হবে কারণ তারা শুধু ব্যাহত অনুষ্ঠান পালন করে গেছে। আলোর মধ্যে যেহোবা আত্মপ্রকাশ করবেন। অফুরন্ত ভূমি ও আনন্দ অনুষ্ঠান দেখা দেবে। প্রাচীনকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে যে স্বর্ণ অধ্যায় দেখা দিয়েছিল সেই স্বর্ণযুগ আবার ফিরে আসবে। আমোস এবং অন্যান্য ধর্মপ্রচারকেরা অবশ্য এ ধরনের চিন্তাধারাকে মোটেও আমল দেননি। তাঁরা মনে করেন যেহোবার দিনে অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে ইজরায়েলকেও শাস্তি পেতে হবে। কারণ তারা নীতিভ্রষ্ট হয়েছে। এ দ্বারা যেহোবা কোন দানবসদৃশ ক্রুদ্ধ প্রতিশোধপরায়ণ দেবতা নন একথাই প্রমাণিত হবে। আমোস্ এবং অন্যান্যদের চিন্তাতে বিচারের দিন ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রলয়ের দিন। কিন্তু এ ধারণা উদ্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি

ধারণাও দেখা দেয়। এতে দেখা যায়, জাতিগুলি দোষমুক্ত হচ্ছে। এমন কি অসভ্য বর্বরেরাও ত্রুটিমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাচ্ছে। এতে প্রাচীন স্বর্ণযুগের আদর্শই (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর নতুন স্বর্ণযুগ দেখা দিচ্ছে) নতুন শক্তি লাভ করেছে, নবসৃষ্ট পৃথিবী অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তবে সুখ সমৃদ্ধি ও সত্য তারাই লাভ করবে যারা সৎকর্মের পথিক। নবরাজ্য কোন স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সৎকর্ম দ্বারাই তা অর্জিত।

জেরেমিয়া এজেকিয়েল-এ দেখা যায় যে, যেহোবার সঙ্গে কোন জাতি নয়, ব্যক্তির সম্পর্ক। সুতরাং যেহোবার দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে বিচার হচ্ছে ব্যক্তির। সে বিচারে সৎ ব্যক্তিরা পুনর্বাসন পাচ্ছেন। অবশ্য জাতিরও বিচার হচ্ছে। যেহোবার দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে দেখা যাচ্ছে ইহুদীরা এমন চিত্রও কল্পনা করেছেন যাতে জেহোশফট উপত্যকায় যেহোবা ইজরায়েলকে উদ্ধার করার পর তার শত্রুদের বিচার করতে বসেছেন। দেখা যাচ্ছে ইজরায়েলের শত্রুরা তখন অনুতপ্ত। কিন্তু যেহোবা তাদের ধ্বংস করছেন।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যের উৎস ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তবে ফ্যারিসিদের সময় থেকে এ চিত্র ভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। খ্রীষ্টের সময়ে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার স্ফুরণ এ সময় থেকেই। এই প্রলয়তত্ত্বের লেখকেরা সমকালীন জনপ্রিয় চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যদিও এ ধরনের সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় নাও থাকতে পারে। যিশু যে প্রলয়-তত্ত্বের কথা বলেছিলেন সেটি সম্ভবত সমকালীন প্রচলিত বিশ্বাস থেকেই এসেছিল।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাতে দেখা যায় যে, পরিত্রাতার বা নবযুগের আবির্ভাব হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারাই। শেষ বিচারের আগে ভয়ানক দুঃখ দুর্দশা দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতিতে রীতিমত বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। ঈশ্বর বা তাঁর প্রেরিত ত্রাতা ইজরায়েলের শত্রুদের ধ্বংস করছেন। ইতিমধ্যে অবশ্য এইসব ভয়াবহ ঘটনার মধ্যে সত্যিকারের ইজরায়েল আড়ালে পড়ে থাকছে। এর পরই পৃথিবীতে সাময়িক বা চিরন্তন স্বর্গরাজ্য নেমে আসছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে পরিত্রাতার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কোথাও তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে যান্ত্রিকভাবে। কিন্তু অন্যত্র তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। ইজরায়েলের শত্রুদের নাশ সংক্রান্ত চিন্তা শেষ বিচারের দিনে রূপ পাচ্ছে। একই সঙ্গে আসছে পুনরুদ্ধারের চিন্তা। কোন কোন রচনায় এসময়ই পাচ্ছি পরলোকে ভবিষ্যৎ সুখ বা দুঃখের চিত্র।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাতে ভবিষ্যতের তিন ধরনের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেমন, (১) প্রচারকদের চিন্তা অনুসারে বিচারের পর পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসছে। (২) পার্থিব স্বর্গরাজ্য ক্ষণস্থায়ী। এর পরই বিচার আরম্ভ হচ্ছে, যার ফলে চিরন্তন জগতের উষালগ্ন আত্মপ্রকাশ করছে। এবং (৩) পৃথিবীতে নয় আসন্ন স্বর্গরাজ্য দেখা দিচ্ছে পরলোকে।

পরবর্তীকালে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুরুদের বার্তাতে দেখা যায় ইহুদীদের ভাল এবং মন্দ উভয় ধরনের ব্যক্তিদেরই পুনরুত্থান হচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত ইহুদীদের গ্রন্থে পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে দুষ্ট আত্মাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। দু একটি গ্রন্থে এদের উত্থানের কাহিনী থাকলেও দৈহিক উত্থানের কাহিনী নেই। পরে খ্রীষ্টানদের প্রভাবে সবারই উত্থানের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। তালমুদে (ইহুদী ধর্মীয় কবিতা) শুধুমাত্র সত্যাশ্রয়ীদের উত্থানের কাহিনী আছে। সত্যাশ্রয়ী জেনটিলরা উঠতে পারে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্ট (DN 12)-এ শেষ বিচারের দিন মৃতদের হাজির থাকতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কারো কারো প্রাথমিক বিচারপর্ব শেষ হয়েছে, এমনও রয়েছে। এক্ষেত্রে শেষ বিচারে দুষ্টদের আরও কঠিন সাজার উল্লেখ রয়েছে। যেখানে পরিত্রাতা ঘোষিত শাশ্বত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে সেখানে অবধারিত রূপে এমন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে শেষ বিচার অবশ্যই হয়েছে। সাময়িক বিচার হলে শেষ বিচারের কথাও রয়েছে।

মৃত্যু ও শেষ বিচারের দিনের মধ্যবর্তী সময়ে মৃতের আত্মাদের দেখানো হয়েছে পরলোক বা প্রেতলোকগামী হিসেবে। সেখানে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের দুষ্ট আত্মা থেকে পৃথকভাবে বাস করতে দেখা যায়। শেষ বিচারের দিন এই সত্যাশ্রয়ী আত্মারা উঠে এসে পরিত্রাতা ঘোষিত অনন্ত স্বর্গে স্থান লাভ করবে এমন বলা হয়েছে। মাঝে দেখা যাচ্ছে দুষ্ট আত্মাদেরও অনন্ত নরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রেতলোকে দুষ্ট আত্মারা শাস্তির মধ্যে বাস করলেও সত্যাশ্রয়ী আত্মারা স্বতন্ত্রভাবে সাময়িক স্বর্গে থাকছে। পরবর্তী ইহুদীতত্ত্বে দেখা যায় তাদের দুষ্টাত্মাদের জন্য নরক হল সাময়িক শাস্তির স্থান, অপরপক্ষে এই নরকই দুষ্ট জেনটিলদের জন্য অনন্ত যন্ত্রণাভোগের স্থান।

প্রলয় সংক্রান্ত আলোচনায় জেনটিলদের পার্থিব অবস্থা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। যে সকল অসভ্য সত্যাশ্রয়ী, যারা ইজরায়েলের শত্রু নয়, তারা পবিত্রাতার অধীন। যারা অনুতপ্ত হয়ে পরিত্রাতার বাণী গ্রহণ করেছে তারাও ইজরায়েলে এসে জ্ঞানদীপ্ত হতে পারে। বাকি জেনটিলরা শাস্তিলাভ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দু-রকম অবস্থার মধ্যে মানুষের বাস। একটি হল, অস্থায়ী, দুর্নীতিপূর্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক, অপরটি স্থায়ী, আনন্দদায়ক ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। যন্ত্রণাদায়ক, অস্থায়ী ও দুর্নীতিপূর্ণ যুগ থেকে মানুষকে স্থায়ী, আনন্দদায়ক ও দুর্নীতিমুক্ত জগতে স্থান করে দেন পরিত্রাতারা। দুভাবে এই যুগের সূচনা হতে পারে, যেমন, পরিত্রাতার অধীনে এবং স্বর্গে। ঈশ্বরের অস্থায়ী রাজ্য নরক ও স্বর্গের মাঝামাঝি অবস্থায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, নবযুগে স্বর্গরাজ্য লাভ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করতেন 'মানবপুত্র' তাদের জন্য স্বর্গে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রাখবেন।

কেউ কেউ মনে করেন অবেস্তাতে ইহুদীদের প্রচুর প্রভাব পড়েছে। আবার কেউ কেউ ভাবেন ইহুদী প্রলয়তত্ত্বে পার্শীদের অবদান প্রচুর। তবে এ ধারণা আগেও

ইহুদীদের মধ্যে ছিল কিনা তা স্পষ্ট করে বলা যায় না বলে একটা সন্দেহও আছে। তবে পার্শী ও ইহুদী প্রলয়তত্ত্বে প্রচুর ভেদও আছে। বাহ্যত মিল থাকলেও নানা অমিলও দেখতে পাওয়া যায়। এই অমিল রয়েছে মৌলের অন্তরালে। বরং ইহুদীদের প্রলয়তত্ত্বের অনেকটাই রয়েছে সেমিটিক জাতির পৌরাণিক কাহিনীতে। সুতরাং, ইহুদী প্রলয়তত্ত্বের রূপরেখা অংকনে তার কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাচীন পারশ্যে মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

প্রাচীন পারশ্যে জরথুস্ত্রবাদ আরম্ভ হবার আগে মৃতের সৎকার-ব্যবস্থা ছিল জরথুস্ত্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। ইরানের ব্যাকট্রিয়া বা বল্‌ক অঞ্চলে দেখা যায় রুগ্‌ণ এবং বৃদ্ধদের ফেলে দেওয়া হত কুকুরের খাদ্য হিসেবে। স্ট্র্যাবো, সিসেরো, ইউসেবিয়াস প্রভৃতির লেখা থেকে একথা জানা যায়। হেরোডোটাস ও স্ট্র্যাবোর লেখা থেকে জানা যায় যে, মগীরা (Mogy) মৃতদেহকে কুকুর ও পাখির ভোজ্য হিসেবে বাইরে ফেলে দিত। তবে পার্শীরা মৃতদেহে মোম মাখিয়ে কবরও দিত। সুতরাং ক্যাম্বিসেস যখন আমাসিসের দেহকে পোড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তা ধর্মবিশ্বাসভঙ্গের পর্যায়ে পড়েছিল। জেনোফোনের লেখা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট কুরুস নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সন্তানদের সঙ্গে তার দেহকে কবর দেওয়া হয়। সঙ্গে যেন সোনা রুপা বা অন্য কোন কিছুর আধার না থাকে। তবে জেনোফোনের এ বর্ণনাতে কেউ আস্থা স্থাপন করতে চান না। কারণ ক্যাম্বিসেসের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি মৃত্তিকাতে মিশে যাওয়াকে আশীর্বাদতুল্য বলে মনে করেছিলেন। সে জন্য দেহের উপর অন্য কিছু দেওয়া পছন্দ করেননি। কিন্তু মৃতদেহে মোম মাখিয়ে কবর দেবার রীতি তখনও প্রচলিত ছিল। জেনোফোন যে আব্রাদেত্‌ (Abradates) ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন তাও বিশ্বাস্য নয়। সেখানে দেখা যায়, আব্রাদেতের জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে এবং তার স্ত্রীর কোলে তার হাত রাখা হয়েছে। তাঁদের মৃতদেহে কিন্তু আচ্ছাদন টেনে দেওয়া হয়েছিল। ক্টেসিয়াস (Ctesias)-এর বর্ণনা বরং কিছুটা গ্রহণীয়। ক্টেসিয়াস বলেছেন ছোট কুরুসের ডানহাত ও মাথা যখন কবর দেওয়া হয়েছিল তখন তা মোম মাখিয়ে কবর দেওয়া হয়েছিল।

তবে এ পর্যন্ত প্রাচীন পারশ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর যত তথ্য পাওয়া গেছে সবই ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত। একিমিনিয়ানদের কবর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের দেহ জরথুস্ত্রের অনুগামীদের মত উন্মুক্ত আকাশের নিচে পশুদের আহার্য হবার জন্য রেখে দেওয়া হত না। এদের কবরে যে সব মৃতদেহ পাওয়া গেছে হয় তার উপর মোম মাখানো থাকতো, নয়তো মলম। এটা সম্ভবত মিশরীয় প্রভাবে করা হয়েছিল। অপর পক্ষে দেখা যায় পুরুষের দেহ সোনার কফিনে ভরে কবর দেওয়া হয়েছে।

তবে পারশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত প্রথাই পাল্টে যায় যখন জরথুস্ত্রের মতবাদ সেখানে গৃহীত হয়। জরথুস্ত্রবাদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে পরলোকের কোন সম্পর্ক নেই। মিশরীয়রা মনে করত যে, আত্মা দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু জরথুস্ত্রবাদীরা মৃতের দেহ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। তারা মনে করতেন যে

মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা কি হবে তা নির্ভর করত সংসারে জীবের কর্মফলের উপর। যারা অহুর মজদ-এর উপর অবিচল আস্থা রক্ষা করে চলে এবং তাঁর নিয়ম বিশ্বাস সহকারে অনুসরণ করে তারা মৃত্যুর পর অহুর মজদের পাশে স্থান লাভ করে। যারা অহুর মজদকে মানে না, নিষিদ্ধ কর্ম করে, তারা নরকে শাস্তি ভোগ করে থাকে। জগৎ ধ্বংসের সময় অংগ্র মইন্যুর সঙ্গে তাদের আত্মাও শেষ হয়ে যায়। আগাথিয়াগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, মৃতদেহকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পশুপাখির আহার্য হিসেবে রাখা হত। মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরও অনুরূপভাবে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, পার্শীরা মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য কফিন ব্যবহার করত না। কোন মৃৎপাত্রেও মৃতদেহ রাখা হত না। এই জন্যই দেখা যায় যে, পঞ্চম শতকে সাসানিয়ান শাসক কোবাদ দাবি করছেন যে, সাইবেরিয়ার খ্রীষ্টান শাসক গার্গেন (Gurgenes)-এর মৃতদেহ পশুপাখির আহার্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হোক। তাঁকে যেন কবর দেওয়া না হয়। কিন্তু তাঁর এ দাবি গ্রাহ্য হয়নি।

পার্শীদের প্রলয়তত্ত্ব : অবেস্ততে বুনদাহি (Bundahis)-দের এবং পরবর্তী আরো অনেকের প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত আছে। তবে এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কতটা যে আদিম অধিবাসীদের তা বলা দুষ্কর। সম্ভবত আদিম অধিবাসীরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর জীবের সত্তা স্থূলদেহে নয় আত্মাতে বেঁচে থাকে।

তবে প্রাচীন পার্শীদের এ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের চারদিকে তিনদিন তিনরাত্রি ঘুরে বেড়ায়। ব্যক্তি যদি সত্যাগ্রহী হয় তার আত্মা পরলোকের দুষ্ট আত্মাদের বিরুদ্ধে 'স্রোশ' (Srosh)-এর সাহায্য লাভ করে। যদি দুষ্ট ব্যক্তি হয় তার আত্মা পরলোকে দুষ্ট দেবদূতের দ্বারা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। সুতরাং ইহলোকে কে কি ধরনের ছিল তারই উপর নির্ভর করে পরলোকে কাদের সাহায্যে কে কোথায় যাবে, এবং কি ধরনের ব্যবহার লাভ করবে। পরলোকে চিনবৎ (Chinvat) সেতু নামে এক সেতু আছে। এখানে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা এসে পেঁছানো মাত্র এক অপূর্ব সুন্দরী কুমারীকে দেখতে পান। এই কুমারী তারই শুভ কর্মফলজাত। সুন্দরী তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। এখানে তাকে 'অহুর' (শ্রেষ্ঠ দেবতা)-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। . তাঁকে স্বাগত জানায় 'বহুমনো' এবং স্বর্গীয় পোশাক ও সোনার সিংহাসন দেওয়া হয়। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির আত্মা যখন চিনবৎ সেতুর কাছে এসে পেঁছোয় তখন সে দেখতে পায় এক বিশ্রী পেত্নী তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই পেত্নী তারই দুষ্টকর্মফলজাত। সে তাকে নরকে নিয়ে যায়। এই নরক হল অস্পষ্ট জগৎ (এ কথা যে মিথ্যে নয় অর্থাৎ অস্পষ্ট জগতের কথা, যারা যোগী তাঁরা তা জানেন।) চিনবৎ সেতুর কাছে পাপপুণ্যের পরিমাপ করেন তিনজন বিচারক— মিথ্র, রশনো এবং সুশ। ওজন করার সময় (মিশরীয় প্রভাব) তুলাদণ্ড যাদের ডানর দিকে যেত তাদের রাখা হত মধ্যবর্তী এক স্থানে যাকে বলা হত—হমেস্তকান

(Homestakan)। অর্থাৎ যারা তেমন পাপীও নয় তেমন পুণ্যবানও নয় তারাই এখানে স্থান পেত। চিনবৎ সেতুর এক দিক ছিল নরকে, একদিক স্বর্গে। সত্যাশ্রয়ীর আত্মার জন্য এই সেতুর প্রশস্ততা বেড়ে যেত। তারা নিরাপদে স্বর্গে গিয়ে পেঁছুতো। কিন্তু দুষ্ট আত্মাদের জন্য এটা এতই সংকীর্ণ হয়ে যেত যেন সুতো বা ক্ষুরের মুখের ধারের মত। এর উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তারা নরকে পড়ে যেত।

প্রাচীন ইরানীরা মনে করত যে, পৃথিবীতে এক একটি যুগ তিনহাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। প্রতি তিন হাজার বছরের শেষ দিকে জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয়। দু'হাজার বছর আরম্ভ হবার মুখে দুষ্টশক্তির প্রভাব বাড়ে। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তখন 'হুশেতর'-এর জন্ম হয়। ধর্ম আবার পুনঃস্থাপিত হয়। জীব তার যথার্থ ব্যবহার আরম্ভ করে (গীতার 'যদা যদাহি ধর্মস্য'...ইত্যাদির মত ?) শেষ হাজার বছরে 'হুশেতর-মহ' জন্ম নেয়। এসময় মানুষের আরও উন্নতি হয়। তারা অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু তার পরই আবার দুষ্টশক্তির প্রভাব বাড়ে। অঝি দহক (Azhi Dahak) নামক সর্প যাকে ফ্রেতুন দেমাবেন পর্বতে আটকে রেখেছিলেন বন্ধন ছিন্ন করে সে আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু সম (Sam) তাকে ধ্বংস করে। এই যুগের শেষে যোশিয়ান নামে পাশীর্য়ান পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি দুষ্ট শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে পুনরুত্থান ঘটান এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব তৈরি করেন।[১] আবার নতুন জগতের সূচনা হয়। সমগ্র মনুষ্য জাতি গয়োমর্‌ত (Gayomart) থেকে মশ্য (Mashya) ও মশ্যোয়ি (Mashyoi) পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠে (Vide Adae et Evae=আদম জাগে আগে পরে তার উত্তর পুরুষেরা)। এরপরই হয় বিরাট সমাবেশ—যেখানে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ভাল ও মন্দ কর্মফল দেখতে পায়। এখানে সত্যাশ্রয়ীদের দুষ্ট আত্মা থেকে পৃথক করা হয়। সত্যাশ্রয়ীদের নেওয়া হয় স্বর্গে ও দুষ্ট আত্মাদের নরকে। এখানে তিন রাত্রি তাদের শাস্তি হয়। এটাই তাদের শেষ শাস্তি। আগুন তখন পৃথিবীকে গলিয়ে দিয়ে নদীর মত তৈরি করে। সকলকেই এই লাভাসদৃশ নদীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সত্যাশ্রয়ী আত্মাদের কাছে একে মনে হয় গরম দুধের মত। কিন্তু দুষ্টাত্মারা একে বোধ করে গলিত ধাতুর ন্যায়। অহ্রমন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অহুর ও দেবদূতদের কাছে পরাজিত হয়। অহ্রমন আগুনে পুড়ে মরে। এরপর সব আবার এক হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন একে অপরকে চিনতে পারে। মানুষ জেগে ওঠে চাল্লিশ বৎসর বয়স নিয়ে, শিশুরা পনের বছর। প্রত্যেকেই তখন অমর। তাদের দেহ তখন অধ্যাত্ম দেহ। প্রত্যেকে তাদের কাজের গুণ হিসেবে পুরস্কৃত হয়। নরক পবিত্র হয়। নরককে পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পৃথিবীর আয়তন বাড়ানো হয়। নতুন বর্ধিত পৃথিবী স্বর্গকে স্পর্শ করে। প্রলয়তত্ত্বে পাশীর্রা এই যে সুখানুভূতির কল্পনা করেছিল সেই সুখ পার্থিব ও স্বগীর্য় সুখের সংমিশ্রণে তৈরি।

---

১ Yast, iii, iff, Bundahis, xi, ff, দিনকরত্‌, vii, of

পরবর্তী পার্শীদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ পরবর্তীকালে পার্শীদের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যু আসন্ন বোঝা গেলে পার্শীরা একজন বা দু'জন পুরোহিতকে ডেকে আনে। তাঁদের কাজ হয় আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছ থেকে পাপের স্বীকৃতি আদায় করা। পাপের স্বীকারোক্তিকে পার্শীরা বলে 'পতেত' (Patet)। পাপের স্বীকারোক্তি আবৃত্তির মত করে বলা হয়। পুরোহিতদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কেউ যদি বার বার এই স্বীকারোক্তি করতে পারে তবে তা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। 'সদ দর' (Sad dar XIV) অনুসারে যে পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে সে নরকবাসের দায় থেকে অব্যাহতি পায়। চিনবৎ সেতুর কাছে পাপের শাস্তিলাভ করে সে নিজের গুণ অনুসারে স্বর্গ লাভ করে। স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রয়োজন যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে শেষ মুহূর্তে 'অশেম বোহু' আবৃত্তি করলেই চলে। 'সদ দর'-এর মতে কেউ যদি নরকবাসের যোগ্য হয় এই আবৃত্তি করলে সে স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি অঞ্চলে থাকতে পারে। স্বর্গ ও মর্ত্যের এই মাঝামাঝি স্থানকে বলা হয় 'হমেসতকান'। যে ব্যক্তি নিজের কর্মফল দ্বারাই এই 'হমীসতকা' লাভ করতে পারে সে এই 'অশেম বোহু' আবৃত্তি করলে স্বর্গে যেতে পারে। যে স্বর্গ লাভ করার যোগ্য সে উচ্চতর স্বর্গ লাভ করে। 'বেন্দ' গ্রন্থে আছে—'তনুপ্রেম'-মৃত্যুর ক্ষেত্রে 'উপমন' বা দীর্ঘতর শোক প্রকাশ করার রীতি আছে। 'তনুপ্রেম'-মৃত্যু হল সেই ধরনের মৃত্যু যেখানে 'পতেত' বা 'অদেম বোহু' আবৃত্তি করা সম্ভব হয়নি। কখনও কখনও এজন্য কয়েক ফোঁটা হোওমা (Haoma) নির্যাস ফেললেও কাজ হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির মুখে যদি তা দেওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। যেন ভারতীয় হিন্দুদের গঙ্গাজল। হোওম (সোম ?) নির্যাস অমরত্ব আনে বলে বিশ্বাস।[১] পূর্বে এই প্রথা পার্শীদের সবাই অনুসরণ করত। এর সঙ্গে মুমূর্ষুর মুখে কয়েক দানা ডালিমের দানা দিয়ে দেওয়া হয়। পার্শীদের অনুষ্ঠানে এই ডালিমের দানা পবিত্র হিসেবে স্বীকৃত।

মৃত্যু ঃ বেন্দ (Vend V. 10) অনুসারে প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদীরা মৃতের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ তৈরি করত যেমন পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু। গুজরাটের বা মহারাষ্ট্রের পার্শী সমাজে আজও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য স্থানে মৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার জন্য পূর্বাহ্নে একটি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। তারা মৃতদেহ আগাগোড়া ধুয়ে পুরানো অথচ পরিষ্কার শাদা বস্ত্র দিয়ে তা আচ্ছাদিত করে। এ কাপড় আর ব্যবহার করা যায় না। মৃতের কোন আত্মীয় দেহের উপর জড়ানো পবিত্র সূত্র রক্ষা করে এবং—'অহুর মজদ খুদাই' আবৃত্তি করে। এই 'আহুর মজদ খুদাই' হল 'পজন্দ'-এর একটি প্রার্থনা মন্ত্র। মৃতদেহকে মৃত্তিকাতে একখণ্ড শ্বেতবস্ত্রের উপর রাখা হয়। দুজন

১ ইরানীয় 'এইচ'-যার ভাওয়েল ভারতে 'এস' উচ্চারণ হয়। সুতরাং হোওম = সোম হতে পারে।

আত্মীয় পাশে বসে মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকে (হিন্দুদের মধ্যেও এ রীতি আছে)। দেহ ছুঁয়ে থাকা হয় যেন সেতু তৈরি করা হচ্ছে এই ভাব বোঝানোর জন্য। মৃতের কানের কাছে 'অশেম বোহু' আবৃত্তি করা হয় (হিন্দুরা যেমন গীতা পাঠ করে বা হরিনাম করে)।

মৃতদেহের অশুচিতা ঃ মৃত্যু হবার পর মানুষের দেহকে 'দ্রুজ নসু' নামে এক ধরনের মৃতদেহের দৈত্য আক্রমণ করে বলে পার্শীদের মধ্যে ধারণা আছে। 'বেন্দ' (Vend vii, 1-5)-এর ধারণা, উত্তর দিক থেকে এই দৈত্য মৃতদেহের কাছে আসে। আসে 'মাছির' ছদ্মবেশে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এরা এসে থাকে। অবশ্য স্বাভাবিক মৃত্যুর পর। কিন্তু মৃত্যু যদি অস্বাভাবিক হয়, যেমন কুকুরের কামড়ে, নেকড়ের মুখে বা ডাইনীর তুকতাকে, শত্রুর অথবা অন্য কোন লোকের হাতে, ফাঁসি দিয়ে বা পাহাড় থেকে পড়ে তবে দ্রুজ আসে গাহ্ (Gah)-এ অর্থাৎ দিনের পাঁচ ভাগের একভাগ সময়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কর্মচারীই শুধু মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে (যাদের সকলেই ঘৃণা করে)। এজন্য এই কর্মচারীদের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হয়। অন্য কোন ব্যক্তি তা স্পর্শ করলে তার দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। এজন্য তাকে শুদ্ধ হতে হয়। এই শুদ্ধিকরণকে বলে 'বরশ্নুম'। নয়দিন ধরে তাকে এজন্য গোচনা দিয়ে ধুইয়ে দেওয়া হয়।[১]

প্রাচীন অশৌচ সম্পর্কিত ধারণা অবেস্ত-এর আমলে কিছুটা নতুন রূপ নিয়ে টিকে আছে। মজদবাদে বিশ্বাসী লোকের মৃত্যু হলে পার্শীরা সে দেহ অশুভ শক্তির প্রভাবে প্রাণ হারিয়েছে এরকম মনে করে। ফলে তা অশুচি বলে গণ্য হয়। কিন্তু মজদবাদে বিশ্বাস করে না এমন ব্যক্তির মৃতদেহ শুচি বলে বিবেচিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, তার মৃত্যু হয়েছে অহুর মজদ-এর হাতে বা তার মৃত্যুতে মজদবাদ প্রসারের পথ সুগম হয়েছে। দুষ্ট লোক জীবিতকালেই ক্ষতি করতে পারে, মৃত্যুর পরে নয়।

মৃতদেহের পৃথকীকরণ ঃ মৃতদেহের পাশে যে দুজন আত্মীয় বসে থাকে তাদের পাশেই থাকে 'নসুকশ্'রা। এরা হল মৃতদেহ বহনকারী—যারা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যায়। এখন ভারতে এদের বলা হয় 'খান্ধ্য' (Khandhya)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারী দুজন ব্যক্তি পবিত্র সূত্র ধারণ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে 'স্রোশ-বাজ' নামে মন্ত্র পড়ে। এই মন্ত্রের শেষ শব্দ 'অশহে'। এর পর এরা মৃতদেহ যে ঘরে রাখা হয় সেই ঘরে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে থাকে এক টুকরো কাপড় বা সুতোর ফিতে, যাকে বলা হয়—পইবন্দ (paivand)। এরা মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। কিন্তু মুখ ঢাকে না। তবে কোথাও, যেমন গুজরাটের পার্শীরা আপাদমস্তকই মৃতদেহ ঢেকে দিয়ে থাকে। দুজন খান্ধ্য তখন কাঁধে তুলে মৃতদেহকে ঘরের কোণে বসানো একটি পাথরের উপরে রাখে। মৃতের হাত বুকের উপর ভাঁজ করে দেওয়া হয়।

১ Vend ix.

কোন মতেই মৃতদেহের মুখ উত্তর দিকে রাখা হয় না। কারণ পাশীরা মনে করে যে, দ্রুজ-দৈত্য ঐ দিক থেকেই আসে। তবে কোথাও কোথাও পুরনো অবেস্তর প্রথা অনুসরণে পাঁচ ইঞ্চির মত মাটি খুঁড়ে, তার উপর বালি ফেলে মৃতদেহ তারই উপর রাখা হয়। 'ইয়েজদ্' নামক স্থানে মৃতদেহকে শবদণ্ড থেকে তুলে পাথর ও কাদা দিয়ে তৈরি একটি উঁচু বেদীতে রাখা হয়। এই বেদী ন'ফুট লম্বা ও চার ফুট চওড়া।[১] এই বেদী জীবিতদের কাছ থেকে তিনটি গভীর বৃত্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। এই বৃত্তকে বলে 'কশ' (kasha)। ধাতব কোন দণ্ড বা শাবল জাতীয় জিনিস দিয়ে এই বৃত্ত রচনা করা হয়। বৃত্ত আঁকে খাশ্ধ্যরা। এরপর এরা এই ঘর ছেড়ে যায়। অবশ্য তখনও পইবন্দ বা সুতোর ফিতে তৈরি করতে থাকে এবং—'স্রোশ বাজ' পাঠ শেষ করে।

কুকুরের দৃষ্টি বা সগদীদ ঃ এর পর অদ্ভুত কাজ করা হয়। চার চোখওয়ালা একটি কুকুর মৃতদেহের কাছে নিতে আসা হয়। চারচোখওয়ালা কুকুর বলতে বোঝায় সেই কুকুর যার ভুরুর উপর চোখের মণির মত দুটো ফুট্‌কি আছে। কুকুর আনা হয় দ্রুজকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য। বেন্দ (vend vlii-16)-এর মতে হলুদ কানওয়ালা সাদা কুকুরেরও দৈত্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে। এমন ধরনের কুকুর হাতের কাছে পাওয়া না গেলে যে-কোন কুকুর হলেও চলে। প্রত্যেকটি 'গা'-এর পর 'সগদীদ'-এর পুনরাবৃত্তি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন চলে। এই কুকুর যদি স্বেচ্ছায় মৃতদেহকে পরিভ্রমণ করে তবে তিনবার ঘুরলেই হয়। যদি জোর করে ঘোরানো হয় তবে ছয় বা ন'বার ঘোরানো হয়। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময়ও কুকুর সঙ্গে রাখা হয়। যাতে সে দৈত্যকে ভয় দেখাতে পারে। ইয়েজদ-এ সাধারণ 'পথের কুকুর' হলেও চলে। মৃতদেহের চার দিকে ও বুকে রুটির টুকরো রাখা হয় যাতে সে ঘুরে ঘুরে এসব খায়।[২] নিস্তব্ধ বুরুজে মৃতদেহকে তোলার আগে আর একবার 'সগদীদ' করা হয়। শুধুমাত্র কুকুর নয় বেন্দ-এর মতে মাংসভোজী পাখিদেরও দৈত্য তাড়াবার ক্ষমতা আছে। মাংস ভোজী পাখি মৃতদেহের উপর দিয়ে উড়ে গেলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে পাশীরা মনে করে।

দৈত্য বা অপশক্তি বিতাড়ক অগ্নি ঃ প্রথম সগদীদ-এর পর দৈত্যবিতাড়ক আগুন আনা হয়। এই আগুন জ্বালানো হয় চন্দন কাঠ দিয়ে। এতে গুগ্‌গুল ছিটোনো হয়। যতক্ষণ মৃতদেহ ঘর থেকে সরানো না হয় ততক্ষণ 'অবেস্ত' থেকে পাঠ চলতে থাকে। যিনি 'অবেস্ত' পাঠ করেন তিনি মৃতদেহ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে তিনপা দূরে থাকেন।

মৃতদেহ সরিয়ে নেবার সময় ঃ মৃতদেহ সরিয়ে নেবার জন্য পাশীদের বিশেষ একটি সময় আছে, সে সময় হল দিনের বেলা। দিনের বেলা সরিয়ে নেওয়া হয় এই

---

১ Jackson, Persia, p. 391.

২ Jackson, Persia, p. 389.

কারণে যে, তা যেন সূর্যের আলোর নিচে থাকে। প্রাচীনকালে মৃতদেহ মাসের পর মাসও মৃতগৃহে থাকত। কিন্তু ভারতে এখন পরদিন সকালবেলাই এই দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়, অবশ্য যদি রাতে মৃত্যু হয়। দিনে মৃত্যু হলে দিনেই সরিয়ে ফেলা হয়। সকালে হলে সন্ধ্যার মধ্যেই সরানো হয়। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মৃতদেহ আরও বেশিক্ষণ থাকতে পারে।

মৃতদেহের অপসারণ: দুজন মৃতদেহবাহক যাদের বলা হয় 'নসা-সালার' তারা সাদা কাপড় পরে হাতে দস্তানা লাগিয়ে সুতোর ফিতে পাকাতে পাকাতে ঘরে ঢোকে। ঢোকে দখম-তে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে। তারা সঙ্গে নিয়ে আসে লোহার দণ্ড যার উপর মৃতদেহ নেওয়া যায়। একে বলে গহন (Gahan)। সব সময়ই মৃতদেহবাহক দু'জন হয়, এমন কি কোন শিশুর মৃতদেহকে বহন করতে হলেও। কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা হয় না এই কারণে যে, তা সংক্রামক। এই দণ্ড মৃতদেহের পাশে রাখা হয়। মৃতদেহবাহকেরা 'অশাহে' পর্যন্ত 'স্রোশবাজ' পাঠ করে এবং ফিসফিস করে বলে—'অহুর মজদ, অমশসপন্দ, পবিত্র স্রোউশ, আদারবদ মহ্রেস্পন্দ, সেই মুহূর্তের দস্তুর-এর নির্দেশক্রমে।' এর পর এরা নীরবে 'কোসটি' করে বসে থাকে। এবং 'গা'-এর জন্য নির্দিষ্ট শ্লোক বার বার পাঠ করে যায়। এর পর ফিতে পাকাতে পাকাতে মৃতের ঘরে ঢুকে বিশেষ ধরনের মুখঢাক্না পরে নেয়। আবার 'অশাহে' পর্যন্ত স্রোশবাজ পাঠ ক'রে—'অনুনাবতি গাথা' আরম্ভ করে। এ সময় তারা দরজার কাছে মৃতদেহ থেকে তিন পা দূরে থাকে। যাসনা থেকে পাঠ চলে (yasna xxxi. 4) 'হে বোহুমন আমার জন্য শক্তিশালী রাজ্য কামনা কর যার সীমানা বৃদ্ধির ফলে আমরা দ্রুজকে জয় করতে পারি…।' এর পর মৃতদেহ বাহকেরা দণ্ডের উপর দেহ তুলে নেয়। পুরোহিত এই সময় মৃতের দিকে ফিরে তাকিয়ে গাথা পাঠ করে। এরপর আবার সগদীদ করা হয়। এবার মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে শেষবার দেখে নেয়। মৃতের মুখ ঢেকে দেবার আগে তারা মাথা নিচু করে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

শবযাত্রা: মৃতদেহ ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে নসা-সালার-রা দু'জন খান্ধ্য-এর হাতে তুলে দেয়। এরা নীরব বুরুজের কাছে মৃতদেহকে নিয়ে যায়। দু'জন পুরোহিত শবযাত্রার আগে যান। 'শব' থেকে তাঁরা প্রায় ত্রিশ পা পেছনে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। এদের মধ্যে দুজন সাদা কাপড় পরে সাদা সুতোর ফিতে বানাতে বানাতে পাশাপাশি হেঁটে চলে। পারশ্যে অবশ্য এ রীতি ভিন্ন ধরনের। সেখানে একজন আগে আগে যায় একপাত্র আগুন নিয়ে। তার পেছনে পেছনে যায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মৃতদেহ, পুরোহিত এবং মৃতের পরিবারের বাড়তি লোকেরা। 'দখ্ম' যদি অনেক দূরে হয়—তাহলে গরু বা গাধার পিঠেও মৃতদেহ নেওয়া চলে। শোকার্তরাও বাহনের পিঠে চেপে যেতে পারে। তবে পুরোহিতকে হেঁটেই যেতে হয়।

বুরুজ : বুরুজের কাছে এসে শববাহন দণ্ড দরজার পাশে নামানো হয়। এবার মৃতের মুখের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়, যাতে উপস্থিত সকলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারে। এ সময় অবশ্য সবাইকে মৃতদেহ থেকে তিন পা দূরে থাকতে হয়। আর একবার সগদীদ করা হয়। এবার যে দুজন 'নসা সালার' গৃহ থেকে মৃতদেহ তুলেছিল শুধুমাত্র তারাই মৃতদেহ নিয়ে বুরুজে ঢুকতে পারে। এখানে তাদের 'দখ্‌ম'-এর জন্য বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরতে হয়। লোহার তালা খুলে দরজার ফাঁকে মৃতদেহ নিয়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করে। মৃতের মুখ সব সময়ই থাকে দক্ষিণ দিকে। মৃতদেহকে নগ্ন ক'রে 'কেশ' নামক এক ধরনের পাথরের বিছানায় রাখা হয় যার আকৃতি হল সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। এই বৃত্ত যেন দেখতে কিছুটা ক্রমোচ্চ রঙ্গমঞ্চের মত যাকে বলে amphitheatre. এখানে মৃতদেহকে মাটি, কাদা, ইঁট, পাথর বা ভেজানো চুনবালির ওপর রাখা যায়। প্রকৃতির ঝাড়ুদাররা অর্থাৎ শকুন আদি পাখিরা কাছেই থাকে। মৃতদেহের জন্যই তারা অপেক্ষা করে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মৃতদেহের দ্রুত পচনশীল অংশ এদের উদরে চলে যায়। এই বুরুজ থেকে 'নসা সালার' বছরে দুবার হাড় গোড় তুলে এনে কুয়োতে ফেলে দেয়। সূর্যের আলো, বৃষ্টি, ধুলো, সবে মিলে অল্প দিনের মধ্যেই হাড়গুলিকে ধুলোতে পরিণত করে। অনেকে 'দখ্‌ম'তে মৃতদেহের উপর বৃষ্টিপাতকে সুবিধাজনক মনে করে। প্রাচীনকালে কিন্তু এই হাড়গোড় এমনি করে নষ্ট না করে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আত্মীয়-স্বজনেরা সযত্নে রক্ষা করত। এই প্রসঙ্গে পার্শীদের বেন্দ-এ এই ধরনের আলোচনা আছে—'হে অহুর মজদ মৃতের কঙ্কালকে আমরা কোথায় রাখব?' অহুর মজদ জবাব দিলেন, 'কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতির বাইরে তোমরা এর জন্য গৃহ বা 'উজদানেম' তৈরি করতে পার। উপর থেকে যেন বৃষ্টি এই হাড়ের উপর না পড়ে। যদি মজদপন্থীরা ধনী হয়—তা হলে তারা এই সব পাথর প্লাস্টার বা মাটি দিয়েও তৈরি করাতে পারে। যদি ধনবান না হয় তাহলে এগুলিকে তারা মুক্ত আকাশের নিচে সূর্যের দিকে মুখ করেও রাখতে পারে।'

পারস্যে এখন জরথুস্ত্রবাদীরা নেই বললেই চলে। অল্প কিছু জরথুস্ত্রবাদী যারা আছেন, তাঁরা 'দখ্‌ম' তৈরি করার মত ক্ষমতা ধরেন না। ফলে এঁরা মৃতদেহকে কাছের কোন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। দেহের চারপাশে পাথরের তৈরি বেড়া দিয়ে উপর থেকে ঢেকে দেওয়া হয়। এ যে কবর দেওয়া, তা নয়।[১]

কঙ্কাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের দাদিস্তান (xviii,)-এর নির্দেশ থেকে দেখা যায় যে মৃতের হাড়গোড় সংগ্রহ করে মাটির উপর নিচু করে ঘর তৈরি করে তার মধ্যে এগুলি রেখে ঢেকে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একে বলে—'অস্তোদান'। কঙ্কালের এই আধার তৈরি করা হত সূর্যের আলো থেকে হাড়গোড় রক্ষা করার জন্য। বৃষ্টি ও জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও এমন করা হত।

১ Jackson, p. 394.

এই আধার দুটো পাথর খোদাই করেও করা যেত। এর একটি কাজ করত কফিন হিসেবে, আর একটি ঢাকনা হিসেবে। এখন অবশ্য হাড়গোড় আর রক্ষা করা হয় না।

'দখ্‌ম'ঃ দখ্‌ম (Dakhma) হল মৃতদেহকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাখার জন্য তৈরি। অবেস্তাতে এর উল্লেখ আছে। পার্শীদের মতে 'দখ্‌ম' হল পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অপবিত্র ও ভয়াবহ স্থান। এই জন্য 'দখ্‌ম' নষ্ট করে ফেলে সেখানে চাষের জমি তৈরি করা একটি কৃতিত্বের কাজ বলে চিহ্নিত। ভারতে পার্শীরা যে 'নীরব বুরুজ' তৈরি করেছে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এখানে তিন দিন পবিত্রকরণের কাজ চলে।

শবযাত্রা ভঙ্গঃ প্রত্যেকটি 'দখ্‌ম'-তেই এক ধরনের বেদী থাকে, যাকে বলে 'সাগ্রী'। এখানে এসেই শবযাত্রা শেষ হয়। নসা সালাররা যখন কাজ করে তখন 'সাগ্রী'তে যারা জড়ো হয় তারা 'স্রোশবাজ' পড়া শেষ করে। ফিতে পাকানো শেষ করার সময় তারা আবৃত্তি করে—'সমস্ত পাপের জন্য অনুতাপ করছি, মৃতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রইল। আমরা এখানে এই ধার্মিক ব্যক্তির কর্মসমূহ স্মরণ করি।' এরপর সকলেই গোচনা নেন, এবং দেহের নগ্ন স্থানগুলি ধুয়ে দেন, 'কোস্‌তি' করেন এবং 'পতেত' পুনরাবৃত্তি করেন। প্রত্যেকবার আবৃত্তির শেষেই মৃতের নাম উচ্চারণ করা হয়। এর পরই গৃহে ফিরে সকলেই স্নান করে নেন।

গৃহে অনুষ্ঠানঃ মৃতদেহ গৃহ থেকে সরিয়ে নেবার পরই সর্বত্র গোচনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে যে পাষাণ বেদীর উপর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল সেই বেদীর উপর। যে পথ দিয়ে এই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথের উপরও গোচনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা বাড়ির বাসনপত্র থেকে আসবাবপত্র সবই ধুইয়ে দেয়। সবই শুদ্ধ করা হয় 'গোমেজ' অর্থাৎ গো-মূত্র ও জল দিয়ে। যে-সব জিনিসে মৃতের ছোঁয়া লেগেছিল সেগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়। বাড়ির সবাই স্নান করে নেয়।

প্রাচীন ইরানের হুবোইব (২ রাত্‌)-এ দেখা যায়, বাড়ির সকলে এক্ষেত্রে ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে যেত। 'বুন্দহীশন্‌' থেকে এবিষয়ে পার্শীদের বক্তব্য জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই ধরনের: 'আমরা রীতি রক্ষা করে চলেছি নয়দিন অথবা মাসাবধি।'…'নয়দিন বা একমাসের জন্য তারা ঘর ছেড়ে চলে যায়। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ ছিল কিছুদিনের জন্য ঘর ছেড়ে দেওয়া। বর্তমান বোম্বাইতে পার্শী-সমাজে দেখা যায় যে, মৃতদেহকে ঘর থেকে বাইরে নেবার পর সবাই স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে। যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়েছিল সেখানে সুগন্ধি আগুন জ্বালানো হয় (হয় চন্দন কাঠের আগুন, বা আগুন জেবলে গুগ্‌গুল্‌ ছড়িয়ে দেওয়া)। শীতের দিনে ন'দিন এবং গ্রীষ্মে একমাস এই জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। পরে ঘরটি ধুইয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর তিনদিন মৃতের আত্মীয়-স্বজন আমিষ গ্রহণ করেন না।

আধুনিক মানসিকতা :—পার্শীসমাজের কেউ কেউ বর্তমানে মৃতের সৎকারের ক্ষেত্রে আরও স্বাস্থ্যপ্রদ ও অবর্বরোচিত ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছেন। অগ্নিদাহ বা সমাধি দেওয়া পার্শীসমাজে বারণ, কারণ, অগ্নি ও মাটি তাদের কাছে খুবই পবিত্র। সেই জন্য তারা তড়িৎ-চুল্লিতে মৃতদেহ দাহ করার দাবি তুলছেন। শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশের উপর প্রশ্ন তুলেছেন যে, তড়িৎচুল্লিতে দাহকে অগ্নিদাহ বলা যায় কিনা। এখনও অবশ্য এবিষয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত পথ ত্যাগ করে পার্শীদের পক্ষে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোমানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

গ্রীক ও রোমানদের ক্ষেত্রে ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের মত তেমন ব্যাপক প্রলয়তত্ত্ব কিছু নেই। প্রলয়ের ক্ষেত্রে পরিত্রাতারও তেমন ভূমিকা নেই। রোমানদের ক্ষেত্রে তো খুবই কম। গ্রীসে হোমার ও হেসিয়ড শেষবিচারের কোন উল্লেখ করেন নি। তবে দেবতাদের শত্রু হিসেবে সেখানে টিটান, ট্যানটালাস, সিসিফাস প্রভৃতিকে দেখা যায়। গ্রীক সাহিত্যে দেখা যায় মিনোসকে পাতালের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।[১] তবে পরবর্তীকালে অরফি ও পাইথাগোরাস-এর তত্ত্বে আত্মার বিচার ও শাস্তির ধারণা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাইথাগোরাস মৃত্যুর পর আত্মার বিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। অরফিবাদে বিচারের দৃশ্য রয়েছে, যার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গ্রীক পাত্রের উপর অংকিত চিত্রে।[২] এই বিচারকেরা হচ্ছেন—ঈআকাস (Aeacus) ট্রিপটোলেমাস (Triptolemus) ও রডমনথাস (Rhadamanthus)। এঁদের তত্ত্বে বলা হয়েছে অদীক্ষিত, পংকিল, ও অসৎরা পাতালে শাস্তি লাভ করে। তবে সাধারণত প্লুটোর রাজ্যে এই তিনজন বিচারক ছিলেন মিনোস, রডমনথাস ও ঈআকাস। এরাও এক সময় পার্থিব জীব ছিলেন। পৃথিবীতে ভাল কাজ করে-ছিলেন বলে পরলোকে এঁদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন ট্রিপটোলেমাস। প্লেটো এই সব পাতালের বিচারক হিসেবে চারজন বিচারকের কথা বলেছেন। রাস্তার মোড়ে একটি সবুজ অধিত্যকাতে বসে তাঁরা এই বিচার করেন। এখানে আত্মা একটি রাস্তা দিয়ে যায় আনন্দের জগতে অর্থাৎ স্বর্গে, অপরটি নরকে। প্লেটো বলেছেন—'রডমনথাস' এশিয়া থেকে আগত আত্মাদের বিচার করতেন। ঈআকাস করতেন ইউরোপ থেকে আগত আত্মাদের। আর মিনোস বিভিন্ন জটিল পাপের বিচার করতেন। অরফি ও পাইথাগোরাস-এর চিন্তাধারা পিনডার ও প্লেটোর রচনাতেও বেশ প্রতিফলিত। তবে আত্মার এই বিচার হয় রূপান্তরের মধ্যে। পবিত্র আত্মাদের ক্ষেত্রে দশ হাজার বা তিন হাজার বছর পার হলে তাঁরা তাঁদের আদি গৃহে ফিরে যেতেন। জীবন শেষ হবার পরই বিচার হত। এসময় কেউ পেতো পুরস্কার, কেউ শাস্তি। হাজার বছর পার হয়ে গেলে আত্মার নবরূপগ্রহণ হত। কেউ পেত মানব কেউ বা পশুর দেহ। এবং পৃথিবীতে সেইভাবেই জন্ম নিত। সেখানে শিক্ষানবিসী করার পর মৃত্যুশেষে আবার তাঁদের বিচার হত।

---

১ Od, xi, 576f, 567f.

২ Pro. of Study of Greek Religon, Cambridge, 1908, p 599

৩ Gorg.524

কেউ পেত স্বর্গ, কেউ নরক। যারা অতিশয় দুষ্টপ্রকৃতির তারা চিরকালই এবার থেকে নরকে বাস করত। ফিডোতে দেখা যায় মৃত্যুর পর আত্মাকে যমদূতেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে বিচারক্ষেত্রে। কেউ যাচ্ছে স্বর্গে, কেউ বা সংশোধনী জগতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আবার স্বর্গে। কেউ বা অনন্ত নরকে। অ্যারিস্টোফেনিস ও লুসিয়ানের বিদ্রূপাত্মক রচনাতেও এর উল্লেখ দেখা যায়। এরা অবশ্য এধরনের বিচারের কথা কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য লেখকের রচনাতে এ ধরনের ঘটনার কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবরের উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকেও এই বিচারের কথা জানা যায়। অনাসক্তিবাদী (stoics) লেখকের রচনা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর দুষ্ট আত্মাদের শাস্তি হত। শাস্তি দেওরা হত সংশোধন করার জন্য। অতি দুষ্ট আত্মা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেনেকা বলেছেন—মৃত্যু হল বিচারের দিন, যেদিন সকলেরই কার্য-কলাপের বিচার হবে।[১] তবে ভোগবাদীরা (Epicureans) ভাবতেন মৃত্যুর পর কিছুই আর থাকে না।

রোমানদের ক্ষেত্রে দেশীয় ধর্মে মৃত্যুর পর বিচার বা শাস্তির কোন উল্লেখই নেই। এক্ষেত্রে পরলোক সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত ব্যবস্থা এসেছিল গ্রীকদের রসাতল সম্পর্কে ধারণা থেকে। রসাতলের শাসক ছিলেন ভয়াবহ অরকাস (Orcus)। মৃতুর পর আত্মা এখানেই যেত। তবে শুধু মাত্র রসাতল নয়—Elysium নামে স্বর্গ সম্পর্কিত কল্পনাও ছিল। এখানে পুণ্যাত্মারা শান্তির জীবন যাপন করতেন। অনেকে বিশ্বাস করত যে, মৃতের ছায়া দেহ ত্যাগ করে যায় না। জীবিতদের সঙ্গেও মৃতের আত্মা সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।[২] তবে কবিরা পরবর্তীকালে পরলোকের বিচারকদের ক্ষেত্রে গ্রীকদের নামগুলিই উল্লেখ করতেন। ভার্জিল যে পাতালের কল্পনা করেছেন, তাতে দেখা যায় মিনোস কয়েকটি পাপের বিচার করছেন। এক্ষেত্রে রডমনথাস-এ এর নামও রয়েছে।

প্রলয়ে সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ ধারণা ছিল দার্শনিক ধারণা। তেমন জনপ্রিয় বা পুরাণকাহিনীমূলক নয়। তবে ভোগবাদীদের দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এবার দেখতে হবে জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাদের চিন্তা কি ধরনের ছিল ?

প্লেটোর তত্ত্বে দেখা যায় দুটো যুগ বার বার ফিরে আসছে। এই তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় বিশ্বজগৎ যখন আপন গতিতে চলছিল সেই সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে যারা মারা যায় তারা নবযুগে বা স্বর্ণযুগে মৃত্তিকা থেকে বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ক্রমশ যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছেন। প্রতি যুগ বা কল্পে ধ্বংসের সময় পৃথিবী বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে। ফলে বিরাট উথালপাথাল ভাবের সৃষ্টি হয়। এই কল্প পরিবর্তনের সময় অনাসক্তিবাদীদের মতে সকল আত্মা প্রচণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বিশ্ব-

১ Ep, xxvi, Herc. Fur, 727f, Stoics, Zeller, 1870, p. 205

২ History of Religion—Sergei Tokarev, p. 282.

আত্মায় বা আদি অগ্নিতে পরিণত হয় (ভারতে যাকে বিন্দু বলে ?)। এই প্রলয় ঘা যাবার পরে নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়। এবং প্রত্যেকটি পূর্বকল্পের জিনিসই ফিরে আ (ভারতীয় তন্ত্রের ধারণাও এই ধরনের। প্রত্যেকটি জীব আবার তার স্ব স্ব ভূমিক পালন করে।) তবে প্রশ্ন হল এর মধ্যে কি তারা ব্যক্তিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর থাকতে পারে ? কেউ কেউ এর জবাবে বলেছেন, ব্যক্তিসত্তা পৃথকই থাকে। কেউ বলেন, স্বতন্ত্র থাকে, যদিও কোন পার্থক্য থাকে না। এই জন্যই সেনেকা চিন্তা করেছিলেন যে, কল্প শেষে নবকল্পের প্রারম্ভে আবার তিনি জেগে উঠবেন।

রোমানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত প্রাচীন রোমেও মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে নানা ধরনের ব্যবস্থা ছিল। এই নানা ধরন নানা জাতি, ধর্ম ও লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুসারে হত।

রোমানদের উর্ধ্বতম শ্রেণীর মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লক্ষ্য করলে রোমে এক্ষেত্রে সাধারণত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত সে বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। দেখা যায় বড় লোকেদের মধ্যে কেউ মারা গেলে উপস্থিত লোকেরা একযোগে উচ্চৈঃস্বরে মৃতের নাম ধরে ডাকতেন। একটা আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসরণ করেই এমন করা হত। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা—এটা করা হত মৃত ব্যক্তিকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। সম্ভবত অতি ঘনিষ্ঠজন এই সময় তাকে চুমু খেত। হয়তো এর পেছনে এই বিশ্বাস কাজ করত যে, এতে মৃতের শেষ নিঃশ্বাস পরিবারের মধ্যেই থেকে যাবে।

ডাকাডাকি হয়ে যাবার পর রোমানরা চোখ দুটি বুজিয়ে দিত। এর পরই মৃত-দেহকে স্নান করিয়ে তেল বা মাখনে মর্দন করে দেওয়া হত। একাজ করতেন সম্ভবত গৃহপুরোহিত বা এক ধরনের বৃত্তিভোগী লোক অর্থাৎ একাজ করাকে যারা বৃত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন তাঁরা। এবার মৃতদেহকে তার প্রাচীন পোশাক ও বৃত্তি অনুসারে নানা চিহ্ন প্রভৃতি পরিয়ে ও ধারণ করিয়ে দেওয়া হত। তারপর তাকে প্রধান গৃহে নিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে পা রেখে শুইয়ে দিত। আত্মীয়-স্বজনরা মৃতকে উপহার দিত ফুলের স্তবক ও গুগগুল। প্রদীপদানিতে গুগগুল দন্ড জ্বলত।

মৃতের জন্য শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে রোমানদের একধরনের কান্নার শ্লোক ছিল। নিকট আত্মীয় বা ভাড়া করা শোকপ্রকাশকেরা সেই শ্লোক গাইতে গাইতে কান্নাকাটি করত। সম্ভবত মৃতের মুখে পাথেয় হিসেবে একটি মুদ্রাও গুঁজে দেওয়া হত—আমরা যাকে বলি 'পারের কড়ি'। এই কড়ি দিয়ে সে রসাতলের স্টিক্স (Styx) নদী পার হবে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এরপর মোম দিয়ে মৃতের মুখের ছাঁচ নেওয়া হত। এই ছাঁচ ঘরের কুলুঙ্গিতে অন্যান্য পূর্বপুরুষদের সঙ্গে থাকত। প্রত্যেকের নামধাম ঠিকানাও লেখা হত। কোন গৃহে কেউ মারা গেলে বাইরের লোকদের তা জানিয়ে দেবার জন্য ঘরের দরজায় সাইপ্রেস অথবা পাইন গাছের ডাল ঝুলিয়ে দিত রোমানরা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হত যত শিগগির করা সম্ভব ততটাই তাড়াতাড়ি। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল ছয় দিন থেকে সাত দিন।

এরই মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করতে হত। একদল লোক রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে করতে এই বলে যেত—'ওল্লুস, কুইরিস লেটো ডেটাস।'···অর্থাৎ এই ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগ দিতে পারেন। তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শবযাত্রা হত বিশেষ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে। শবযাত্রায় থাকত গায়ক, বাদক, নর্তক, মূক অভিনেতা প্রভৃতি। পেছনে অনেক সময় শত শত গাড়িতে এই সব অভিনেতারা মৃতের পূর্বপুরুষের মুখোশ পরে শব অনুগমন করত। মৃত ব্যক্তির জীবনকালে তিনি যে সব কাজের জন্য নানা পুরস্কার পেয়েছিলেন সেগুলিও লোককে শবযাত্রায় দেখানো হত। গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সেনাপতি হলে অস্ত্র উল্টো করে অর্থাৎ নিচের দিকে ধরে সৈন্যরা তাকে সম্মান জানাতো। সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা মিছিলে যেত, তাদের মধ্যে ছেলেরা যেত মুখ চেপে, মেয়েরা মুখ খুলে চুল উড়িয়ে। সাধারণ শবযাত্রীরাও কোন না কোন ভাবে শোক প্রকাশ করত। দুধারে দাঁড়িয়ে লোকেরা এ-সব দেখত। শবযাত্রাকে রোমানরা একটি বিরাট ঘটনা বলে মনে করত।

শবযাত্রা নিয়ে আসা হত শহরের কেন্দ্রস্থলে, যাকে বলা হত ফোরাম। এখানে তার পূর্বপুরুষদের মুখোশধারীদের মধ্যে মৃতদেহকে রাখা হত। মৃত এবং তার পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন চলত। বলা বাহুল্য এতে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। পূর্বপুরুষদের কাহিনী পাঠ করা হত বংশপঞ্জী থেকে। এখান থেকে আবার শবযাত্রা আরম্ভ হত শ্মশান বা কবরের দিকে, যেখানে শেষকৃত্য হবে। এখানে মৃত ব্যক্তির প্রিয় দ্রব্যসমূহ তার চিতায় তুলে দেওয়া হত। এরপর মৃতের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় অর্থাৎ পুত্র বা আর কেউ চিতায় আগুন ধরাতো। চিতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোমানরা খাঁচায় বয়ে আনা বাজপাখি ছেড়ে দিত আকাশে। বাজপাখি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতো। এই বাজপাখিকে ধরা হত মৃতের আত্মার প্রতীক হিসেবে। যেন স্বর্গে সে অমর আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

চিতা নেভানো হত জল বা সুরা দিয়ে। তখন শেষ বিদায়বাক্য জানানো হত। এর পরই লোকেরা ফিরতে আরম্ভ করত—শুধু নিকট আত্মীয়েরা ছাড়া। এরা মৃতের ভস্মাবশেষ একটি পাত্রে সংগ্রহ করে নিত। পরে তাকে সংরক্ষিত করে অশৌচ ক্রিয়াশেষে পারিবারিক সৌধমন্দিরে অন্ত্যেষ্টি-আহার গ্রহণ করত। রোমানদের ক্ষেত্রে অশৌচ চলত নয়দিন। এরপর শুকনো শবভস্ম পাথর বা ধাতুর পাত্রে ভরে পারিবারিক সমাধিমন্দিরে নিয়ে যথারীতি সমাহিত করত তাঁরা। মৃতের উদ্দেশে ভোজ দেওয়া হত এখানে। পরে বাড়ি ফিরে দিত শ্রাদ্ধের ভোজ।

শোক চলত এর পরও। আমাদের দেশে যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে এ-সময় বিবাহ-সাদি নানা অনুষ্ঠান এক বছর পিছিয়ে যায়, তেমনই রোমানদের ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা, বয়স্ক পুত্র কন্যা এদের জন্যও দশ মাস শোকপালন করা হত। অপর পক্ষে

আত্মীয়ের জন্য শোকপালন করা হত আট মাস। শিশুদের ক্ষেত্রে যে বয়সে সে মারা গেছে সেই বয়স হিসেবে একমাস, দু'মাস, চারমাস ইত্যাদি করে কয়েক মাস পর্যন্ত শোক পালন করত। সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসে মৃতের স্মৃতিসভা হত। এই স্মৃতিসভা আর বসত তার জন্মদিনে এবং সমাধি বা দাহের দিনে। আরেকবার হত মার্চ ও মে মাসের শেষের দিকে। এই সময় প্রচুর গোলাপ ফুলও বিতরণ করত তারা সৌধক্ষেত্রে প্রদীপও জ্বালাতো রোমানরা। ভোজসভার আয়োজন করা হত আমাদের দেশের সাংবাৎসরিকের মত। দেবদেবী ও মৃতের প্রেতাত্মার জন্য নানা জিনিস উৎসর্গ করারও ব্যবস্থা ছিল।

তবে সাধারণ মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মকানুন এক হলেও এরকম জাঁকজমক হত না।

রোমানদের আজকালের মত রাষ্ট্রীয় সমাধিক্ষেত্র ছিল না। শহরের বাইরে রাজপথের ধারে সারি বেঁধে এই সমাধি বা অন্ত্যেষ্টিক্ষেত্র থাকত। রোম থেকে বাইরে যত রাস্তা গিয়েছে প্রতিটি রাস্তার ধারেই এ ধরনের কবর বা শ্মশান ক্ষেত্র ছিল প্রত্যেকটি সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্রেই সাবধানতাসূচক স্তম্ভে নানা হুঁশিয়ারী উৎকীর্ণ থাকত। তাছাড়া থাকত মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিফলক। কখনও কখনও আবক্ষমূর্তিও তৈরি করে দেওয়া হত। তা ছাড়া থাকত পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কবিতা, যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরের পাশে লেখা আছে ঃ

> "দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব এই বঙ্গে,
> তিষ্ঠ ক্ষণকাল।..."

রোমানদের স্মৃতিফলকে এ ধরনের কবিতার বক্তব্য ছিল এই রকম ঃ

> "এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে মার্কাস সিসিলিয়াসের উদ্দেশে।
> পথিক তুমি যে এখানে আমার
> বিশ্রাম ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়েছ তা আমায়
> আনন্দ দিচ্ছে
> তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাক, বিদায় বন্ধু,
> নির্ভয়ে নিদ্রা দাও।"

রোমানদের এই স্মৃতিফলক মানুষের কাছে আবেদনমূলক। সমাধিক্ষেত্রে আবক্ষ মূর্তি স্থাপন প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও জীবিতদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের কী আকুতি ছিল! এটা আরও প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব থাকে।

রোমে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমাধির উপর যে সৌধ নির্মাণ করত তা দেখতে হত অনেকটা কবুতরের খোপের মত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল জীবিতদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি। লম্বা পাথরের ভল্ট বা ছোট ছোট গর্তে এদের দেহাবশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে ধরা থাকত। এই সব পাত্রের নিচে ছোট

ছোট পাথরের উপর এদের পরিচয় লিপিবন্ধ থাকত। কখনও কখনও—ছোট আবক্ষ মূর্তিও থাকত। দরিদ্রতর শ্রেণী ও ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আরও খারাপ স্মৃতিচিহ্ন হত। শহরের সাতটি দেয়ালের বাইরে বিরাট সমাধিক্ষেত্রে এদের সমাহিত করা হত বা এদের দেহাবশেষ থাকত। 'হোরেস' এদের সম্পর্কেই তাঁর রচনাতে বলেছেন—"অনেক কাল আগে সহকর্মী ক্রীতদাসেরা আর এক ক্রীতদাসের মৃতদেহ মুড়ে সস্তাদরের ছোট্ট কফিনে ঢুকিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিত।..." ১৩ থেকে ১৬ স্কোয়ার ফিটে গভীর গর্তে অপরাধীদের মৃতদেহ একের উপর আর একজন করে পাঠানো হত।

পৌত্তলিক যুগে রোমে শবদাহ ও সমাধি উভয় প্রথাই ছিল। মাটি খুঁড়ে রোমে বহু চিতাভস্মাধার ও চুনাপাথরের কফিন পাওয়া গেছে। কর্নেলিয়ানরা সুল্লার শাসনকাল পর্যন্ত সমাধি দেওয়াকেই পছন্দ করত। সুল্লা আইন করে শবদাহের ব্যবস্থা করেন। সমাধি দেওয়া হত এই কারণে যে, এটা ছিল কম ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে। ফলে দেখা যায়, অগাস্টাসের সময় রোমানদের মধ্যে শবদাহ সর্বজনগ্রাহ্য হলেও দেহের কোন অদগ্ধ অংশকে তারা কবর দিতই। এই কবর দেওয়া হত প্রাচীন ধারার একটি স্মৃতি হিসেবেই, যা ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান আছে। রোমে খ্রীষ্টধর্ম গৃহীত হবার পর আবার কবর দেবার প্রথা দেখা দেয়। শবদাহ প্রথা উঠে যায়। উঠে যায় প্রথমত এর ব্যয়বাহুল্যের জন্য। দ্বিতীয়ত খ্রীষ্টানদের পুনরুত্থান তত্ত্বে বিশ্বাসের জন্য। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কবর থেকে আত্মারা উঠে আসবে এই বিশ্বাসের জন্য।

তবে শবদাহই হোক আর সমাধিই হোক রোমানরা সর্বকালেই বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। সূক্ষ্মদেহে আত্মা জৈব পৃথিবীর নানা কার্যে অংশগ্রহণ করে। যথারীতি অনুষ্ঠান করে সমাধি বা শবদাহ হলে মৃতের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকে। প্রাচীন রোমে জীবিত ও মৃতের আত্মার মধ্যে নিবিড় একটা সম্পর্ক ছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

খ্রীষ্টানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

খ্রীষ্টানদের প্রলয়তত্ত্ব : খ্রীষ্টানরা মনে করে যে, মৃত্যুর পর দেবদূতেরা আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। তিনি সাময়িক একটা বিচার করে যার যার কর্ম অনুযায়ী অন্তরীক্ষলোকে তাকে একটি স্থান দেন। অনেকে মনে করেন এই অন্তরীক্ষলোক হল পরলোকের এক একটি স্তর। আবার ভিন্ন মতে খ্রীষ্ট প্রেতলোকে নেমে এসে সব আত্মাদের স্বর্গে তুলে নেন। আবার কোথাও বিশ্বাস আছে যে একমাত্র শহীদেরাই মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যেতে পারে অপর কেউ নয়। এ ছাড়া ধারণা রয়েছে যে, মৃত্যুর পর আগুনের মধ্য দিয়ে আত্মাকে বিচার মঞ্চে যেতে হয়। কাউকে অনুতপ্ত হতে হয়। কাউকে শুদ্ধিকরণ করতে হয়।

প্রথম দিকে খ্রীষ্টানরা সকলেই প্রায় জগতের আসন্ন ধ্বংস বিশ্বাস করত। আবার পুনরাগমনের উপরও আস্থা রাখত। তারা ভাবত, এর আগে আসবে নানা অত্যাচার, নিপীড়ন এবং খ্রীষ্টবিরুদ্ধ ভাব। তবে যিশুর আবির্ভাবের পর খ্রীষ্টবিরুদ্ধ ভাব ও দুষ্টের দমন হবে। তারা মনে করত যে, গত একহাজার বছরে খ্রীষ্ট একবার এসেছিলেন। এক হাজার বছর শেষে আবার তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কেউ কেউ মনে করতেন যে, মহাপ্রলয় আসবে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। ইহুদী চিন্তার প্রভাবে কেউ ভাবতেন যে খ্রীষ্ট আসবেন সত্যিই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। কেউ ভাবতেন, মানুষ যথার্থ স্বর্গরাজ্য দেখবে ভবিষ্যতে, মৃত্যুর পর। খ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার স্থূলদেহ নিয়ে ফিরে আসবেন না। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ একদিন পুরানো হয়ে ক্ষয়ে যাবে, এবং আগুন জ্বলে উঠে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং নতুন জগতের আবির্ভাবের চিন্তা প্রাচীন অনেক বর্বরজাতের মধ্যেও ছিল। ছিল অনেক সভ্য জাতের মধ্যেও, যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ধর্মপ্রবর্তকদের গ্রন্থে দেখা যায়, এ ধরনের ঘটনার পূর্বে (১) প্রকৃতিতে বিরাট রকম একটা বিপর্যয় ঘটবে। এর পর মৃতের আত্মাদের বিচার হবে। (২) পৃথিবী ও স্বর্গ উর্বরতা ও সৌন্দর্যে ভরে যাবে। কেউ কেউ এই সঙ্গে পৃথিবীর স্থায়িত্বের কথাও ভেবেছেন। কারো কারো মতে ধ্বংসের পর নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় হবে নব সৃষ্টির পর। কারো কারো মতে পূর্বে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল মহাপ্লাবনে, ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংস হবে আগুনে। আবার কেউ কেউ ভাবতেন যে, দুনিয়ায় যা ধ্বংস হতে পারে এমন জিনিসই ধ্বংস হবে। এর পরে আবার নতুন পৃথিবী আত্মপ্রকাশ করবে। আবার কোথাও কোথাও এমন ধারণাও রয়েছে যে, পৃথিবীর নিচে যে আগুন রয়েছে, তাই জ্বলে উঠে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে সেও নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর আত্মা আগুনের সমুদ্র পার হবে। এতে কোন ক্ষতি হবে না। কারণ

এ আগুন পূতকরণের জন্য। কারো কারো মতে মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মার পাপপুণ্যের বিচার হবে। প্রথম হবে সাধারণ এক বিচার যাতে ভোকিয়েল নামে এক দেবদূত—মৃতের আত্মার ওজন করবেন। যার দাঁড়িপাল্লা যে দিকে ঝুঁকবে সে সেরকমই ফল পাবে। ইউরোপের মধ্যবর্তী যুগে মাইকেলকে এই আত্মার ওজন করতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেন্ট পিটারকেও এই বিচারের দায়িত্ব নিতে দেখা গেছে। সুতরাং প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের খুব স্পষ্ট একটা ধারণা অর্থাৎ একক ও নির্ভেজাল ধারণা নেই বললেই চলে। ব্যাবিলন, মিশর থেকে আরম্ভ করে নানা বর্বরজাতির চিন্তার প্রভাবও তাদের উপর পড়েছে। শেষ পর্যন্ত এরকম একটা চিত্র এসে দাঁড়িয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, পাপের ভারে পৃথিবী ক্লান্ত হলে একদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। সেদিন স্বর্গের দুয়ারে ঈশ্বরের পাশে স্বয়ং যিশুখ্রীষ্ট সেন্টপিটার প্রভৃতিকে নিয়ে মৃতের আত্মাদের বিচার করবেন। যারা স্বর্গে যাবার যোগ্য তারা স্বর্গে যাবে। যারা নরকে যাবার তারা নরকে। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী যারা চলবে তারা স্বর্গে গিয়ে চিরন্তন সুখ ভোগ করবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক রাজত্বে বাস করতে আরম্ভ করবে। চিন্তার বিভিন্নতা খ্রীষ্টান প্রলয়তত্ত্বের স্বরূপকে তেমন স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। তবে একটি জিনিস স্পষ্ট যে, তারা মৃত্যুর পরও জীবের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং সেই জন্য মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন নয়। আত্মার সংগতির জন্য মৃতের শেষকৃত্য নিয়ে তারাও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মত নানা অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী।

আদিযুগে খ্রীষ্টানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—খ্রীষ্টানরা প্রথম দিকে ইহুদীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথা অনুসারে করতেন। কিন্তু পুনরুত্থানের নতুন তত্ত্ব খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কিত পূর্বধারণা দূর করে দেয়। ফলে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। খ্রীষ্টানরা মনে করতে আরম্ভ করে যে, যিশুখ্রীষ্টে যাঁরা আস্থা স্থাপন করেছেন, তাঁদের কাছে সমাধিক্ষেত্র একটি বিশ্রামস্থল মাত্র। সুতরাং মৃতের পিছনে পড়ে থাকা নানা জিনিসই তখন অশুচিতার পরিবর্তে শুচিতার পর্যায়ে পড়ে। কারণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁদের দেহ পবিত্র আত্মার (Holy Ghost) আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই দেহই শেষের দিনের শেষবিচারের জন্য আবার সমাধিক্ষেত্র থেকে উঠে আসবে। উঠে আসবে গৌরবান্বিত হবার জন্য। মৃত্যু হলে খ্রীষ্টানরা মৃতের দেহ ধুয়ে দিত এবং চোখ বন্ধ করে দিয়ে সারা অঙ্গ কাপড় দিয়ে মুড়ে দিত। সমাধিগহ্বরের উপরে একটি কুর্শি বসানো হত। এ-সব কাজ করতেন ঘরের কোন বৃদ্ধা রমণী। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের তার মরা মুখ দেখতে দেওয়া হত। এবং মৃত্যুর পর কবর দেবার আগে আট নয় ঘণ্টা মৃতদেহকে রেখে দিত। কফিন বহন করে নিয়ে যেত তরুণেরা। তাদের অনুসরণ করত আত্মীয়-স্বজন। আগে যে ড্রাম বাজানো চলত, ভাড়াটে গায়কদের দিয়ে গান করানো হত, এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করার রেওয়াজ ছিল তা উঠে যায়। কবর দেওয়া হত সব

সময়ই শহরের বাইরে। যেমন স্বাভাবিক কোন গুহায়, পাহাড় কেটে তৈরী করা সমাধিক্ষেত্রে বা মাটি খুঁড়ে তৈরি করা কবরে। যোহন কর্তৃক লজারাস-এর সমাধি বর্ণনা ও যিশুখ্রীষ্টের সমাধি আদি খ্রীষ্টানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। যিশুকে সমাধি দেবার ঘটনা থেকেই পরবর্তীকালে খ্রীষ্টানরা মৃতের সৎকার হিসেবে কবর দেবার রীতি অনুসরণ করে। মথির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমাধিক্ষেত্র ছিল পারিবারিক। এই ক্ষেত্রের পরিসর ছিল যথেষ্টই বড়। পাশাপাশি অথবা মূল সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে কুলুঙ্গির মত তৈরী করে সেখানেই মৃতদের কবর দেওয়া হত। তবে খ্রীষ্টান সৌভ্রাতৃত্ব হেতু, সকলে মিলে দরিদ্রদের সমাধি দেবার ব্যবস্থা করত। পাহাড়ের গায়ে যে-সব ব্যক্তির সমাধি দেওয়া হত, বড় বড় পাথরের চাপ দিয়ে তারা সেই সমাধিগহ্বরের মুখ বন্ধ করে দিত, যাতে পশুরা মৃতদেহ খেতে না পারে বা ডাকাতেরা সমাধিক্ষেত্র থেকে সহজে কিছু কুড়িয়ে নিতে না পারে। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা সম্ভবত সমাধিক্ষেত্রের দেয়ালে চুনকাম করে দিত। রোম, পশ্চিম ইউরোপ, মিশর, উত্তর আফ্রিকা সর্বত্রই খ্রীষ্টানরা আঞ্চলিক শেষকৃত্যের রীতি পরিত্যাগ করে প্যালেস্টিনীয় খ্রীষ্টানদের সমাধি দেবার রীতি অনুসরণ করত। অনেকে আবার নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এ ক্ষেত্রে আরও অনেক পরিবর্তন এনেছিল। তৎকালে প্রচলিত বর্বরদের রীতি অনুসরণ করেই তারা এ-সব করত। একই স্থানে বহু ব্যক্তিকে কবর দেবার রীতি খ্রীষ্টানরা ইহুদী ও বর্বরদের কাছ থেকেই ধার করেছিল।

সর্বত্রই খ্রীষ্টানরা কবর দিত অত্যন্ত সাদাসিধে ভঙ্গীতে। এ জন্য সম্ভবত দারিদ্র্য ও পুনরুত্থানের চিন্তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। অনেক কবরের উপর অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে ছোটখাটো ফলকও রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে কবরে থাকত নানা ধরনের প্রতীক, যেমন, তাল ও খেজুর জাতীয় বৃক্ষের শাখা, নোঙর, মাছ বা ঘুঘু কিংবা পায়রা। খ্রীষ্টে আস্থা স্থাপন করে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—এই সব করা হত তাদেরই আত্মার সম্মানার্থে।[১]

পরিবেশের রূপান্তরও নানাধরনের নতুন রীতি উদ্ভাবনে কাজ করত। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার এবং ধীরে ধীরে ইহুদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে কবর দান প্রথার মধ্যে নানা ধরনের নতুন রীতি দেখা দিচ্ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও চার্চের উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারও এ জন্য দায়ী। অর্থাৎ সমাধিপ্রথা পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ইহুদীদের বর্বরোচিত প্রথাসমন্বিত কবরে এরপর থেকে খ্রীষ্টানদের কবর দেওয়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তন সম্ভবত এসেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই। ইহুদীদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বিরোধও এ সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এই শত্রুতা ছাড়া অন্যান্য কারণও কবর

১ Bingham, Antig. of Christian Church, Ed. 1870, bk. xxiii, Am. Earth, Quart, Rev. 1891, xvi 501 f. etc.

দেবার রীতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। তবে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে খ্রীষ্টানদের কবর দেবার প্রথার মধ্যে পরিবর্তন আসতে আরও বেশ সময় লেগেছিল। এক কথায় এ-জন্য কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল বলে ভাবা যেতে পারে।

সবার আগে খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ধরনে কবর দেবার রীতি দেখা যায় রোমের আশেপাশে। নীরো ও ডোমিসিয়ান-এর খ্রীষ্টানদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার খ্রীষ্টানদের তাদের শহীদদের জন্য স্বতন্ত্র সমাধি দেবার রীতি তৈরি করতে বাধ্য করেছিল। শহীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাধিক্ষেত্র পবিত্র বলে বিবেচিত হতে থাকে। শহীদদের সমাধিসৌধ প্রার্থনাগারে পরিণত হয়। কোন কোন সম্প্রদায় গোপন প্রার্থনাগার তৈরী করতেও বাধ্য হয়। এ-জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর প্রভাব মৃতের সৎকারের ক্ষেত্রে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের উপর পড়েছিল। রোমের আশেপাশে মাটির নিচে কবর দেবার রীতি অনুসারে নাপলস, সাইরাকুজ, আলেকজান্দ্রিয়া, ট্রেভ, এমনিতর বহুস্থানে এই ধরনের কবর দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়। পারিবারিক সমাধি দেবার রীতির পরিবর্তে পশ্চিমদেশে চার্চের নির্দেশে সকল খ্রীষ্টানকেই সেখানে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পশ্চিম জগতের সকল নগর এলাকার আশেপাশেই খ্রীষ্টানদের সকলের জন্য একই সমাধিক্ষেত্র গড়ে ওঠে। যে-সব স্থানে উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টান শহীদদের সমাহিত করা হত স্বভাবতই সেখানে প্রার্থনাগৃহ গড়ে ওঠে। এখানে জমায়েত হয়ে খ্রীষ্টানরা পবিত্র Eucharist, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহ ও শোণিত ত্যাগ করার মহান স্মৃতি উদ্‌যাপন করত। এই জমায়েতে সন্ত খ্রীষ্টান শহীদদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের চেষ্টা চলত। যে প্রার্থনাগৃহ তৈরি হত, তার ‘পথ’ যে শহীদের সমাধির উপর এই প্রার্থনাগৃহ তৈরী হত তার নাম অনুসারে হত। অনেক সময় সমগ্র সমাধি অঞ্চলটিই সেই শহীদের নামে পরিচিত হত। অবশ্য অধিকাংশক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সমাধিক্ষেত্র দান করতেন লোকে তাঁর নাম অনুসারেই সমাধিক্ষেত্রের নামকরণ করত। পরে এটা একটা রীতি বা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে পশ্চিম জগতে যা-ই ঘটুক না কেন, প্রাচ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত রীতি ভিন্নতর ছিল। প্যালেসস্টাইন ও সিরিয়াতে দেখা যায় পাহাড়ী কবরের প্রাধান্য এবং এশিয়া মাইনরে গীর্জাপ্রাঙ্গণ-সমাধির। এ-সব ক্ষেত্রে পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রই প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের সর্বত্রই এই পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রের প্রাধান্য ছিল। পাথর চাপা দিয়ে এবং পাথরের কফিনে কবর দেবার রীতি খ্রীষ্টানদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। অধিকাংশ কবর দেওরা হত সাধারণভাবে, বা পাহাড়ের চূড়ায় নিরাভরণ সমাধিসৌধ তুলে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টানপ্রথার অনুপস্থিতিই বেশি ছিল। পাশ্চাত্য দেশে কনস্টানটাইনের পূর্ববর্তী সময়ে সমাধিরীতি প্রকাশ পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। সমাধিপ্রথার শুরু হয় ইহুদী ও বর্বরদের প্রথায়। শেষ হয় যৌথ সমাধিক্ষেত্রে অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য তৈরি সমাধিক্ষেত্রে। এই যৌথ সমাধিক্ষেত্র ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতাল-সমাধি। এই পাতাল-সমাধির প্রথা

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ছিল রোম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। এই সমাধিক্ষেত্রগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে কাজ করত। এ সব সমাধিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান স্মারক ফলক স্থাপন করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। কবরের উপর প্রতীক চিহ্ন স্থাপনের রীতিও বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান স্থাপত্যকলা এই পাতাল সমাধিক্ষেত্র থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টান ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও জন্মস্থান এই পাতাল-সমাধি। সমবেতভাবে বা সমাবেশে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করার এবং যাজকের মাধ্যমে প্রার্থনা করার রীতিও এ সময় আত্মপ্রকাশ করে। তবে সমাধিকে কেন্দ্র করে নিসেনি-ধর্ম-সমাবেশ-এর রীতিবিরুদ্ধ মনোভাবেরও এখানেই প্রকাশ ঘটে। সমকালীন সাহিত্যে এর যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সমাধিক্ষেত্রে শহীদ স্মরণে সংবাৎসরিকও পালিত হত। এই মৃত্যু-দিবস পালন জন্মদিবস পালনের মতই ছিল।

খ্রীষ্টানদের যে শবদাহ প্রথাতে আপত্তি ছিল, তা নয়, তবে তারা ভূমিতে সমাধি দেওয়াই বেশি পছন্দ করত।[১] খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সর্বত্রই অনাড়ম্বর সমাধিপ্রথারই প্রাধান্য ছিল। তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরু থেকে প্রত্যেকটি প্রথারই বিস্তার ঘটতে থাকে। সম্পদ রক্ষার জন্য পাশ্চাত্যে সংঘ গঠিত হয়। সমাধিক্ষেত্রে স্থান বিক্রি হতে থাকে। কবরগমনকারীরা পৃথক শ্রেণী হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে। সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিল্পী, পাথর কাটিয়ে কারিগর, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি প্রভৃতি। বাৎসরিক পালনরীতি আরো কম পরিসরে বৃদ্ধি পায়। যেমন, কবর দেবার পর মৃতের স্মরণে তৃতীয়, সপ্তম, এবং সম্ভবত ত্রিংশ ও চত্বারিংশ দিনেও অনুষ্ঠান পালনের রীতি দেখা দেয়। সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা জানানো হত। পবিত্র বাইবেল থেকে হত পাঠ, এবং যিশুর ইউকারিস্ট (Eucharist) পালিত হত শেষ নৈশভোজনের অনুকরণে। মৃতের সঙ্গে আত্মীয়তা সংরক্ষণের চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। সমাধি-বেদীতে প্রদীপ দেবার ব্যবস্থা হয়। আবার সেই বর্বর রীতি অনুসরণে মৃতের সঙ্গে কবরে তার নানাবিধ প্রিয় জিনিস দিয়ে দেবার ব্যবস্থাও চলে।[২]

খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নিলে এই ধর্মের ক্ষেত্রে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়। শহীদের সমাধিক্ষেত্রগুলি তখন নানা ভাবে পবিত্র হয়ে উঠতে থাকে। সম্রাটের সৌজন্যে সারা সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বড় বড় গীর্জা গড়ে ওঠে। সন্তশহীদদের সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ বিশাল আকার ধারণ করে। এগুলি গণ্য হতে আরম্ভ করে সমাধি-গীর্জা নামে। পাশ্চাত্যে এমন কি উত্তর আফ্রিকাতে পর্যন্ত গীর্জা-প্রাঙ্গণে সমাধি দেবার রীতি আত্মপ্রকাশ করে। তবে শহরের মধ্যে স্থানসংক্ষেপহেতু সেখানে গীর্জাপ্রাঙ্গণে বহুজনের সমাধি হতে পারত না।

---

১ Min. Felix, Oct. xxxiv. cf. Mart, polye, xviii ; etc.

২ Synod of Elvira, Can 34, of Laodicea, can, 9 etc.

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে খ্রীসীয় রীতি কতদূর অগ্রসর হতে পারে৷ সম্রাট কনস্টান্টাইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই তা লক্ষ্য করা যায়। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল কনস্টান্টিনোপোলে। সম্রাট কনস্টান্টাইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : "সম্রাটের দেহ রাখা হল প্রাসাদের প্রধান কক্ষে। দেহের চতুর্দিকে মোম জ্বালানো হল। সম্রাটের নানা শ্রেণীর পরিচারকেরা এই মোমবৃত্ত ঘিরে দাঁড়াল। তারা অহোরাত্র সর্বক্ষণ কঠোর নজর রাখতে লাগল। শবযাত্রার নেতৃত্ব করলেন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র কনস্টানটিয়াস। তার আগে থাকল সামরিক কায়দায় সৈন্যদল। এদের পেছনে এল অসংখ্য আরো। মৃতদেহকে ঘিরে রইল ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী ও বর্শাধারীরা। শবযাত্রা এসে দাঁড়াল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি গীর্জা-প্রাঙ্গণ-কবরে। সেখানে সম্রাটের কফিনাবদ্ধ দেহকে সমাধিস্থ করা হল।...কনস্টানটিয়াস সামরিক বাহিনী নিয়ে ফিরে যেতেই এগিয়ে এলেন যাজকেরা। সঙ্গে সঙ্গে এল খ্রীষ্টান জনসমুদ্র। তারা প্রার্থনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল ...তাঁর আত্মার জন্য প্রার্থনা জানানো হল...সমাধির উপর তোলা হল তাঁর মূর্তি।"

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বাহুল্য কিভাবে বেড়ে যাচ্ছিল তার আর একটি প্রমাণ মিলবে সীজারিয়ার বিশপ বেসিল (**Basil**)-এর সমাধিপ্রথা লক্ষ্য করলে। এই সমাধি দেবার বর্ণনা রেখে গেছেন নাজিয়ানজুর গ্রেগরী।[১] এতে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : "ধর্মাত্মারা সন্ত-এর দেহ ঊর্ধ্বে তুলে বহন করে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকেই তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগ স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর মৃতদেহের কফিনের স্পর্শ বা ছায়া মাড়িয়েও যেন অনেকে ধন্য হল। পবিত্র ধর্মসঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। প্রকাশ পেল শোককান্না :—"এবার তিনি স্বর্গে, আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে তিনি আমাদের জন্য সেখানে অনুষ্ঠান করে জনকল্যাণে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।" পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ হল।

এই সময় থেকেই সমাধিক্ষেত্রে নামকরা ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য পাঠের রীতি বেশ ভালভাবেই প্রচলিত হয়। শহীদদের বাৎসরিক পালনের সময়ও তাঁদের কার্যবিবরণী প্রশংসাবাক্য সহকারে পঠিত হতে থাকে। তাদের সমাধিসৌধ দূরাগত তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। শহীদের স্মৃতিসামগ্রী তুলে বিভিন্ন গীর্জাতে নিভৃতে দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা হয়। সেখানে বেদী তুলে প্রার্থনার আয়োজন চলে। কোন কোন প্রান্ত থেকে এতসব আধিক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এলেও আবেগের বন্যায় তা ভেসে যায়। গীর্জার প্রাঙ্গণে সমাধি লাভের বাসনায় লোক যেন ভেঙে পড়ে। শেষ-কৃত্যের সময় দরিদ্রদের মধ্যে ভিক্ষাদানের প্রথাও চালু হয়। ভিক্ষাদান প্রথা চালু হয় এই আশায় যে, এতে মৃতের আত্মার কল্যাণ হবে। এইভাবে অতিসাধারণ কবর দানের প্রথা থেকে খ্রীষ্টান জগতে জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিক কবর দেবার রীতি প্রচলিত হয়।

---

১ **Panegyrics of Basil, 80.**

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্লাভজাতির মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

স্লাভজাতি প্রাচীনকালে আর্যদের মত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুসরণ করত। ঐতিহাসিক যুগের আদিপর্বে এদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কবর দেওয়া ও দাহ করা উভয় প্রকার পদ্ধতিই চালু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তারা এই দুটি পদ্ধতিই অনুসরণ করত। এরা কবরক্ষেত্রের উপর কুটীর জাতীয় সমাধিসৌধ তুলত। মধ্য জার্মানী ও দক্ষিণ রাশিয়ার নানাক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কবরে মৃতের পাশে নানা ধরনের জিনিস দিয়ে দেওয়া হত, যেমন, ব্রোঞ্জের কুড়োল, শাবল, ছোরা, বাটালি, হাতুড়ি, নানাপ্রকার সোনার গহনা, চুলের কাঁটা, প্যাঁচানো আংটি, ব্রেসলেট প্রভৃতি। এসবই ব্রোঞ্জযুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ) নিদর্শন। এরা মৃতের পরিচারক বা আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেও মৃতের সঙ্গে কবর দিত। তবে কবরের উপর কাঠের যে ঘর তৈরী করে দিত তারা, সেটাই সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ্য করার মত। স্লাভেরা বিশ্বাস করত যে আত্মা এই ঘরে এসে বাস করবে।

দক্ষিণ রাশিয়ার সর্বত্রই প্রায় উপরোক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী 'কুরগান' বা স্তূপের আকৃতি সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়। সাইথিয়ানরা এইসব কবর তৈরি করেছিল বলে বিশ্বাস। তবে ইতিহাসের ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসায় ধরা পড়েছে যে, আরও আগে থেকে এই অঞ্চলে এ ধরনের সমাধিক্ষেত্র ছিল। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিক থেকে এই ধরনের কবর দেবার ব্যবস্থা এ অঞ্চলে ছিল বলে বিশ্বাস। এইসব স্তূপের ঠিক উপরিভাগে চতুষ্কোণ এক ধরনের গর্ত ছিল। তাতে 'ওক' কাঠের কফিন তৈরি করে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত। এই কবরের এক প্রান্তে থাকত নানা রঙের কুঁজো ও গরুর মাথা। চতুষ্কোণ সমাধির চারদিকে থাকত চারটি গরুর পা। এখানে এমন একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে যে বাঁ কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথা রয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকে, হাত রয়েছে বুকের নিচে। কঙ্কালটি মহিলার। এই কঙ্কালের গলায় ব্রোঞ্জের দানা পাওয়া গেছে। সম্ভবত হারের দানা। এছাড়া এ ধরনের আরও গহনাও মিলেছে। মৃতের কাছে একটি মাটির হাঁড়ি এবং পশুর মেরুদণ্ডের হাড় দিয়ে তৈরি এক প্রকার শব্দ করার যন্ত্রও পাওয়া গেছে। খড়িমাটি ধরনের এক প্রকার মাটির উপর এই দেহটিকে শোয়ানো হয়েছিল। কিন্তু মাথার নিচে ছিল ঘাসের তৈরি এক রকমের বালিশ। কঙ্কালটির ঠিক বুক বরাবর কবরের মধ্যেই কুঁড়েঘরের মত সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল সম্ভবত এই বিশ্বাস থেকে যে, জীবের প্রাণ বা সূক্ষ্মসত্তা থাকে তার বুকের মধ্যে। মাথা ও পায়ের দিকে দুটি গোলাকার গর্তে দণ্ড পুঁতে আড়াআড়িভাবে বিম তুলে দিয়ে এই কুঁড়েঘরটি তৈরি। এই বিম থেকে ডালপালা দুই দিকে ঝুঁকে পড়ে খড়ো চালের ঢালু তৈরি করেছে। এই ডালগুলো

আবার নলখাগড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাকা। চালের এই বিমের উপর কতকগুলি দণ্ড উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড় করানো। এর পাশে রয়েছে ক্ষয়ে যাওয়া কিছু শিলাজাতীয় বেলেপাথর। উপরে রয়েছে ছাইয়ের গাদার মধ্যে একটি গরুর মাথা, চারটি পা, কিছু দাগকাটা হাড়ের গহনা। এই গহনা একটি পাত্রে মৃতের গলার কাছে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি হাড়ই গোড়ার দিকে ফুটো করা। এই হাড়গুলো সবই অগ্নিদগ্ধ। এর একটিতে মাথার দিকে ঘষে ঘষে ধারালো করাও রয়েছে। সম্ভবত ইউরোপে শবদাহের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা পুরনো অঞ্চল নীপার ও নীস্টার নদীর উপত্যকাস্থ অঞ্চলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপেক্ষাও এই কবরটির গুরুত্ব বেশি। নীস্টার ও নীপার নদীর উপত্যকা অঞ্চলে শাবদাহ প্রথা নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বলে বর্তমানে ধারণা করা হচ্ছে। যে কবরটির উল্লেখ করা হয়েছে সেই কবরটি এই অঞ্চল থেকে খুব একটা দূরেও নয়। নব্যপ্রস্তর যুগ এ অঞ্চলে অভিনব কিছু না দেখালেও মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশলে সভ্যতার এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। মৃৎপাত্রগুলো সুন্দরভাবে চিত্রিত। এর সঙ্গে রয়েছে ষাঁড়ের মাথা এবং অন্যান্য জিনিসের মডেল ও অসংখ্য পুতুল। এই ষাঁড়ের মাথা ও পুতুল দ্বারা নারী জাতি ও গরু ভেড়া বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শবযাত্রা ঃ এইসব নিদর্শন দেখে মনে হয় এখানে শবযাত্রা পদ্ধতিও ছিল। মৃতদেহকে স্লেজগাড়ি করে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত। এই স্লেজগাড়ি হয় পশুতে টানতো নয়তো মানুষে ঠেলে নিয়ে যেত। গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার নিদর্শন এখানকার প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপির (Sylvester Ms of SS) ছবি দেখে অনুমান করা যায়। স্লেজ দিয়ে সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহ নিয়ে যাবার নমুনা ফিনদের মধ্যেও রয়েছে। ইউরোপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অদ্যাবধি গ্রীষ্মকালেও গাড়ির পরিবর্তে স্লেজে করে এই শব নিয়ে যাওয়া হয়। মিশরেও এ ধরনের শবযাত্রার নমুনা পাওয়া গেছে।[১] লাইসিয়ান সমাধিতে ব্যবহৃত পাথর থেকেও স্লেজ গাড়িতে শবযাত্রার কথা জানা যায়, কারণ এর উপর এ ধরনের চিত্র রয়েছে।

মৃতকে প্রদত্ত উপহার ঃ ইলিয়াদে যেমন দেখা যায় যে, পেট্রোক্লাস-এর চিতায় তার রথ বহনকারী চারটি অশ্বকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, হেরোডোটাসে যেমন দেখা যায় যে সাইথিয়ান রাজাদের শ্মশানে বহু ঘোড়া দেওয়া হত, তেমনই জার্মান ও রাশিয়ানদের এই অঞ্চল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানুষকে তার ঘোড়া সহ কবর দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় ঘোড়ার পিঠে বসিয়েও কবর দেওয়া হত। 'অনুচিন' কাব্য থেকে বোগাতাইরি পোটোক মিখাইল আইভনোভিচের কবর সম্পর্কে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ—

"এরপর তারা সেখানে কবর খুঁড়তে আরম্ভ করল। খুব বড় ও গভীর একটি

১ Ency. of Religion and Ethics, Edt, James Hastings, Vol. V, P. 509.

কবর খুঁড়ল। এত বড় কবর খুঁড়ল যে তা কুড়ি হাতের মত প্রশস্ত। এরপর পোটোক মিখাইল আইভনোভিচকে তার ঘোড়া এবং যুদ্ধের পোশাক-আসাক সহ কবরের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হল। উপরে ওক কাঠ দিয়ে তারা একটি আচ্ছাদন তৈরি করে দিল আর কবর ভরে দিল হলুদ বালি দিয়ে।'

অন্ত্যেষ্টি ভোজ: স্লাভরা অন্যান্য জাতির মত প্রাচীনকালে মৃতের উদ্দেশে অন্ত্যেষ্টি ভোজের আয়োজন করত। তারা যে অন্ত্যেষ্টি ভোজ দিত তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মথিয়াস মুরকো (Matthias Murko)-এর চিত্রশিল্প থেকেও এ বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। ভোজ হত তিন পর্যায়ে, যেমন—(১) কবর দেবার পর সমাধি স্থানে (২) ব্যক্তি-কবরে ও (৩) সকল আত্মার জন্য (এদের মধ্যে ছিল পূর্বপুরুষ ও রাশিয়ায় মৃত বিদেশীরাও)। এ বিষয়ে মুরকো (Murko) যে মন্তব্য করেছেন তার মূল বক্তব্য এই ধরনের :—স্লাভদের অন্ত্যেষ্টিভোজে গ্রীক, রোমান এমনকি আদিকালের মানুষের বহু নিয়মকানুন পর্যন্ত ঠাঁই পেয়েছিল। সমাধিক্ষেত্রে যে ভোজ দেওয়া হত তাতে এই বিশ্বাস কাজ করত যে, মৃতের আত্মা সরাসরি আত্মীয়-স্বজন বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে ভোজে অংশ নিতে পারে। এইজন্য শোকার্তরা ভোজসভায় একটি টেবিল মৃতের আত্মার জন্য শূন্য রাখত। তারা সরাসরি তাকে ভোজে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণও জানাতো। মৃত যে যে খাবার পছন্দ করত সেই সেই খাবার সকলে আনন্দ সহকার গ্রহণ করত। মৃতকে তারা মদ ও মধু পান করতে দিত। কবরে তার মাথার দিকে এজন্য মদ ও জল ঢেলে দেওয়া হত। কবরের পাশে বা উপরে মৃতের জন্য তারা খাবারও রেখে দিত। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, স্লাভরা মৃত্যুর পর মানুষের সূক্ষ্ম সত্তার উপস্থিতিতে বিশ্বাস করত।

তিব্বতীদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

তিব্বতীরা মনে করত যে, মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হয় না, মৃত্যু হয় একজন দৈত্যের জন্য, যার কাজই হল মানুষের মৃত্যু ঘটানো। সেই জন্য তারা কোন গৃহে মৃত্যু হলে এই দৈত্যকে সেই গৃহ ও গ্রাম থেকে তাড়াবার জন্য ক্রিয়া করত। তিব্বতীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও যে পদ্ধতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে তা বৌদ্ধযুগপূর্ব, যদিও রক্ষণশীল বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই তা পারিচালনা করে। তিব্বতীরা মনে করে যে, মৃত্যুর পরও জীবাত্মা বেঁচে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য যা কামনা করে তা বৌদ্ধধর্মসম্মত নয়, অর্থাৎ অর্হত্ত্ব, নির্বাণ বা বুদ্ধত্ব নয়। তারা চিরন্তন এক স্বর্গে অমর জীবন কামনা করে। ভারতীয় মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অমিতাভ বুদ্ধ এই স্বর্গে বাস করেন বলে বিশ্বাস। সুতরাং কারো মৃত্যু হলে তিব্বতীদের প্রথম লক্ষ্য হয় মৃতের আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হয় তার উত্তরাধিকারীদের মৃত্যু-দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা করা। তারা

আরও বিশ্বাস করে যে, মৃতের আত্মা যদি স্বর্গে পৌঁছুতে না পারে, তবে সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে এবং জীবিতদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করে, যে বিশ্বাস থেকে আমরা গয়ায় পিণ্ড দেই।

আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বা সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি মারা গেলে তিব্বতীরা তার সমাধিস্থলে মানুষ বলি দিত। রাজকর্মচারীদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ' জন রাজার খুব অন্তরঙ্গ হত। এদের বলা হত সাথী। রাজার মৃত্যুর পর এরা নিজেরা আত্মহত্যা করে পরলোকে তাঁর সঙ্গে স্বর্গবাসী হবার চেষ্টা করত। এদের রাজার পাশেই সমাধিস্থ করা হত। পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়াতে এ ধরনের নানা সমাধিস্তূপ অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায়। মৃতের পাশে তাঁর সকল প্রিয় সামগ্রীও কবরস্থ হত। এর মধ্যে তাঁর নানা যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়াও থাকত। তাঁর কবরের উপর মাটি দিয়ে স্তূপ তৈরি করে দেওয়া হত। মৃতের উদ্দেশে যে পশু বলি দেওয়া হত, তার প্রমাণ, অদ্যাবধি বৌদ্ধ পুরোহিতেরা পশুর মূর্তি কবরের উপর বা পাশে রেখে দেয়।[১]

আত্মা নির্গতকরণঃ তিব্বতীরা মনে করে যে, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে দৈহিক মৃত্যু ঘটলেই আত্মা সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছেড়ে যায় না। চারদিন পর্যন্ত আত্মা দেহের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। যাতে আত্মা দেহ ছেড়ে যে পথে সহজে স্বর্গে যাওয়া যায় সেই পথে যেতে পারে এজন্য একজন পুরোহিত দিয়ে কাজ করানো হয়।

মৃত্যু হবার পর কাউকে মৃতদেহ স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। মৃতদেহের মুখ সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একজন পুরোহিত তিব্বতের আদি কায়দায় তখন সেই দেহ থেকে আত্মা বের করে আনার ক্রিয়া করতে থাকেন। এই পুরোহিত একজন উচ্চ পর্যায়ের পুরোহিত। তাঁর নাম 'পি ও বো' বা স্থানত্যাগীর গতিকারক। আত্মীয়-স্বজনদের সরিয়ে দিয়ে পুরোহিতটি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে পশ্চিম দিকে মুখ করে মৃতের শিয়রে বসে মন্ত্র পড়তে থাকে, যাতে তার আত্মা পশ্চিমে, স্বর্গে গিয়ে সহজে পৌঁছুতে পারে। মৃতের আত্মাকে দেহ ও মাটির সম্পদ থেকে বিচ্যুত করে পুরোহিতটি তার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মৃতের ব্রহ্মরন্ধ্রের কয়েকটি কেশ টেনে ধরে এবং জোরে কয়েকবার তা নাড়িয়ে দেয়। ধারণা, এখান দিয়ে তার আত্মা বেরুবার পথ খুঁজে পায়। অর্থাৎ চুলের গোড়া দিয়ে বেরুবার পথ করে নেয়। এরা মনে করে যে, এমন করা হলে মাথায় ফুটো হয়ে যায়। যদি এরকম করতে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তবে তা শুভ লক্ষণ বলে তিব্বতীরা মনে করে। এর পর আত্মাকে নির্দেশ দেওয়া হয় স্বর্গের পথে যে সব বিপদ আছে সেখানে সে যেন তা এড়িয়ে চলতে পারে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় ঈশ্বরাভিমুখী গতি লাভ করার জন্য। এই অনুষ্ঠান প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি চারদিনের মধ্যে মৃতের দেহ না পাওয়া যায় তাহলে পুরোহিত ধ্যানে বসে মৃতকে স্মরণ করে এই কাজ করেন।

---

১ L. A. Waddel, Buddhism of Tibet, p. 518 f.

শবস্পর্শ করাঃ—কেউ মারা গেলে সবাইকে মৃতদেহ স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র আত্মীয়-স্বজন বা জ্যোতিষী নির্দেশিত ব্যক্তিই তা স্পর্শ করতে পারে। এজন্য জ্যোতিষীকে মৃতের ঠিকুজী বিচার করতে হয়। এই কোষ্ঠী-ঠিকুজী দেখেই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ধার্য করা হয়। কিভাবে এবং কোথায় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়। মৃতের আত্মার কল্যাণ ও আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলের জন্য কি ধরনের পুজো করা হবে তাও কোষ্ঠী-ঠিকুজী ঠিক করে দেয়।

সাধারণভাবে যারা মৃতের দেহ স্পর্শ করতে পারে তারা হল মৃতের শিশু সন্তানেরা। তবে লাসা ও বড় বড় শহরে ডোমেরাও মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে। গ্রামে আত্মীয়-স্বজনহীন কেউ মারা গেলে কোন বন্ধু তাকে নিজের বলে গ্রহণ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারে। অন্ত্যেষ্টি-ভোজও সে দিতে পারে। এইভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার অধিকারী হয়ে সে মৃতদেহের কাছে যায় এবং দেহটিকে ভাঁজ করে ফেলে। ভাঁজ করে এমন ভঙ্গীতে যেন সে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এইভাবেই দেহটিকে বেঁধে ফেলে মাথা নামিয়ে দেওয়া হয় দুই হাঁটুর মাঝখানে, হাত দুটি পায়ের নিচ দিয়ে। যদি দেহ শক্ত হয়ে যায় তাহলে এমনভাবে ভাঁজ করার জন্য যদি হাড় ভেঙে ফেলতেও হয় তাই করা হয়ে থাকে। প্রচীনকালে এই ধরনের ভঙ্গীতে কবর দেওয়া হত। সম্ভবত এই প্রথা প্রাচীন সেই প্রথারই অবশিষ্টাংশ মাত্র। এতে মৃতদেহ সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

এইভাবে দেহ বাঁধা হবার পর মৃতেরই কোন বস্ত্র দ্বারা তার দেহ আচ্ছাদিত করা হয়। তারপর একটি চামড়ার থলেতে পুরে তাতে তাঁবুর কাপড় কম্বল ইত্যাদি দিয়ে দেহটিকে সরিয়ে নেওয়া হয় বাড়ির কোন ছোট উপাসনালয়ে। যদি উপাসনালয় না থাকে, তবে কোন এক কোণে তার দেহ রেখে দেওয়া হয়। আবহাওয়ার কারণে দেহটা এখানে অনেকদিন অবিকৃত থাকে। তা না হলে থলে সমেত মৃতদেহটি ঘরের কোন বিমে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

প্রাক-অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানঃ দেহ স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দিনরাত্রি কোন পুরোহিত মৃতদেহের পাশে থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে। প্রধান পুরোহিত যে পর্দা মৃতদেহকে দৃষ্টির অগোচরে রাখে সেই পর্দার দিকে পিঠ রেখে বসে থাকেন। এরপর সাধারণ লোকেরা বিদায় নেয়। অন্যান্য পুরোহিত প্রধান পুরোহিতের দিকে মুখ করে বসে থেকে বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করতে থাকে। অনেক সময় একাধিক গ্রন্থ থেকেও পাঠ করা হয়। সব সময়ই প্রদীপ জ্বলে। মৃতের উদ্দেশে তারা খাদ্য ও পানীয় দান করে। মৃতের 'পাত্র' চা ও বিয়ার দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়। তাছাড়া তারা যা খায় সেই খাদ্যের অংশও মৃতের নামে উৎসর্গ করে। মৃতের উদ্দেশে যে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয় পরে তা ফেলে দেওয়া হয়। কারণ, তারা মনে করে যে, খাদ্যের সূক্ষ্মাংশ মৃতের সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করে নিয়েছে। ভারতীয় বৌদ্ধেরাও

'অবলম্বন' নামক ক্রিয়া করে মৃতকে খাদ্য ও পানীয় দান করে থাকে, যেমন হিন্দুরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করে। মৃতদেহ সৎকারের আগে অতিথিরা নীরবে মৃতের গৃহে, (যে ঘরে মৃতদেহ থাকে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু মৃতদেহ সরিয়ে নেবার পর কেউ সে গৃহে আর এক মাসের জন্য জলস্পর্শ করে না।

শবযাত্রা : তিব্বতীদের শবযাত্রা আরম্ভ হয় দিনক্ষণ দেখে। এই দিনক্ষণ ঠিক করে দেয় জ্যোতিষিরা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা এরপর নত হয়ে মৃতদেহকে সম্মান জানায়। [মৃতদেহকে প্রণাম করার রীতি ভারতবর্ষেও রয়েছে। ভারতীয়েরা শবকে শিব মনে করে নমস্কার করে]। এরপর মৃতদেহ বহন করার জন্য যে সব ব্যক্তি আছে, তারাই মৃতদেহকে তুলে নেয়। মৃতদেহটিকে রাখা হয় প্রধান শোকার্ত-এর পিঠে। সে দেহটি নিয়ে এগিয়ে যায় দরজা পর্যন্ত। এখানে চতুষ্কোণ একটি কফিনে মৃতদেহটিকে রাখা হয়। যে বৌদ্ধমঠ এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করবে সেই মঠ থেকেই কফিনটি সরবরাহ করা হয়। মৃতদেহ কফিনে ভরা হলে কফিনবাহকেরা তা নিয়ে যায় সমাধিক্ষেত্রে বা শ্মশানে। যদি প্রধান শোকার্ত মহিলা হন, তবে তিনি শবযাত্রায় অংশ নেন না। তিনবার কফিন প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গে তিনবারই শবকে প্রণাম জানান। এরপর তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

শবযাত্রার পুরোভাগে যায় পুরোহিতেরা। তারা সংস্কৃতে মন্ত্র পড়তে পড়তে যায়। এই মন্ত্র পরবর্তীকালে লেখা ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ধার করা। শবযাত্রায় শিঙা, জয়ঢাক, হাতবেল, সব বাজে। এরপর যায় মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা। সবার শেষে আসে কফিন। প্রধান পুরোহিত একটি বড় রুমাল বেঁধে কফিন পরিচালনা করেন। এই রুমালের প্রান্তভাগ তিনি বাঁ হাত দিয়ে ধরে থাকেন। ডান হাতে একটি করোটি বাজাতে বাজাতে তিনি এগিয়ে যান। এই দীর্ঘ রুমালকে তিব্বতীরা বলে 'হুরিন-ফন' অর্থাৎ আত্মার পতাকা। চৈনিকরা এই রুমাল কফিনের আগে আগে উড়িয়ে যায়।

মৃতদেহকে সমাধিস্থ বা দাহ করার জন্য যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহল একটি নির্জন পর্বতের চূড়া। দুষ্ট-আত্মারা সব সময় এখানে ঘুরে বেড়ায় বলে তাদের ধারণা। লাসাতে অবশ্য সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র শহরের মধ্যেই। একে বলা হয়—'দুর-করোদ'। রাস্তায় মৃতদেহ কোথাও নামানো যায় না। যদি কোথাও নামানো হয় তাহলে শেষকৃত্য সেখানেই করতে হবে।

শেষকৃত্য : কিভাবে মৃতদেহের সৎকার হবে তিব্বতে তা নির্ণয় করে দেন একজন জ্যোতির্বিদ লামা। তিব্বতে মৃতদেহ সৎকারের যত পদ্ধতি আছে তার মধ্যে শবদাহই হল বৌদ্ধপদ্ধতি। সাধারণত পাঁচ ধরনের সৎকার-এর ব্যবস্থা আছে। যেমন, (১) পশু দ্বারা মাংস ভক্ষণ করিয়ে হাড় কবর দেওয়া। একে বলা হয় 'উন্মুক্ত পদ্ধতি'। এই প্রথা হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষের আদিমতম প্রথা।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রাচীন সাইথিয়ানদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য করে তাঁর রচনায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। বর্তমানে পার্শী সম্প্রদায় এই প্রথা অনুসরণ করে। সম্ভবত তারাও এই প্রথা পেয়েছিল আদিম মানুষ বা তুর্কীদের কাছ থেকে। এখন অবশ্য তিব্বতী বৌদ্ধরা এ ধরনের সমাধি দেবার পক্ষে জাতকের একটি গল্পকেই দায়ী মনে করেন। জাতকে গল্প আছে যে, প্রাক্তন জীবনে শাক্যমুনি নিজের মৃতদেহকে ক্ষুধার্ত-ব্যক্তি ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের জন্য উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। তবে ঐতিহাসিকেরা এ অজুহাতকে কোন মূল্য দেন না। ভারতীয় বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কোথাও এ ধরনের কবর দেবার রীতি প্রচলিত নেই। শ্যাম, কোরিয়া ও তিব্বতে আজও এ ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে পদ্ধতি আছে তা সাইথিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা বলে অনেকে মনে করেন। সমাধিক্ষেত্রে এই প্রথায় মৃতদেহকে কোন পাহাড়ের উপর একটি দণ্ডে মাথা নিচের দিকে করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটি বড় ছুরি দিয়ে দেহটি চিরে দেন। এরপর যারা এ কাজ করে তারা দেহ চিরে চিরে মাংসের টুকরো শকুনী ও মাংসাশী অন্যান্য প্রাণীদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়। লাসাতে কুকুর ও শুকররা পর্যন্ত এই মাংস খেয়ে থাকে। তবে শকুনীর পেটে যাওয়াকে তিব্বতীরা অধিক কল্যাণপ্রদ বলে মনে করার জন্য সমাধি-ক্ষেত্রে ভাড়া করা লোক রেখে দেওয়া হয়। তারা শকুনী ভিন্ন অন্য কোন মাংসাশী প্রাণী কাছে আসার চেষ্টা করলে তাদের তাড়া করে। যত তাড়াতাড়ি মৃতদেহ পশুর পেটে চলে যায় ততটাই কল্যাণদায়ক বলে তিব্বতীরা মনে করে। এই ধরনের মৃতের করোটি জল রাখার জন্য অতি উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়।

দেহ থেকে মাংস তুলে নেওয়া হলে হাড়গুলিকে কবর দেওয়া হয়। মৃতের পরিবার বিত্তশালী হলে এই কবরের উপর মাটির স্তূপ দেয়।

(২) মৃতের হাড়গোড় মাংস সবই পশু দ্বারা ভক্ষণ করানো হল তিব্বতীদের দ্বিতীয় ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। একে তিব্বতে বলা হয় স্বর্গীয় প্রথা। ধনীরা এইভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেও এ প্রথা খুব একটা বেশি চালু নয়। এতে দেহ থেকে মাংস কেটে পশুদের খাওয়াবার পর হাড়গুলিকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে কুকুর ও শকুনিকে খাওয়ানো হয়।

(৩) তৃতীয় প্রথাতে মৃতদেহকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বা কোন নির্জন জায়গায় রেখে আসে। এ প্রথা সাধারণত গরীবেরাই অনুসরণ করে, কারণ অন্য সব প্রথায় খরচ বেশি। মৃত পশুকে যেমন দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হয়, এই প্রথায় মানুষের মৃতদেহকেও তেমনি টেনে নেয়। এই প্রথায় অপরাধী ব্যক্তি, দুষ্ট রোগী, বন্ধ্যা রমণী প্রভৃতিরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যুদ্ধে নিহত শত্রুর করোটি খুব শুভ বলে বিবেচিত। তিব্বতীরা একে পানীয় জলের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

(৪) চতুর্থ প্রথায় কিছুটা বৌদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। এই প্রথা উচ্চ সম্প্রদায়ের লামাদের জন্য সংরক্ষিত। এই প্রথা অনুযায়ী মৃতের শবদাহ করা হয়। যেখানে কাঠ সহজলভ্য সেখানে সাধারণ লোকও এই অন্ত্যেষ্টিপ্রথা অনুসরণ করতে পারে।

এই প্রথানুসারে মৃতদেহকে পদ্মাসনে বসা ভঙ্গীতে চিতাগ্নিতে স্থাপন করা হয়। দক্ষিণ হাত থাকে জঙ্ঘার উপর। বাঁ হাত বরদানের ভঙ্গিতে কাঁধ বরাবর উঁচু হয়ে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মাথা নিচু করে রাখা হয়। কাঠে আগুন জ্বলে উঠলে চিতায় বসানো মৃতদেহের উপর ঘি ঢালে লোকেরা। এইভাবে পুড়তে পুড়তে দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে পড়লে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়। তবুও যতক্ষণ না চিতাগ্নি নির্বাপিত হচ্ছে ততক্ষণ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কয়েকজন থেকেই যায়। তবে দেহ যে সবটাই পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় তা নয়। দেহের যে অংশ ভস্মীভূত হয় না পুরোহিত সেই অংশটুকু মৃতের জন্য সংরক্ষিত গৃহে নিয়ে যান এবং দগ্ধ অস্থি গুঁড়ো করে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে চৈত্য ধরনের ফলক তৈরি করে তার উপর বৌদ্ধশাস্ত্র 'ধর্মসূত্র' থেকে 'জ' 'জ' শব্দ লেখেন। চোরটেন নামে সমাধি-সৌধের কুলুঙ্গিতে এই ফলক রেখে দেওয়া হয়। যদি মৃত ব্যক্তি ধনী হন, তবে এই ফলক রক্ষার জন্য তিনি স্বতন্ত্র সৌধ নির্মাণ করতে পারেন।

(৫) তিব্বতে পঞ্চম ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল ফলক লাগিয়ে সম্পূর্ণ দেহকেই রক্ষা করা। এই প্রথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুধুমাত্র লাসার প্রধান লামা ও তাশিলহুনপোর জন্য বিখ্যাত। লবণ বিছিয়ে দেহ ঔষধিকরণ করা হয়। দেহ মলমীকৃত হলে তাতে লামার নিজস্ব পোশাক পরিয়ে দেয় ভক্তেরা। এরপর তাঁর দেহের চারপাশে পুজার থালা, ঘণ্টা, ফুলদানি, ধূপদানি, কোষাকুষি, চামড়া ইত্যাদি থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে বুদ্ধের যোগাসন ভঙ্গীতে বসিয়ে রাখা হয়। মৃতদেহ রাখা হয় গিল্টি করা তামার পাত্রে। রাখা হয় প্রাসাদেরই একটি কক্ষে। এই মূর্তিকে পরে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হয়। তাঁর সামনে বেদীতে নিত্য আজ পর্যন্ত পানীয় দেওয়া হয় এবং ভক্তেরা প্রদীপ জ্বালায়। পরে এই মূর্তিকে গিল্টি করা একটি কুলুঙ্গিতে রাখা হয়। তীর্থযাত্রীরা এখানে পুণ্যার্থে আগমন করলে এই সংরক্ষিত মৃতদেহেরও পুজো হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের ব্যবস্থা: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলেই যে সব শেষ হয়ে যায় তা নয়। উনপঞ্চাশ দিন পর্যন্ত মৃতের আত্মাকে যথার্থ স্থানে আনা যায় না বলে তিব্বতীয়দের ধারণা। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র এলাকা থেকেই মৃত্যু-দৈত্যকে তাড়াবার কাজ চলতে থাকে। এই দৈত্য তাড়ানোর কাজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার দুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হয়। একে বলা হয় 'জ-দ্রে' অর্থাৎ মৃত্যু-দৈত্যের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া। তীব্বতীরা মনে করে যে, এই দৈত্যের দেহ দেখতে মানুষেরই মত। বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ায়। ময়দা বা আটা দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি তৈরি করে

এজন্য বলি দেওয়া হয়। দৈত্য তাড়ানোর কাজ সারা হলে পরলোকে আত্মাকে যথার্থ স্থানে স্থাপন করার জন্য উনপঞ্চাশ দিন ধরে প্রতি সপ্তাহে পুরোহিতদের মাধ্যমে পারলৌকিক ক্রিয়া করতে হয়। এই সাত সপ্তাহ মৃতের শুদ্ধিকরণ পর্যায় বা তিব্বতী ভাষায় 'বর-দো' অবস্থায় আত্মা মৃত্যু ও নবজন্মের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে। অন্যান্য পুরোহিতও মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য এই সময় পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ নেয়। মৃতের একটি সাধারণ প্রতিমূর্তি তৈরী করা হয়। যেদিন গৃহ থেকে মৃতদেহ সরানো হয় সেদিনই এই প্রতিকৃতি বা কুশপুত্তলিকা তৈরী করে তারা। একটি কাগজে ছাপানো ফুল এই কুশপুত্তলিকাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের পোশাকও এই কুশপুত্তলিকাই পরে। উনপঞ্চাশতম দিনে ক্রিয়া শেষ হয়। মুখোশটি পুড়িয়ে দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র বিলি করে দেয় তিব্বতীরা। মৃতের সম্পত্তি থেকে যে পুরোহিত পারলৌকিক ক্রিয়া করেন তিনি বেশ মোটা রকমের কিছু পান।[১]

তিব্বতে শোকপ্রকাশ করা হয় মৃত তরুণ-তরুণীদের জন্য। বৃদ্ধদের জন্য তেমন শোকপ্রকাশ করা হয় না। শোক পালনের পূর্ণ সময় এক বছর। তবে সাধারণত তিন চার মাস এই শোক পালন করা হয়। এই সময় মৃতের পরিবারের লোকেরা কোন রঙিন কাপড় পরতে, মুখ ধুতে ও চুল আঁচড়াতে পারে না। পুরুষেরা মাথা কামায়। মেয়েরা গয়নাগাটি ও গলার জপের মালা খুলে রাখে। বড় কোন লামার মৃত্যু হলে লোকে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত শোক পালন করে।[২]

১ S. W. Bushell, JRAS, 1880, pp. 440, 521, 527 etc. W. Ramsay, Western Tibet, Lahore, 1890, p 49f. w. w. Rockhill, Ethnology of Tibet, Washington, 1895, pp 727 etc, JRAS, 1891, L. A. Wadel, Buddhism in Tibet, Lhasa and its Mysteries—1905,

২ Ency. of Religion and Ethics, Vol. IV, Edt. James Hastings, P. 511.

ষোড়শ অধ্যায়

মৃত্যু ও মুসলমানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

কোরানের কথামত প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে (iii 182)। শেষের দিনে ঈশ্বরের তূর্যনাদে (Trumpet) যাঁরা বেঁচে থাকবে তারাও মারা যাবে (xxxix 86)। মহত্তর কিছু দেবদূতই (Angle) শুধু বেঁচে থাকবে হয়তো। কে কবে মারা যাবে তা পূর্ব নির্দেশিত (xiv 38)। পয়গম্বর স্বেচ্ছায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করতে বারণ করে গেছেন। মৃত্যুকালে যাঁর মুখ থেকে 'কালিমা' (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রচারিত বিশ্বাস—'আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই') বেরুবে তিনি নিশ্চয়ই বেহেস্তে যাবেন। মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে এই কালিমা এবং সুরা ইয়াসীন (কোরান, xxxvi) আবৃত্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে দয়ার্দ্র কোন দূত সাদা পোশাক পরে আত্মার কাছে আসেন এবং ঈশ্বরের শান্তিতে স্থান লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আত্মাকে এক দেবদূতের কাছ থেকে আর এক দেবদূতের কাছে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলামে বিশ্বাসী আত্মারা যেখানে আছেন সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন আত্মাকে দেখে তারা সন্তুষ্ট হন এবং পৃথিবীতে ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু যারা ইসলামে আত্মসমর্পণ করেনি তাদের কাছে আসেন ক্রুদ্ধ দেবদূত। অবিশ্বাসীর আত্মা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেহত্যাগ করে। বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরের দূতেরা তাকে অবিশ্বাসীদের আত্মা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে আসেন। ভিন্ন মতে সৎ ব্যক্তির মৃত্যু হলে আত্মা তার দেহ থেকে জলের মত বেরয়। মৃত্যুদূত তাকে হস্তগত করেন। কিন্তু শ্বেতবস্ত্র পরিহিত দেবদূতেরা তাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মৃগনাভির গন্ধওয়ালা এক ধরনের ধোঁয়াতে জড়িয়ে সপ্তম সর্গে পাঠিয়ে দেন। এখানে ইসলামে বিশ্বাসীর নাম লেখা হয়। এরপর আবার সেই আত্মাকে মর্ত্যে তাঁর দেহের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেহের সঙ্গে কবরে বাস করার জন্য। কিন্তু অবিশ্বাসীর আত্মাকে গরম থুতুর মত ভেজা পশমের জিনিস থেকে টেনে বার করে এবং থলে জাতীয় বস্তের মধ্যে পুরে দেয়। এই আত্মা থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। তার নাম নরকে লেখানো হয় অর্থাৎ—'সিজ্জীন'-এ। এখান থেকে একে ঠেলে পৃথিবীতে ফেলা হয়। কবরের দূতেরা তাকে পরীক্ষা করে দেখে।

সূক্ষ্মজগতে যখন এ ধরনের কাজ চলতে থাকে তখন পৃথিবীতে মৃতের দেহ নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া চলে। পুরুষ এবং নারীর জন্য প্রায় একই ধরনের বিধান কাজ করে। পারলৌকিক সকল ক্রিয়াই হয় পয়গম্বর নির্দেশিত পথে। মৃতব্যক্তিকে মক্কার দিকে মুখ করে রাখা হয়। মৃতের কাছে যারা থাকে তাদের উদ্দেশে পবিত্র গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি চলে। মহিলারা শোক প্রকাশ করেন।

কারো মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার দেহবাস পরিবর্তন করা হয়। লোকে তার মুখ ও পা বেঁধে দেয়। মৃতদেহ বস্ত্রে আবৃত হয়। শোকার্তরা শোকপ্রকাশ করতে থাকেন। মৃত ব্যক্তি যদি গণ্যমান্য হন, সঙ্গে সঙ্গে মিনার থেকে তার নাম ঘোষণা করা হয় (কোরান, ixxvi 5-9)। কেউ যদি সন্ধ্যাবেলা মারা যান, সারারাত তার জন্য শোক প্রকাশ করা চলে। 'ফিকী'রা কোরান বা কুরান থেকে আবৃত্তি করেন। তবে সকালে যদি কারো মৃত্যু হয়, দিনে দিনেই তাকে কবর দেওয়া হয়। মুঘস্‌সিল (Mughassil) বা ঘস্‌সাল (Ghassal) নামে এক ধরনের ধৌতকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি (মহিলা পুরুষ—উভয়েই) মৃত দেহ ধুয়ে মুছে দেয়। মৃতদেহকে কবরস্থ করার জন্য আয়োজন চলে। ইতিমধ্যে কোরান থেকে পাঠ হতে থাকে। মৃতদেহকে কবরস্থ করার আগে যতপ্রকার সুন্দর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তার সবই নেওয়া হয়।

ইসলামে বিশ্বাসীদের শবযাত্রা দেশ অনুসারে এক এক দেশে এক এক রকম। মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে যাবার সময় কোন পথিক যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইসলামে তা পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। প্রার্থনা করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় পথে যারা পড়েন, তাদের দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রদ্ধা জানাবার বিধান আছে। মৃত যদি মহিলা হন তাঁর শবযাত্রায় একটু ভিন্ন ধরন রয়েছে। কোন সাধু শ্রেণীর অর্থাৎ ওয়ালীর মৃত্যু হলে মহিলারা আনন্দধ্বনি করেন।

মৃতদেহ যে আধারে নিয়ে যাওয়া হয় তা নামানো হয় মসজিদের কাছে। মৃতদেহের দক্ষিণভাগ থাকে মক্কার দিকে। ইমাম যখন তার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রার্থনা শেষ করেন তখন তাঁর সহযোগী মুবাল্লিঘ (Muballigh) সকলের সামনে মৃতের গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। ফিকী (Fiqis)-রা তখন 'ফতিহ' (Fatiha) আবৃত্তি করেন। এরপর শব নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের জন্য বড় ধরনের সমাধিসৌধ তোলা হয়। বড় সমাধি সৌধ তোলা হয় এই কারণে যে, যখন মুনকর (Munkar) ও নকীর (Nakir) নামে দূতেরা এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন সে যেন সহজে উঠে বসতে পারে। যদি মৃতের উত্তর মনোমত হয়, তাহলে তার কবরের পরিসর বেড়ে যায়। সুন্দর এক মুখশ্রীসম্পন্ন মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—'আমি তোমার সৎকর্ম।' অসৎকর্ম হলে বীভৎস এক মূর্তি এসে সামনে দাঁড়ায়। এ হল তার অশুভ কর্মের প্রতিমূর্তি।

মৃতদেহকে আধার থেকে তুলে নতুন কবরে সমাধিস্থ করা হয়। কবরে মৃতদেহ রাখা হয় দেহের ডান দিকে। মুখ থাকে মক্কার দিকে। মৃতদেহের বাঁধন এই সময় আলগা করে দেওয়া হয়। অল্প একটু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোরান থেকে আবৃত্তি চলে (ওয়াহাবি এবং আরও অনেকে এই আবৃত্তি বারণ করেছিলেন)। এরপর কবরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কবরে আর কোন অনুষ্ঠান হয় না (যদি না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোন মালিকানীর হয়)। জনৈক ফিকি (Fiqi) মুলাক্কিন (Mulaqqin) অর্থাৎ

মৃতের শিক্ষকের ভূমিকায় কবরের কাছে বসে মৃতের উদ্দেশ্যে পাঁচটি যথার্থ জবাব শিখিয়ে দেয়, যে জবাব সেই রাতেই পরীক্ষক দূতেরা এসে জিজ্ঞাসা করবে। এই জিজ্ঞাসার বিষয় প্রশ্নোত্তরে তার ধর্মতত্ত্বের সার। দূতেরা জিজ্ঞাসা করা মাত্র তাকে জবাব দিতে হবে যে, তাব ঈশ্বর হলেন আল্লা, ধর্মপ্রচারক হজরত মহম্মদ, ধর্মগ্রন্থ কোরান ও কিবল্য (Qibla) কাবা। এরপর কবর ত্যাগ করে নীরবে চলে আসা হয়। শুধুমাত্র একটি ফাতিহ (Fatiha) আবৃত্তি করা চলে মৃতের জন্য এবং অপরটি ঐ গোরস্থানের সকল মৃতের জন্য। কোন কোন ফিকী মৃতব্যক্তি যে ঘরে মারা গিয়েছিল সেখানে ভোজন করে থাকে এবং কোরান থেকে পাঠ করে (ch. ixvii)। কিংবা আরও বিস্তৃত অনুষ্ঠান করে, যাকে বলে সভা (Sabha)। এসময় মালা গনা হয়। গুনে গুনে হাজারবার 'কালিমা' পুনরাবৃত্তি করে। অনুষ্ঠান শেষ হয় একজন ফিকী অন্যান্যদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করবার পর—'তোমরা যা আবৃত্তি করেছ তার গুণ কি মৃতকে দিতে পেরেছ ?' সকলে উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

মৃতের গৃহের মহিলারা কবর দেবার প্রথম তিন সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার কান্না সহকারে শোকপ্রকাশ করে। পুরুষ মানুষেরা এই সময় গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যর্থনা জানান। ফিকীরা কোরান থেকে 'হতমা' (Hatma) অনুষ্ঠান করে। এই তিনটি বৃহস্পতিবারের প্রতি বৃহস্পতিবারের পরের শুক্রবার মহিলারা কবরে গিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করেন। এই সময় দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এইভাবে প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রতিটি নির্দিষ্ট দিনে একই ধরনের কাজ করা হয়। পুরুষেরা কোন বিশেষ ধরনের পোশাক পরে শোকপ্রকাশ করেন না, তবে মহিলারা গভীর নীল রঙের ওড়না পরেন। হাতে ও বাহুতেও অনুরূপ রঙ লাগান। এই সময় তারা কেশচর্চা করেন। গৃহের প্রধান মারা গেলে আসবাবপত্র ও কার্পেট উল্টে রাখা হয়।[১]

১ Ency. of Religion and Ethics, edt. James Hastings, vol iv, pp, 550, 501, 502

আরো কয়েকটি আকর গ্রন্থ ও সংক্ষেপে উল্লেখিত গ্রন্থের পূর্ণ নাম

1· American Journal of Psychology, Religions and Education (AJRPE)
2. Archaeological Survey of W. India (ASWI)
3. Bombay Gazatteer (BG)
4. Census of India (CI)
5. Contemporary Review (CR)
6. Dictionary of Islam (DT)
7. Folklore (FL)
8. Folklore Journal (FLJ)
9. Folklore Record (FLR)
10. Golden Bouga (Frazer) (GB)
11. History of Israel (HI)
12. Indian Antiquary (IA)
13. Journal of Asiatique (JA)
14. Journal of American Folklore (JAFL)
15. Journal of American Oriental Socicty (JAOS)
16. Journal of Anthropological Society of Bombay (JASB)
17. Oriental Translation Fund Publications (OTP)
18. Publication by the Bureau Ethnology (PBE)
19. Popular Religion and Folklore of N. India (PRFI)
20. Reports of the Bureau of Ethnology (RBE)
21. Sacred Books of the East (SBE)
22. Tribes and Castes (TC)
23. Isaiah (Is)
24. Old Testament (OT)
25. New Tcstament (NT)
26. Encyclopaedia of World's Religions
27. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edt. James Hastings
28. The World's Religions (A Lion Hand book)
29. History of Religion (Sergei Tokarev)

30. Mysteries of Afterlife (F. Smyth and Roy Stemman)
31. Mysteries of the Inner Self (S. Holroyd)
32. Mysteries of the Mind (C. Wilson and S. Holroyd)
33. The Cultural Heritage of India
34. Indian Philosophy—Dr. Radha Krishna, Vol I
35. The Story of Philosophy—Will Durant
36. Structure and Pattern of Religion—Gustav Mansching
37. দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা—লেখক
38. Life Beyond Death—S. Abhedananda
39. মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব—মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
40. The Tao of Physics—Fritjof Capra
41. Beyond Einstein—Michio Kaku and J. Trainer
42. A Brief History of Time—Stephen. W. Hawking

* অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা প্রতি পৃষ্ঠার ফুটনোটে দেওয়া হয়েছে।